'কিন্তু, কিন্তু—এ আপনি কেমন করে পেলেন মশাই!' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস না করে পারলেন না।

ফেলুদা বলল, 'এই শালুটা আপনিও দেখেছিলেন আজ সকালে। রামাই নামে নুলিয়া বাচ্চাটি মাথায় জড়িয়ে বসে ছিল। দেখেই সন্দেহ হয়। নুলিয়া বস্তিতে গিয়ে খোঁজ করে আমি আজই সকালে এটা উদ্ধার করি। পুঁথিটা পেয়ে ছেলেটি তার মার কাছে দিয়ে আসে। শালুটা সে নিয়ে নেয়, পাটা আর পুঁথি ওদের ঘরেই সযত্নে রাখা ছিল। দশ টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে আমায়। মিঃ মহাপাত্র, মিঃ সরকারের পকেট থেকে পার্সটা নিয়ে তার থেকে দশটা টাকা বের করে দিন তো আমায়।'

* * *

দুর্গাগতিবাবুর বাড়ির ছাত থেকে সমুদ্রটা যে আরও কত বিশাল দেখায় সেটা আজ ছাতের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম।

কাল রাত্রে সব চুকে যাবার পর মিঃ সেন বার বার অনুরোধ করলেন, আমরা যেন সকালে তাঁর বাড়িতে এসে কফি খাই। মহিমবাবু রাত্রে বাপের সঙ্গেই থাকলেন, কারণ নিশীথবাবু নেই, চাকরটাও ঘুষ খেয়ে পালিয়েছে। ফেলুদা কথা দিয়েছে, শ্যামলাল বারিককে বলে একজন চাকরের বন্দোবস্ত করে দেবে। রান্নার একটা লোক অবিশ্যি আছে; সে-ই কফি করে এনেছে আমাদের জন্য, আর সে-ই ছাতে চেয়ার পেতে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়েছে।

এখানে বলে রাখি, পুঁথি উদ্ধার করার জন্য ফেলুদা যা পারিশ্রমিক পেয়েছে, তাতে ওর গত তিন মাসের বসে থাকা পুষিয়ে গেছে। ও অবিশ্যি ওর স্বভাব অনুযায়ী প্রথমে টাকা নিতে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে বাপ-ছেলের পীড়াপীড়িতে চেক নিতেই হল। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন, 'আপনি না নিলে আপনার মাথায় আবার ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্টের বাড়ি পড়ত, এবং সেটা মারতুম আমি। এ সব ব্যাপারে আপনার হ্যাঁ-না, না-হ্যাঁ ভাবটা ডিজগাস্টিং।'

কফি খেতে খেতেই ফেলুদা বলল, 'আপনি কি জানেন মিঃ সেন, আমার কাছে সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল আপনার গাউট?'

দুর্গাগতিবাবু কপালে ভুরু তুলে বললেন, 'কেন, এতে রহস্যের কী আছে? বুড়ো মানুষের গাউট হতে পারে না?'

'কিন্তু গাউট নিয়েই তো আপনি সকাল-সন্ধে সমুদ্রের ধারে দিব্যি হেঁটে বেড়ান। গোড়ায় এসে পায়ের ছাপ দেখেছি এবং মুর্খের মতো ভেবেছি সেটা বিলাস মজুমদারের ফুটপ্রিন্ট। কিন্তু কাল যে আপনাকে স্বচক্ষে দেখলাম।'

'তাতে কী প্রমাণ হল মিঃ মিত্তির? গাউটের যন্ত্রণা যে সর্বক্ষণ স্থায়ী, এমন তো নয়।'

'কিন্তু আপনার পায়ের ছাপ যে অন্য কথা বলছে, মিঃ সেন। সে কথাটা কাল রাত্রে বলিনি, কারণ আমার বিশ্বাস কথাটা আপনি গোপন রাখতে চান। কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে কী, গোয়েন্দার কাছ থেকে যে সব কিছু গোপন রাখা যায় না। আপনার বাঁ হাতের লাঠিটাই যে শুধু তাৎপর্যপূর্ণ তা তো নয়, আপনার দুটো জুতোর ছাপে যে বেমিল রয়েছে।'

দুর্গাগতিবাবু চুপ করে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলে চলল, 'সেদিন কাঠমাণ্ডুর বীর হাসপাতালে ফোন করে বিলাস মজুমদারের ইনজুরির ব্যাপারটা কনফার্মড হয়। সেখানে ওই সময়ে পাহাড় থেকে পড়ে জখম হওয়া আর কোনও পেশেন্ট আসেনি। শেষে গাইড বুকে দেখলাম কাঠমাণ্ডুর কাছেই পাটানে আরেকটা হাসপাতাল আছে—শান্তা ভবন। সেখানে ফোন করে জানি যে দুর্গাগতি সেন অক্টোবর থেকে জানুয়ারির গোড়া পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। আপনার ইনজুরির বর্ণনাও তারা দিল।'

দুর্গাগতিবাবুর মুখের চেহারা পালটে গেছে। একটুক্ষণ চুপ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নিশীথ জানত যে আমি ব্যাপারটা কাউকে জানতে দিতে চাই না। সকালে কেউ আসার থাকলে ও-ই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিত, আর জিজ্ঞেস করলে বলত গাউট। আজ মহিম বেঁধে দিয়েছে ব্যান্ডেজ। এ জিনিস আমি প্রচার করতে চাইনি, মিঃ মিত্তির। একটা মহামূল্য পুঁথি হারানোর চেয়ে এটা কিছু কম ট্র্যাজিক নয়। কিন্তু আপনি যখন বুঝেই ফেলেছেন—'

দুর্গাগতিবাবু তাঁর বাঁ পায়ের ট্রাউজারটা বেশ খানিকটা তুলে ফেললেন।

অবাক হয়ে দেখলাম ব্যান্ডেজটা শুধু গোড়ালির ইঞ্চি তিনেক উপর অবধি। তার উপরে আসল পায়ের বদলে রয়েছে কাঠ আর প্লাস্টিকে তৈরি যান্ত্রিক পা।

॥ শেষ ॥

পাহাড়ে ফেলুদা

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে

১

রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাংগুলী ওরফে জটায়ুর মতে হগ সাহেবের বাজারের মতো বাজার নাকি ভূ-ভারতে নেই। যারা জানে না তাদের জন্যে বলা দরকার যে হগ সাহেবের বাজার হল, আমরা যাকে নিউ মার্কেট বলি তারই আদি নাম। —'দিল্লী বোম্বাই যোধপুর জয়পুর সিমলা কাশী, সবই তো দেখলুম, আর আপনাদের সঙ্গেই দেখলুম, কিন্তু আন্ডার দি সেম রুফ এমন একটা বাজার কোথাও দেখেছেন কি ?'

এ ব্যাপারে অবিশ্যি আমি আর ফেলুদা দুজনেই লালমোহনবাবুর সঙ্গে একমত। মাঝে একটা কথা হয়েছিল যে এই মার্কেট ভেঙে ফেলে সেখানে একটা মাল্টি-স্টোরি সুপার মার্কেট তৈরি হবে। ফেলুদা তো শুনেই ফায়ার। বলল, 'এ কাজটা হলে কলকাতার অর্ধেক কলকাতাত্ব চলে যাবে, সেটা কি এরা বুঝতে পারছে না ? নগরবাসীদের কর্তব্য : প্রয়োজনে অনশন করে এই ধ্বংসের পথ বন্ধ করা।'

আমরা তিনজন গ্লোবে ম্যাটিনিতে এপ অ্যান্ড সুপার এপ দেখে বাইরে এসে নিউ মার্কেটে যাব বলে স্থির করেছি। লালমোহনবাবুর টর্চের ব্যাটারি আর ডট পেনের রিফিল কেনা দরকার, আর ফেলুদাও বলল কলিমুদ্দির দোকান থেকে ডালমুট নিয়ে নেবে ; বাড়ির ডালমুট মিইয়ে গেছে, অথচ চায়ের সঙ্গে ওটা চাই-ই চাই। তা ছাড়া লালমোহনবাবুর একবার মার্কেটটা ঘুরে দেখা দরকার, কারণ কালই নাকি এই মার্কেটকে সেন্টার করে একটা ভালো ভুতুড়ে গল্পের প্লট ওঁর মাথায় এসেছে। ট্রাফিক বাঁচিয়ে রাস্তা পেরিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সির লাইনের ফাঁক দিয়ে এগোনোর সময়

প্লটের খানিকটা আভাস দিলেন আমাকে—'একজন লোক রাত্তিরে মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবার পরে দেখে কি, সে ভিতরে আটকা পড়ে গেছে। লোকটা রিটায়ার্ড জজ—অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। বোঝো তপেশ—এই বিশাল হগ সাহেবের বাজার, সব দোকান বন্ধ, সব বাতি নিভে গেছে, শুধু লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকের কোল্যাপ্‌সিব্‌ল গেটের ভিতর দিয়ে আসা রাস্তার ক্ষীণ আলোয় যেটুকু দেখা যায়। গলিগুলোর এ মাথা থেকে ও মাথা খাঁ খাঁ করছে, আর তারই মধ্যে কেবল একটিমাত্র দোকান খোলা, একটা কিউরিওর দোকান, তাতে টিমটিমে আলো, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কাল, হাতে ছোরা! খুনীর কঙ্কাল, যে খুনীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিলেন ওই জজ সাহেব। যে দিকেই পালাতে যান, মোড় ঘুরেই দেখেন সামনে সেই কঙ্কাল, হাতে ছোরা, ড্রিপিং উইথ ব্লাড!'

আমি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বললাম ভদ্রলোক ভেবেছেন ভালোই, তবে ফেলুদার হেল্‌প না নিলে গল্পের গোড়ায় গলদ থেকে যাবে; জজ সাহেবের আটকে পড়ার বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে বার করা জটায়ুর সাধ্যের বাইরে।

সামনেই মোহনস্‌-এর কাপড়ের দোকানের ডান পাশ দিয়ে ঢুকে, বাঁয়ে ঘুরে গুলাবের ঘড়ির দোকান পেরিয়ে ডাইনে একটু গেলেই একটা তেমাথার মোড়ে ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের দোকান। ব্যাটারি সেইখানেই পাওয়া যাবে, আর তার উলটো দিকেই পাওয়া যাবে রিফিল। দে ইলেকট্রিক্যালসের মালিক ফেলুদার ভক্ত, দেখেই একগাল হেসে নমস্কার করলেন। আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক ঢুকলেন, তিনি গল্পে একটা বড় ভূমিকা নেবেন, তাই তাঁর বর্ণনা দিয়ে রাখি। বছর চল্লিশ বয়স, মাঝারি হাইট, ফরসা রং, মাথার চুল পাতলা, দাড়ি-গোঁফ নেই, সাদা বুশ শার্ট, কালো প্যান্ট আর হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ।

'আপনি মিস্টার মিত্র না?' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে অবাক হেসে প্রশ্নটা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওই সামনের বইয়ের দোকানের লোক আমাকে চিনিয়ে দিল।

বলল, উনি হচ্ছেন ফেমাস ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্র। হাউ স্ট্রেঞ্জ! ঠিক আপনার কথাই ভাবছি আজ দু দিন থেকে।'

বাংলায় সামান্য টান। হয় ও দিকের লোক এ দিকে সেট্‌লড, নাহয় এ দিকের লোক ও দিকে।

'কেন বলুন তো?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক কিছুটা নার্ভাস কি? গলাটা খাক্‌রে নিয়ে বললেন, 'সেটা আপনার সঙ্গে দেখা করেই বলব। আপনি কাল বাড়ি থাকবেন কি?'

'বিকেল পাঁচটার পরে থাকব।'

'তা হলে আপনার অ্যাড্রেসটা যদি একটু—'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা নোটবুক আর ফাউনটেন পেন বার করে ফেলুদার হাতে দিলেন। ফেলুদা ঠিকানা লিখে দিল।

'স্যরি!'

ভদ্রলোকের 'স্যরি' বলার কারণ আর কিছুই না, পেন থেকে সামান্য বেগুনি কালি লিক করে ফেলুদার আঙুলে লেগেছে। আমি জানি ফেলুদা পুরনো ধরনের ফাউনটেন পেনই পছন্দ করে, বলে তাতে হাতের লেখা আরও ভাল হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে লিক করে বলে ইদানীং ডট পেনই ব্যবহার করছে।

'আমার নাম বাটরা,' পেন-খাতা পকেটে পুরে বললেন ভদ্রলোক, 'আমার গ্র্যান্ডফাদার ক্যালকাটায় সেট্‌ল করেছিলেন সেভেনটি ফাইভ ইয়ারস আগে।'

'আই সি।'

'এর মধ্যেই মক্কেল জুটিয়ে ফেললেন নাকি?'

ভদ্রলোক চলে যাবার পরমুহূর্তেই সামনের দোকান থেকে রিফিল কিনে এনে প্রশ্ন করলেন জটায়ু। ফেলুদা একটা নিঃশব্দ হাসি ছাড়া কোনও মন্তব্য করল না। তিনজনে রওনা দিলাম ডালমুটের উদ্দেশে।

লালমোহনবাবু পকেট থেকে ওঁর ছোট্ট লাল ডায়রিটা বার করে নোট নিতে শুরু করলেন। তার ফলে মাঝে মাঝে একটু পিছিয়ে পড়ছেন, আবার তৎক্ষণাৎ পা চালিয়ে আমাদের পাশ নিয়ে

নিচ্ছেন। গত সপ্তাহে একবার লোডশেডিং-এর মধ্যে এসে দেখেছি, সারা মার্কেটটার উপরে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছে। আজ আলো থাকায় ভোল পালটে গেছে। পদে পদে কানে আসছে এ পাশ ও পাশ থেকে ছুঁড়ে মারা 'কী চাইলেন দাদা ?'—আর আমরা তারই মধ্যে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছি ভিড় বাঁচিয়ে। ফেলুদার লক্ষ্য একটাই, কিন্তু দৃষ্টি ডাইনে বাঁয়ে সামনে তিন দিকে, যদি তার জন্য ঘাড় ফেরাতে হয় না, চোখ ফেরালেই হল, আর তাতেই মনের মধ্যে অবিরাম ছাপা হয়ে যাচ্ছে ছবি আর কথা, যেগুলো পরে কখন কোন্ কাজে লাগবে কে জানে। আমি জানি, লালমোহনবাবু অত কসরৎ করে খাতায় যা লিখছেন, ফেলুদার মাথায় আগেই তা লেখা হয়ে যাচ্ছে। সামনে পুজো, তাই ভিড় বেশি, তাড়া বেশি, কেনার তাগিদ বেশি, লোকের পকেটে পয়সাও নিশ্চয়ই বেশি।

লালমোহনবাবু বেশ সাহেবি কায়দায় 'কস্‌মোপোলিট্যান' কথাটা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কলিমুদ্দির দোকানের সামনে এসে পড়লাম। এ দোকানও চেনা, 'সালাম বাবু' বলে কলিমুদ্দি তার কাজে লেগে গেল। দিব্যি লাগে দু হাতে ঠোঙা ধরে ঝাঁকিয়ে মেশানোর ব্যাপারটা। আর সেই সঙ্গে টাটকা, নোনতা, জিভে-জল আনা গন্ধ।

আমি গরম ঠোঙাটা হাতে নিয়েছি, এমন সময় দেখি ওয়ালেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে কী যেন একটা দেখে ফেলুদা একেবারে স্ট্যাচু।

কারণটা স্পষ্ট। আমাদের পাশ দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে লোকটা এই মুহূর্তে মার্কেটের আরও ভিতর দিকে চলে গেল, সে হল মিঃ বটরার ডুপলিকেট।

'টুইন্‌স,' চাপা গলায় মন্তব্য করলেন জটায়ু।

সত্যি, যমজ ছাড়া এ রকম হুবহু মিল কল্পনা করা যায় না। তফাৎ শুধু শার্টের রঙে। এঁরটা গাঢ় নীল। হয়তো কাছ থেকে সময় নিয়ে দেখলে আরও তফাত ধরা পড়ত, কিন্তু সেও নিশ্চয়ই খুবই সূক্ষ্ম। অবিশ্যি আর-একটা তফাত এই যে, ইনি ফেলুদাকে আদপেই চেনেন না।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' ফেরা-পথে রওনা দিয়ে বলল ফেলুদা, 'মিঃ বাটরার একটি যমজ ভাই থেকে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'সে আপনার নীলগিরি, বিন্ধ্য, আরাবল্লী, ওয়েস্টার্ন ঘাট্‌স—যাই বলুন না কেন, পাহাড়ের মাথায় যদি বরফ না থাকে, তাকে আমি পাহাড়ই বলব না।'

এবার পুজোয় পাহাড়ে যাবার কথাটা ক' দিন থেকেই হচ্ছিল। নতুন উপন্যাস বেরিয়ে গেছে, লেখার তাগিদ নেই, তাই লালমোহনবাবু তার সেকেন্ড হ্যান্ড সবুজ অ্যাম্বাসাডারে রোজই বিকেলে আসছেন আড্ডা দিতে। কাশ্মীরটা আমাদের কারুরই দেখা হয়নি, কিন্তু ওখানকার অক্টোবরের শীত সহ্য হবে না সেটা বোধ হয় নিজেই বুঝতে পেরে লালমোহনবাবু দু-একবার 'কাশ' 'কাশ' করে থেমে গেছেন। একটা অ্যাটলাস পড়ে আছে সামনের টেবিলে চা-ডালমুটের পাশে, সেটা খুলে বোধহয় ভারতবর্ষের ম্যাপটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকের, এমন সময় কলিং বেল।

শ্রীনাথ আমাদের বাড়িতে চোদ্দ বছর কাজ করছে, তাই মিঃ বাটরা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে আর-এক পেয়ালা চা এসে গেল।

'আপনার কি কোনও যমজ ভাই আছে?'

বাটরা কপালের ঘাম মুছে রুমালটা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

মিঃ বাটরার ভুরু যে কতটা ওপরে উঠতে পারে, আর তলার ঠোঁট যে কতটা নিচে নামতে পারে, সেটা এই এক প্রশ্নেই বোঝা গেল।

'আপনারা...আপনারা কী করে... ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হবার মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই নিউ মার্কেটেই তাকে দেখেছি আমরা', বলল ফেলুদা।

'মিস্টার মিটরা',—চেয়ারে প্রায় এক হাত এগিয়ে এসে হাতলে একটা জবরদস্ত চাপড় মেরে বললেন মিঃ বাটরা—'আই অ্যাম দি

ওনলি চাইল্ড অফ মাই পেরেন্টস্। আমার ভাই বোন কিচ্ছু নেই।'

'তাহলে— ?'

'সেজন্যেই তো আপনার কাছে এলাম মিঃ মিটরা। এক উইক হল এই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে। ফ্রম কাঠমাণ্ডু। আমি কাঠমাণ্ডুর একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করি—সান ট্র্যাভেলস—আই অ্যাম দ্য পি আর ও। আমাকে কাজের জন্য ক্যালকাটা বোম্বাই দিল্লি যেতে হয় মাঝে মাঝে। আমার অফিসের কাছে একটা ভাল রেস্টোরান্ট আছে—ইন্দিরা—সেখানেই লাঞ্চ করি আমি এভরি ডে। লাস্ট মানডে গেছি—ওয়েটার বলছে, আপনি তো আধঘন্টা আগে লাঞ্চ করে গেলেন, আবার কী ব্যাপার ?—বুঝুন মিঃ মিটরা ! আরও দু'-একজন চেনা লোক ছিল, তারাও বলল আমাকে দেখেছে। দেন আই হ্যাড টু টেল দেম—কি আমি আসিনি। তখন ওয়েটার বলে কি, ওর সাসপিশন হয়েছিল, কারণ যে লোক খেতে এসেছিল, হি হ্যাড এ ফুল লাঞ্চ, উইথ রাইস অ্যান্ড কারি অ্যান্ড এভরিথিং ; আর আমি খাই স্রেফ স্যান্ডউইচেজ অ্যান্ড এ কাপ অফ কফি !'

মিঃ বাটরা দম নিতে থামলেন। আমরা তিন জনেই ঝাঁকে বলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লালমোহনবাবু বেশি মনোযোগ দিলে মুখ হাঁ হয়ে যায়, এখনও সেই অবস্থা। মিঃ বাটরা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন।

'আমি কলকাতায় এসেছি পরশু, সানডে। কাল সকালে হোটেল থেকে বেরোচ্ছি—আমি আছি গ্র্যান্ডে—ফ্র্যাঙ্ক রসে যাব টু বাই সাম অ্যাসপিরিন। আপনি জানেন বোধ হয়, হোটেলের ভিতরেই একটা কিউরিওর দোকান আছে ? সেইটের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ শুনি, ভিতর থেকে আমায় ডাকছে—মিঃ বাটরা, প্লিজ কাম ফর এ মোমেন্ট !—কী ব্যাপার ? গেলাম ভিতরে। সেলসম্যান একটা একশো টাকার নোট বার করে আমাকে দেখাচ্ছে। বলে—মিঃ বাটরা, আপনার এই নোটটা জাল নোট, নো ওয়াটারমার্ক, প্লিজ চেঞ্জ ইট !—আমার তো মাথায় বাজ পড়ল মিঃ মিটরা ! আমি তো

দোকানে ঢুকিইনি ! অ্যান্ড দে ইনসিসটেড, কি আমি গেছি আধ ঘন্টা আগে, আর আমি ওই একশো টাকার নোট দিয়েছি ওদের, অ্যান্ড আই বট এ কুক্‌রি !'

'কুক্‌রি ? মানে, নেপালী ছুরি ?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'বুঝুন কী ব্যাপার ! আমি থাকি কাঠমাণ্ডুতে ; কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দোকান থেকে আমি নেপালের জিনিস কিনব কেন ? নেপালে তো ও জিনিস আমি হাফ প্রাইসে পাব !'

'আপনাকে নোটটা বদলে দিতে হল ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'অনেকবার বললাম, যে আই অ্যাম নট দ্য সেম পারসন। শেষকালে এমন ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগল যেন আমি আইদার পাগল, অর ফোর-টোয়েন্টি। এ অবস্থায় কী করা যায়, বলুন !'

'হুঁ...'

ফেলুদা ভাবছে। হাতটা সাবধানে বাড়িয়ে চারমিনারের ডগা থেকে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাইটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনি বেশ অসহায় বোধ করছেন সেটা বুঝতে পারছি।'

'আমার রেগুলার প্যানিক হচ্ছে, মিঃ মিটরা। সে যে কখন কী করবে, তার ঠিক কী ?'

'খুবই অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল ফেলুদা। 'আপনার কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হত, যদি না আমরা নিজের চোখে সে লোককে দেখতাম। কিন্তু তাও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি এ ব্যাপারে আপনাকে কীভাবে হেল্প করতে পারি, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভদ্রলোকও চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটা ঠিক। এখন, আমি তো কাল কাঠমাণ্ডু ফিরে যাচ্ছি। ভরসা কী যে সে লোক আমার পিছে পিছে যাবে না, আর সেখানেও আমাকে হ্যারাস করবে না ? এ তো বুঝতে পারছি যে সে লোককে আমি না দেখলেও, সে আমাকে দেখেছে, আর ডেলিবারেটলি আমার পিছনে লেগেছে। দিস ইজ এ নিউ টাইপ অফ ক্রাইম, মিঃ মিটরা। এবারে

হাম্ব্রেড রুপিজের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এর পরে কী হবে কে জানে ?'

বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় ফেলুদা এমনিতে পায়ের উপর পা তুলে বসে। যখন বোঝে আর কথা বলার নেই, বেশি বললে সময় নষ্ট হবে, তখন পা-টা এমন ভাবে নামিয়ে নেয় যে তাতেই বেশ বোঝা যায় 'এবার আপনি আসুন'। আজও তাই করল, আর তাতে ফলও হল। মিঃ বাটরা উঠে পড়লেন। বুঝলাম কতকটা ভদ্রতার খাতিরেই ফেলুদা বলল, 'আশা করি কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে কোনও অসুবিধায় পড়তে হবে না।'

'সেট আস হোপ সো', বললেন ভদ্রলোক। 'এনিওয়ে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি মিঃ সর্বেশ্বর সহায়ের কাছে।'

সর্বেশ্বর সহায় ফেলুদার এক মক্কেল। কোডার্মায় থাকেন। হাজারিবাগে তাঁর একটা বাংলো প্রায়ই খালি পড়ে থাকে ; আমরা একবার সেখানে গিয়ে ছিলাম দিন দশেক।

'কাঠমাণ্ডুতে কোনও গোলমাল দেখলে আপনি পুলিসে খবর দিয়ে দেবেন', বলল ফেলুদা। 'এসব লোকের দরকার স্রেফ ধোলাই।'

মিঃ বাটরা চলে যাবার পর লালমোহনবাবু প্রথম মুখ খুললেন।

'আশ্চর্য! ফরেন কান্ট্রি বলেই বোধহয় এই হিল স্টেশনের কথাটা একবারও মাথায় আসেনি।'

২

পরদিন সকালে যে ঘটনাটা ঘটল, বলা যেতে পারে সেটা থেকেই আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের শুরু। অবিশ্যি সেটার বিষয়ে বলার আগে গতকাল রাত্রের টেলিফোনটার কথা বলা দরকার।

কলকাতায় অক্টোবর মাসেও মাঝে মাঝে আকাশ কালো-টালো করে বৃষ্টি এসে যায়। কালও তাই হল। লালমোহনবাবু সাধারণত

বিকেলে এলে আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকেন ; কাল সাতটা নাগাদ মেঘের গর্জন শুনে হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়লেন—'বরঞ্চ কাল সকালে আসা যাবে, তপেশ। নিউ মার্কেটের প্লটটা আরও খানিকটা এগিয়েছে ; তোমার একটা ওপিনিয়ন নেওয়া দরকার।'

বৃষ্টি এল আটটায়, আর ফোনটা পৌনে নটায়। ফেলুদা ওর ঘরে এক্সটেনশনে কথা বলল, আর আমি বসবার ঘরের মেইন টেলিফোনে শুনলাম।

'মিস্টার প্রদোষ মিত্র ?'

'কথা বলছি।'

'ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্র ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর।'

'নমস্কার। আমার নাম অনীকেন্দ্র সোম। আমি বলছি সেন্ট্রাল হোটেল থেকে।'

'বলুন।'

'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। একটু দেখা করা যাবে কি ?'

'ব্যাপারটা জরুরী ?'

'খুবই। আজ তো বাদলা, তবে কাল সকালে যদি একটু সময় দিতে পারেন। আমি বাইরে থেকে এসেছি, এবং আসার একটা প্রধান কারণ হল আপনার সঙ্গে দেখা করা। মনে হয়, আপনি ব্যাপারটা শুনলে ইন্টারেস্টেড হবেন।'

'টেলিফোনে এর বেশি বলা যাবে না বোধ হয় ?'

'আজ্ঞে না। ভেরি স্যরি।'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল সকাল নটায়। 'কণ্ঠস্বরে বেশ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়', বলল ফেলুদা। আমারও অবিশ্যি তাই মনে হয়েছিল। মনে মনে বললাম—সকালে বটব্যাল, বিকেলে সোম—মক্কেলের কিউ লেগে গেছে।

আজকাল ফেলুদার সঙ্গে আমিও যোগব্যায়াম করি। সকাল আটটার মধ্যে স্নান-টান সেরে দু'জনেই সারা দিনের জন্য তৈরি। সাড়ে আটটায় লালমোহনবাবু ফোন করে বললেন, সে দিন

নিউমার্কেটে একটা দোকানের উইন্ডোতে নাকি একটা লাইট গ্রিন জার্কিন দেখেছেন, সেইটের দরটা জেনেই আমাদের বাড়িতে চলে আসবেন। বুঝলাম, ভদ্রলোক ছিল স্টেশনে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিয়েছেন।

পৌনে দশটাতেও যখন অনীকেন্দ্র সোম এলেন না, তখন হাত থেকে খবরের কাগজটা পাশে ফেলে ফেলুদার মাথা নাড়ার ভাবটা দেখে বুঝলাম, বাঙালিদের পাংচুয়ালিটির অভাব নিয়ে একটা তেতো মন্তব্য করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল।

'মার্ডার ভিকটিমের নোটবুকে আপনার ফোন নম্বর দেখছি কেন মশাই?'

প্রশ্নটার মধ্যে একটা ভড়কে দেবার ভাব থাকলেও, আসলে সেটা যে হালকা মেজাজেই করা হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রশ্নকর্তা হচ্ছে জোড়াসাঁকো থানার ইন্সপেক্টর মহিম দত্তগুপ্ত।

ফেলুদার কপালে খাঁজ।

'কে খুন হল?'

'চলে আসুন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। সেন্ট্রাল হোটেল। তেইশ নম্বর ঘর।'

'অনীকেন্দ্র সোম কি?'

'আপনার চেনা নাকি?'

'পরিচয় হবার কথা ছিল আজ সকালেই। কীভাবে খুন হল?'

'ছুরিকাঘাত।'

'কখন?'

'আর্লি মর্নিং। এলে সব জানতে পারবেন। আমি এসেছি এই মিনিট কুড়ি।'

'আমি চেষ্টা করছি আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে।'

লালমোহনবাবু এলেন দশ মিনিট পরেই, তবে ঘরে ঢোকার আর সুযোগ পেলেন না। 'মার্ডার!' বলে লালমোহনবাবুকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তার গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে তাঁর পাশে বসে ফেলুদা ড্রাইভার হরিপদবাবুকে বলল, 'সেন্ট্রাল হোটেলে, চট-জলদি।'

আপিসের ট্রাফিক, তার মধ্যেই যথাসম্ভব স্পিডে চলেছে আমাদের গাড়ি, আমি সামনে বসে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখেই বুঝেছি, লালমোহনবাবুর অবস্থা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো। এটাও তিনি জানেন যে, এ অবস্থায় ফেলুদাকে কোনও প্রশ্ন করেই উত্তর পাবেন না।

হোটেলে পৌঁছে যেটা জানা গেল, তা মোটামুটি এই। রবিবার সন্ধ্যাবেলা অনীকেন্দ্র সোম এসে হোটেলে ওঠেন। খাতা থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি থাকেন কানপুরে। আগামীকাল তাঁর চলে যাবার কথা ছিল। আজ ভোর পাঁচটায় নাকি একজন লোক এসে তাঁর খোঁজ করেন। তাঁকে বলা হয় সোম থাকেন তেইশ নম্বর ঘরে। দোতলার ঘর, তাই আগন্তুক লিফটে না উঠে সিঁড়ি দিয়েই ওঠেন, আর মিনিট পনের বাদেই নাকি চলে যান। চেহারার বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, পরিষ্কার রঙ, দাড়ি-গোঁফ নেই, পরনে ছাই রঙের প্যান্ট আর নীল বুশ সার্ট। দারোয়ান বলল যে, ভদ্রলোক নাকি একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

মিঃ সোম আটটায় ব্রেকফাস্ট চেয়েছিলেন, রুমবয় ঠিক সময়ে গিয়ে দরজার বেল টিপে কোনও সাড়া পায়নি। তার পর ডুপলিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে দেখে, দরজার সামনেই পড়ে আছে মিঃ সোমের মৃতদেহ। অস্ত্রটা হচ্ছে একটা নেপালি কুকরি। সেটা মেরেছে বুকের মোক্ষম জায়গায়, এবং সেটাকে আর বার করা হয়নি।

তেইশ নম্বর ঘরে পুলিস খানাতল্লাশি করছে, তবে জিনিস বলতে বিশেষ কিছুই নেই। একটি মাত্র ছোট ভি আই পি ব্যাগ, তাতে দিন-তিনেকের ব্যবহারের জন্য জামা-কাপড়। টাকা-পয়সা কিছুই পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে সেগুলো আততায়ীই সরিয়েছে। ফেলুদা লাশ দেখে এসে বলল ভদ্রলোক রীতিমতো সুপুরুষ ছিলেন, বয়স ত্রিশের বেশি নয়। রুম-বয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল মিঃ সোম সিগারেট খেতেন না, ড্রিংক করতেন না। রিসেপশনে বসেন মিঃ লতিফ, তিনি বললেন মিঃ সোম নাকি গতকাল বেশির ভাগ সময়টাই হোটেলের বাইরে ছিলেন, ফেরেন

বৃষ্টি নামার ঘন্টাখানেক আগে। আজ ভোরে ছাড়া ওঁর কাছে কোনও ভিজিটর আসেনি, কেউ টেলিফোনেও ওঁর খোঁজ করেনি। তবে হ্যাঁ, এই হোটেলের ঘরে টেলিফোন নেই, তাই মিঃ সোম নাকি কাল রাত্রে রিসেপশন থেকে ডিরেক্টরি দেখে একটা নম্বর বার করে কাকে যেন টেলিফোন করেন, এবং করার পর নিজের নোটবুকে নম্বরটা লিখে নেন।

যে নোটবুকে ফেলুদার নম্বরটা ছিল, সেটা পাওয়া যায় খাট এবং বেডসাইড টেবিলের মাঝখানে মেঝেতে। নতুন কেনা নোটবুক, তার প্রথম তিনটে পাতাতেই শুধু লেখা। এলোমেলো টুকরো টুকরো কথা—বাংলা ইংরেজি মেশানো। 'কী মনে হচ্ছে বল তো?'—একটা পাতা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'লেখা মাঝে মাঝে কেঁপে গেছে, বিশেষ করে "ঘাঁটি" কথাটা তো প্রায় পড়াই যায় না।'

'প্রচণ্ড নার্ভাস টেনশনে লিখেছেন বলে মনে হয়', মন্তব্য করলেন জটায়ু।

'অথবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান কোনও যানে,' বলল ফেলুদা, 'ধরুন ঘন্টায় ছ'শো মাইল।'

বোঝাই যাচ্ছে ফেলুদা প্লেনের কথা বলছে। জেটপ্লেনের স্পিড গড়ে ঘন্টায় ছ'শো মাইল হতে পারে।

'আমার বিশ্বাস ঘাঁটি কথাটা লেখার সময় প্লেনটা একটা এয়ারপকেটে পড়েছিল,' বলল ফেলুদা।

'মোক্ষম ধরেছেন,' বললেন জটায়ু, 'সেবার বম্বে যাবার সময় মনে আছে সবেমাত্র কফিতে চুমুক দিয়েছি—আর অমনি পকেট! সে মশাই কফি অন্ননালীতে না গিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে বিষম-টিষম লেগে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।'

ফেলুদা লেখাগুলো নিজের খাতায় টুকে নিয়ে নোটবুকটা মহিমবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল।

'আমরা কানপুরে জানিয়ে দিচ্ছি,' বললেন মহিম দত্তগুপ্ত, 'লাশ সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে তো।'

ফেলুদা বলল, 'আমার বিশ্বাস, রাত্তিরে দিল্লি থেকে একটা ফ্লাইট আছে, যেটা কানপুর হয়ে আসে। গত রবিবারের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম নামে কোনও প্যাসেঞ্জার ছিল কিনা, সেটাও খোঁজ করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা লোকটা কোনও পাহাড়ি জায়গা থেকে আসছে।'

'কেন বলুন তো ?'

'এক জোড়া মাউন্টেনিয়ারিং বুটস দেখলাম, তার একটার তলায় এক টুকরো ফার্ন লেগে রয়েছে, যেটা পাহাড়েই থাকা স্বাভাবিক।'

মহিমবাবু বললেন নতুন কোনও তথ্য পেলেই জানিয়ে দেবেন, বিশেষ করে কুক্‌রির হাতলে কোনও ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া গেল কিনা।

'আর গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকেই প্যাসেজের বাঁ দিকে একটা কিউরিওর দোকান আছে,' বলল ফেলুদা, 'খোঁজ করে দেখতে পারেন, কুক্‌রিটা ওখান থেকেই কেনা হয়েছে কিনা।'

ফেরার পথে নোটবুকের তিনটে পাতায় যে লেখাগুলো ছিল, সেগুলো দেখাল ফেলুদা।

প্রথম পাতায় দু' লাইন লেখা—১) only L S D. কি ? ২) ASK C P about methods and past cases.

দ্বিতীয় পাতায় তিন লাইন—১) ঘাঁটি এখানে না ওখানে ? ২) A B সম্বন্ধে আগে জানা দরকার ; ৩) Ring up P C M, D D C.

তৃতীয় পাতায় শুধু আমাদের বাড়ির ফোন নম্বর।

'ফরেন কারেন্সি ঘটিত কোনও ব্যাপার নাকি মশাই ?' প্রশ্ন করলেন জটায়ু। মেট্রো ছাড়িয়ে চৌমাথায় লাল বাতিতে এসে থেমেছে আমাদের গাড়ি।

'কেন বলুন তো ?'

'না, ওই এল এস ডি দেখলাম কিনা। পাউন্ড-শিলিং-পেন্স তো ?'

'আপনি বৈষয়িক চিন্তাটা একটু কম করুন তো মশাই,' মেকি ধমকের সুরে বলল ফেলুদা—'এল এস ডি হল এক রকম ড্রাগ। লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইয়েথিলামাইড। হিপিদের দৌলতে এর

খ্যাতি এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা বলেন, মানুষের মগজে সেরোটোনিন বলে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেটা মানুষকে সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে বুঝতে, চিন্তা করতে সাহায্য করে। এল এস ডি নাকি সেরোটোনিনের মাত্রা সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্য মানুষ তাই একটা অবাস্তব জগতে বিচরণ করে। ধরুন, এই চৌরঙ্গিকে মনে হতে পারে নন্দনকানন।'

'বলেন কি! এ জিনিস কিনতে পাওয়া যায় নাকি?'

'তা যায় বইকি। তাই বলে কি আর দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সে গিয়ে চাইলে পাবেন? এ সব পাওয়া যায় গোপন আস্তানায়। গ্লোব সিনেমার পিছন দিকে হিপিদের একটা হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলে পরে এক-আধটা শুগার কিউব পেলেও পেতে পারেন।'

'শুগার কিউব?'

'চার চৌকো চিনির ডেলা দেখেননি? তার মধ্যে পোরা থাকে এক কণা এল এস ডি। এই এক কণার তেজ আপনার ভাষায় ফাইভ থাউজ্যান্ড হর্স পাওয়ার। অবিশ্যি এল এস ডি সেবন করে সাময়িক স্বর্গবাসে নরকবাস দুই-ই হতে পারে। সেটা কে খাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। সিঁড়ি নামছে মনে করে সাত-তলার ছাতের কার্নিশে দাঁড়িয়ে শূন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে এল এস ডি-র প্রভাবে, এও শোনা যায়।'

'তার মানে পপাত চ—?'

'অ্যান্ড মমার চ।'

'কী ভয়ঙ্কর!'

৩

খুনটা হয়েছিল মঙ্গলবার সকালে। বিষ্যুদবার দুপুরে ফেলুদার ফোন এল মহিম দত্তগুপ্তর কাছ থেকে। খবর আছে অনেক।

অনীকেন্দ্র সোম কানপুরের আই আই টি-তে অধ্যাপনা

করতেন। সেখানে তাঁর কোনও আত্মীয় থাকে না। তবে তাঁরা খবর পাঠান যে কলকাতায় অনীকেন্দ্র সোমের এক ভাই থাকে সে নাকি স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করে। পুলিস তার হদিশ বার করে। ভদ্রলোক নাকি খবরের কাগজে তাঁর দাদার মৃত্যু-সংবাদটা মিস্ করে গেছিলেন। যাই হোক, তিনি লাশ সনাক্ত করে যান, এবং বলেন যে অনীকেন্দ্রবাবু নাকি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতেন না। কলকাতায় প্রায় আসতেন না বললেই চলে। তবে দাদা একটু খামখেয়ালী হলেও, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন সেটা ভাই স্বীকার করেন।

দু' নম্বর—কুক্‌রিতে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ খুনী অত্যন্ত সাবধানী লোক। যে ভাবে যে অ্যাঙ্গেলে ছোরা ঢুকে ঢুকেছে, তাতে মনে হয় খুনী ন্যাটা বা লেফট-হ্যান্ডেড। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কিউরিওর দোকানের মালিক ছোরাটা দেখে চিনেছেন এবং বলেছেন সেটা তাঁরা বিক্রি করেন সোমবার সকালে মিঃ বাটরা নামক এক ব্যক্তিকে। ইনি গ্র্যাণ্ড হোটেলেই ছিলেন, এবং যেদিন খুন হয় সেদিন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সকাল ন'টার ফ্লাইটে চলে যান কাঠমাণ্ডু।

তিন নম্বর—কানপুর হয়ে আসা দিল্লীর রবিবারের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম বলে কোনও যাত্রী ছিলেন না। তবে রবিবারের অন্য সব ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে পুলিস জেনেছে যে, সেদিন কাঠমাণ্ডু-ক্যালকাটা বিকালের ফ্লাইটে অনীকেন্দ্র সোম নামে একজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন। এক ঘণ্টা লেট ছিল ফ্লাইটটা; সেটা এসে দমদমে পৌঁছায় সাড়ে পাঁচটায়।

মহিমবাবু শেষ কথা বললেন এই যে, খুনী যখন বিদেশে ভাগলওয়া, তখন এখান থেকে কিছু করার কোনও সোজা রাস্তা নেই। কেসটা আপাতত চলে যাচ্ছে সি আই ডি হোমিসাইডের হাতে। সেখান থেকে দিল্লীর হোম ডিপার্টমেন্টে জানালে পর তারা আবার নেপাল সরকারের অনুরোধ জানাবেন এই খুনের তদন্তে সহায়তার জন্য। নেপাল সরকার সম্মতি জানালে পর এখান থেকে সি আই ডি-র লোক চলে যাবে কাঠমাণ্ডু।

ফেলুদা ফোনটা রাখার সময় শুধু একটি কথাই বলল—

'বেস্ট অফ লাক্ !'

এর পর দুটো দিন ফেলুদার কথা একদম বন্ধ। তবে ও যে গভীরভাবে চিন্তা করছে সেটা ওর ঘনঘন পায়চারি, মাঝে মাঝে আঙুল মটকানো, আর হঠাৎ হঠাৎ বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে থাকা দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

দ্বিতীয় দিন লালমোহনবাবু এসে প্রায় দু' ঘণ্টা রইলেন, অথচ পুরো সময়টা ফেলুদা মোটামুটি মৌনী। ভদ্রলোক শেষটায় যা বলার আমাকেই বললেন, এবং মোদ্দা ব্যাপারটা এই যে, উনি নাকি গতকাল এক আশ্চর্য পামিস্টের কাছে গিয়ে হাত দেখিয়ে এসেছেন।

'বুঝলে ভাই তপেশ, ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মৌলিনাথ ভট্টাচার্য। শুধু যে দুর্ধর্ষ হাত-দেখিয়ে তা নয়, ওরিজিন্যাল রিসার্চ আছে। বলেন, মানুষের মতো বাঁদরের হাতেও নাকি রেখা থাকে, আর সে রেখা পড়া যায়। আমাদের চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পাঞ্জি আছে। মৌলিবাবু কিউরেটারকে বলে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে, যে লোকটা শিম্পাঞ্জিটার দেখাশোনা করে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিলেন খাঁচার ভেতর। বললেন ভারী ভব্য জানোয়ার। দশ মিনিট ধরে হাত বাড়িয়ে বসে ছিল, টুঁ শব্দটি করেনি। কেবল বেরোবার সময় নাকি ভদ্রলোকের কাছাটা টেনে খুলে দেয়, হুইচ মে বি অনিচ্ছাকৃত। যাই হোক, হেড লাইন, লাইফ লাইন, হার্ট লাইন, ফেট লাইন—সব আছে ওই বাঁদরের হাতে। ওটা মরবে এইট্টি-থ্রির অগাস্টে। অ্যাট দি এজ অফ থার্টি থ্রি। আমি ডায়রিতে নোট করে নিয়েছি। আমার তো মনে হয় ফলে যাবে। তুমি কী বল ?'

আমি বললাম, 'ফললে নিশ্চয়ই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে। কিন্তু আপনাকে কী বললেন ?'

'সে তো আর-এক মজা। বছর পাঁচেক আগে কৈলাস বোস স্ট্রিটে এক পামিস্টকে হাত দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ফরেন

ট্যুর নেই। ইনি দেখিয়ে দিলেন পষ্টো রয়েছে। না হয়ে যায় না।'

লালমোহনবাবু হতাশ হননি। পরদিনই সকালে চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'বুঝলি তোপসে, মন বলছে অল রোড্‌স্‌ লিড টু নেপাল। আর তার মধ্যে কিছু রাস্তা বেশ সর্পিল। অতএব নেপাল যাওয়াটা ফেলু মিত্তিরের কর্তব্য।'

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সে কাঠমাণ্ডু ফ্লাইটে তিনজনের টিকিট কিনে, লন্ড্রি থেকে গরম জামা আনিয়ে, পুষ্পক ট্র্যাভেলস-এর সুদর্শনবাবুকে দিয়ে ওখানকার হোটেল বুক করার কথা বলে দিয়ে আমাদের রওনা হতে আরও তিন দিন লেগে গেল।

এরই মধ্যে একদিন আমি ফেলুদাকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার কি ধারণা নকল বাটরাও কাঠমাণ্ডু চলে গেছে?'

ফেলুদা বলল, 'খুন করে দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে পারলে একটা মস্ত সুবিধে আছে। শুনলি তো মহিমবাবু কী বললেন—দুই দেশের সরকারের মধ্যে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত তো খুনী নিশ্চিন্ত। যুক্তরাষ্ট্রে খুন করে অনেকে সীমানা পেরিয়ে পালিয়ে যায় মেকসিকোতে, শুনেছিস তো। ভারত আর নেপালও তো সেই একই ব্যাপার।'

যাবার আগের দিন সকালবেলা লালমোহনবাবু এসে বলে গেলেন যে, লেনিন সরণির মোড়ে নকল বাটরাকে দেখেছেন। সে নাকি একটা ঠাণ্ডাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লস্যি খাচ্ছিল। ফেলুদা চারমিনারে টান দিয়ে সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করল, 'গেলাসটা বাঁ হাতে ধরেছিল কিনা সেটা লক্ষ করেছিলেন?'

'এই রে!'

লালমোহনবাবু জিভ কেটে বুঝিয়ে দিলেন সেটা করেননি।

'তা হলে আপনার স্টেটমেন্টের কোনও মূল্য নেই', বলল ফেলুদা।

এয়ারপোর্টের কাউন্টারে ফেলুদার চেনা লোক ছিল। তিনি বললেন, 'আপনাদের ডান দিকে সিট দিচ্ছি, তা হলে ভাল ভিউ পাবেন।'

ভাল ভিউটা যে কতটা ভাল সেটা যে না দেখেছে তাকে বলে বোঝানো মুশকিল। স্বপ্নেও কি ভাবা যায় যে কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে ডান দিকে চেয়ে দেখতে পাব দূরে ঝলমল করছে আমাদের সেই ছেলেবেলা থেকে চেনা কাঞ্চনজঙ্ঘা ?

আর তার পরেই অবিশ্যি শুরু হল সারা ডান দিকটা জুড়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত সব পর্বতশৃঙ্গ, তার অনেকগুলোই কোনও-না-কোনও সময়ে কোনও-না-কোনও দেশের বিখ্যাত পর্বতারোহী দলগুলোকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গেছে শেরপাদের দেশে, যেখান থেকে তারা থোড়াই-কেয়ার মেজাজে মরণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শৃঙ্গবিজয় অভিযানে।

ক্যাপ্টেন মুখার্জি যে এই প্লেনের অধিনায়ক সেটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা জানালা দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বরফের চুড়োগুলোর দিকে দেখছি, এমন সময় একজন বাঙালি এয়ার হোস্টেস এসে ফেলুদার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন একবার আপনাকে ককপিটে ডেকেছেন।'

ফেলুদা ওঠবার জন্য তৈরি হয়ে মেয়েটিকে বলল, 'আমার পরে এঁরা দু-জনও একবার যেতে পারেন কি ?'

এয়ার হোস্টেস হেসে বললেন, 'আপনারা তিনজনেই আসুন না।'

ককপিটে জায়গা খুবই কম, তবে ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের দু' দিক দিয়ে গলা বাড়িয়ে আমরা দুজনে যা দেখলাম, তাই যথেষ্ট। দেখে মনের যে ভাবটা হল, সেটাকে লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন 'স্তব্ধভাব রুদ্ধশ্বাস বিমুগ্ধ বিমূঢ় বিস্ময়'। পর পর চুড়োর লাইন ডান দিক থেকে এসে বাঁয়ে ঘুরে প্লেন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে একটা প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। দূরত্ব যতই কমে আসছে, শৃঙ্গগুলো ততই ফুলে ফেঁপে মেঘ চিতিয়ে উঠছে। কো-পাইলটের হাতে একটা হ্যাডলি চেজের বই, তিনি সেটাকে বন্ধ করে পর পর চুড়াগুলো চিনিয়ে দিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরই মাকালু, আর তার দুটো চুড়োর পরেই এভারেস্ট। বাকিগুলোর মধ্যে যে নামগুলো

আমার চেনা সেগুলো হল গৌরীশঙ্কর, অন্নপূর্ণা আর ধবলগিরি।

মিনিট পাঁচেক ককপিটে থেকে আমরা ফিরে এলাম। এক ঘন্টা লাগে কাঠমাণ্ডু পৌঁছাতে। এয়ার হোস্টেস চা দিয়েছিল, সেটা শেষ হতে না হতে বুঝতে পারলাম প্লেন নিচে নামতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, নিচে ঘন সবুজ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই সেই বিখ্যাত তেরাই। এর পরে মহাভারত পাহাড় পেরিয়েই কাঠমাণ্ডু ভ্যালি।

সামনে একটা বিশাল সাদা মেঘের কুণ্ডলী, আমাদের প্লেনটা তার মধ্যে ঢুকতেই বাইরের দৃশ্য মুছে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি শুরু হল।

মিনিটখানেক এই অবস্থায় চলার পর হঠাৎ মেঘ সরে গেল, ঝাঁকুনি থেমে গেল, আর ঝলমলে রোদে দেখতে পেলাম, নিচে বিছিয়ে আছে এক আশ্চর্য সুন্দর উপত্যকা।

'এ যে করেন কান্ট্রি সে আর বলে দিতে হয় না মশাই,' ঢোক গিলে কানের তালা ছাড়িয়ে অবাক চোখ করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা ঠিকই। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই। পাহাড় নদী ধানক্ষেত গাছপালা ঘরবাড়ি সবই আছে, কিন্তু তাও যেন একেবারে অন্য রকম।

'গ্রামের বাড়িগুলো লক্ষ কর,' বলল ফেলুদা, 'চিনেদের তৈরি ইটের দোতলা বাড়ি, তার উপর খড়ের চাল। এ জিনিস আমাদের দেশে দেখতে পাবি না।'

'ওগুলো কি মন্দির নাকি মশাই?'

'বৌদ্ধমন্দির,' বলল ফেলুদা। 'নদীর এ পারে, তাই মনে হয় ওটা পাটন শহর। আর ওইটে কাঠমাণ্ডু।'

আমাদের প্লেনের ছায়াটা কিছুক্ষণ থেকেই সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। লক্ষ করছিলাম, সেটার বড় হওয়ার স্পিড ক্রমেই বাড়ছে ; এবারে সেটা যেন হঠাৎ তড়িঘড়ি ছুটে এসে বিরাট হয়ে আমাদের প্লেনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমরা ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছি।

এয়ারপোর্টে বেশ চনমনে অভিজ্ঞতা হল। এ রকম বিদেশী টুরিস্টের ভিড় এর আগে একবারই দেখেছি, বোম্বের তাজমহল হোটেলের লবিতে।

আগেই জানতাম এখানে কাস্টমস-এর ঝামেলা আছে, চেকিং-এর একটু বাড়াবাড়ি, সকলেরই সুটকেস নাকি খুলে দেখে। আমাদের কাছে আপত্তিকর কিছুই নেই, তাও লালমোহনবাবু দাঁতে দাঁত চেপে আছেন কেন জিগ্যেস করাতে বললেন, একটা টিফিন বক্সে কিছু আমসত্ত্ব এনিচি ভাই। ফরেন কান্ট্রি, যদি সন্দেহ-টন্দেহ করে।'

শেষ পর্যন্ত কাস্টমস কিছু বলল না দেখে লালমোহনবাবু একটা হাঁপ-ছাড়া হাসি হেসেই হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন, সেটা ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলাম।

ফেলুদা আগেই দেখেছে লোকটাকে। একজন লালচে দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গ ঢ্যাঙ্গার সঙ্গে কথা বলছেন লাউঞ্জের কোণে দাঁড়িয়ে হয় নকল নাহয় আসল বাটরা।

না, নকল নয়, আসল।

ফেলুদার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে ভদ্রলোক সাহেবকে 'এক্সকিউস মি' বলে ভুরু কপালে তুলে হেসে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'ওয়েলকাম টু কাঠমাণ্ডু!'

'শেষ পর্যন্ত নিজেদের তাগিদেই এসে পড়লাম', বলল ফেলুদা।

'ভেরি গুড, ভেরি গুড!' তিনজনের সঙ্গেই হ্যান্ডশেক করলেন ভদ্রলোক। 'ফরচুনেটলি, সে লোক বোধ হয় আর আমাকে ফলো করেনি, মিঃ মিটরা। এ ক' দিনে আর কোনও গোলমাল হয়নি। আপনারা ক' দিন আছেন?'

'দিন সাতেক?'

'কোথায় উঠছেন?'

'হোটেল লুম্বিনীতে রিজার্ভেশন আছে।'

'নতুন হোটেল', বললেন মিঃ বাটরা, 'অ্যান্ড কোয়াইট গুড। আপনারা সাইট-সিইং-এ যেতে চাইলে আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আমার আপিস আপনাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ইয়ে—এ খবরটা আপনি দেখেছেন কি? কলকাতার কাগজ এখানে আসে?'

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কাটিং বার করে বাটরার হাতে দিল। আমি জানি এটা অনীকেন্দ্র সোমের খুনের খবর, স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল। তাতে এটাও বলা হয়েছিল যে, খুনটা করা হয়েছিল একটা নেপালি কুকরির সাহায্যে।

'আপনি যেদিন এলেন, সে-দিনকারই ঘটনা এটা।'

মিঃ বাটরা খবরটা পড়ে কাগজটা থেকে চোখ তুলে গভীর সংশয়ের দৃষ্টিতে চাইলেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলল, 'কুকরিটা গ্র্যান্ড হোটেলের দোকান থেকে কেনা হয়েছিল খুনের আগের দিন সেটা পুলিশ ভেরিফাই করেছে! দোকানী এটাও বলে যে, যিনি কিনেছিলেন তার নাম বাটরা।'

'হাউ টেরিব্‌ল!'

মিঃ বাটরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'আপনি বোধ হয় এই অনীকেন্দ্র সোমের নাম শোনেননি?'

'নেভার,' কাটিংটা ফেরত দিয়ে বললেন মিঃ বাটরা।

'ইনি কিন্তু একই প্লেনে এসেছিলেন আপনার সঙ্গে।'

'ফ্রম কাঠমাণ্ডু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নেপাল এয়ার লাইনস্‌?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে চেহারা দেখলে হয়তো চিনতে পারতাম। একশো ত্রিশজন প্যাসেঞ্জার ছিল ওই ফ্লাইটে, মিঃ মিটরা।'

'যাই হোক, আপনি আর এর মধ্যে কলকাতা-টলকাতা যাবেন না, তা হলে গোলমালে পড়তে পারেন,' মোটামুটি হালকা ভাবেই বলল ফেলুদা।

'কিন্তু আমাকে ফাঁদে ফেলার এ রকম চেষ্টা কেন, মিঃ মিটরা?' প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন মিঃ বাটরা।

ফেলুদা বলল, 'একজন ক্রিমিন্যাল যদি আবিষ্কার করে যে, আর-একজন লোকের সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল, তা হলে তার নিজের ক্রাইমের বোঝাটা সেই লোকের ঘাড়ে ফেলার চেষ্টাটা কি তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক?'

'সে তো মানছি, কিন্তু এ তো সাধারণ ক্রাইম নয়, এ যে মার্ডার!'

ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা খুনী কাঠমাণ্ডুতেই ফিরে আসবে, এবং আমার সঙ্গে তার একটা মোকাবিলা হবেই। এই অনীকেন্দ্র সোম কতকটা আমার সাহায্য চাইতেই কলকাতায় গিয়েছিলেন।

কী কারণে সেটা আর জানা হয়নি। তার খুনী বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে সেটা আমি মানতে পারছি না, মিঃ বাটরা। আমি অনুরোধ করব, আপনি বা আপনার কোনও লোক যদি তাকে কাঠমাণ্ডুতে দেখেন, তা হলে আমি যেন একটা খবর পাই।'

'সেটা আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে,' বললেন মিঃ বাটরা। 'আমি কালকের দিনটা থাকছি না, একটা অ্যামেরিকান টুরিস্ট দলের সঙ্গে পোখরা যেতে হচ্ছে, পরশু ফিরে এসে আপনাকে কনট্যাক্ট করব।'

কাস্টমসের ঝামেলা চুকিয়ে আমরা ট্যাক্সিতে করে রওনা দিলাম। জাপানী ডাটসুন ট্যাক্সি, রাস্তায় জাপানী ও বিদেশী গাড়ির ছড়াছড়ি, পরিষ্কার চওড়া রাজপথের ধারে ইউক্যালিপ্টাসের সারি, পেল্লায় পার্কের মধ্যে বাহারের স্পোর্টস স্টেডিয়াম, বিরাট বিরাট বিলিতি ধাঁচের বিল্ডিং—যার অনেকগুলোই নাকি আগে রাণাদের প্রাসাদ ছিল—দূরে এখানে-ওখানে মাথা উঁচিয়ে আছে হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরের চুড়ো—সব মিলিয়ে ফরেন-ফরেন ভাবটা যে ক্রমে লালমোহনবাবুকে আরও বেশি করে পেয়ে বসছে, সেটা তাঁর হাত কচলানি আর আধ-বোজা চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। নেপালের রাজাই যে পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাজা—সেটা শুনে তিনি যেমন ইমপ্রেসড, তেমনই ইমপ্রেসড শুনে যে নেপালের লুম্বিনী শহরেই বুদ্ধের জন্ম, আর নেপাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম গিয়েছিল চিন আর জাপানে।

শহরের মেইন রাস্তা 'কান্তি পথ' দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে একটা কারুকার্য করা তোরণের ভিতর দিয়ে আমরা এসে পড়লাম নিউ রোডে। এই নিউ রোডেই আমাদের হোটেল। দু' দিকে দেখে বুঝলাম, এটা দোকান আর হোটেলেরই পাড়া। লোকের ভিড়টাও এখানেই প্রথম চোখে পড়ল।

একটা চৌমাথার কাছাকাছি এসে আমাদের ট্যাক্সিটা রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে রাস্তার উল্টো দিকে একটা বাহারের কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো দরজার সামনে থামল। এক দিকের পাল্লার কাচে লেখা 'হোটেল', অন্য দিকে 'লুম্বিনী'।

ফেলুদা একদিন বলছিল ভ্রমণের বাতিকটা বাঙালিদের মধ্যে যেমন আছে, ভারতবর্ষের আর কোনও জাতের মধ্যে তেমন নেই; আর এই বাতিকটা নাকি মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাতায়াতের খরচ যত বাড়ছে, ভ্রমণের নেশাও নাকি বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

কাঠমাণ্ডুতে এসেও যার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল, তিনি একজন বাঙালি টুরিস্ট। হোটেলের রিশেপসনে দাঁড়িয়ে খাতায় নাম লেখা হচ্ছে, এমন সময় ভদ্রলোক পাশের একটা সোফা থেকে উঠে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'আপনারা আই-এ ফ্লাইটে এলেন?' লালমোহনবাবুকে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখে তাঁকেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স। দশ মিনিট লেট ছিল।'

'এদিকে এই প্রথম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পারলে পোখরাটা একবার ঘুরে আসবেন। বেড়াতে এসেছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হলিডে,' ফেলুদার দিকে একবার আড়-চোখে দেখে বললেন জটায়ু।

'আপনি এখানে থাকেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। বেয়ারা এসে আমাদের মালপত্র নিয়ে গেছে দোতলায়। দুটো পাশাপাশি ঘর আমাদের—দুশো ছাব্বিশ, দুশো সাতাশ।

'আমি কলকাতার লোক,' বললেন ভদ্রলোক, 'বেড়াতে এসেছি ফ্যামিলি নিয়ে। ইনি অবিশ্যি এখানকারই বাসিন্দা।'

আর-একজন বয়স্ক ভদ্রলোকও যে সোফাটায় বসেছিলেন, সেটা এতক্ষণ লক্ষ করিনি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, টকটকে রং, চুল ধপধপে সাদা। সব মিলিয়ে রীতিমতো সৌম্য চেহারা।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের নমস্কার করলেন।

'এনারা নেপালে আছেন প্রায় তিনশো বছর,' প্রথম ভদ্রলোকটি বললেন।

'বলেন কি!' ফেলুদা ও জটায়ু একসঙ্গে বলে উঠল।

'সে এক ইতিহাস। শুনে দেখবেন এঁর কাছে।'

'তা চলুন না আমাদের ঘরে,' বলল ফেলুদা। 'আমি এমনিতেই নেপালের বাঙালিদের সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম, একটা বিশেষ দরকারে।'

আমি জানি ফেলুদা কী দরকারের কথা বলছে, আর এটাও জানি যে, দরকার না থাকলে ফেলুদা চট করে কাউকে প্রথম আলাপেই নিজের ঘরে ডেকে এনে গপ্পো করে না।

দুশো ছাব্বিশ টা ডাবল রুম, অর্থাৎ আমার আর ফেলুদার ঘর। সেখানেই বসে রুম সার্ভিসকে বলে আনানো চা খেতে খেতে কথা হল।

কাঠমাণ্ডুর বাসিন্দা ভদ্রলোকটির নাম হরিনাথ চক্রবর্তী। ত্রিভুবন কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন, পাঁচ বছর হল রিটায়ার করেছেন। তিনি তাঁদের বংশের ইতিহাস যা বললেন তা হল এই—

প্রায় তিনশো বছর আগে নেপালে নাকি একবার প্রচণ্ড খরা হয়। এখানে তখন মল্লদের রাজত্ব। রাজা জগৎজয় মল্ল এক বিখ্যাত তান্ত্রিককে নিয়ে আসেন বাংলাদেশ থেকে, যদি তাঁর তন্ত্রের জোরে তিনি খরা দূর করতে পারেন। এই তান্ত্রিক ছিলেন হরিনাথের পূর্বপুরুষ জয়রাম চক্রবর্তী। জয়রামের পুজোর জোরে নাকি কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় এগারো দিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়। জগৎজয় মল্ল জমিজমা দিয়ে জয়রামকে সপরিবারে কাঠমাণ্ডুতেই রেখে দেন। পঁচিশ বছরে এক পুরুষের হিসেবে চক্রবর্তীরা কাঠমাণ্ডুতে দশ-পুরুষ ধরে আছেন। মল্লদের পরে রাণাদের আমলেও চক্রবর্তীদের খাতির কমেনি, কারণ রাণারাও ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। দুই পুরুষ আগে অবধি পুজো-আচ্চার কাজই চালিয়ে এসেছেন চক্রবর্তীরা। হরিনাথবাবুর এক কাকা এখনও পশুপতিনাথের মন্দিরের পূজারীদের একজন। হরিনাথের বাবা দীননাথই প্রথম কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ফিরে এসে তিনি রাণাদের ফ্যামিলিতে প্রাইভেট টিউশনি করেন বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। হরিনাথবাবুও কলকাতায় লেখাপড়া করেন। তাঁর ছিল ইংরেজি সাহিত্যের দিকে

ঝোঁক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে তিনিও কাঠমাণ্ডু ফিরে এসে একই রাণা পরিবারে প্রাইভেট টিউশনি করেন। তার পর যখন রাণাদের প্রতিপত্তি চলে গিয়ে রাজা ত্রিভুবনের নামে কলেজ তৈরি হল, তখন হরিনাথ সেই কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

'অবিশ্যি আমার ছেলেরা মন্ত্রতন্ত্র থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিল', তাঁর কাহিনী শেষ করে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী। 'বড়টি—নীলাদ্রি—ছিল মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের শিক্ষক।'

'ছিল মানে?'

'সে সেভেনটি-সিক্সে পাহাড় থেকে পড়েই মারা যায়।'

'আর অন্যটি?'

'হিমাদ্রি করত নেপাল সরকারের চাকরি। হেলিকপটার-পাইলট। তেরাই-এর জঙ্গল আর হিমালয়ের পিকগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসত টুরিস্টদের। সেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে আজ তিন হপ্তা হল।'

'এয়ার ক্র্যাশ?'

ভদ্রলোক বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন।

'তা হলে তো তবু এক রকম বীরের মৃত্যু হত। এক বন্ধুকে থ্যাংবোচে নিয়ে যায় সেখানকার মনাস্টারি দেখাতে। ফিরে এসে দেখে, কখন যেন হাতে একটা সামান্য ইনজুরি হয়েছে। কাউকে বলেনি, ডেটল লাগিয়ে চুপচাপ ছিল। শেষটায় ওর বন্ধুর চোখে পড়ে। তার ধারণা, একটা কাঁটাতারের বেড়া পেরোনোর সময় স্ক্র্যাচটা হয়েছে, সুতরাং কোনও রিস্ক না নিয়ে অ্যান্টি-টিট্যানাস ইনজেকশন নেওয়া উচিত। শেষটায় বন্ধুই ডাক্তার ডেকে এনে জোর করে ইনজেকশন নেওয়ায়।'

'তার পর?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'কিছুই হল না। সেই টিট্যানাসেই মরল।'

'দেরি হয়ে গিয়েছিল কি ইনজেকশন নিতে?'

'দেরি আর কী করে বলি? বন্ধুটির হিসেবে বিকেলে জখমটা

হয়েছে। পরদিন সকালে ইনজেকশন পড়েছে। কিন্তু ফল হল না। ইনজেকশনের কিছু পর থেকেই কনভালশন শুরু হল। এক দিনের মধ্যে সব শেষ।'

'ডাক্তার কি আপনার বাড়ির ডাক্তার?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'বাড়ির ডাক্তার না হলেও, ডঃ দিবাকরকে আমরা যথেষ্ট চিনি। ইদানীং প্র্যাকটিসও বেড়েছে খুব—নতুন গাড়ি, বাড়ি—বোধ হয় ডঃ মুখার্জি মারা যাবার পর থেকেই। মুখার্জি ছিলেন আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।'

এবার অন্য বাঙালি ভদ্রলোকটি একটি মন্তব্য করলেন।

'ডাক্তারের কথা জিগ্যেস করে কী হবে? বরং ওষুধের কথা জিগ্যেস করুন। ওষুধে কাজ না দেওয়াটা আর আজকের দিনে কি আজব ব্যাপার মশাই? এ তো আকছার হচ্ছে। অ্যাম্পুলে জল, ক্যাপসুলে চুণ, চকখড়ি, এমন কি স্রেফ ধুলো—এ সব শোনেননি?'

হরিনাথবাবু একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

'বেশির ভাগ লোকে আপনার কথাটাই বলবে। আজকের যুগে সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। আমাকেও মেনে নিতে হল!'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন, আর সেই সঙ্গে অন্যজনও, যাঁর নাম এখনও জানা হয়নি।

'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম,' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী, 'কিছু মনে করবেন না।'

'মোটেই না,' বলল ফেলুদা, 'শুধু একটা কথা জানার ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার ছেলের বন্ধুটি কি এখন এখানে?'

'না। তবে কোথায় তা বলতে পারব না। ভয়ানক শক পেয়েছিল হিমুর মৃত্যুতে। তাকে বললাম, কপালের লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি! সে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। আমার বাড়িতেই ছিল। দিন আষ্টেক হল একদিন দেখি কোথায় যেন চলে গেছে। অবিশ্যি ফিরে সে আসবেই। কারণ তার কিছু জিনিসপত্র এখনও রয়ে গেছে আমার বাড়িতে। দশ বছর এক ইস্কুলে, এক

কলেজে পড়েছে দু' জনে।'

'তার নামটা?'

'অনীক বলে ডাকি। অনীকেন্দ্র সোম।'

৫

আধঘন্টার মধ্যে স্নান সেরে নিয়ে তিনজনে একতলায় গেলাম হোটেলেরই নিরভানা রেস্টোরান্টে লাঞ্চ খেতে। কাঠমাণ্ডুতে আসার এত অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনা একটা বিরাট ধাপ এগিয়ে গেছে ভাবতে মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব এসে গেছে, আর সেই সঙ্গে খিদেটাও পেয়েছে জবর। কলকাতায় অনীকেন্দ্র সোম খুন, নেপালে বাঙালি হেলিকপটার পাইলটের মৃত্যু, মিঃ বাটরার ডুপলিকেট—এ সবই যে এক সঙ্গে জট-পাকানো তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মিঃ সোম কি চেয়েছিলেন ফেলুদা ওঁর বন্ধুর মৃত্যুর ব্যাপারেই তদন্ত করুক? ইনজেকশনে ভেজাল ছিল বলেই কি হিমাদ্রি চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়? কিন্তু এ ব্যাপারে ফেলুদা আর কত দূর কী করতে পারে?

আমরা দুজনে মোটামুটি চেনাশোনা খাবার অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু লালমোহনবাবু হঠাৎ কেন যেন মেনু দেখে ওয়েটারকে জিগ্যেস করে বসলেন, 'হোয়াট ইজ মোমো?'

'ইটস মিট বলস ইন সস, স্যার,' বলল ওয়েটার।

'তরল পদার্থে ভাসমান মাংসপিণ্ড,' বলল ফেলুদা। 'তিব্বতের খাবার। শুনেছি, মন্দ লাগে না খেতে। ওটা খেলে আপনি কলকাতায় গিয়ে বলতে পারেন যে দালাই লামা যা খান, আপনিও তাই খেয়ে এসেছেন।'

'দেন ওয়ান মোমো ফর মি, ইফ ইউ প্লিজ।'

এ ছাড়া অবিশ্যি ভাত আর ফিশ কারি অর্ডার দিয়েছেন ভদ্রলোক। বললেন, 'মোমোটা ফর একসপিরিয়েন্স।'

একটা হালকা সবুজ রঙের কার্ড হাতে নিয়েই রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকেছিলেন লালমোহনবাবু, এবার সেটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে

বললেন, 'এইটে যে ধরিয়ে দিল হোটেলের কাউন্টারে, এর মানেটা কিছু বুঝলেন ? আমি তো মশাই হেড অর টেল কিছুই বুঝছি না। ক্যাসিনো কথাটা চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ব্ল্যাকজ্যাক, পনটুন, রুলেট, জ্যাকপট—এগুলো কী ? আর বলছে এই কার্ডের ভ্যালু নাকি পাঁচ ডলার। তার মানে তো চল্লিশ টাকা। ব্যাপারটা কী বলুন তো।

আমিই লালমোহনবাবুকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা আরও গুছিয়ে বলতে পারবে বলে ওর ওপর ছেড়ে দিলাম।

'এখানে একটা বিখ্যাত হোটেল আছে,' বলল ফেলুদা। 'নানা রকম জুয়া খেলার ব্যবস্থা আছে সেখানে। জ্যাকপট, পনটুন, কিনো—এ সবই এক-এক রকম জুয়ার নাম। আর খেলার জায়গাটিকে বলে ক্যাসিনো। আমাদের দেশে এ ধরনের পাবলিক গ্যাম্বলিং নিষিদ্ধ, তাই ক্যাসিনো জিনিসটা পাবেন না। এই কার্ডটা নিয়ে ক্যাসিনোতে গিয়ে আপনি পাঁচ ডলার পর্যন্ত জুয়া খেলতে পারেন, নিজের পকেট থেকে পয়সা না দিয়ে।'

'লেগে পড়ব নাকি, তপেশ ?'

'আমার আপত্তি নেই।'

'নাকের সামনে মুলোর টোপ ঝোলালে গাধা কি আর না খেয়ে পারে ?'

'খেলার শেষে নিজেকে গর্দভ গর্দভ মনে হতে পারে, সেটা কিন্তু আগে থেকে বলে দিচ্ছি,' বলল ফেলুদা। 'অবিশ্যি জ্যাকপটে এক টাকা দিয়ে হাতলের এক টানে পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছে, এমনও শোনা যায়।'

ঠিক হল একদিন সন্ধেবেলা গিয়ে দেখে আসা যাবে ক্যাসিনো ব্যাপারটা। হোটেল থেকেই বার-তিনেক বাস যায় সেখানে, তার জন্য আলাদা পয়সা লাগে না।

মোমো খেয়ে লালমোহনবাবু বললেন যে, এর পাকপ্রণালীটা জেনে নেওয়া দরকার। ওঁর রান্নার লোক বসন্ত নাকি খুব এক্সপার্ট—'উইকে একদিন করে মোমো খেতে পারলে মশাই ছ' মাসের মধ্যে চেহারায় একটা ধ্যানী ভাব এসে যাবে। রাস্তায়

বেরোলে পাড়ার ছোঁড়াগুলো যে মাঝে মাঝে ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রে হাসে, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

মনে মনে বললাম যে লালমোহনবাবু যখন মাঝে মাঝে ধ্যানী ভাব আনার চেষ্টা করেন, তখনই ওঁকে দেখে সবচেয়ে বেশি হাসি পায়।

তবে কাঠমাণ্ডুতে কেউ হাসবে না সেটা ঠিকই

দুপুরে খাওয়ার পর নিউ রোড ধরে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে মনে হল, দেশী-বিদেশী এত জাতের লোক—নেপালী তিব্বতী পাঞ্জাবী সিন্ধী মারোয়াড়ি, জার্মান সুইডিশ ইংলিশ আমেরিকান ফ্রেঞ্চ—আর এত রকম ঘর বাড়ি দালান দোকান মন্দির হোটেলের এ রকম সংঙে বত্রিশ ভাজা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

ফেলুদা বলল আমরা যেখানে যাচ্ছি—দরবার স্কোয়ার—যেটাকে বলা চলে কাঠমাণ্ডুর নার্ভ-সেন্টার, যেমন কলকাতার চৌরঙ্গি ধর্মতলার মোড়—সেইখানেই নাকি এখানকার পুলিস ঘাঁটি। ওকে একবার সেখানে যেতে হবে। আমরা ততক্ষণ চারপাশটা ঘুরে দেখব। আধঘন্টা পরে একটা বাছাই করা জায়গায় আমরা আবার মিট করব।

হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়েই একটা চৌমাথা পড়ে. তার পর থেকে নিউ রোডের নাম হয়ে গেছে গঙ্গা-পথ। তার পর খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেছে। এটা হল বসন্তপুর স্কোয়ার। ডাইনে পুরনো রাজার প্যালেস। সেটা ছাড়িয়ে ডাইনে ঘুরতেই বুঝে গেলাম দরবার স্কোয়ারে এসে গেছি, আর এমন একটা বিচিত্র জায়গা আমরা এর আগে কখনও দেখিনি।

লালমোহনবাবু বার তিনেক 'এ কোথায় এলাম মশাই' বলাতে ফেলুদা আর থাকতে না পেরে বলল, 'আপনার প্রশ্নের যে উত্তরটা এক কথায় হয়, যেটা আপনি ম্যাপ খুলেই পেতে পারেন, সেটা আপনি নিশ্চয়ই চাচ্ছেন না। আর অন্য যে উত্তর, সেটা সোজা গদ্যে বলার জিনিস নয়। আপাতত আপনাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি—চোখ-কান সজাগ রেখে মনপ্রাণ ভরে দেখে নিন। প্রাচীন

শহরের এমন চেহারা আপনি ভারতবর্ষের কোথাও পাবেন না। এক পেতে পারেন কাশীর দশাশ্বমেধে, কিন্তু তার মেজাজ একেবারে আলাদা।'

সত্যিই, যে দিকে চাই সে দিকেই চমক। দাবা খেলা কিছুক্ষণ চলার পর যেমন ছকের উপর রাজা মন্ত্রী বড়ে গজ নৌকো সব ছড়িয়ে বসে থাকে, তেমনই কোনও খামখেয়ালি দানব যেন এই সব ঘর বাড়ি প্রাসাদ মন্দির মূর্তি স্তম্ভ ছড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আর তারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ আর যানবাহন। কাশীর কথা যে মনে পড়ে না তা নয়, কিন্তু কাশীর আসল মন্দিরগুলো সব গলির মধ্যে হওয়াতে সেগুলো আর দূর থেকে দেখার কোনও উপায় থাকে না। এখানে কিন্তু তা নয়। রাস্তা দিব্যি চওড়া। পুরোনো প্যালেসের বারান্দায় এসে রাজা দর্শন দিতেন বলে অনেকখানি খোলা জায়গা রাখা আছে।

'ম্যাপ অনুযায়ী একটু এগিয়েই কালভৈরবের মূর্তি,' বলল ফেলুদা। 'ওই মূর্তির সামনে আধঘন্টা পরে তোদের মিট করছি।'

ফেলুদা পা চালিয়ে এগিয়ে গেল।

নেপালের কাঠের কাজ প্রসিদ্ধ সেটা আগেই শুনেছিলাম, সেটা যে কেন, এখানে এসে বুঝতে পারলাম। পুরোনো বাড়িগুলোর জানালা দরজা বারান্দা, ছাত, সবই কাঠের তৈরি, আর তার কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়। এখানকার মন্দিরগুলোও কাঠের, আর তেমন মন্দির আর-কোথাও দেখিনি। এমনিতে ভারতবর্ষের ধাঁচের হিন্দু মন্দিরও আছে, কিন্তু আসল হল যেগুলোকে গাইড বুকে বলে প্যাগোডা। দো-চালা, তিন-চালা, চার-চালা মন্দির, চওড়া থেকে ধাপে ধাপে ক্রমে সরু হয়ে উপর দিকে উঠেছে।

তবে দরবার স্কোয়ার শুধু ধর্মস্থান নয়, বাজারও বটে। রাস্তায় ফুটপাথে সিঁড়িতে বারান্দায়—সব জায়গায় জিনিস ফেরি হচ্ছে। শাকসবজি ফলমূল থেকে ঘটি-বাটি জামা কাপড় অবধি। এখানকার নেপালীরা যে টুপি ব্যবহার করে, তার মধ্যে বেশ বাহার আছে। এক জায়গায় সেই টুপি বিক্রি হচ্ছে দেখে দুজনে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে জটায়ুর মন এখন

কাঠমাণ্ডুর বাজারে চলে এসেছে, সেটা বুঝতে পারলাম ভদ্রলোককে তাঁর লাল ডায়রিটা বার করতে দেখে।

টুপির শেপ সবই এক, কিন্তু নকশা প্রত্যেকটাতে আলাদা। আমি নিজে একটা বাছাই করে দর করছি, এমন সময় পিছন থেকে চাপা গলা পেলাম জটায়ুর।

'তপেশ!'

নামটা কানে আসতেই ঘুরে দেখি ভদ্রলোক কী যেন দেখে তটস্থ হয়ে গেছেন।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডাইনে মুখে ঘোরাতেই দেখলাম—

হাত পঁচিশেক দূরে দাঁড়িয়ে বাটরা বা নকল বাটরা আমাদের দিকে পাশ করে সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ডান দিকে একটা গলি লক্ষ করে।

'তোমার দাদাকে বাঁ হাতে লাইটার ধরাতে দেখেছ কখনও?'

'না।'

'ইনি ধরালেন।'

'দেখেছি। আর বাঁ পকেটে রাখলেন লাইটারটা।'

'ফলো করবে?'

'আপনাকে দেখেছে লোকটা?'

'মনে তো হয় না।'

রোখ চেপে গেল। ফেলুদার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আরও বিশ মিনিট দেরি।

দুজনে এগিয়ে গেলাম।

সামনে একটা মন্দিরের চারপাশে ভিড়। লোকটা হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে।

মন্দিরটা পেরোতেই আবার দেখতে পেলাম তাকে। সে এবার গলিটার মধ্যে ঢুকেছে। প্রায় বিশ হাত তফাত রেখে আমরা তাকে অনুসরণ করে চললাম।

গলিটার দু' দিকে দোকান, ছোট ছোট হোটেল, রেস্টোর্যান্ট। 'পাই শপ' কথাটা অনেক রেস্টোরান্টের গায়েই লেখা রয়েছে।

'কলকাতায় পাইস হোটেল ছিল এক-কালে বলে জানি,' চাপা গলায়

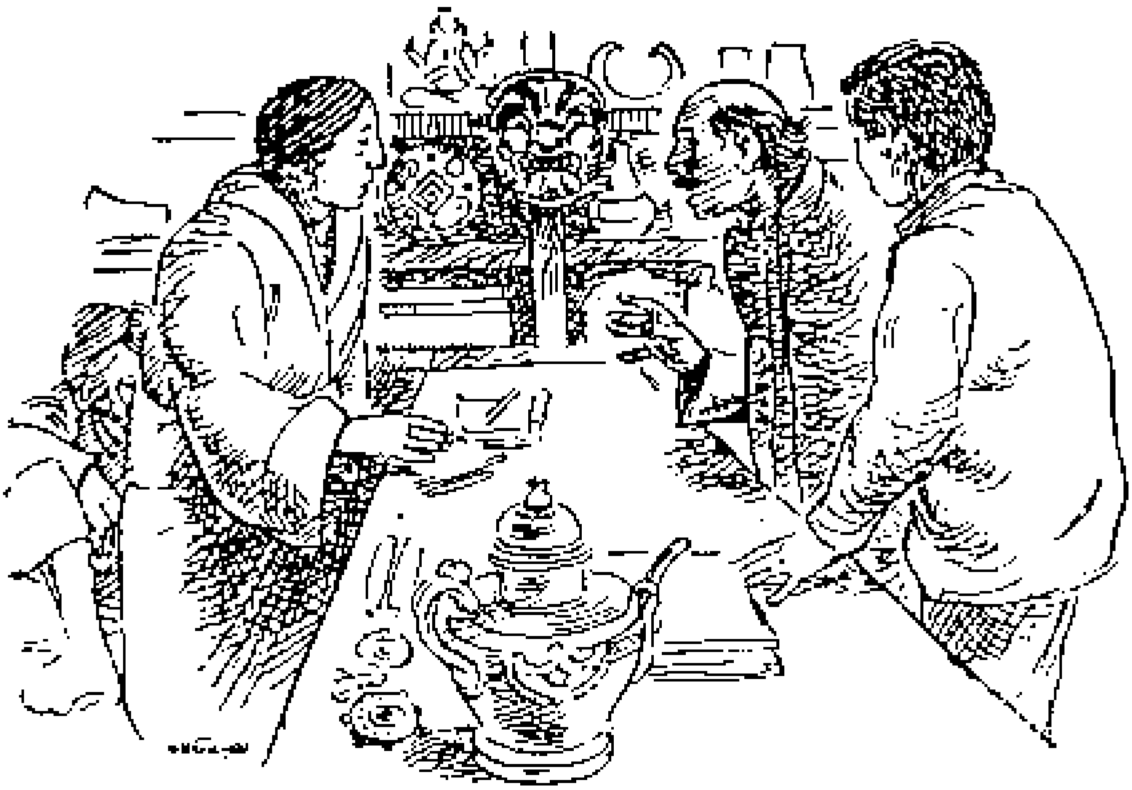

মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু, 'পাই শপ তো কখনও শুনিনি।'

আমি বললাম, 'এ পাই টাকা আনা-পাই না ; পাই এক রকম বিলিতি খাবার।'

একদল হিপি আসছে। গলিতে পাঁচমিশালি গন্ধ, তার বেশির ভাগটাই খাবারের। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা নতুন গন্ধ যোগ হল যখন হিপির দলটা আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাঁজা, ঘাম আর অনেক দিনের না-ধোয়া জামা-কাপড়ের গন্ধ।

'এই রে!'

কথাটা লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, কারণ লোকটা ডাইনে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কী করব এবার ? লোকটা আবার বেরোবে নিশ্চয়ই। অপেক্ষা করব ? যদি দেরি করে ? হাতে আর পনের মিনিট সময়। বললাম, 'চলুন যাই গিয়ে ঢুকি দোকানে। সে তো আমাদের চেনে না, ভয়টা কিসের ?'

'ঠিক বলেছ।'

তিব্বতি হ্যান্ডিক্র্যাফটের দোকান। মাঝারি দোকান, দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা কাউন্টার। তার পাশে ফাঁক দিয়ে দোকানের

পিছন দিকে যাওয়া যায়। পিছনে দরজা, তারও পিছনে একটা অন্ধকার ঘর।

সেই ঘরেই হয়তো গিয়ে থাকবেন নকল বাটরা, কারণ আমার কোনও যাবার জায়গা নেই।

'ইয়েস ?'

কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো তিব্বতি মহিলা হাসিমুখে আমাদের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন। তার পিছনে একটি মাঝবয়সী তিব্বতি পুরুষ, গালে অসংখ্য বলিরেখা, একটা চোখ একটু ছোট, বেঞ্চিতে বসে আছে ঝিম ভাব নিয়ে।

আমরা দোকানে ঢুকে পড়েছি, তাই মহিলার প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলা দরকার। কিছু দেখতে চাইতে হবে, যেন কিনতে চাই এমন ভাব করে। জিনিসের অভাব নেই দোকানে মুখোশ, তংখা, জপযন্ত্র, তামার ঘটিবাটি, ফুলদানী, মূর্তি।

'আই লাইক মোমো,' হঠাৎ কী কারণে যেন বলে বসলেন লালমোহনবাবু।

'মোমো ইউ গেট ইন টিবেটান রেস্টোরান্ট, নট হিয়ার।'

ইংরিজিটা মোটামুটি ভালোই বলেন মহিলা।

'নো নো নো,' বললেন লালমোহনবাবু, 'মানে, আই ডোন্ট ওয়ন্ট টু ইট মোমো।'

মহিলার ভুরু বিশেষ না থাকলেও, যেটুকু আছে সেটুকু উপর দিকে উঠে গেছে।

'ইউ লাইক মোমো, অ্যান্ড ইউ ডোন্ট ওয়ন্ট টু ইট মোমো ?'

'নো নো—মানে, নট নাউ। ইন হোটেল আই এট মোমো। নাউ আই ওয়ন্ট টু, মানে, নো হাউ—মানে...'

এর কোনও শেষ নেই, অথচ ভদ্রলোক কী বলতে চাইছেন সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর পিঠে হাত দিয়ে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ডু ইউ হ্যাভ এ টিবেটান কুক-বুক ?'

আমি জানতাম এ জিনিসটা দোকানে থাকবে না। মহিলাও মাথা নেড়ে 'স্যরি' বলে বুঝিয়ে দিলেন নেই।

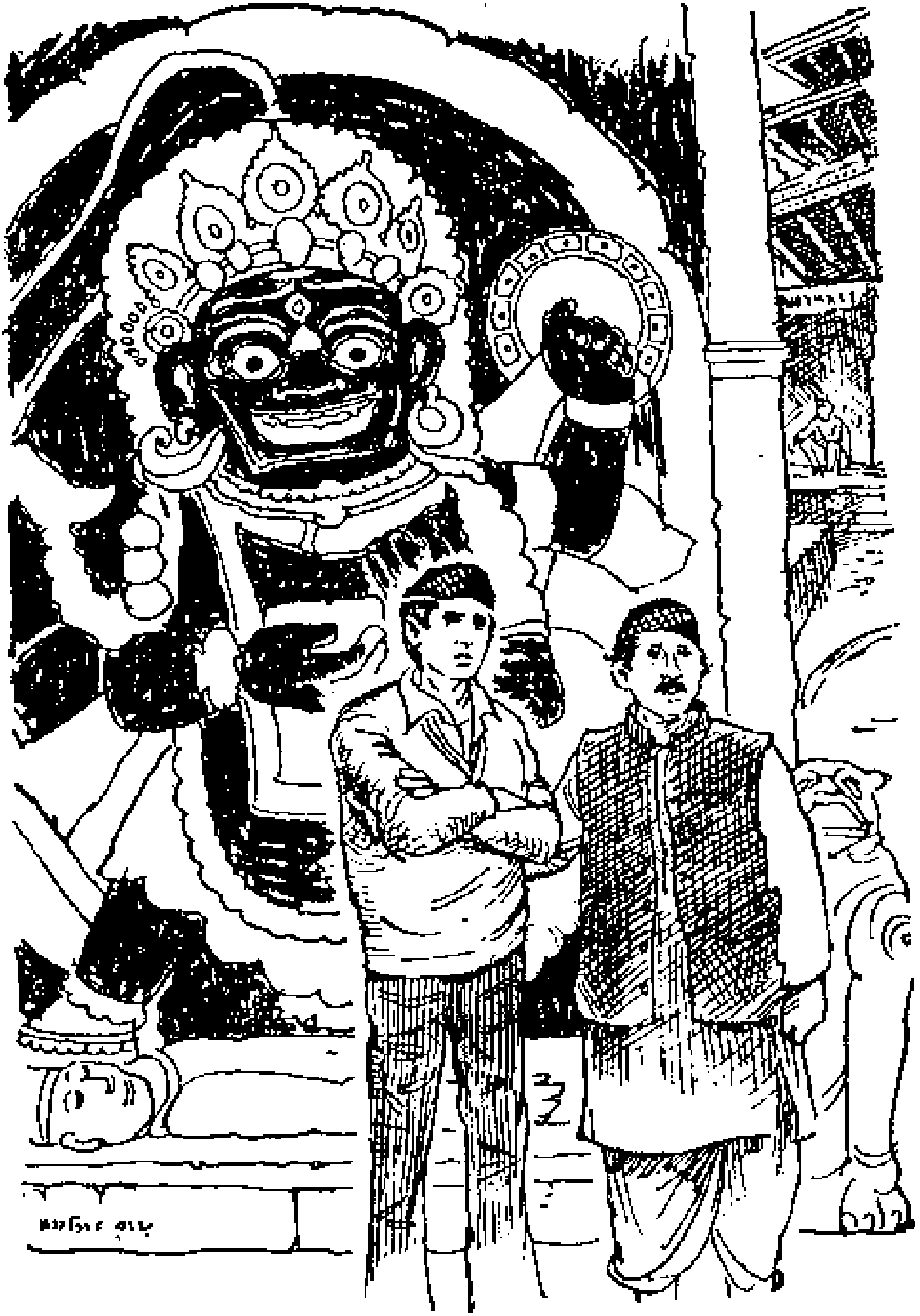

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে বেরিয়ে এলাম দুজনে। হাতে মিনিট আষ্টেক সময়। নকল-বাটরা-উধাও রহস্যটাকে হজম করে যে পথে গিয়েছিলাম, সে পথে ফিরে এসে একজন লোকের কাছ থেকে দুটো নেপালি ক্যাপ কিনে সেগুলো মাথায় চাপিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই দেখি, পৌঁছে গেছি কালভৈরবের মূর্তির সামনে।

বাপ্‌রে কী ভয়াবহ মূর্তি! দিনের বেলা দেখেই গা শিউরে ওঠে, আর রাত্তিরে যখন লোক থাকে না তখন দেখলে না জানি কী হবে। এর কাছেই কোথায় যেন আবার একটা শ্বেতভৈরবের মূর্তি আছে, সেটাও এক সময় এসে দেখে যেতে হবে।

ফেলুদা এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। থানার ফটক মূর্তির ঠিক সামনেই।

আমরা দুজনেই নকল বাটরার ঘটনাটা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ফেলুদার কী বলার আছে সেটা জানা দরকার, সে যে কেন থানায় গিয়েছিল সেটাই জানি না। বলল, 'দিব্যি লোক ও সি মিঃ রাজগুরুং। বললেন নেপাল সরকার যদি ভারত সরকারের অনুরোধ রাখতে রাজি হয়, তা হলে মিঃ সোমের আততায়ীকে ধরার ব্যাপারে এরা সব রকম সাহায্য করবেন।'

'দ্যাট ম্যান ইজ হিয়ার, ফেলুবাবু!' আর চাপতে না পেরে বলে ফেললেন জটায়ু।

আমি ব্যাপারটা আর-একটু খুলে বললাম।

'তুই ঠিক দেখেছিস বাঁ হাতে লাইটার ধরাল?'

'আমরা দুজনেই দেখেছি!' বললেন জটায়ু।

'ভেরি গুড', বলল ফেলুদা। 'মিঃ বাটরাকে কাল খবরটা দিতে হবে। ইয়ে, তোরা বরং বাজার-টাজার একটু ঘুরে দেখ, আমার হোটেলে গিয়ে দু'-একটা ফোন করার আছে।'

বুঝলাম কাঠমাণ্ডুতে এসে সাইট-সিইং ব্যাপরটা খুব বেশি হবে না ফেলুদার।

৬

আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েই যে চৌমাথা'র কথা বলেছিলাম, সেটা দিয়ে ডাইনে ঘুরলে পড়ে শুক্র পথ। এই শুক্র পথ দিয়ে কিছু দূর গেলেই এখানকা'র সুপার মার্কেট। একটা বেশ বড় ছাতওয়ালা চত্বরের চার দিক ঘিরে দোকানের সারি। কোনটা যে কিসের দোকান বোঝা মুশকিল, কারণ প্রায় সবকটাতেই সব কিছুই পাওয়া যায়। জামাকাপড় ঘড়ি ক্যামেরা রেকর্ডার রেডিও ক্যালকুলেটার কলম পেনসিল টফি চকোলেট—কী না নেই, আর সবই অবশ্য বিদেশী জিনিস।

'ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ভাই তপেশ', একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন লালমোহনবাবু।

'কেন ?'

'এ সব দোকান কি আর আমাদের জন্যে ? এখানে আসবে জন ডি রকফেলার, কি বোম্বাইয়ের ফিল্ম স্টার !'

শেষ পর্যন্ত আর লোভ সামলাতে না পেরে পৌনে দু মিটার জাপানী টেরিউলের ট্রাউজারের কাপড় কিনে ফেললেন লালমোহনবাবু। 'এই গেরুয়া টাইপের রংটা লামাদের দেশে মানাবে ভালো, কি বল তপেশ ?'

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল লামাদের দেশটা আসলে হল তিব্বত, নেপালের শতকরা আশি ভাগ লোকই হিন্দু।

ট্রাউজারস আগামী কাল বিকেলে চারটেয় রেডি থাকবে, ট্রায়াল লাগবে না। লোকে দু' দিনের জন্য এসেও কোট-প্যান্ট করিয়ে নিয়ে যায় কাঠমাণ্ডু থেকে, আর তার ফিটিংও হয় নাকি দিব্যি ভাল।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, ফেলুদা তার খাটে বসে নোটবুকটা খুলে কী যেন লিখছে। বলল, 'বোস। ডাক্তারকে কল দিয়েছি।'

ডাক্তার ? ডাক্তার আবার কেন ? শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি ফেলুদার ?

আমরা দুজনে সোফায় বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে রইলাম রহস্য

উদ্ঘাটনের অপেক্ষায়।

ফেলুদা আরও দু' মিনিট সময় নিল। তার পর খাতাটাকে পাশে সরিয়ে রেখে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'হরিনাথ চক্রবর্তী মশাইয়ের ছেলেকে যে ইনজেকশন দিয়েছিল, সেই ডঃ দিবাকরকে একটা কল দিয়েছি। ধর্ম পথে স্টার ডিসপেনসারিতে বসেন। তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। কিছু পয়সা খসবে, ভিজিট নেবে, তা সে আর কী করা যায়!'

'আমাদের এই তদন্তে ওষুধপত্রের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে হচ্ছে!' লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন।

ফেলুদা তার কথাগুলোর ওপর বেশ জোর দিয়ে বলল, 'শুধু ভূমিকা নয়, আমার ধারণা প্রধান ভূমিকা।'

'সেই যে সার্জিক্যাল অ্যাসিডের কথা অনীকেন্দ্র সোমের নোটবুকে লেখা ছিল, সেটা কি—'

'সার্জিক্যাল নয়, লাইসার্জিক অ্যাসিড। এল এস ডি। অবিশ্যি—'

ফেলুদা আবার খাতাটা হাতে তুলে নিয়েছে, তার কপালে ভাঁজ।

'এল এস ডি অক্ষরগুলোর আর-একটা মানে হতে পারে। সেটা এই কিছুক্ষণ হল খেয়াল হয়েছে। এল এস ডি—লাইফ সেভিং ড্রাগস, অর্থাৎ যে ড্রাগ বা ওষুধের উপর মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে। যেমন টিট্যানাস-রোধক ইনজেকশন। বা পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টি বি-র ওষুধ, হার্টের ওষুধ। আমার তো মনে হচ্ছে—'

ফেলুদা আবার খাতাটার দিকে দেখল। তারপর বলল—

A-B-র বিষয় জানা দরকার—কথাটাও এই সব ওষুধের বিষয়েই বলা হয়েছে। এ বি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকস। মিঃ সোম বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—এই সব ড্রাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে চাচ্ছিলেন। রিং আপ পি সি এম, ডি ডি সি—পি সি এম তো প্রদোষচন্দ্র মিত্র, আর ডি ডি সি নির্ঘাৎ আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেকটোরেট অফ ড্রাগ কন্ট্রোলকে দিয়ে টেস্ট করাতে

চেয়েছিল। আশ্চর্য। লোকটা যে রকম মেথডিক্যালি এগোচ্ছিল, তাতে তো মনে হয় ও ইচ্ছে করলে অই আই টি-র প্রোফেসরি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরিতে নেমে পড়তে পারত।'

'আর C P নিয়ে যে ব্যাপারটা ছিল?'

'ওটা সহজ। সি পি হল ক্যালকাটা পুলিস। আস্ক সি পি অ্যাবাউট মেথড্‌স্‌ অ্যান্ড কেসেস—অর্থাৎ পুলিসকে জিগ্যেস করতে হবে কত রকম ভাবে ওষুধ জাল হয়, আর আগে এ রকম জালের কেস কী কী ধরা পড়েছে।'

'তা হলে তো খাতায় যা লেখা ছিল, তার সবই—'

কলিং বেল।

আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখলে বেশ হকচকিয়ে যেতে হয়, কারণ এত ফিটফাট ডাক্তার এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বয়স ষাটের মধ্যে, বিলিতি পোশাকটা নিশ্চয়ই কাঠমাণ্ডুর সেরা টেলারের তৈরি, চশমার সোনার ফ্রেমটা বিলিতি, হাতের সোনার ঘড়িটা নিশ্চয়ই পেশেন্টের কাছ থেকে পাওয়া।

ফেলুদা খাটে ছিল বলে ভদ্রলোক অনুমান করে নিলেন সেই রুগী। আমি খাটের পাশে একটা চেয়ার দিয়ে দিলাম। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন খাটেই বসল।

'কী ব্যাপার?'

ভদ্রলোক বাংলা বলবেন আশা করিনি, কারণ 'দিবাকর' পদবিটা হয়তো বাংলা নয়। তার পর মনে হল এখানকার অনেকেই তো কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করেছে। ইনিও নির্ঘাৎ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা।

'এই নিন।'

ফেলুদা বালিশের তলা থেকে একটা খাম বার করে ভদ্রলোককে দিল। ডাক্তার কিঞ্চিৎ হতভম্ব।

'এটা—'

'ওটা আপনার ফি। আর এইটে আমার কার্ড।'

কার্ড মানে ফেলুদার ভিজিটিং কার্ড, যাতে নামের তলায় ওর

পেশাটা লেখা আছে

ভদ্রলোক কার্ডটার দিকে দেখতে দেখতে চেয়ারে বসলেন।

'আমি জানি, আপনার কাছে ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু কয়েকটা কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন।'

ডাক্তারের ভাব দেখে বুঝলাম, তিনি সত্যিই এখনও অন্ধকারে রয়েছেন।

ফেলুদা বলল, প্রথমেই বলে দিই, আমি একটা খুনের তদন্ত করছি। খুনটা হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু আমার ধারণা খুনি এখানে রয়েছে। আমি সেই ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি। আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।'

খুন শুনেই ভদ্রলোকের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে। বললেন, 'কে খুন হয়েছে?'

'সেটা পরে বলছি,' বলল ফেলুদা, 'আগে একটা জিনিস একটু ভেরিফাই করে নিই—হরিনাথ চক্রবর্তীর ছেলেকে তো আপনি অ্যান্টি-টিট্যানাস ইনজেকশন দেন?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

'ইনজেকশনটা বোধ করি আপনার স্টক থেকেই এসেছিল?'

'হ্যাঁ। আমার ডিসপেনসারির স্টক।'

'কিন্তু তাতে কাজ দেয়নি!'

'তা দেয়নি, কিন্তু তার জন্য আমাকে রেসপনসি—'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না, ডঃ দিবাকর। দায়িত্বের প্রশ্ন এখনও আসছে না। ইনজেকশন দিয়েও লোকে টিট্যানাসে মরেছে এমন ঘটনা নতুন নয়। সাধারণ লোক সেটা মেনেই নেয়। হরিনাথবাবুও তাঁর ছেলের মৃত্যু মেনেই নিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার হয়ে, হিমাদ্রি চক্রবর্তীর মৃত্যুর কী কারণ, সে সম্বন্ধে হয়তো আপনার কোনও মতামত থাকতে পারে।'

'কারণ একটা নয়,' বললেন ডঃ দিবাকর, 'প্রথমত সে নিজেই জানত না তার ইনজুরি কখন হয়েছে। তার বন্ধু বলেছে পনের-ষোল ঘন্টা আগে। সেটা যদি ষোল না হয়ে ছাব্বিশ হয়,

দেন দ্য ইনজেকশন মাইট হ্যাভ বিন টু লেট। দ্বিতীয়ত, সে ছেলে আগে কোনও কালে প্রিভেনটিভ নিয়েছে কিনা সেটারও কোনও ঠিক নেই। নেওয়া থাকলে ইনজেকশনে কাজ দেবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। ছেলে বলছে মনে নেই, বাবা বলছে নিয়েছে। হরিনাথবাবুর কথা, খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। ওঁর স্ত্রী আর ছেলে মারা যাবার পর থেকে আমি দেখেছি, ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে মেমরি ফেল করে।'

ফেলুদা বলল, 'হিমাদ্রির মৃত্যুর পর ওর বন্ধু কি আপনার ডিসপেনসারি থেকে কোনও ইনজেকশনের অ্যামপুল নেয়?'

'নিয়েছিল।'

'অ্যান্টি-টিট্যানাস?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা আপনি জানলেন কী করে? সে কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?'

'দেখা করেছিল বললে ঠিক বলা হবে না। সে আমার চেম্বারে ঢুকে এসে আমায় জানিয়ে দিয়ে যায় যে, আমিই তার বন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। আর সেটা যে সে খুব নরম ভাবে জানিয়েছিল, তা নয়।'

'এই বন্ধুটিই খুন হয়েছে।'

'মানে?'

'হিমাদ্রি চক্রবর্তীর বন্ধু। অনীকেন্দ্র সোম।'

ডঃ দিবাকর অবাক হয়ে চেয়ে আছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদা বলে চলল—

'সে আপনার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাবে বলে। সম্ভবত সে-কাজটা তার করা হয়ে ওঠেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইনজেকশনে ভেজাল ছিল। সে চেয়েছিল যে আমার সাহায্য নিয়ে এই জাল ওষুধের চোরা কারবারটা একবার তলিয়ে দেখবে।'

'আমার ডিসপেনসারি থেকে কোনও জাল ওষুধ বেরোয়নি,' দৃঢ় স্বরে বললেন ডঃ দিবাকর।

'আপনি কি ওষুধ খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে ইনজেকশন দেন ?'

ভদ্রলোক রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'হাউ ইজ দ্যাট পসিবল ? এমারজেন্সি কেস, তখন আমি ওষুধ পরীক্ষা করব, না ইনজেকশন দেব ?'

'আপনার ডিসপেনসারির ওষুধ আসে কোত্থেকে ?'

'হোলসেলারদের কাছ থেকে। তাতে ব্যাচ নাম্বার থাকে, এক্সপায়ারি ডেট থাকে—'

'সে সবই যে জাল করা যায়, সেটা আপনি জানেন ? ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে চোরা কারবারিদের, সেটা জানেন ? নাম-করা বিলিতি কম্পানির লেবেল পর্যন্ত ছাপাখানার ব্যাকডোর দিয়ে চলে যায় এই সব জালিয়াতদের হাতে, সেটা আপনি জানেন ?'

ডঃ দিবাকরকে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে, তিনি এ কথার চট্‌ করে উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

'শুনুন ডঃ দিবাকর,' ফেলুদা এবার একটু নরম সুরে বলল, 'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, ঘুণাক্ষরে কেউ ব্যাপারটা জানবে না। আপনি স্টক থেকে একটা অ্যান্টি-টিটানাসের অ্যামপুল নিয়ে তার ভেতরের পদার্থটি ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে তার রিপোর্ট আমাকে দিন। সময় বেশি নেই, সেটা বুঝতেই পারছেন।'

ডঃ দিবাকর ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। 'কাল একটা জরুরি কেস আছে,'—দরজার দিকে হেঁটে যেতে বললেন ভদ্রলোক—'কাল সম্ভব না হলে পরশু জানাব।'

'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ; এবং আপনাকে এভাবে উত্যক্ত করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

আমরা যে একটা সাংঘাতিক গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, সেটা বেশ বুঝতে পারছি ; আর, যতই নতুন নতুন ব্যাপার শুনছি, ততই অনীকেন্দ্র সোম লোকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এমন একজন লোকের এভাবে খুন হওয়াটা যে ফেলুদা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক। কুকরিটার জন্য দু' নম্বর বাটরাকেই খুনি বলে মনে হয় ; কিন্তু তা না হয়ে যদি অন্য

কেউও হয়, ফেলুদা তাকে সায়েস্তা না করে ছাড়বে না।

ফেলুদা আগেই বলে রেখেছিল যে খাবার পরে আমাদের নিয়ে একবার ঘুরতে বেরোবে, তবে সেটা কী উদ্দেশ্যে সেটা আন্দাজ করতে পারিনি। দরবার স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছি দেখে মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল, আর সেটা যে ঠিক, সেটা বুঝতে পারলাম যখন পুরনো প্যালেসের সামনে খোলা জায়গাটায় এসে ফেলুদা বলল, 'এবার বল কোন গলিটায় গিয়েছিলি দুপুরে।'

রাত্তিরে দরবার স্কোয়ারের চেহারা একেবারে অন্যরকম। এখান থেকে ওখান থেকে মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে, এরই মধ্যে কোত্থেকে যেন হিন্দি ফিল্মের গান ভেসে আসছে। টুরিস্টদের ভিড় আর সাইকেল-রিকশার ভিড় কাটিয়ে আমরা গলিটার মুখে গিয়ে পড়লাম। 'এটার নাম আগে ছিল মারু টোল', বলল ফেলুদা, 'হিপিরা এর নতুন নাম দিয়েছে পিগ অ্যালি—শুয়োর গলি।'

পাই শপগুলোর পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের সেই তিব্বতি দোকানটার দিকে।

দোকানটা এখনও খোলা রয়েছে। দু' একজন খদ্দেরও রয়েছে কাউন্টারের এদিকে, আর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সকালের সেই মহিলা। সেই পুরুষটি নেই।

ফেলুদা দোকানের বাইরে থেকেই ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দোতলা বাড়ির এক তলায় দোকানটা। দোতলায় রাস্তার দিকে দুটো পাশাপাশি জানলা, দুটোই বন্ধ। কাঠের পাল্লাগুলোর একটার ফাটলের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতর একটা ক্ষীণ আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দোকানের ডান পাশে একটা সরু চিলতে গলির পরেই একটা তিনতলা হোটেল, নাম 'হেভেনস্ গেট লজ'। স্বর্গদ্বার বলতে চোখের সামনে যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে তার সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য নেই।

ফেলুদা হোটেলটার ভিতরে গিয়ে ঢুকল, পিছনে আমরা দুজন।

'হাউ মাচ ডু ইউ চার্জ ফর রুমস হিয়ার?'

কাউন্টারে একটা রোগামতন লোক বসে একটা ছোট্ট পকেট

ক্যালকুলেটরের উপর পেনসিলের ডগা দিয়ে টোকা মেরে মেরে হিসেব করে একটা খাতায় লিখছে। লোকটা নেপালি কি ভারতীয় সেটা বোঝা গেল না। ফেলুদা তাকে প্রশ্নটা করেছে।

'সিঙ্গল টেন, ডাব্‌ল ফিফটিন।'

কাউন্টারের সামনে খোলা জায়গাটার এক পাশে একটা খালি সোফা, তার উপরে দেওয়ালে তিনটে পাশাপাশি ট্যুরিস্ট পোস্টার, তিনটেতেই হিমালয়ের কোনও না কোনও বিখ্যাত শৃঙ্গের ছবি।

'ঘর খালি আছে?' ফেলুদা ইংরেজিতে জিগ্যেস করল।

'ক'টা চাই?'

'একটা সিঙ্গল একটা ডাবল। দোতলার পুব দিকে হলে ভাল হয়। অবিশ্যি নেবার আগে একবার দেখে নেওয়া দরকার।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক যাকে বলে স্বল্পভাষী। মুখে কিচ্ছু না বলে শুধু একটা বেল টিপলেন, তার ফলে একটি নেপালি বেয়ারার আবির্ভাব হল। ভদ্রলোক তার হাতে একটা চাবি দিয়ে আমাদের দিকে একবার শুধু দেখিয়ে দিয়ে, আবার হিসেব করতে লেগে গেলেন।

বেয়ারার পিছন পিছন সিঁড়ি উঠে আমরা সোজা চলে গেলাম পুবমুখো একটা প্যাসেজ দিয়ে। ডাইনের শেষ ঘরটা চাবি দিয়ে খুলে দিল বেয়ারা।

ঘরের বর্ণনা দেবার কোনও মানে হয় না, কারণ ফেলুদা যে ঘর ভাড়া করতে আসেনি, সেটা খুব ভাল করেই জানি।

যেটা বলা দরকার সেটা এই যে, ঘরটার পুব দেয়ালে একটা জানালা রয়েছে, যেটা দিয়ে তিব্বতি দোকানের দোতলার একটা জানালা এক পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে।

লালমোহনবাবু যতক্ষণ খাটের গদি-টদি টিপে, বাথরুমের বাতি জ্বালিয়ে ভিতরটা দেখে, টেবিলের দেরাজ খোলা কিনা দেখে, আমরা যে সত্যিই ঘর নিতে এসেছি—এমন একটা ধারণা বেয়ারার মনে ঢোকানোর চেষ্টা করছেন, ততক্ষণে আমি আর ফেলুদা যা দেখার দেখে নিলাম।

দোকানে দুপুরে যে তিব্বতি লোকটাকে দেখেছিলাম, সে বসে

আছে ওই টিমটিমে বাতি-জ্বালা ঘরটার ভেতর। তার কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে। তবে বেশ বোঝা যায়, সে কোনও একটা কাজে ব্যস্ত। তার পিছনে কার্ড বোর্ডের প্যাকিং কেসের স্তূপ দেখে মনে হল, সে হয় বাক্স থেকে জিনিস বার করছে, নাহয় বাক্সের মধ্যে পুরছে।

আর-একজন লোক রয়েছে ঘরের ভেতর, তবে তার ছায়াটা শুধু দেখা যাচ্ছে। সে যে ঘাড় নিচু করে তিব্বতিটার কাজ দেখছে, সেটা বোঝা যায়।

হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল।

ছায়াটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেছে।

সিগারেট মুখে গোঁজার পর আর-একটা জিনিস বার করল পকেট চাপড়িয়ে।

লাইটার।

এবার লাইটারটা জ্বালানো হল।

বাঁ হাতে।

৭

'তোরা দুজন দেখবার জায়গাগুলোর কিছু কিছু আজ সকালেই দেখে নে,' পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় বলল ফেলুদা।—'আমার আর-একবার থানায় যাওয়া দরকার। ট্রান্সপোর্ট তো সান ট্র্যাভেলস্ থেকে পেয়ে যাবি। আর কিছু না হোক, স্বয়ম্ভু, পশুপতিনাথ ও পাটনটা ঘুরে আয়। এক দিনের পক্ষে এই তিনটেই যথেষ্ট।'

রেস্টোর্যান্ট থেকে বেরিয়ে সামনেই দেখি মিঃ বাটরা। একেই বলে টেলিপ্যাথি!

ভদ্রলোক হাসিমুখে তিন জনকেই 'গুড মর্নিং' জানালেন বটে, কিন্তু সে হাসি টিকল না।

'দ্যাট ম্যান ইজ ব্যাক হিয়ার,' গম্ভীরভাবে বললেন মিঃ বাটরা। 'কাল বিকেলে নিউ রোডেরই এক জুয়েলারি শপ থেকে ওকে

বেরোতে দেখেছে আমাদের আপিসের এক ছোকরা।'

'সে ছোকরা কি ভেবেছিল, আপনি হঠাৎ পোখরা থেকে ফিরে এসেছেন ?'

বাটরা একটু হেসে বলল, 'সেখানে একটা সুবিধে আছে। আমার যমজ ভাইটি একটু উগ্র রং-এর জামাকাপড় পছন্দ করে। কাল পরেছিল একটা শকিং পিংক পুলোভার আর একটা সবুজ শার্ট। আমাকে যারা চেনে, তারা কখনও ওকে দেখে আমি বলে ভুল করবে না। যাই হোক, আমি আজ শুনেই পুলিশে জানিয়েছি ব্যাপারটা। এক সাব-ইনস্‌পেকটর আছে, তাকে আমি ভাল করে চিনি।'

'তিনি কী বললেন ?'

'যা বলল, তাতে আমি অনেকটা নিশ্চিত বোধ করছি। বলল, পুলিশ এ লোক সম্বন্ধে জানে। ওদের সন্দেহ লোকটা কোনও স্মাগলিং র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত। তবে, কোনও পাওয়ারফুল, ধনী লোক ওর পিছনে থাকায় পুলিশ ওকে বাগে আনতে পারছে না। তা ছাড়া লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বেচাল চালছে, ততক্ষণ পুলিশের ওঁত পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

'কিন্তু আপনার নিজের যে অসুবিধে হচ্ছে, সেটা বললেন না ? কুকরিটা কিন্তু সে আপনার নামেই কিনেছিল।'

বাটরা বললেন, 'আপনার কথাটা মনে করেই ওদের জিগ্যেস করলাম যে, লোকটা তার ক্রাইমের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে পারে কিনা। তাতে ওই সাব-ইনস্‌পেকটর হেসেই ফেলল। বলল, মিঃ বাটরা, ডোন্ট থিংক দ্য নেপাল পোলিস আর সো স্টুপিড।'

'যাক, তা হলে আপনি এখন খানিকটা হালকা বলুন।'

'মাচ রিলিভ্‌ড, মিঃ বাটরা। আমি বলি কি, আপনারাও একটু রিল্যাক্স করুন। প্রথম বার কাঠমাণ্ডুতে এসে স্রেফ একটা ক্রিমিন্যালের পিছনে ঘুরে বেড়াবেন, সেটা কি ভাল হবে ? আপনি একটা দিন ফ্রি রাখুন। এই জন্যে বলছি কি, আমাদের কোম্পানি একটা নতুন ফরেস্ট বাংলো করেছে রাপ্তি ভ্যালিতে, ইন দ্য

তেরাইজ। এ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল স্পট। আপনি বিকেলে বলবেন, আমি পরদিন সকালে আপনার ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জ করে দেব। চাই কি, আমি ফ্রি থাকলে আপনাদের সঙ্গে চলেই আসব। কী বলেন?'

তেরাই শুনেই আমার মনটা নেচে উঠেছে। লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক। তবু ভাল যে ফেলুদা কথা না দিলেও ব্যাপারটা বাতিল করে দিল না।

'আপনি শূকর-সরণির ঘটনাটা চেপে গেলেন কেন?' ভদ্রলোক চলে যাবার পর জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'তার কারণ,' বলল ফেলুদা, 'তদন্তের সব কথা সব্বাইয়ের কাছে ফাঁস করে দেওয়াটা আপনার গোয়েন্দা-হিরো প্রখর রুদ্রের অভ্যাস হলেও, প্রদোষ মিত্রের নয়। বিশেষ করে যে ব্যক্তির সঙ্গে সর্বসাকুল্যে আড়াই ঘন্টার আলাপ, তার কাছে তো নয়ই।'

'বুঝলাম,' বললেন জটায়ু। 'জানলাম। শিখলাম।'

সকালের আর একটা ঘটনা হল—যে-বাঙালি ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাল এসেই আলাপ হল, যাঁর নাম আজ জানলাম বিপুল ভৌমিক—তাঁর সঙ্গে দেখা হল মিঃ বাটরাকে বিদায় দিয়ে দোতলায় ওঠার সময়।

'এটা কী চিনতে পারছেন?' ভনিতা না করেই হাতের একটা বোতল ফেলুদার দিকে তুলে ধরে প্রশ্নটা করলেন ভদ্রলোক। বোতল আমার চেনা, বিশেষ করে তার ভিতরের লাল রঙের ওষুধটার জন্য। কাশির ওষুধ, আমাদের বাড়িতে সব সময়ই থাকে। বেনাড্রিল এক্সপেকটোর্যান্ট।

'চিনতে তো পারছি,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু রঙটা তো—'

'আপনি রঙে তফাত পাচ্ছেন? সেটা বোধ হয় আপনাদের বিশেষ ক্ষমতা। আমি পাচ্ছি গন্ধে।'

ভদ্রলোক ক্যাপ খুলে বোতলটা ফেলুদার নাকের সামনে ধরলেন।

'আপনার ঘ্রাণশক্তি তো খুবই প্রখর,' বেশ তারিফের সঙ্গে বলল ফেলুদা।—'তফাত আছে, তবে খুবই সূক্ষ্ম।'

'অন্তত একটি ইন্দ্রিয় তো জোরদার হওয়া চাই,' বললেন বিপুলবাবু, 'আপনি চারমিনার খেয়েছেন না একটু আগে ? আমি দেখিনি খেতে, কিন্তু গন্ধ পাচ্ছি। কেমন, ঠিক তো ?'

'ঠিক তো বটেই। কিন্তু আপনি বোতল নিয়ে চললেন কোথায় ?'

'ফেরত দোব। পয়সা ফেরত নোব,' বললেন বিপুলবাবু, 'ছাড়ব না। একি ইয়ার্কি পেয়েছে ?'

'কোন্ দোকান ?'

'আইডিয়াল মেডিক্যাল স্টোর্স, ইন্দ্র চক। আপনাকে বললাম না সে দিন, ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেতাই কারবার হচ্ছে ? মিল্ক পাউডারে খড়ি মিশিয়ে দেয়, জানেন ? শিশুদের পর্যন্ত বাঁচতে দেবে না এরা।'

মিঃ বাটরাকে গাড়ির কথা বলে দিয়েছিলাম, সাড়ে নটায় একটা জাপানী টয়োটা এসে হাজির। আমরা যখন বেরোচ্ছি, তখন ফেলুদা টেলিফোন ডিরেক্টরি নিয়ে পড়েছে। বলল এ অঞ্চলের ওষুধের দোকানগুলোর নাম নোট করে নিচ্ছে।

একই শহরে স্বয়ম্ভুনাথের মতো বৌদ্ধস্তূপ আর পশুপতিনাথের মতো হিন্দু মন্দির—এ এক কাঠমাণ্ডুতেই সম্ভব। পশুপতিতে 'তপেশ, তুমি দৃশ্য দেখো' বলে আমাকে ফেলে রেখে মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়ে ফোঁটা-টোটা কেটে এলেন লালমোহনবাবু। মন্দিরটা কাঠের তৈরি, দরজাগুলো রূপোর আর চুড়োটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমেই যেটা সামনে পড়ে, সেটা হল পাথরের বেদিতে বসানো সোনায় মোড়া বিশাল নন্দীর মূর্তি। চাতাল দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখা যায়—নিচ দিয়ে বাগমতী নদী বয়ে যাচ্ছে, সেখানেই শ্মশান। নদীর ও পারে পাহাড়।

স্বয়ম্ভুতে যেতে হলে গাড়ি প্যাঁচালো পাহাড়ি পথ দিয়ে উপরে উঠে একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। বাকি পথ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি, সিঁড়ির মুখ অবধি রাস্তার ধারে তিব্বতি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। লালমোহনবাবুর হঠাৎ শখ হয়েছে

একটা জপযন্ত্র কিনবেন। জিনিসটা আর কিছুই না—একটা লাঠির মাথায় একটা কৌটো, তার পাশ থেকে ঝুলছে একটা চেনের ডগায় একটা বলের মতো জিনিস। লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘোরালে মাথার বল সমেত কৌটোটা ঘুরতে থাকে। ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'লিখতে লিখতে যখন আইডিয়ার অভাবে থেমে যাই, বুঝলে তপেশ, তখন অনেক সময় মনে হয়েছে হাতে একটা কিছু নিয়ে ঘোরাতে পারলে হয়তো মাথাটা খুলে যেত। দেখে মনে হচ্ছে জপযন্ত্র ইজ আইডিয়াল ফর দ্যাট।'

চার রকমের হয় জিনিসটা—কাঠের, তামার, রূপোর আর হাতির দাঁতের। কাঠের হলেই চলত, কিন্তু এখানে টুরিস্টদের জন্য সব জিনিসের দাম চড়িয়ে রেখেছে এরা ; কাঠও সত্তর টাকার কমে হবে না শুনে ভদ্রলোক আর এগোলেন না।

দু' হাজার বছর আগে পাহাড়ের চুড়োয় বসানো বৌদ্ধস্তূপ স্বয়ম্ভুনাথে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মনে থাকে, সেটা হল স্তূপের চুড়োর ঠিক নিচে চারকোনা স্তম্ভের চার দিকে আঁকা ঢেউ খেলানো ভুরুওয়ালা জোড়া জোড়া চোখ—যে চোখ মনে হয় সেই আদ্যিকাল থেকেই সারা কাঠমাণ্ডু উপত্যকার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে আসছে, কোথায় কী ঘটেছে সব জানে, কিন্তু কোনওদিন বলবে না।

স্তূপটা যে সমতল চাতালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেমন গিজগিজ করছে দেখবার জিনিসে, তেমনই করছে মানুষ আর বাঁদরের ভিড়ে। লালমোহনবাবু একবার কোমরে একটা খোঁচা খেয়ে বললেন, বাঁদরের খোঁচা, কিন্তু সেটা যে আসলে তা নয়, সেটা পরে জেনেছিলাম। সেটার কথা, যাকে বলে, যথাস্থানে বলব।

আসল ঘটনা ঘটল পাটনে।

পাটন শহর, যার প্রাচীন নাম ললিতপুর, হল বাগমতীর ও-পারে, কাঠমাণ্ডু থেকে মাত্র তিন মাইল। শহরে ঢোকবার মুখে একটা পেল্লায় তোরণ, সেটা পেরিয়ে একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে আমেরিকান কোকা-কোলা খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে আমরা এখানকার দরবার স্কোয়ারে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেলুদা এবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল—'আমাদের কাঠমাণ্ডু অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে যখন লিখবি, তখন খেয়াল রাখিস যে ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দা কাহিনী যেন নেপালের টুরিস্ট গাইড না হয়ে পড়ে।'

ফেলুদার কথা মনে রেখে শুধু এইটুকুই বলছি যে, দেড় হাজার বছর আগে লিচ্ছবি বংশের রাজা বরদেবের পত্তন করা পাটন বা ললিতপুরের মন্দির, স্তূপ, প্রাসাদ, কাঠের কারুকার্য, স্বর্ণস্তম্ভের মাথায় রাজার মূর্তি ইত্যাদির এ-বলে-আমায়-দেখ ও-বলে-আমায়-দেখ অবস্থার মধ্যে পড়ে লালমোহনবাবু অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অতুলনীয়, অননুকরণীয়, অবিস্মরণীয় ইত্যাদি ছাব্বিশ রকম বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন গড়ে তিন মিনিটে একটা করে। আমার বিশ্বাস সেই সময় সেই বিশেষ ঘটনাটা না ঘটলে তিনি আরও মিনিট পনের এই ভাবে চালিয়ে যেতে পারতেন।

ঘটনাটা ঘটল দরবার স্কোয়ার পেরিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে একটা বাজারে পড়বার পর। এই বাজার যে মঙ্গল বাজার নামে বিখ্যাত, সেটা পরে জেনেছিলাম। এখানে চার দিকে ছোট ছোট দোকানে নেপালি আর তিব্বতি জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কাঠমাণ্ডুর চেয়ে দাম কম, আর ভিড় কম বলে দেখার বেশি সুবিধে।

আমরা জিনিস দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। লালমোহনবাবুর দৃষ্টি জপযন্ত্রের দিকে, ফেলুদা বলে দিয়েছে পাটনের কাঠের কাজ পৃথিবী-বিখ্যাত, তাই দাম স্বয়ম্ভুর চেয়ে অনেক কম হলেও 'হাই ক্লাস কারুকার্য নয়' বলে অনেকগুলোই হাতে নিয়েও বাতিল করে দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলাম, বাজারের শেষ দিকে একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে একটা বেশ বড় পুরনো বাড়ির নিচে একটা দোকানের সামনে টেম্পোতে মাল তোলা হচ্ছে।

দোকানের কাছে গিয়ে দেখি, লালমোহনবাবু যা চাইছেন সেই জিনিসই বাক্স-বোঝাই হয়ে চালান যাচ্ছে, সম্ভবত কাঠমাণ্ডুর বাজারে।

'এইখেনেই বোধহয় তৈরি হচ্ছে জিনিসগুলো, বুঝলে তপেশ।

দেখে একেবারে টাটকা বলে মনে হয়। এটা বোধ হয় একটা ফ্যাকটরি।'

সেটাও অসম্ভব না। ফেলুদা বলেছিল, পাটনে নাকি অনেক কারিগর এইসব পুরনো কালের জিনিস নতুন করে তৈরি করছে।

'সুবিধের দরে পাওয়া যেতে পারে। জিগ্যেস করব?'

'করুন না।'

সে গুড়ে বালি। দোকানদার বলল অন্য দোকানে দেখো, আমাদের স্টক ফুরিয়ে গেছে। যা মাল চালান যাচ্ছে সব অর্ডারের মাল।

'যাচ্চলে, লাক্-টাই—'

লালমোহনবাবুর কথা আটকে গেছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি চলে গেছে পাশের গলিটায়।

একটা লোক গলির ডান দিক থেকে বাঁয়ে আসছে। তিব্বতি। একে আমরা চিনি। সেই হলদে টুপি, সেই লাল জোব্বা, সেই একটা চোখ বড়, একটা ছোট।

এ সেই শুয়োর গলির তিব্বতি দোকানের বেঞ্চিতে বসা আধঘুমো লোকটা। একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা যে-বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তারই একটা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল।

ঢুকেছে কি? আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে দরজাটা দৃষ্টির বাইরে। সেটা দেখতে পাওয়া যাবে চার পা সামনে গিয়ে বাঁয়ের গলিটায় ঢুকে এগিয়ে গেলে।

আবার সেই ফলো করার ঝোঁক চেপেছে আমাদের দুজনের একসঙ্গে।

লোকটা কোথায় গেল দেখা দরকার।

গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাবটা যথা সম্ভব চেপে রেখে দুজনে এগিয়ে গেলাম গলিটা দিয়ে।

হাত-বিশেক যেতেই বাঁয়ে একটা দরজা পড়ল, যার পাল্লা আর ফ্রেমে কাঠের কাজ দেখলে তাক্ লেগে যায়।

দরজাটা বন্ধ।

বাড়িটার এ দিকের দেওয়ালে এই একটাই দরজা।

এই দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকেছে লোকটা।

আরও দশ-পা গিয়ে বাড়িটা শেষ হয়েছে; তার পাশ দিয়ে একটা গলি বাঁয়ে চলে গেছে। একটা ছড়-টানা বাজনার শব্দ আসছে। মনে হল গলিটা থেকেই।

এগিয়ে গেলাম গলিটার মুখ অবধি। এ দিকটা একেবারে নির্জন।

গলির ডাইনে, আমাদের থেকে দশ-বারো হাত দূরে, একটা ভিখিরি একটা বাড়ির রোয়াকে বসে সারিন্দা বাজাচ্ছে। লোকটা নেপালি, কারণ সারিন্দা নেপালের যন্ত্র, তিব্বতের নয়। অবিশ্যি এই রকমই যন্ত্র একই নামে পূর্ববঙ্গেও পাওয়া যায়।

যতটা সম্ভব টুরিস্টের ভাব করে এগিয়ে গেলাম গলি ধরে। লোকটার সামনে একটা মরচে-ধরা টিনের কৌটো। যেখানে বসেছে, তার উল্টো দিকে একটা দরজা। এটা সেই একই বাড়ির দরজা, যার সামনের দিকে দোকান থেকে জপযন্ত্র চালান যাচ্ছে কাঠমাণ্ডু। এই বাড়িতেই ঢুকেছে শুয়োর গলির সেই তিব্বতি।

ভিখিরি এক মনে বাজিয়ে চলেছে তার নেপালি গৎ, আমাদের সম্বন্ধে তার কোনও কৌতূহল নেই।

লালমোহনবাবু টিনের কৌটোটায় কয়েকটা খুচরো পয়সা ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'যাবে নাকি ভেতরে?'

এ দরজাটা খোলা। এটা সাইজেও ছোট আর এটার বাহারও কম, কারণ এটা হল ব্যাকডোর, যাকে বলে খিড়কি।

'চলুন।'

'যদি জিগ্যেস করে তো কী বলবে?'

'বলব টুরিস্ট, ভেতরে কী আছে দেখতে এসেছি।'

'চলো।'

ভিখিরিটার দিকে একটা আড়দৃষ্টি দিয়ে, গলিতে আর কোনও লোক নেই দেখে—আমরা দুজনে মাথা হেঁট করে দরজাটা দিয়ে ভেতরের প্যাসেজে ঢুকলাম।

প্যাসেজটা পেরিয়ে ডাইনে একটা উঠোনের এক চিলতে দেখা যাচ্ছে। তারও ডাইনে নিশ্চয়ই ঘর আছে। সেই ঘরের দিক

থেকেই শব্দটা আসছে।

যান্ত্রিক শব্দ?

না, ঠিক যান্ত্রিক না। যদি বা একটা মেশিন গোছের কিছু চলে, তার সঙ্গে আরও কয়েকটা শব্দ মিশে আছে। মোটামুটি বলা যায় যে, শব্দটার মধ্যে একটা তাল আছে।

আমরা দম বন্ধ করে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম।

বাঁয়ে একটা দরজার পিছনে অন্ধকার ঘর।

একটা পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ডান দিক থেকে আসছে সেটা। শব্দটা বাড়ছে।

হঠাৎ খেয়াল হল যে, এর মধ্যে কখন যেন সারিন্দার সুর পালটে গেছে। আগেরটা ছিল করুণ, মোলায়েম; এটা নাচানি, হালকা সুর।

এবারে যে লোকটা আসছে, তাকে দেখা যাবে।

গলা শুকিয়ে গেছে।

বুঝলাম লোকটা যদি কিছু জিগ্যেস করে তো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না।

আর চিন্তা না করে এক ঝটকায় লালমোহনবাবুকে টেনে নিয়ে দুজনে ঢুকে পড়লাম বাঁ পাশের অন্ধকার ঘরটায়। রাস্তার দিকের একটা খুপরি জানালা দিয়ে ঘরে সামান্য আলো আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একটা খাটিয়া, একটা তামার পাত্র, দড়িতে ঝোলানো কিছু জামা-কাপড়।

আমরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলাম, পায়ের শব্দটা বাইরে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তার দিকে চলে গেল।

সারিন্দা থেমেছে। তার বদলে গলার আওয়াজ পেলাম। লোকটা বাইরে গিয়ে ভিখিরিটার সঙ্গে কথা বলছে।

আমাদের ডাইনে আর একটা দরজার পরে আর একটা ঘর। এটাও অন্ধকার।

জটায়ুর আস্তিন ধরে টেনে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলাম।

কাঠ ও কার্ডবোর্ডের বাক্সে বোঝাই ঘরটা। তা ছাড়া আছে কিছু তামার জিনিস, কিছু মূর্তি, গোটা কুড়ি-পঁচিশ কাঠের ছাঁচ। বাঁয়ে

ঘরের কোণায় পড়ে আছে লালমোহনবাবুর শখের জিনিস — তিনটে কাঠের জলপাত্র।

আমরা ঢুকেই বাঁয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। বেশ বুঝতে পারছি, এ ঘরের বাইরেই বারান্দা পেরিয়ে উঠোন, আর উঠোনের ও দিকের ঘর থেকেই শব্দটা আসছিল।

এখন শব্দ নেই।

এবার একটা নতুন শব্দ।

লোকটা বাইরে থেকে ফিরে এসেছে।

সে খুঁজছে আমাদের।

প্যাসেজ ধরে পায়ের শব্দ এগিয়ে গিয়ে কাউকে না পেয়ে আবার ফিরে এল। যে ঘরে আছি, সে ঘরের ডাইনের দেওয়ালে উঠোনের দিকে পর পর তিনটে দরজা। দরজার বাইরে থেকে আসা আলো তিনবার বাধা পেল সেটা দেখতে পেলাম।

এবারে আমাদের ঠিক পাশের দরজার সামনে এসে পায়ের শব্দটা থামল।

একটা আবছা ছায়া ঢুকে এল ঘরের ভিতরে চৌকাঠ পেরিয়ে।

আমার দম বন্ধ। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে তৈরি হচ্ছি। যা করবার আমাকেই করতে হবে।

লোকটা আর দু' পা এগোতেই আমাদের দেখতে পেল।

ওর প্রথম হকচকানিটা কাটবার আগেই আমি ডাইভ দিয়ে পড়লাম লোকটার উপর। হাত দুটো সমেত কোমর জাপটে ধরে ঘুরিয়ে দেয়াল-ঠাসা করব।

কিন্তু লোকটা ষণ্ডা। এক ঝটকায় হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার কোটের ল্যাপেল দুটো দু' হাতের মুঠোয় ধরে এক হ্যাঁচকায় মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল আমায়। বোধ হয় ইচ্ছে ছিল ছুড়ে ফেলবে, কিন্তু লালমোহনবাবু সে ব্যাপারে বাগড়া দিচ্ছেন। আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে লোকটার হাত দুটোকে আমার কোট থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু পারলেন না।

লোকটার কনুইয়ের ধাক্কা লালমোহনবাবুকে ছিটকে ফেলে দিল

কার্ডবোর্ডের বাক্সের স্তূপের ওপর।

আমার দু' হাতের তেলো লোকটার থুতনির তলায় রেখে উপর দিকে চাড় দিয়ে মাথাটাকে চিতিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারছি আমি এখনও শূন্যে, এখনও লোকটা আমাকে ধরে—

ঠকাং!

হাত দুটো আলগা হয়ে গেল। আমার পায়ের তলায় আবার মাটি। লোকটা দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে পড়ল অজ্ঞান হয়ে।

মাথায় বাড়ি।

জপযন্ত্রের বাড়ি।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা দুজনে আবার রাস্তায়, জপযন্ত্র লালমোহনবাবুর থলিতে।

৮

কলকাতায় আমাদের বাড়িতে বসে আমি আর ফেলুদা অনেক সময় আমাদের পুরনো অ্যাডভেঞ্চারগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে তাদের সম্বন্ধে, যাদের শয়তানি বুদ্ধি ফেলুদাকেও মাঝে মাঝে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল। লখ্‌নউ-এর বনবিহারী সরকার, কৈলাসের মূর্তি চোর, সোনার কেল্লার বর্মন আর মন্দার বোস, মিঃ গোরে, কাশীর মগনলাল মেঘরাজ—এরা সব কোথায়? কী করছে? ভোল পালটে সৎপথে চলছে, না শয়তানির মওকা খুঁজছে? নাকি অলরেডি আরম্ভ করে দিয়েছে শয়তানি?

এসবগুলো এত দিন শুধু প্রশ্নই ছিল; শেষে কাঠমাণ্ডুতে এসে এই পুরনো আলাপীদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে নেগেটিভ-পজিটিভের ঠোকাঠুকিতে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে, সেটা কে জানত?

পাটন থেকে ফিরে ইন্দিরা রেস্টোরান্টে লাঞ্চ খেয়ে (এদের মেনুতে মোমো ছিল না) প্রায় তিনটে নাগাদ হোটেলে ফিরে দেখি, ফেলুদা খাটে শুয়ে সদ্য-কেনা একটা ইংরিজি বই পড়ছে, নাম 'ব্ল্যাক

মার্কেট মেডিসিন'। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই চোখ কপালে উঠে গেল।

'ব্যাপার কী? খুব ধকল গেছে বলে মনে হচ্ছে?'

দুজনে ভাগাভাগি করে পাটনের পুরো ঘটনাটা বললাম। জানতাম, ফাঁকে ফাঁকে অনেক প্রশ্ন গুঁজে দেবে ফেলুদা। বেশ বুঝতে পারছি, আমরা দুজনে মিলে আজ একটা জবরদস্ত কাজ করে এসেছি। কেন—তা ঠিক বলতে পারব না, সমস্ত বাড়িটার মধ্যে যেন জালিয়াতির একটা গন্ধ ছড়িয়ে ছিল। অথচ বাইরে থেকে দেখলে প্রাচীন পাটনের ইমারতি আর কাঠের কাজের তারিফ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

সব শুনে-টুনে ফেলুদা 'সাবাস' বলে আমাদের দুজনেরই পিঠ চাপড়ে দিল।

'গোয়েন্দাগিরিতে বীরচক্র থাকলে আমি তোদের দুজনেরই নাম রেকমেন্ড করতাম। কিন্তু আপনি যে জিনিসটা দিয়ে বাজিমাত করলেন, সেটা একবার দেখান!'

লালমোহনবাবু হালকা মেজাজে থলি থেকে জপযন্ত্রটা তুলে ধরে দেখালেন।

'ওর মধ্যে মন্ত্র পোরা আছে কিনা সেটা দেখেছেন?'

'আজ্ঞে?'

'ওম্ মণি পদ্মে হুম্।'

'আজ্ঞে?'

'ওম্—মণি—পদ্মে—হুম্। তিব্বতি মহামন্ত্র। এই মন্ত্রটা একটা কাগজে হাজার বার লিখে অথবা ছেপে প্রত্যেকটা জপযন্ত্রে পুরে দেবার কথা।'

'পুরে দেবে? কোথায় পুরে দেবে?'

'ওই ওপরের জিনিসটা তো একটা কৌটো। ওটার মাথাটা তো ঢাকনার মতো খুলে যাবার কথা।'

'তাই বুঝি?'

লালমোহনবাবু একটা মোচড় দিতেই মাথাটা খুলে এল।

'উঁহু—নো সাইন অফ মন্ত্র।'

'ভেতরে কিচ্ছু নেই?'

লালমোহনবাবু আর একবার ভেতরটা দেখলেন আলোর কাছে এনে।

'নাথিং।—না না, দেয়ার ইজ সামথিং। কিসের যেন গুঁড়ো চকচক করছে।'

'কই দেখি।'

এবার ফেলুদা ভাল করে দেখল ভেতরটা। তার পর ল্যাম্পের পাশে বেডসাইড টেবিলের উপর উপুড় করে ধরল কৌটোটা।

'কাঁচ। কাঁচের টুকরো।'

'একটা বড় টুকরো রয়েছে, ফেলুদা।'

'দেখেছি।'

'মনে হয় একটা ছোট্ট পাইপ জাতীয় কিছুর অংশ।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

'পাইপ নয়। অ্যামপুল। অসাবধানে ভেঙে ফেলাতে এই পুরো জিনিসটাকে বাতিল করে দিয়েছে।'

'তার মানে বলছেন, এই জপযন্ত্রের মধ্যে জাল ওষুধ চালান হত?'

'কিছুই আশ্চর্য না। জপযন্ত্রের ভিতর পুরে প্যাকিং কেসে করে জমা হত পিগ অ্যালির তিব্বতি দোকানের দোতলায়। সেখান থেকে নিশ্চয়ই চলে যেত হোলসেলারদের কাছে। তার পর সেখান থেকে দাওয়াখানায়। যে বাক্সগুলো কাল ওই হোটেলের ঘর থেকে দেখেছিলি, আর আজ টেম্পোতে যে বাক্সগুলো তুলছিল—সে কি একই রকম?'

'আইডেনটিক্যাল,' উত্তর দিলেন জটায়ু।

'বুঝেছি'—ফেলুদার কপালে ত্রিশূলের মত দাগ—'সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা তদ্বির করছে নকল বাটরা। আর ব্যাপারটা যদি বড় স্কেলে হয়, তা হলে হয়তো বেশ কিছু মাল চলে যাচ্ছে সীমানা পেরিয়ে ভারতবর্ষে। বিহার, ইউ পি-র ছোট ছোট শহরে কত লোক এই ভেজাল ওষুধ খায়, আর ভেজাল ইনজেকশন ব্যবহার করে, তার হিসেব কে রাখছে? ডাক্তারের সন্দেহ হলেও সে যে

সোরগোল তুলবে না, সে তো দেখাই গেল। এই যুগটাই যে ওই রকম। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!'

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ বেশ তেজের সঙ্গে পায়চারি করে নিল। লালমোহনবাবু আবার জপযন্ত্রে ঢাকনা পরিয়ে সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন। ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে অনেক সময়ই তিনি কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন; আজ তিনি যাকে বলে স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

ঘড়িতে দেখি পৌনে চারটে। আমি লালমোহনবাবুকে মনে করিয়ে দিলাম যে, এতক্ষণে তাঁর প্যান্ট রেডি হয়ে থাকার কথা।

'এইদ্দ্যাখো! ভুলেই গেস্‌লাম।'

ভদ্রলোক এক লাফে সোফা থেকে উঠে পড়লেন। 'আজ ক্যাসিনো যাচ্ছি তো আমরা? ট্রাউজারটা কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই করানো।'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা তালি মেরে মন থেকে যেন সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে বলল, 'গুড আইডিয়া। আজকে উই ডিজার্ভ এ হলিডে। ডিনারের পরে এক ঘন্টা ক্যাসিনোয় যাপন।'

অবিশ্যি ক্যাসিনো-পর্ব এক ঘন্টায় শেষ হয়নি। কেন হয়নি সেটা জানতে হলে আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাসিনো খোলা থাকে নাকি ভোর চারটে অবধি, আর আসল ভিড়টা হয় এগারোটার পর থেকে। এখন গেলে খানিকটা খালি পাওয়া যাবে।

হোটেলটা শহর থেকে খানিকটা বাইরে। বাসে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমরা লোকালয় ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছি, কারণ রাস্তার আলো ছাড়া আর বিশেষ আলো চোখে পড়ছে না।

মিনিট পনের চলার পর খানিকটা চড়াই উঠে একটা গেট পড়ল। তার পর ডাইনে বেশ বড় একটা লন ও সুইমিং পুল পেরিয়ে আবার ডাইনে ঘুরে বাসটা গিয়ে থামল হোটেলের পোর্টিকোর ঠিক আগে একেবারে ক্যাসিনোর প্রবেশদ্বারের সামনে।

পেল্লায় হোটেলের এক পাশটায় এই ক্যাসিনো। বুঝলাম যারা বাইরে থেকে আসবে, তাদের আর আসল হোটেলে ঢুকতেই হবে না।

আমাদের আজকের হিরো---অন্তত এখন পর্যন্ত---হলেন লালমোহনবাবু। বিদেশী ফিল্মে দেখা আদব-কায়দার কোনটাই বাদ দেবেন না এমন একটা সংকল্প নিয়েই যেন তিনি ক্যাসিনোতে এসেছেন। অবিশ্যি এ সব আদব-কায়দা যে তিনি সব সময় ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন, তা নয়। যেমন, সুইং ডোর দিয়ে ঢুকেই বাঁয়ে কাউনটারের পিছনে যে দুটি বো-টাই পরা ভদ্রলোক বসেছিলেন---যাদের কাছে হোটেল থেকে পাওয়া পাঁচ ডলারের কার্ডটা দেখিয়ে তবে ক্যাসিনোয় ঢুকতে হয়—তাদের দিকে চেয়ে রীতিমতো গলা তুলে 'হেল্‌লো' বলাটা ঠিক বিলিতি কেতার মধ্যে বোধ হয় পড়ে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কাঠমাণ্ডুর টেলার ভদ্রলোকের প্যান্ট বেশ ভালই বানিয়েছে। তার সঙ্গে নিউ মার্কেটে কেনা হাল্‌কা সবুজ জার্কিন আর মাথায় নেপালি ক্যাপ—সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ একটা স্মার্টনেসের ভাব এসেছে সেটা স্বীকার করতেই হবে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে তবে আসল ক্যাসিনো। এক জাপানী ভদ্রমহিলা উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে টাকা ভরতে ভরতে, আর লালমোহনবাবুর দৃষ্টি হাতের কার্ডের দিকে; ফলে দুজনের মধ্যে একটা কোলিশন লাগত, যদি না আমি ভদ্রলোকের জার্কিনের আস্তিনটা ধরে ঠিক সময়ে একটা টান দিতাম। লালমোহনবাবু মহিলার দিকে চেয়ে যেভাবে হেসে "হেহেকস্‌কিউজ মিহিহি' বললেন, সেটার দামও লাখ টাকা।

অবিশ্যি যতই কনফিডেনস্‌-এর ভাব করুন না কেন, খোদ ক্যাসিনোয় ঢুকে চারিদিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভদ্রলোককে ফেলুদার শরণাপন্ন হতেই হল। ফেলুদাও তৈরি ছিল ওঁকে উদ্ধার করার জন্য।

'হাতের কার্ডটায় দেখুন পাঁচ রকম খেলার জন্য পাঁচটা কুপন রয়েছে। আপনার বাবা জ্যাকপট ছাড়া আর কিছু খেলা চলবে না।

অন্যগুলোর তল পাবেন না। আপনি জ্যাকপটের কুপনটি ছিঁড়ে ওই কাউন্টারে দিন। ওটা হল ক্যাসিনোর ব্যাঙ্ক। আপনাকে এক ডলারের হিসেবে যত টাকা হয় দিয়ে দেবে। বোধ হয় এগারো টাকার মতো হবে—নেপালি টাকা। তাতে আপনি এগারোটা চান্স পাবেন জ্যাকপটে। তাতে যদি কিছু মূলধন হয়, তা হলে আরও খেলতে পারবেন। যদি টাকাগুলো যায়, তবে আরও খেলতে হলে ট্যাঁক থেকে দিতে হবে। কখন থামবেন, সেটা সম্পূর্ণ আপনার মর্জি। বেশি হারলে কী হয় তার একটা বড় নজির তো রয়েইছে—যুধিষ্ঠির।'

একটা বড় হল-ঘর আর তার ডান দিকে একটা মাঝারি ঘর মিলিয়ে ক্যাসিনো। বড়টায় পনটুন, ব্ল্যাকজ্যাক, ফ্লাশ আর আসল খেলা রুলেট ছাড়াও কিছু জ্যাকপটের মেশিন রয়েছে, আর ছোটটায় রয়েছে কিনো আর জ্যাকপট। ফেলুদা দেখলাম, রুলেটের দিকে এগিয়ে গেল; আমরা গিয়ে ঢুকলাম ডাইনের ঘরে। আমরা দুজনেই কুপন ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে নিয়েছি।

তিন দিকের দেয়ালের সামনে পর পর দাঁড়িয়ে আছে বারো-চোদ্দটা জ্যাকপট মেশিন।

'ব্যাপারটা খুব সোজা,' একটা মেশিনের সামনে নিয়ে গিয়ে বললাম লালমোহনবাবুকে, 'এই দেখুন স্লট। ওয়েইং মেশিনের মতো করে এর মধ্যে টাকা গুঁজে দেবেন। তার পর এই ডাইনের হাতল ধরে টান। তার পর যা হবার আপনিই হবে।'

'মানে?'

'জিত হলে মেশিন থেকে টাকা বেরিয়ে এই পাত্রটায় পড়বে, যেমন ওজনে কার্ড পড়ে। হার হলে কিছুই বেরুবে না।'

'হুঁ...'

'আপনি একবার ফেলে দেখুন।'

'দেখব?'

'হ্যাঁ। গুঁজুন টাকা।'

'গুঁজলাম।'

একটা ঘড়ঘড় শব্দের পর বোঝা গেল টাকাটা একটা জায়গায়

গিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের গায়ে এক লাইন লেখা জ্বলে উঠল—'কয়েন অ্যাক্সেপটেড।'

'এবার হাতল টানুন। জোরে।'

লালমোহনবাবু মারলেন টান।

মেশিনের সামনে একটা চৌকো কাঁচের জানালার পিছনে পাশাপাশি তিনটে তিন-রকম ছবি ছিল—হলদে ফল, লাল ফল, ঘন্টা। হাতলে টান দিতেই মেশিনের ভিতর থেকে একটা ঘড়ঘড় করে ঘোরার শব্দ শুরু হল, আর চোখের সামনে কাঁচের পিছনের ছবিগুলো বদলাতে বদলাতে সেকেন্ড পাঁচেক পরে ঘট ঘট ঘট শব্দে একটা নতুন কম্বিনেশনে এসে দাঁড়াল। হলদে ফল, হলদে ফল, নীল ফুল।

আর তার পরমুহূর্তেই ঝনাৎ ঝনাৎ করে দুটো টাকা এসে পড়ল পাত্রের মধ্যে।

'জিতলুম নাকি?' চোখ গোল গোল করে জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'জিতলেন বইকি। একে দুই। সে-রকম ভাগ্য হলে একে একশোও হতে পারে। এই দেখুন চার্ট। কোন্ কম্বিনেশনে কত লাভ হবে এটা দেখালেই বুঝতে পারবেন। ঠিক হ্যায়?'

'ওকে।'

আমি দুটো মেশিন পরে আমার মেশিনে চলে গেলাম। আরও সাত-আটটা মেশিনের সামনে দেশি-বিদেশি মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে খেলে যাচ্ছে। ঘরের এক পাশে কাউন্টারে একজন লোক বসে আছে, তার কাছে চাইলেই একটা প্লাসটিকের বাটি পাওয়া যায় টাকা রাখার জন্য। আমি দুটো চেয়ে নিয়ে একটা লালমোহনবাবুকে দিয়ে এলাম।

এমন জমাটি ব্যাপার যে, খেলার সময় অন্য কোনো দিকে চাওয়া যায় না, অন্য কিছু ভাবা যায় না, মনে হয় বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই জ্যাকপট। তাও একবার বাঁদিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম লালমোহনবাবু বাটিতে করে বেশ কিছু টাকা কাউন্টারে নিয়ে গিয়ে সেগুলোর বদলে নোট নিয়ে এলেন।

আমারও জিতই হচ্ছিল, রোখও চেপে গিয়েছিল, এমমন সময় ফেলুদা পাশের ঘর থেকে এসে হাজির, সঙ্গে একজন বছর পঁচিশেকের মহিলা।

'আপাতত কিছুক্ষণের বিরতি,' বলল ফেলুদা।

'হোয়াই স্যার?'

বুঝলাম লালমোহনবাবুর মোটেই ভালো লাগল না ফেলুদার প্রস্তাবটা।

'চারশো তেত্রিশ থেকে ডাক এসেছে।'

'মানে?'

ভদ্রমহিলাই বুঝিয়ে দিলেন পরিষ্কার বাংলায়।

'ফোর থার্টিথ্রীতে আপনাদের একজন বন্ধু রয়েছেন। তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'হু ইজ দিস ফ্রেন্ড?'

লালমোহনবাবু এখনো পুরো ক্যাসিনোর মেজাজে রয়েছেন।

'নাম বললেন না, তবে বললেন আপনারা তিনজনেই খুব ভালো করে চেনেন?'

'চলুন চট্ করে দেখাটা সেরে আসি,' বলল ফেলুদা, 'কৌতূহলও হচ্ছে, তা ছাড়া মিনিট দশেকের বেশি থাকার তো কোনো প্রয়োজন নেই।'

অগত্যা খেলা থামিয়ে রওনা দিলাম এই অজানা বন্ধুর উদ্দেশে। ভদ্রমহিলা লিফ্‌টের মুখ অবধি এসে নমস্কার করে চলে গেলেন।

চার তলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে কার্পেট মোড়া প্যাসেজ ধরে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ডানদিকে ৪৩৩ নম্বর ঘর। ফেলুদাই বেল টিপল।

'কাম ইন।'

দরজাটা লক্ করা ছিল না; ঠেলতেই খুলে গেল। ফেলুদাকে সামনে নিয়ে ঢুকলাম আমরা।

বিশাল বৈঠকখানায় একটা মাত্র ল্যাম্প জ্বলছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা সোফায় যিনি বসে আছেন, তার ঠিক পিছনেই

ল্যাম্পটা জ্বলছে বলে ভদ্রলোকের মুখ ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে থেকে মনে হয়েছিল ঘরে আরো লোক, কারণ কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন দেখলাম ভদ্রলোকের উল্টো দিকে একটা টেলিভিশনের পাশে আরেকটা যন্ত্র। রঙিন আমেরিকান ছবি হচ্ছে টিভিতে, দেখে বুঝলাম ভিডিও চলছে। ফিল্মের কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে।

'আসুন মিঃ মিত্তির, আসুন আঙ্কল।'

আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে, গলা শুকিয়ে গেছে, পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে।

এ গলা যে আমাদের খুব চেনা! ফেলুদা বলেছিল এর মতো ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়েও আনন্দ। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে এর সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল ফেলুদার।

মগনলাল মেঘরাজ।

যার মাইনে করা নাইফ থ্রোয়ার লালমোহনবাবুকে টার্গেট করে খেলা দেখিয়ে ওঁর আয়ু কমিয়ে দিয়েছিল অন্তত তিন বছর।

কাঠমাণ্ডুতে কী করছে এই সাংঘাতিক লোকটা?

৯

'আসেন! বসেন।'

টিভির পাশের যন্ত্রটা থেকে একটা তার চলে গেছে ভদ্রলোকের হাতে, সেটার ডগায় একটা সুইচ। ভদ্রলোক সেটা টিপতেই শব্দ সমেত রঙিন ছবি উবে গেল।

'ওয়েল, মিঃ মিটার?'

আমরা দুটো সোফায় ভাগ করে বসেছি, আমার পাশে লালমোহনবাবু।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখটা খানিকটা স্পষ্ট। বিশেষ বদল হয়নি চেহারায়। ধুতিটা এখনও ছাড়েন নি, তবে শেরওয়ানিটায় জাত [illegible] হয়েছে, আর বোতামগুলো হীরের হলেও হতে পারে। সবচেয়ে বদল হয়েছে পরিবেশে; বেনারসের গলির বাড়ির

গদি, আর ফাইভ-স্টার হোটেলের রয়েল সুইটে আকাশ পাতাল তফাত।

'এবার রিয়েল হলিডে তো?'

'তার কি আর জো আছে,' একপেশে হাসি হেসে বলল ফেলুদা। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, জানেন তো?'

'এখানে কী ধান ভানবেন আপনি মিঃ মিত্তির?'

মগনলালের সামনে রূপোর ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে পাশের টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিলেন।

'টি অর কফি? বেস্ট দার্জিলিং টি পাবেন এই হোটেলে।'

'চা-ই হোক।'

রুম সার্ভিস ডায়াল করে তিনটে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফোন রেখে আবার ফেলুদার দিকে চাইলেন মগনলাল।

'ইন্ডিয়াতে আপনি হিরো—বিগ ডিটেকটিভ। কাঠমাণ্ডু ইজ ফরেন কান্ট্রি মিঃ মিত্তির। এখানে জান-পেহ্‌চান আছে কি আপনার?'

'এই তো একজন পুরোন আলাপী বেরিয়ে গেল!'

মগনলাল হালকা হাসি হাসলেন। দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের দিক থেকে সরছে না।

'আপনি কি সারপ্রাইজড্ হলেন আমাকে দেখে?'

'তা একটু হয়েছি বৈকি!' একটা চারমিনার ধরিয়ে দুটো রিং ছেড়ে জবাব দিল ফেলুদা। 'আপনি হাজতের বাইরে দেখে নয়; ওটা আপনার কাছে কিছুই না। অবাক হচ্ছি আপনার কর্মক্ষেত্র বদলেছে দেখে।'

'হোয়াই? বনারস হোলি প্লেস, কাঠমাণ্ডুভী হোলি প্লেস। ওখানে বিশ্বনাথজী, ইখানে পশুপতিনাথজী। একই বেপার, মিঃ মিত্তির। যেখানে ধরম, সেখানেই আমার করম। কী বোলেন, আঙ্কল?'

'হেঁঃ হেঁঃ।'

বুঝলাম হাসি ফুটলেও, কথা ফোটার অবস্থা এখনও হয়নি

জটায়ুর।

'কর্মের কথা যে বলছেন, সেটা কি ওষুধ সংক্রান্ত কোনো কাজ?'

আমার শিরদাঁড়ায় একটা শিহরন খেলে গেল। বাঘের সামনে পড়ে ধরনের বেতোয়াক্কা ব্যবহার একমাত্র ফেলুদার পক্ষেই সম্ভব।

'ওসুদ?' মগনলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'হোয়াট ওসুদ মিঃ মিত্তর? সুদের কারবার আমার একটা আছে ঠিকই, লেকিন ওসুদকা কেয়া মতলব?'

'তা হলে আপনি এখানে কী করছেন সেটা জানতে পারি কি?'

'সার্টেনলি! লেকিন ফেয়ার এক্সচেঞ্জ হোনা চাই।'

'বেশ। আপনি বলুন। আমিও বলব।'

'আমার বেপার ভেরি সিম্পল মিঃ মিত্তর। আমি আর্টের কারবারী সেটা তো আপনি জানেন, আর নেপালে যে আর্টের ডিপো, সেটাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

ফেলুদা চুপ। লালমোহনবাবু দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন।

'এবার আপনার বেপার বলুন। ফেয়ার এক্সচেঞ্জ।'

'আপনি সব কথা খুলে বলেছেন বলে মনে হয় না,' বলল ফেলুদা, 'তবে আমার কথা আমি খুলেই বলছি। আমি এসেছি একটা খুনের তদন্ত করতে।'

'খুন?'

'খুন।'

'ইউ মীন দ্য মার্ডার অফ মিঃ সোম?'

আমি থ। ফেলুদাও থ কিনা বোঝার উপায় নেই। লালমোহনবাবু শীত লাগার ভাব করে দাঁতে দাঁত চাপলেন সেটা লক্ষ করলাম। হোটেলের ভিতরের টেম্পারেচারটা এমনিতেই একটু কমের দিকে। ক্যাসিনোতে লোকের ভিড়ের জন্য বলে বোধহয় ঠাণ্ডা লাগেনি।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মগনলালজী,' বলল ফেলুদা, 'মিস্টার অনীকেন্দ্র সোম।'

চা এলো। মগনলালের আদেশে নতুন ট্রে থেকে শুধু তিনটে

কাপ-ডিশ আর টি-পট রেখে পুরোনটা থেকে টি-পট আর মগনলালের ব্যবহার করা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল বেয়ারা।

'আমার বিশ্বাস,' ফেলুদা বলে চলল, 'সোম ভদ্রলোকটি এখানকার কোনো ব্যক্তির কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। তাই তাকে খতম করে ফেলা হল।'

মগনলাল চা ঢালছেন আমাদের জন্য।

'ওয়ান? টু?'

মগনলালের হাতে চিনির পাত্র। কিউব শুগার।

'ওয়ান,' আমি বললাম, কারণ প্রশ্নটা আমাকেই করা হয়েছিল।

'ওয়ান?'

এবার জটায়ুকে প্রশ্ন। আমি জানি জটায়ুর মাথায় এল এস ডি ঘুরছে, আর ঘুরছে সেই লোকটার কথা, যে সিঁড়ি নামছে ভেবে সাত তলার ছাতের কার্নিশ থেকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'টু? থ্রী?'

'নো, নো।'

'নো শুগার?'

'নো।'

লালমোহনবাবু মিষ্টির ভক্ত, চায়ের দু চামচের কম চিনি হলে চলে না, তাও নো বলছেন।

'ই কেমন কথা হল মোহনবাবু? আপনার রসগুল্লা খাওয়া চেহারা, শুগারে নো করছেন কেন?'

আমি নিয়েছি বলেই বোধ হয় ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত সাহস পেলেন।

'ও-কে। ওয়ান।'

ফেলুদারও একটা। উঠে গিয়ে যে যার চা নিয়ে এসে আবার বসলাম।

ফেলুদা চায়ের কাপটা পাশের টেবিলে রেখে আগের কথার জের টেনে বলল—

'আমার বিশ্বাস মিঃ সোম জানতে পেরেছিলেন যে এখানে একটা

সহিত কারবার চলেছে। সে ব্যাপারে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার সঙ্গে দেখা করা। তার আগেই তাকে খুন করা হয়। আপনি যখন খুনের ব্যাপারটা জানেন, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আপনি এ ব্যাপারে জড়িত কিনা।'

মগনলাল ভাসা ভাসা চোখে ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি নিয়ে কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে রইলেন। আমাদের হাতে ধরা পেয়ালা থেকে ভুরভুর করে হাই ক্লাস চায়ের গন্ধ বেরোচ্ছে; আমি আর লালমোহনবাবু এই অবস্থাতেই চুমুক না দিয়ে পারলাম না।

'জগদীশ!'

মগনলাল হঠাৎ হাঁকটা দেওয়াতে চমকে উঠেছিলাম। বসবার ঘরের দু দিকেই যে আরো ঘর আছে সেটা এসেই বুঝেছিলাম। এবার মগনলালের পিছনের একটা দরজা খুলে একজন লোক এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে 'কিড়িং' করে যে শব্দটা হল সেটা লালমোহনবাবুর হাতের পেয়ালা কেঁপে গিয়ে পিরিচের সঙ্গে লাগার শব্দ।

জগদীশ নামে যে ভদ্রলোকটি মগনলালের পিছনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি হলেন বাটরা নাম্বার টু। কাছ থেকে দেখে বাটরার সঙ্গে সামান্য তফাতটা বুঝতে পারছি। এনার চোখ একটু কটা, কানের দু পাশের চুলে সামান্য পাক ধরেছে, হয়ত শরীরে মাংসও কিছুটা বেশি। আরেকটা বড় তফাৎ হল, এঁর চাহনিতে মিশুকে ভাবটা নেই।

'ইনাকে চিনেন?' প্রশ্ন করলেন মগনলাল।

'আলাপ হয়নি। দেখেছি,' বলল ফেলুদা।

'তবে শুনে রাখুন গোয়েন্দা বাহাদুর। ইনাকে হ্যারাস করবেন না। আমি জানি আপনারা ইনার পিছুনে লেগেছেন। উয়ো আমি বরদাস্ত করব না। জগদীশ ইজ মাই রাইট হ্যান্ড ম্যান।'

'যদিও উনি নিজে যা করেন তা বাঁ হাতেই করেন।'

বলিহারি ফেলুদা। এখনো নার্ভ স্টেডি, গলার স্বর একটুও কাঁপছে না।

মগনলাল আর কিছু বলার আগে ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

'ওনার চেহারার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়, এমন একজন লোক কাঠমাণ্ডুতে আছে সেটা আপনি জানেন কি ?'

মগনলালের মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল।

'ইয়েস মিঃ মিত্তর। আই নো দ্যাট। সে লোক যদি আপনার দোস্ত হয় তাহলে টেল হিম টু বি ভেরি কেয়ারফুল। সে যেন বুঝে-সুঝে কাম করে। আপনি তো আজ পসুপতিনাথজীর শ্মশান দেখে এসেছেন, মোহনবাবু ?'

লালমোহনবাবু প্রচণ্ড মনের জোরে মগনলালের কথা যেন শুনতে পাননি এমন ভাবে করে বাকি চা-টা ঢক করে খেয়ে পেয়ালাটা ঠং শব্দে পাশের টেবিলে রেখে দিলেন।

মগনলালের দৃষ্টি আবার ফেলুদার দিকে ঘুরল।

'বাটরা যদি মনে করে সে তার নিজের গলতি কাম জগদীশের কান্ধে ডালবে, তবে তাকে বলে দিবেন, মিঃ মিত্তর, কি ওই শ্মশানে তার ডেডবডির সৎকার হবে উইদিন টু ডেজ।'

'নিশ্চয়ই বলব।'

ফেলুদাও তার চা শেষ করে কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

মগনলালের কথা শেষ হয়নি এখনো।

'আরো একটা কথা বলে দিই মিঃ মিত্তর। আপনি দাওয়াইয়ের কথা বলছিলেন। আপনি জানেন আমাদের দেশের মানুষের সবসে বড়া দুষমন কে ? অ্যালোপ্যাথ ডকটরস্। সাইসিন জানেন তো ? সিন মানে কী ? সিন মানে পাপ। প্যাকিট ফেঁড়ে পয়সা নেবে, হাথ ফেঁড়ে ব্লাড নেবে, পেট ফেঁড়ে পিঠ ফেঁড়ে বুক ফেঁড়ে এটা নেবে সেটা নেবে। ওয়র্স দ্যান এনি স্মাগলিং র‍্যাকেট। পেনিসিলিনসে পসপতিনাথের চরণামৃত ইজ হান্ড্রেড টাইমস বেটার। দেশের লোক যদি অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে দুসরা দাওয়াই খাবে তো আখেরে দেশের মঙ্গল হবে—এ আপনি জেনে রাখবেন।'

'শুনলাম আপনার কথা'—ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে,—'কিন্তু আপনি দেখছি নিজে এখনো অ্যালোপ্যাথি ছাড়তে পারেননি। আপনার টেলিফোনের পাশে রাখা ওই শিশিটা নিশ্চয়ই চরণামৃতের শিশি নয়।'

শিশিটা এমনভাবে আড়ালে রয়েছে যে প্রায় চোখেই পড়ে না।

কথাটা যে মগনলালের মোটেই পছন্দ হল না সেটা তার মুখের উপর খোঁড়ো ভাবটা নেমে আসা থেকেই বুঝেছি।

'আসি, মগনলালজী। চা-টা সত্যিই ভালো ছিল।'

মগনলাল তার জায়গা থেকে নড়লেন না।

যখন চারশো তেত্রিশ নম্বর সুইট থেকে বেরোচ্ছি, তখন একটা সুইচের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম মার্কিন ছবির সংলাপ আবার শুরু হয়েছে।

১০

মগনলালপর্বের পরেও একই রাত্রে যে আরো কিছু ঘটতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অথচ লুম্বিনী হোটেলে ফেরার পর আরো দুটো এমন ঘটনা ঘটল, যার ফলে এই বিশেষ দিনটা আমার জীবনে চিরকালের মতো একটা লাল-তারিখ মার্কা দিন হয়ে রইল।

হোটেলে ফিরে রিসেপশনের বেঞ্চিতে হরিনাথ চক্রবর্তীকে বসে থাকতে দেখে রীতিমত অবাক হলাম। এত রাত্রে কী ব্যাপার? বললেন প্রায় এক ঘণ্টা, মানে সাড়ে দশটা থেকে, ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য, বিশেষ দরকার।

'আসুন আমাদের ঘরে,' বলল ফেলুদা।

ঠাণ্ডা মানুষটার মধ্যে বেশ একটা চাপা উদ্বেগের ভাব লক্ষ করছিলাম।

'কী ব্যাপার বলুন তো?' ঘরে এসে ভদ্রলোককে সোফায় বসিয়ে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

ভদ্রলোক একটুক্ষণ সময় নিয়ে যেন তাঁর চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'হিমাদ্রি এইভাবে চলে যাওয়াতে সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি বলতে কি, এও মনে হচ্ছিল যে, তাকে যখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, তখন এত কথা বলেই বা লাভ কী?'

'কিসের কথা বলছেন আপনি ?'

'বছর তিনেক আগে,' একটু দম নিয়ে বললেন হরিনাথবাবু, 'হিমাদ্রি এখানে একটা চোরা কারবারের ব্যাপার ধরিয়ে দিয়েছিল। গাঁজা চরস ইত্যাদি গোপনে চালান যাচ্ছিল এখান থেকে। হিমাদ্রি ছিল ভয়ানক রেকলেস অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছেলে। নিজের জীবনের কোনো তোয়াক্কা করত না। স্মাগলিং যে হচ্ছে সেটা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঘাঁটিটা কোথায় জানা যাচ্ছিল না। আপনাকে আগেই বলেছি যে হিমাদ্রিকে হেলিকপটারে নেপালের উত্তর-দক্ষিণ দুদিকেই যেতে হত। একবার উত্তরে গিয়ে সে নিজেই অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে ঘাঁটিটা হচ্ছে হেলাম্বুর কাছে একটা শেরপাদের গ্রামে। সে পুলিসকে খবর দেয়। ফলে দলটা ধরা পড়ে।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনার কি ধারণা ইদানীং সে এই ধরনের আরেকটা চোরা কারবারের সন্ধান পেয়েছিল ?'

'আমাকে সে কিছু বলেনি,' বললেন হরিনাথবাবু, 'তবে ও মারা যাবার দিন পাঁচেক আগে থেকে দুই বন্ধুতে উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। তার কিছু কিছু কথা আমার কানেও এসেছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, তুই এসব গোলমালের মধ্যে আর যাস না। এসব গ্যাঙ বড় সাংঘাতিক হয়; এদের দয়ামায়া বলে কিছু নেই। ও আমার কথায় কান দেয়নি।'

ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'ওরা যে নির্মম হয় সেটা তো অনীকেন্দ্র সোমের খুন থেকেই বুঝতে পারছি।'

'আমার বিশ্বাস হিমু টেট্যানাসে না মরলে ওকেও হয়ত এরাই মেরে ফেলত।'

'এটা কেন বলছেন ?'

ভদ্রলোক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ফেলুদার হাতে দিলেন। খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া কাগজ। তাতে লাল কালি দিয়ে দেবনাগরীতে লেখা এক লাইন কথা।

'এটা ছিল হিমুর একটা প্যান্টের পকেটে। ও মারা যাবার পর আমার চাকর পেয়ে আমাকে দেয়।'

'নেপালি ভাষা বলে মনে হচ্ছে?' ফেলুদা বলল।

'হ্যাঁ। ওর মোটামুটি বাংলা হচ্ছে—তোমার বাড় বড্ড বেড়েছে।'

ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জাল ওষুধের চোরা কারবার বন্ধ করতে গিয়ে আপনার পুত্রকে সেই জাল ওষুধের ইনজেকশনেই মরতে হল!'

'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন যে ইনজেকশনে ভেজাল ছিল?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস। সেটা ঠিক কিনা সেটা কাল জানতে পারব বলে আশা করছি।'

ডাঃ দিবাকরকে যে ওষুধ টেস্ট করতে বলা হয়েছে সেটা ফেলুদা হরিনাথবাবুকে বলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

'জানি না এসব তথ্য জেনে আপনার কোনো লাভ হল কিনা,' দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন হরিনাথ চক্রবর্তী।

'আমার মনের কিছু অস্পষ্ট ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হল।' বলল ফেলুদা। 'তদন্তের ব্যাপারে সেটা একটা মস্ত লাভ।'

হরিনাথবাবু যাবার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও গুডনাইট করে চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

আমি শুয়ে পড়লাম, যদিও ফেলুদার হাবভাবে মনে হচ্ছে বেড-সাইড ল্যাম্প এখন জ্বলবে কিছুক্ষণ।

আজকের রাতটা কী অদ্ভুত ভাবে গেল, হিমাদ্রিবাবুর চোরা কারবারিদের ধরিয়ে দেওয়া, মগনলাল কী সাংঘাতিক লোক, কী বেপরোয়াভাবে ফেলুদাকে শাসিয়ে দিল—এইসব ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা দুটো বুজে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ দরজার বেলটা বেজে উঠল।

সোয়া বারো। এই সময় আবার কে এল?

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তাজ্জব ব্যাপার।

লালমোহনবাবু। বাঁ হাতে এক টুকরো কাগজ, ডান হাতে

জপযন্ত্র। মুখের হাসিটাকে লাখ্‌-স্মাইল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এরকম অমায়িক, স্নিগ্ধ হাসি আজকের দিনে চট করে কোনো সেয়ানা শহুরে লোকের মুখে দেখা যায় না।

'হুম্ হুম্ হুম্!'

তিনবার হুম্ শব্দটা উচ্চারণ করে জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে ভদ্রলোক ঢুকে এলেন ঘরের ভেতর।

ফেলুদা খাটে উঠে বসেছে। আমি ভদ্রলোকের হাত থেকে

কাগজের টুকরোটা নিয়ে নিয়েছি। তাতে লাল কালি দিয়ে ইংরাজিতে লেখা—'ইউ হ্যাভ বিন ওয়ার্নড।' অর্থাৎ তোমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক এই লাল কালিই দেখেছি একটু আগে একটা নেপালি ভাষায় লেখা হুমকিতে।

'কোথায় ছিল এটা?' ফেলুদার হাতে কাগজটা চালান দিয়ে জিগ্যেস করলাম ভদ্রলোককে। লালমোহনবাবু তাঁর জহরকোটের ডান পকেটে দুটো চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এই কোটটা পরেই বেরিয়েছিলেন সকালে। মনে পড়ল স্বয়ম্ভুনাথে বলেছিলেন বাঁদরে ওর পকেট ধরে টান দিয়েছিল।

'ও—ম্‌ম্‌ম্‌!'

টেনে দম নিয়ে পুরো দমটা ছেড়ে শব্দটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে বসতে।

'ও-ম্ মণি পদ্মে হুম্—হুম্—হুমকি।'

হুমকি তো বটেই, কিন্তু এ কী দশা লালমোহনবাবুর। অথচ মুখে সেই হাসিটা রয়েই গেছে।

আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম। ও ঠোঁট নেড়ে বুঝিয়ে দিল—'পাউন্ড-শিলিং-পেন্স।'

এল এস ডি।

শুগার কিউব।

মগনলাল নিজের হাতেই চিনি দিয়েছিল আমাদের চায়ে। আমাদের যখন কিছুই হচ্ছে না, তখন শুধু লালমোহনবাবুর চায়েই দিয়েছিল ওই বিশেষ একটি কিউব। আঙ্কলকে নিয়ে রসিকতা করাটা দেখছি মগনলাল চরিত্রের একটা বিশেষ দিক। কী শয়তান লোকটা!

'ওঁ—ম্‌ম্‌ম্‌মণিপদ্মে হুমকি!' আবার বললেন ভদ্রলোক। পরমুহূর্তেই হঠাৎ হাসিটা চলে গিয়ে একটা বিরক্তির ভাব দেখা দিল চাহনিতে। দৃষ্টি ফেলুদার দিকে। ফেলুদা একদৃষ্টে লক্ষ করে যাচ্ছে ভদ্রলোককে।

'খুলিটা খুলে ফেলুন!' ধমকের সুরে বললেন ভদ্রলোক—'বলছে খুলি, অথচ খোলার নামটি নেই। হ্যাঃ!'

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'স্কাউন্ড্রেল'। বুঝলাম সেটা মগনলালকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

জপযন্ত্র এখন থেমে আছে। আস্তে আস্তে বিরক্ত ভাবটা চলে গিয়ে লালমোহনবাবুর চোখ ফেলুদা'র উপর থেকে সরে গিয়ে চলে গেছে খাটের পাশে জলভরা গেলাসটার দিকে।

চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে এল।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরে পিন ড্রপ সাইলেন্স। লালমোহনবাবু চেয়ে আছেন গেলাসটার দিকে; মনে হচ্ছে গেলাসটা হয়ত বা ওঁর মন্ত্রের জোরে টেবিল থেকে শূন্যে উঠে পড়বে।

'অহোহো!' বললেন লালমোহনবাবু। তীক্ষ্ণতা চলে গিয়ে একটা ঢুলু-ঢুলু ভাব চোখে, সেই সঙ্গে তারিফের হাসি। 'অহোহো ভিবজিওর! অহো! অহো!—তপেশ, দেখেছ রঙ?'

আমি থতমত খেয়ে কিছু বলার খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ লালমোহনবাবু ছাড়বেন না। ভিবজিওর মানে হচ্ছে ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রীন, ইয়েলো, অরেঞ্জ রেড। অর্থাৎ গেলাসের জলে রামধনুর রঙ দেখছেন তিনি।

'তপেশ ভাই, দেখেছ রঙ? ভিবজিওর ভাইব্রেট করছে, দেখেছ?'

কথার মাঝে মাঝে যখন ফাঁক পড়ছে আর লালমোহনবাবু শুধু চুপ করে চেয়ে আছেন সামনের দিকে, সেই সময়টা আমার তন্দ্রার মতো আসছে। আবার কথা শুরু হলেই ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে। একবার তন্দ্রার অবস্থা থেকে 'মাইস!' বলে একটা চিৎকারে লাফিয়ে উঠে দেখি লালমোহনবাবু ভীষণ সোজা হয়ে বসে ওঁর সামনে মেঝের দিকে চেয়ে আছেন।

'মাইস!' আবার বললেন ভদ্রলোক। তারপর বিড়বিড়ানি শুরু হল কিছুক্ষণ—'টেরামাইসিন, টেট্রামাইসিন, সুবামাইসিন, ক্লোরোমাইসিন, কমপ্রোমাইসিন...কিল-বিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব।—আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?'

শেষের কথাটা বেদম জোরে বলে লালমোহনবাবু হঠাৎ সোফা

ছেড়ে উঠে কার্পেটে মোড়া মেঝেতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘা দিতে শুরু করলেন—যেন প্রত্যেকটা ইঁদুরকে পিষে পিষে মারছেন।—'আবার পেথম ধরা হয়েছে! এদিক নেই ওদিক আছে!'

এইভাবে চলল মিনিট তিনেক। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না—সারা ঘর ঘুরে ঘুরে এই কাণ্ড। আশা করি আমাদের ঠিক নিচের ঘরে কোনো গেস্ট নেই!

'ব্যস্, খতম।'

লালমোহনবাবু বসে পড়লেন।

'ঝ্যাক্' আবার বললেন ভদ্রলোক।—'অল টিকটিকিজ খতম।'

কোন ফাঁকে যে ইঁদুর টিকটিকি হয়ে গেল সেটা বোঝা গেল না।

'খতম্! অ্যান্টিবায়োটিকটিকিজ—খতম্।'

এতটা এনার্জি খরচ করার ফলেই বোধ হয় লালমোহনবাবুর মধ্যে এবার একটা ঝিমধরা ভাব এসে গেল। তার সঙ্গে সেই আলাভোলা হাসি।

'ওম্ম্ম্ মোমোমোমোমো—ওম্ম্ম্!'

এর পরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন উঠলাম, তখন পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘর একেবারে আলোয় আলো। ফেলুদা চানটান করে দাড়িটাড়ি কামিয়ে রেডি, সবেমাত্র কাকে যেন ফোন করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

'উঠে পড় তোপ্‌সে, কাজ আছে। আজ সকালেই বাটরার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তার অবস্থাটা যে খুব নিরাপদ নয় সেটা তাকে জানানো দরকার।'

'ফোনটা কাকে করলে?'

'পুলিশ স্টেশন। ভেরি গুড নিউজ। দুই সরকারে সমঝোতা হয়ে গেছে।'

'এ তো দারুণ খবর!'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে আমি নিজে একটা ফোন করেছিলাম, সেটার খবরটা খুব ভাল না।'

'কেন ? কাকে করেছিলে ফোন ?'

'ডঃ দিবাকর। উনি নাকি আজ ভোরে একটা জরুরী কল পেয়ে চলে গেছেন, এখনো ফেরেননি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না।'

'কেন ফেলুদা ?'

'মনে হয় উনি আমাদের হয়ে ওষুধ পরীক্ষা করে দেখছিলেন, সেটা চোরাকারবারির দল পছন্দ করেনি। অবিশ্যি এটা আমার অনুমান। দেখি, ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ফোন করে দেখব। তাতেও নাহলে ডিসপেনসারিতে চলে যাব।'

লালমোহনবাবুর ব্যাপারটা কতক্ষণ চলেছিল সেটা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'উনি গেছেন ঘন্টা খানেক হল', বলল ফেলুদা, 'পরের দিকটা একেবারে মহানির্বাণের অবস্থা। কোনো উৎপাত করেন নি। আসলে এল এস ডি-র প্রভাব সাত আট ঘন্টার কমে যায় না।'

'তুমি অল অ্যালং জেগে ছিলে ?'

'উপায় কী ? কখন কী করে বসে তার তো ঠিক নেই। ভাগ্য ভালো ভদ্রলোকের কোনো খারাপ এফেক্ট হয়নি।'

'এখন একদম নরম্যাল ?'

'পুরোপুরি নয়। যাবার সময় বলে গেলেন আমার মগজের নাকি তিন ভাগ স্থল, একভাগ জল। সেটা কমপ্লিমেন্ট হল কিনা ঠিক বুঝলাম না। তবে খোশ মেজাজে আছেন। কোনো ডেঞ্জার নেই।'

১১

আমি আধ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা বলেছিল নিচে থাকবে, যাতে টেলিফোন এলে তৎক্ষণাৎ রিসেপশন থেকেই কথা বলতে পারে। গিয়ে দেখি ও পায়চারি করছে। বলল, 'এখনও ফেরেনি ডাঃ দিবাকর। মুশকিল হচ্ছে কি, কোথায় যে গেছেন, সেটাও বাড়ির লোকে জানে না।'

'আর বাটরা ?'

'বাটরার লাইনটা পাচ্ছি না। আরও বার-দুয়েক দেখি। না হলে ব্রেকফাস্টের পর সোজা চলে যাবো ওর আপিসে। এমনিতেও একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই লালমোহনবাবু এসে হাজির। কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। তবে আমার সঙ্গে যে সামান্য কথাবার্তা হল, তাতে বুঝলাম যে চিনি এখনও সম্পূর্ণ হজম হয়নি।

রিসেপশনের দেওয়ালে টাঙানো একটা নেপালি মুখোসের নাকের উপর বার তিনেক হাত বুলিয়ে বললেন, 'ইংলন্ডের রাজপ্রাসাদের নামটা কী যেন, ভাই তপেশ ?'

'বাকিংহাম প্যালেস ?'

'ইয়েস,' বললেন লালমোহনবাবু, 'তবে এর সঙ্গে বোধহয় কমপ্যারিজন হয় না।'

'কার সঙ্গে ?'

'আমাদের এই হোটেল লুমুম্বা।'

'লুম্বিনী।'

'লুম্বিনী।'

তার পর একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এইখানেই তো জন্মেছিলেন, তাই না ?'

'কে ?'

'গৌতম বুদ্ধ ?'

'এই হোটেলে নয় নিশ্চয়ই।'

'কেন, বিফোর ক্রাইস্ট হোটেল ছিল না বলছ ?'

এই অদ্ভুত আলোচনা আর বেশিক্ষণ চলল না, কারণ ফেলুদা এসে বলল যে, চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে বাটরার আপিস সান ট্র্যাভেলসে যাওয়া দরকার, ওদের টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও শুধু কফিতে ব্রেকফাস্ট সারলাম। মন বলছে, আজ অনেক কিছু ঘটবে। কিন্তু কী ঘটবে সেটা বুঝতে পারছি না।

আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ মিঃ বাটরার আপিস। বেশি বড় না হলেও, বেশ ছিমছাম আপিস, দেখেই বোঝা যায় বয়স বছর-তিনেকের বেশি না। এক দেওয়ালে নেপালের রাজা-রানীর ছবি, আর অন্য দেওয়ালে যার ছবি—বুঝলাম সে-ই এই আপিসের মালিক মিঃ রাণা।

আপিসে এসে যে খবরটা পেলাম, সেটাকে একটা বমশেল বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

বাটরার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই, রয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি মিঃ প্রধান। তাঁর কাছেই জানলাম যে মিঃ বাটরাকে হঠাৎ বেরিয়ে যেতে হয়েছে।

'এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পারসন আজ সকালে ফোন করলেন মিঃ বাটরাকে,' বললেন মিঃ প্রধান। 'বললেন তেরাইতে আমাদের নতুন বাংলোটা দেখার খুব ইচ্ছা। তাই মিঃ বাটরাকে ওঁর সঙ্গে চলে যেতে হল। অবিশ্যি উনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন যে, আপনার গাড়ি লাগলে যেন তার ব্যবস্থা আমরা করে দিই। তাৎ কোনও ডিফিকাল্টি হবে না।'

'এই ইম্পর্ট্যান্ট পারসনটির নাম জানতে পারি কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সার্টেনলি। মিঃ মেঘরাজ। ওবেরয় হোটেলে আছেন। ভেরি বিগ আর্ট ডিলার।'

লালমোহনবাবু আমার হাতটা খপ্ করে ধরলেন। বুঝলাম মেঘরাজের নামেই ওর নেশা ছুটে গেছে। সত্যিই, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। মিঃ বাটরা যে এত সহজেই মগনলালের ফাঁদে পড়ে যাবেন, সেটা ভাবতে পারিনি।

'এখান থেকে আপনাদের বাংলোয় যেতে কতক্ষণ লাগে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আপনাকে যেতে হবে ত্রিভুবন রোড দিয়ে হেতাওরা—১৫০ কিলোমিটার। হেতাওরা ইজ এ টাউন—ওখানে আপনি লাঞ্চ করে নিতে পারেন। কারণ আমাদের বাংলো নতুন, সেখানে কিচেন চালু হয়নি এখনও। টাউন থেকে ডাইনে ঘুরে রাপ্তি নদীর পাশ দিয়ে

তিন কিলোমিটার গিয়ে আরও ডাইনে দু ফার্লং গিয়েই বাংলো। জঙ্গলের মধ্যে—বিউটিফুল স্পট।'

ফেলুদা আধঘন্টা পরে হোটেলে গাড়ি পাঠাতে বলে দিল। ওকে একবার নাকি চট করে দরবার স্কোয়ারের দিকে ঘুরে আসতে হবে। বলল, 'তোরা হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমার বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

গাড়ি এল কুড়ি মিনিটের মধ্যে, আর ফেলুদা পঁচিশে। বলল, ওকে নাকি একবার ফ্রিক স্ট্রিট-এ যেতে হয়েছিল। 'সেটা আবার কোথায়?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কাছেই,' বলল ফেলুদা, 'বলা যেতে পারে হিপি-পাড়া।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শহর ছাড়িয়ে ত্রিভুবন রোড ধরল আমাদের ট্যাক্সি। ফেলুদার হাতে খাতা, চোখে ভ্রূকুটি, বাইরের দৃশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। লালমোহনবাবুর নেশা ছুটে গেলেও, একটা আশ্চর্য মোলায়েম ভাব লক্ষ করছি ওঁর মধ্যে, যেটা আগে কখনও দেখিনি। মনে হয় যেন এ সব সাময়িক উত্তেজনার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে শুধু একটা মাত্র মন্তব্য করলেন—

'কাল সব ডবল দেখছিলাম, আজ সিঙ্গল।'

ফেলুদা কথাটা শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে লালমোহনবাবুর দিকে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থেকে বলল, 'এটাও যেমন ঠিক, তেমন এর উলটোটাও ঠিক।'

কথাটা আমার কাছে ভীষণ রহস্যজনক বলে মনে হল।

কাঠমাণ্ডুর চার হাজার ফুট থেকে আরও অনেক উপরে উঠে এসেছি। তিন পাশ ঘিরে বরফের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। আগেই জানতাম যে, সাড়ে সাত হাজার ফুট অবধি উঠতে হবে। তাই ঝোলাতে করে গরম মাফলার নিয়ে নিয়েছিলাম। ঘন্টা দেড়েক চলার পর সেগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি ছিল, গাড়ি চালু অবস্থাতেই তিনজন খেয়ে নিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নামা শুরু হয়ে গেল। ন্যাড়া মহাভারত পর্বতশ্রেণী ছাড়িয়ে আমরা এখন ঘন সবুজে ঢাকা শিবালিক

পর্বতশ্রেণীর দিকে চলেছি। অত দূর যেতে হবে না আমাদের, কারণ মাঝপথেই পড়বে রাপ্তি উপত্যকায় নদীর পাশে হেতাওরা শহর। সেইখান থেকে ত্রিভুবন রাজপথ ছেড়ে ডান দিকে ঘুরব আমরা।

'তোপ্‌সে—বাটরার পুরো নামটা জানিস?'

হাতের খাতাটা বন্ধ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'না তো, উনি তো কোনওদিন বলেননি।'

'না বললেও তোর জানা উচিত ছিল,' বলল ফেলুদা, 'ওর আপিসের ঘরে ওর টেবিলের উপর একটা প্লাস্টিকের ফলকে লেখা ছিল পুরো নামটা। অনন্তলাল বাটরা।'

হেতাওরা যখন পৌঁছলাম, তখন দুটো বেজে গেছে। খিদে পাবার কথা, কিন্তু পায়নি। এক-একটা অবস্থায় পড়লে মানুষ খিদে-তেষ্টা ভুলে যায়, এটা সেই অবস্থা। লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করাতে বললেন, 'ফুড ইজ নাথিং।'

ড্রাইভার রাস্তা জানে, সে ত্রিভুবন রোড ছেড়ে ডান দিকে ঘুরল। একটা সাইন বোর্ড দেখে বুঝলাম যে, এই রাস্তা দিয়েই ট্রি-টপস হোটেলে যায়, যেখানে গাছের মাথায় বসানো হোটেলের বারান্দায় বসে তেরাই-এর বন্য জানোয়ার দেখা যায়। আমাদের বাংলো অবিশ্যি পড়বে তার অনেক আগেই।

বাঁ দিক দিয়ে রাপ্তি নদী ছুটে চলেছে পাথর ভেঙে দু' দিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমাদের রাস্তারও ডান দিকে ঘন শালবন। মন বার বার বলছে, এই হল সেই তেরাই—সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া অরণ্যভূমি, হিংস্র জানোয়ারের ডেরা হিসেবে যার আর জুড়ি নেই। সিপাহী বিদ্রোহের পর নানাসাহেব তার দলবল নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসে এই তেরাইয়েরই এক অংশে গা ঢাকা দিয়ে ছিল।

রাস্তা আবার ডাইনে মোড় নিল। এটা কাঁচা, হালে তৈরি হয়েছে।

এই রাস্তা ধরে মিনিট-তিনেক চলেই লাল টালির ছাতওয়ালা কালো কাঠের বাংলোটা চোখে পড়ল। বনের গাছ কেটে বেশ

কিছুটা জায়গা সাফ করে কম্পাউন্ডে ঘেরা বাংলোটা তৈরি হয়েছে।

তাহলে ঘুরে বাংলোর গেট দিয়ে ঢুকে নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে শব্দ তুলে আমাদের গাড়ি বাংলোর বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁয়ে কিছুটা দূরে কম্পাউন্ডেরই ভেতর দুটো পাশাপাশি গ্যারাজের সামনে আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার আশ্চর্য নিস্তব্ধতার একটা আন্দাজ পেয়েছি। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। না, সেটা ঠিক না। একটা সামান্য খুটখাট শব্দ কোত্থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারছি না।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার অন্য গাড়িটার দিকে চলে গেল, আমরা তিনজন তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে জাল দেওয়া দরজাটা খুলে বারান্দায় গিয়ে ঢুকলাম।

'ভিতরে আসুন মিঃ মিত্তির!'

সামনের ঘরটাই বৈঠকখানা, তার ভিতর থেকেই ডাকটা এসেছে। মগনলালের পালিশ করা গম্ভীর গলাটা চিনতে অসুবিধা হয় না।

আমরা তিনজন গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম।

ঘরের তিন দিকে সোফা, মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল, দেওয়ালে বাঁধানো নেপালের দৃশ্য, মেঝেতে তিব্বতী কার্পেট। এ ছাড়া পাশে একটা টেবিলের উপর একটা রেডিও রয়েছে। আর এক কোণে একটা বুক শেলফে কিছু বই আর পত্রিকা।

আমাদের ঠিক সামনের সোফাটার এক ধারে বসে মগনলাল একটা টিফিন ক্যারিয়ার থেকে পুরী আর তরকারি খাচ্ছে। একজন চাকর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জলের জাগ আর গামলা হাতে নিয়ে।

এ ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই।

'আমি জানতাম, আপনি আসবেন,' খাওয়া শেষ করে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বললেন মগনলাল। আমরা তিনজনে ইতিমধ্যে বসে পড়েছি।

'আপনি কী ব্যাপারে এসেছেন, সেটা আমি জানি মিঃ মিত্তির। বাট দিস টাইম ইট ইজ মাই টার্ন। ঘুঘুতে বার বার খাবে না দানা,

খাবে কি ?'

ফেলুদা নির্বাক।

'বেনারসে আপনি যে বেইজ্জত করলেন আমাকে,' বললেন মগনলাল, 'সে তো আমি ভুলিনি মিঃ মিত্তর। বদলা নেবার মওকা যদি আপনি দিয়ে দেন, বদলা আমি নেব না ?'

একটা ধপ ধপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে এই বাংলোরই কোনও অংশ থেকে। মনে হচ্ছে, ডান দিকের কোনও ঘর থেকে আসছে। কিসের শব্দ বোঝা মুশকিল।

'মিঃ বাটরা কোথায়, সেটা জানতে পারি কি ?'

মগনলালের হুমকি অগ্রাহ্য করে শান্তভাবে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

মগনলাল আপসোসের ভঙ্গিতে চুক্ চুক্ করে শব্দ করে বললেন, 'ভেরি স্যাড, মিঃ মিত্তর। আমি তো কাল বললাম আপনাকে—জগদীশ আমার রাইট হ্যান্ড ম্যান। রাইট হ্যাণ্ড তো একটাই থাকে মানুষের—দোনো কা কেয়া জরুরত ?'

'আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন না। আমি জানতে চাই, সে ভদ্রলোক কোথায় ?'

'বাটরা জিন্দা আছে মিঃ মিত্তর,' শেরওয়ানির পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে দুটো পান মুখে পুরে দিয়ে বললেন মগনলাল—'ডে টাইমে হি উইল বি সেফ। তেরাই-এর বেপার তো আপনি জানেন। গরমিন্ট ল আছে কি এখানে ওয়াইলড লাইফ মারা চলবে না, লেকিন ওয়াইলড লাইফ যদি মানুষ মারে, দেন হোয়াট ? সেটার এগনেস্টে কোনও ল আছে কি ?'

'আপনি যে এখানে চলে এলেন, কাঠমাণ্ডুতে আজ কী হচ্ছে সেটা আপনি জানেন ?'

'কী হচ্ছে মিঃ মিত্তর ?'

'আপনার পাটনের কারখানা আর কাঠমাণ্ডুর শুয়োর গলির গুদোমে আজ তছনছ হয়ে যাচ্ছে।'

মগনলাল সমস্ত দেহ দুলিয়ে অট্টহাসি করে উঠলেন।

'আপনি কি ভাবেন, আমি এত বুদ্ধু মিঃ মিত্তর ? পোলিস উইল

ফাইন্ড নাথিং, নাথিং। পাটনে দেখবে হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট তৈয়ার হচ্ছে, আউর গুয়ার গলিতে দেখবে গুদাম খালি! সব মাল লরিতে করে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি মিঃ মিত্তর। হেতাওরা দিয়ে লরিতে মাল যায় ইন্ডিয়া। টিম্বার। সেই লরিতে করে সব দাওয়াই চলে যাবে বিহার, ইউ পি। ওষুধের অনেক কাম তো আমার ইন্ডিয়াতেই হয়। লেবেল, ক্যাপসুল, অ্যামপুল, ক্যাপ, ফায়াল, সবই তো ইন্ডিয়া থেকে আসে। বাকি কাম হয় এখানে, বিকজ এখানের লোক ইন্ডিয়ার লোকের চেয়ে কাম করে বেশি। অ্যান্ড বেটার।'

আমার কানটা খুব ভাল বলেই বোধ হয় ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে আর একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফেলুদার ঘাড়টা এক মুহূর্তের জন্য একবার সামান্য বাঁ দিকে ঘুরতে—বুঝলাম, সেও আওয়াজটা পেয়েছে।

'জগদীশ!'

বুঝলাম, মগনলাল কথা শেষ করে কাজে চলে এসেছেন।

ডান পাশের ঘর থেকে ফুলকারী করা পর্দা ফাঁক করে যিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন, তার বাঁ হাতে ধরা রিভলভারটা সোজা ফেলুদার দিকে তাগ করা রয়েছে।

'উঠুন আপনারা তিনজন!' মগনলাল হাঁকিয়ে হুকুম দিলেন।

আমরা উঠলাম।

'হাত তুলুন মাথার উপরে।'

তুললাম।

'গঙ্গা! কেসরী!'

আরও দুজন লোক—তাদের ঠিক ভদ্র বলা যায় না—পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা আমাদের তিনজনকে সার্চ করে ফেলুদার পকেট থেকে ওর কোল্ট রিভলভারটা বার করে মগনলালের কাছে দিয়ে দিল।

রিভলভারধারী জগদীশ ভদ্রলোকটিকে দিনের আলোতে দেখেও বাটরার সঙ্গে যে তফাতটুকু পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে না।

ডান দিক থেকে আবার সেই ধুপ ধুপ শব্দটা শোনা গেল।

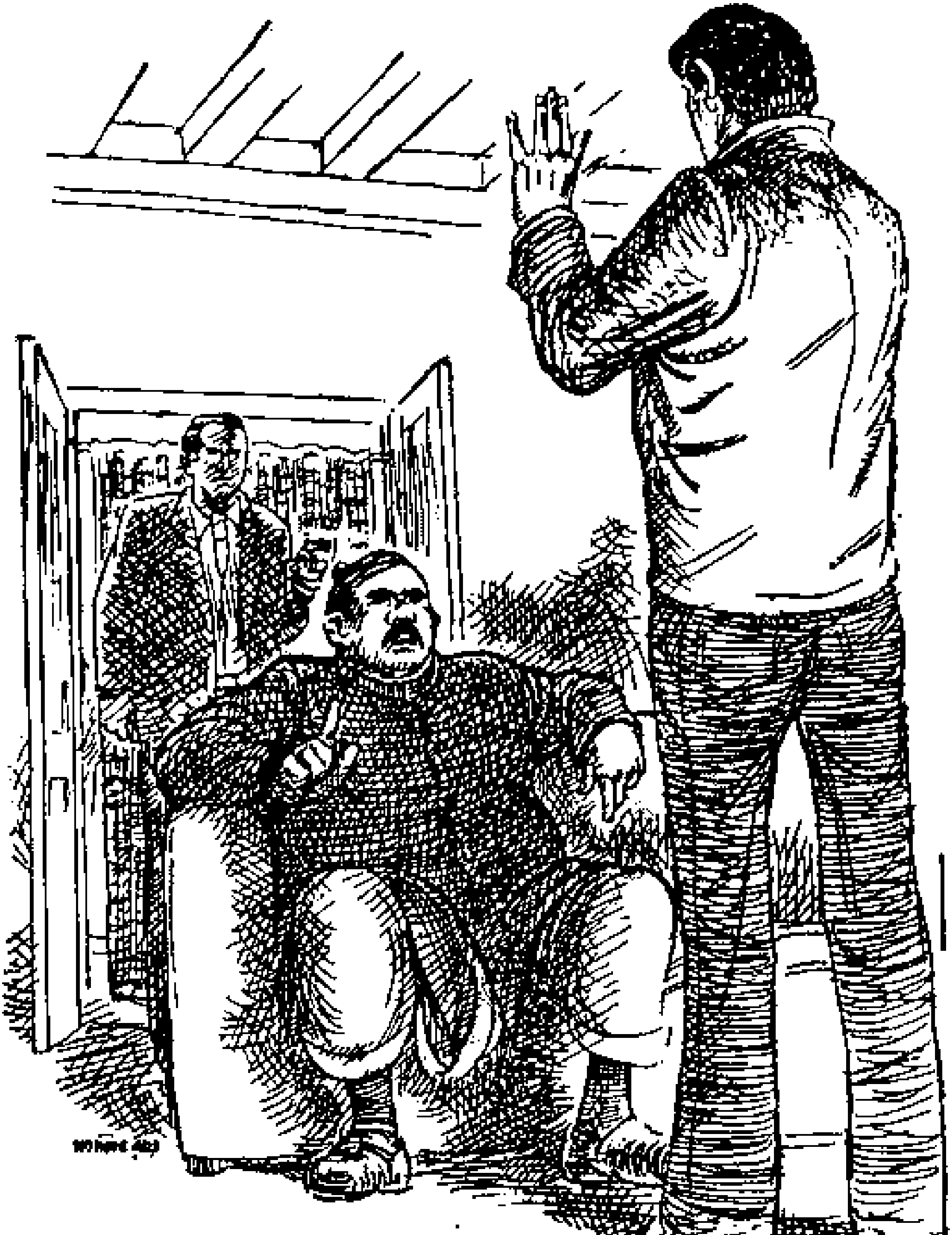

এবার মগনলাল সে দিকে একটা বিরক্ত দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'ভেরি স্যরি মিঃ মিত্তর, আপনার আর একজন ফ্রেন্ডকেও এখানে নিয়ে এসেছি আমি। উনি আমাদের ওষুধ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে ঝামেলা করছিলেন। ন্যাচারেলি ওনাকে রোকে দিতে হল।'

'উনিও কি বাঘের পেটে যাবেন?'

'নো নো মিঃ মিত্তর,' হেসে বললেন মগনলাল, 'ওনাকে দিয়ে আমার অন্য কাম হবে। একজন ডকটর হাতে রাখলে সুবিধা হবে আমার, মিঃ মিত্তর। আমার নিজের হার্ট খুব ভাল নেই, সেটা আপনি বোধ হয় জানেন না।'

'তা হলে চরণামৃততে কাজ দিল না?'

মগনলাল এ কথার কোনও উত্তর দেবার আগেই গঙ্গা ও কেশরী নামে দুটো ষণ্ডা মার্কা লোক লম্বা লম্বা দড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই, পর পর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে, সেগুলো লিখে বোঝানো খুবই কঠিন। তাও আমি চেষ্টা করছি—

প্রথমে বাইরে একটা গাড়ির শব্দতে জগদীশ ভদ্রলোক খচ্ শব্দে রিভলভারটার সেফ্‌টি ক্যাচ্‌টা খুলে ফেলুদার দিকে টান করে বাড়াতেই কিছু বোঝার আগেই দেখলাম ফেলুদার ডান পা-টা একটা হাই কিক্ করে রিভলভারটাকে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিটকে বার করে দিল, কিন্তু তার আগে ট্রিগারের চাপ পড়ে যাওয়াতে তার থেকে সশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে বন্ধ সিলিং ফ্যানের ব্লেডের কিনারে লেগে সেটাকে ঘোরাতে আরম্ভ করে দিল।

এরই মধ্যে কখন যে ঘরে এত লোক ঢুকে পড়েছে, জানি না। এদের কাউকেই চিনি না, কিন্তু বুঝতে, পারছি এরা সবাই পুলিসের লোক। আর তার মধ্যে কিছু নেপালের, আর কিছু আমাদের পশ্চিমবাংলার। এদেরই একজন খপ করে ধরে ফেললেন জগদীশকে, যিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে গিয়েছিলেন।

মগনলাল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

'খবরদার! আমার গায়ে কেউই হাত দিবেন না! খবরদার!'

'আপনার ব্যাপারে পরে আসছি মগনলালজী,' বলল ফেলুদা, 'আগে এনারটা ফয়সালা হয়ে যাক।'

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেছে পুলিসের হাতে বন্দী জগদীশের দিকে।

'আপনার বাঁ হাতের তর্জনীটা এতক্ষণ রিভলভারের ট্রিগারে ছিল বলে দেখতে পাইনি,' বলল ফেলুদা, 'এখন দেখছি তর্জনীতে বেগুনি কালির দাগ। আপনি কি এখনও সেই লিক-করা কলমটাই ব্যবহার করছেন, মিঃ বাটরা?'

'আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, মিঃ মিত্তর,' ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন মগনলাল, 'জগদীশ ইজ মাই—'

'জগদীশ না, বাটরা—অনন্তলাল বাটরা—ইজ ইওর রাইট হ্যান্ড ম্যান। জগদীশ বলে কেউ নেই, নকল বাটরা নেই, লোক একজনই। একটু চাপ দিলেই উনি চোখের কনট্যাকট লেনস্ দুটো খুলে ফেলবেন, তা হলেই কটা ভাবটা চলে যাবে। আর মিঃ বাটরা বোধ হয় জানেন না যে, তিনি আজ ভোরে চলে আসার পর তার বাড়িতে সার্চ হয়েছিল, এবং একটি চোরা কুঠরি থেকে বেশ কিছু জাল একশো টাকার নোট পাওয়া গেছে—যেগুলো আপনার ওই জাল ওষুধের কারখানাতেই ছাপানো হত।'

নেপাল পুলিসের একজন অফিসার এক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট বার করে ধরলেন আমাদের সামনে। বাটরার মুখ ব্লটিং পেপার। ফেলুদা বলল—

'আপনি একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছিলেন কলকাতায়, মিঃ বাটরা। আপনি যে জাল নোটটা দিয়েছিলেন সেই কুকরির দোকানে, সেটা আর ফেরত নেননি। কারণ একবার যখন বলেছেন সেটা আপনি দেননি, তখন আর সেটা ফেরত নেওয়া যায় না। ফলে সেটা দোকান থেকে পুলিসের হাতে চলে আসে। এখন দেখা যাচ্ছে, সে নোটের নম্বর আর আজ আপনার বাড়িতে পাওয়া নোটের নম্বর এক।'

বাটরার শেষ অবস্থা, কিন্তু মগনলাল এখনও তম্বি করে চলেছে।

'আমি ফের বলছি মিস্টার মিত্তর, আমি—'

'আপনি বড্ড বেশি বকছেন,' বাধা দিয়ে বলল ফেলুদা, 'আপনার বুকনিটা বন্ধ করা দরকার। তোপসে, তোরা দুজনে চেপে ধর তো লোকটাকে।'

আমি তো এ সব পারিই, কিন্তু লালমোহনবাবুর মধ্যেও যে হঠাৎ এতটা এনার্জি এসে যাবে, সেটা ভাবতে পারিনি। দুই রাজ্যের পুলিস হল দর্শক, আর তার মধ্যে আমাদের এই নাটক।

দুজনের কম্বাইন্ড ঠেলা আর চাপে মগনলাল সোফার সঙ্গে সিঁধিয়ে গেলেন। ফেলুদা এর মধ্যে ওর পকেট থেকে দুটো জিনিস বার করেছে, তার একটা ভদ্রলোকের হাঁসফাঁসানির ফাঁকে তার মুখের ভেতর চলে গেল। এটা হল একটা শুগার কিউব। বুঝলাম এটা আজই সকালে ফ্রিক স্ট্রিটের হিপিদের কাছ থেকে জোগাড় করে এনেছে ফেলুদা। দ্বিতীয় জিনিসটা হল একটা স্কচ টেপ, যেটা থেকে চড়াৎ করে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেলুদা সেটা দিয়ে মগনলালের ঠোঁট দুটো সিল করে দিল।

সব শেষে একটা সিগারেট কেসের মতো দেখতে জিনিস বার করে নেপাল পুলিস অফিসারের হাতে দিয়ে ফেলুদা বলল, এই মিনি-ক্যাসেট রেকর্ডারটা এই ঘরে ঢুকবার আগেই আমি পকেটে চালু করে দিয়েছিলাম। এতে আপনারা এই ভদ্রলোকের জাল ওষুধের কারবার সম্বন্ধে ওঁর নিজেরই বলা অনেক তথ্য পাবেন।'

১২

ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা তার আপিসের জনসংযোগের কাজের মধ্য দিয়েই মগনলালের সঙ্গে বাটরার পরিচয় হয়।'

আমরা ফিরতি পথে কাঠমাণ্ডুর আশি কিলোমিটার আগে সাড়ে সাত হাজার ফুট হাইটে দামন ভিউ টাওয়ার লজের ছাতে বসে কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছি। আমরা তিনজন ছাড়া আছেন ডঃ দিবাকর, নেপাল পুলিসের সাব-ইনস্পেকটর শর্মা, আর কলকাতার হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর জোয়ারদার। ডাঃ

দিবাকরকে হাত-পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বাংলোর বৈঠকখানার দুটো ঘর পরে দক্ষিণে একটা বেডরুমে। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই পা দিয়ে মেঝেতে লাথি মেরে উনিই ধপ্ ধপ্ শব্দ করছিলেন। তিনি যে ফেলুদার ফরমাশে তাঁর দোকানের ওষুধ টেস্ট করছেন, সে খবর তার চর মারফৎ পৌঁছায় মগনলালের কাছে। তার রাইট হ্যান্ড ম্যান বাটরা আজই ভোরে একটা রুগী দেখতে নিয়ে যাবার অছিলায় ডঃ দিবাকরকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে, মগনলালকেও তুলে, এখানে চলে আসে। মগনলালের দলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাঠমাণ্ডু। এল এস ডি খেয়ে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা কালকের আগে জানা যাবে না। ঘড়িতে বলছে পাঁচটা পাঁচ। বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের চারিদিকে ঘিরে থাকা হিমালয়ের বিখ্যাত চুড়োগুলোতে একটু পরেই সোনার রং ধরতে শুরু করবে।

ফেলুদা বলে চলল—'বাটরা চতুর লোক, শিক্ষিত আর ভদ্র বলে তার ভারতবর্ষেও যাতায়াত আছে, এই সব জেনে মগনলাল বাটরাকে তার চোরা কারবারের মধ্যে জড়ায়।

'অনীকেন্দ্র সোম জাল ওষুধের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে শুনে মগনলাল বাটরাকে দিয়ে তাকে হটাবার মতলব করে। মিঃ সোম কলকাতায় যাচ্ছে জেনে বাটরাকে তার সঙ্গে পাঠায়। হয় এয়ারপোর্টে না হয় প্লেনে, বাটরা সোমের সঙ্গে আলাপ করে, যদিও বাটরা আমার কাছে এটা অস্বীকার করে। সোমের নোটবুকে একটা কথা লেখা ছিল—এ বি-র বিষয় আরও জানা দরকার। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এ বি হল অ্যান্টিবায়োটিকস, কিন্তু যখন জানলাম বাটরার প্রথম নাম অনন্তলাল, তখন বুঝতে পারলাম সোম আসলে বাটরার বিষয়েই আরও জানবার কথা লিখেছিল। হয়তো আলাপ করে বাটরা সম্বন্ধে সোমের মনে কোনওরকম সন্দেহ দেখা দিয়েছিল।

'আমার বিশ্বাস কথাচ্ছলে সোম বাটরাকে বলেছিল, সে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাটরা আমাকে নামে জানত। তার তখন বিশ্বাস হয় যে, সে যদি সোমকে খুন করে, তা

হলে সে খুনের তদন্ত আমিই করব।

'নিউ মার্কেটে দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ফলে একটা নকল বাটরা তৈরি করার আশ্চর্য ফন্দিটা বাটরার মাথায় আসে। মার্কেটে তার হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগে নতুন কেনা একটা নীল রংয়ের শার্ট ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পরমুহূর্তেই সে কোনও একটি কাপড়ের দোকানে ঢুকে তাদের ট্রায়াল রুমে গিয়ে পুরনোর জায়গায় নতুন শার্টটা পরে নিয়ে, পুরনোটা আর একটা প্যাকেটে ভরে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়, এবং বুঝিয়ে দেয়, সে আমাদের আদৌ চেনে না।

'পরদিন বিকেলে আমার বাড়িতে এসে সে নকল বাটরার ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে। তার পরদিন সকালে ন'টায় তার কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট। মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সি করে ভোরে হোটেল থেকে বেরোয়, পাঁচটায় সেন্ট্রাল হোটেলে গিয়ে সোমকে খুন করে চলে যায় এয়ারপোর্টে। ছুরিটা সে রেখেই যায়, যেন আমি মনে করি যে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে যে লোক ছুরিটা কিনেছিল অর্থাৎ নকল বাটরা, সে-ই খুনটা করেছে।'

'কিন্তু আপনার প্রথম সন্দেহটা হয় কখন?' প্রশ্ন করলেন ইনস্পেকটর জোয়ারদার।

ফেলুদা বলল, 'নিউ মার্কেটে বাটরার একটা পুরনো ফাউন্টেন পেন দিয়ে আমি তার নোটবুকে আমার ঠিকানাটা লিখে দিই। সে আমাকে দিয়ে লেখাল, কারণ নিজে লিখলে লিখতে হত বাঁ হাতে। সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, নকল বাটরাই লেফট-হ্যান্ডেড। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি, যারা ন্যাটা হয়, তারা এক কলম দিয়ে বেশি দিন লিখলে সেই কলমের নিব একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে ক্ষয়ে যায়, ফলে রাইট-হ্যান্ডেড লোকেদের সে কলম দিয়ে লিখতে একটু অসুবিধে হয়। এই সামান্য অসুবিধাটা তখন বোধ করেছিলাম। কিন্তু গা করিনি। পরে যখন জানলাম, যিনি খুন করেছেন তিনি লেফট-হ্যান্ডেড, তখনই প্রথম খটকাটা লাগে, আর তখনই স্থির করি যে, কাঠমাণ্ডু গিয়ে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে। অবিশ্যি এসে যে দেখব খুন একটা নয়, দুটো—সেটা ভাবতেই পারিনি।'

'ডাবল ?' ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। আমরা সকলেই অবাক, সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখছি ফেলুদার দিকে। দ্বিতীয় কোন্ খুনের কথা বলছে ফেলুদা ?

শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন ডাঃ দিবাকর।

'উনি ঠিকই বলেছেন। টিট্যানাসের ওষুধ আমার টেস্ট করা হয়ে গিয়েছিল। খবরটা মিঃ মিত্রকে দেবার আর সুযোগ হয়নি। ওটা সত্যিই ছিল জাল। কাজেই এই ইনজেকশানের পর টিট্যানাস হয়ে মরাটা এক রকম খুন বইকি। যারা জাল ওষুধ চালু করে, তারা তো এক-রকম খুনিই।'

'আমি কিন্তু জাল ওষুধের কথা বলছি না।'

এবার দিবাকরও অবাক হয়ে চাইলেন ফেলুদার দিকে। পাহাড়ের চুড়োগুলোতে সোনালি রং লেগেছে বলেই বোধ হয় সকলের মুখ এত হলদে দেখাচ্ছে।

'তা হলে কিসের কথা বলছেন ?' ডাঃ দিবাকর প্রশ্ন করলেন।

'সেটা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। হিমাদ্রি চক্রবর্তী বছর তিনেক আগে একটা চোরা-কারবারের ব্যাপার ফাঁস করে দিয়েছিল। এই নতুন চোরা-কারবারটা সম্বন্ধেও তার মনে সন্দেহ জেগে থাকতে পারে, সে খবর হরিনাথবাবু আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং মগনলালের দিক থেকে তাকে হটাবার একটা বড় কারণ পাওয়া যাচ্ছে। মগনলাল সে ব্যাপারে পেছ-পা হবার পাত্র নয়।'

'কিন্তু সে কীভাবে হটাবে ?'

'রাস্তা আছে,' বলল ফেলুদা, 'যদি একজন ডাক্তার তার হাতে থাকে।'

'ডাক্তার ?'

'ডাক্তার।'

'কোন্ ডাক্তারের কথা বলছেন আপনি ?'

'এমন ডাক্তার—যার অবস্থার উন্নতি দেখা গেছে সম্প্রতি—নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি, সোনার ঘড়ি, সোনার কলম—'

'আপনি এ সব কী ননসেন্স—'

'—যে ডাক্তার সামান্য একটা স্ক্র্যাচ দেখে টিট্যানাসের কোনও সম্ভাবনা নেই বুঝেও ইনজেকশন দেয়। আজ আপনাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখাটা যে স্রেফ ভাঁওতা, সেটা কি আমি বুঝিনি, ডঃ দিবাকর ? আপনিও যে বাটরার মতোই মগনলালের একজন রাইট হ্যান্ড ম্যান, সেটা কি আমি জানি না ?'

'কিন্তু জল দিয়ে কি খুন করা যায় ?' কাঁপতে কাঁপতে তারস্বরে প্রশ্ন করলেন ডঃ দিবাকর।

'না, জল দিয়ে যায় না, যায় বিষ দিয়ে।' কপালের শিরা ফুলে উঠেছে ফেলুদার—'বিষ, ডঃ দিবাকর, বিষ ! স্ট্রিকনিন ! যার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে টিট্যানাসের প্রতিক্রিয়ার কোনও পার্থক্য ধরা যায় না। ঠিক কিনা, মিঃ জোয়ারদার ?'

ইনস্পেক্টর জোয়ারদার গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ডঃ দিবাকর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার আবার ধপ করে বসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

আসলে গল্প এখানেই শেষ, তবু লেজুড় হিসেবে তিনটে খবর দেওয়া যেতে পারে।

এক—এল এস ডি খেয়ে মগনলালের প্রতিক্রিয়া নাকি মোটেই ভাল হয়নি, একটানা তিন ঘণ্টা ধরে হাজতের দেয়াল নখ দিয়ে আঁচড়ানোর পর ঘরের টেবিল ক্লথটাকে কাশীর কচৌরি গলির রাবড়ি মনে করে চিবিয়ে ফালা ফালা করে দেয়।

দুই—ওষুধের চোরা কারবার, আর সেই সঙ্গে জাল নোটের কারবার—ধরে দেবার জন্য নেপাল সরকার ফেলুদাকে পুরস্কার দেয়, যাতে কাঠমাণ্ডুর পুরো খরচটা উঠে আসার পরেও হাতে বেশ কিছুটা থাকে।

তিন—লালমোহনবাবুর ভীষণ ইচ্ছে ছিল যে, আমাদের কাঠমাণ্ডুর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের নাম হোক 'ওম্ মনি পদ্মে হমিসাইড'। যখন বললাম সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, ভদ্রলোক শুধু 'হুম্‌ম্' বলে যেন একটু রাগত ভাবেই আমাদের ঘরের সোফায় বসে জপযন্ত্র ঘোরাতে লাগলেন।

টিনটোরেটোর যীশু

রুদ্রশেখরের কথা (১)

মঙ্গলবার ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় একটি কলকাতার ট্যাকসি—নম্বর ডব্লিউ. বি. টি. ৪১২২—বৈকুণ্ঠপুরের প্রাক্তন জমিদার নিয়োগীদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে থামল।

দারোয়ান এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি বছর পঞ্চান্নর ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের রং ফরসা, চুল অবিন্যস্ত, মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি, চোখে টিনটেড গ্লাসের চশমা, পরনে গাঢ় নীল টেরিলিনের সুট।

গাড়ির ড্রাইভার ক্যারিয়ারের ডালা খুলে একটি ব্রাউন রঙের সুটকেস বার করে ভদ্রলোকের পাশে রাখল।

'নিয়োগী সাহাব ?' দারোয়ান প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। দারোয়ান সুটকেসটা তুলে নিল।

'আসুন, বাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বাড়ির বর্তমান মালিক সৌম্যশেখর নিয়োগী দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে বায়ু সেবন করছিলেন। আগন্তুককে দেখে তিনি একটু সোজা হয়ে বসে নমস্কার করে সামনে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সৌম্যশেখরের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দৃষ্টির দুর্বলতা হেতু চোখে পুরু চশমা পরতে হয়েছে, এ ছাড়া শরীরে বিশেষ কোনও ব্যারাম নেই।

'আপনিই রুদ্রশেখর ?'

আগন্তুক ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে কোটের বুক পকেট থেকে একটি পাসপোর্ট বার করে সৌম্যশেখরের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যশেখর সেটি হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে একটু হেসে

বললেন, 'দেখুন কী কাণ্ড। আপনি আমার আপন খুড়তুতো ভাই, অথচ আপনাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে সেটা প্রমাণ করতে হচ্ছে। অবিশ্যি আপনাকে দেখলে নিয়োগী পরিবারের বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না।'

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটা সামান্য কৌতুকের আভাস দেখা গেল।

'তা যাকগে,' পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে বললেন সৌম্যশেখর, 'আপনার রোম থেকে লেখা চিঠিটা পেয়ে আমি যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটা আপনি পেয়েছিলেন আশা করি। আপনি যে অ্যাদ্দিন আসেননি সেটাই আমাদের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কাকা ঘর ছেড়ে চলে যান ফিফ্‌টি ফাইভে, অর্থাৎ সাতাশ বছর আগে। থার্টি-এইটে কাকা যখন আপনাকে ছাড়াই দেশে ফিরলেন তখন অনুমান করেছিলুম আপনাদের দুজনের মধ্যে খুব একটা বনিবনা নেই। কাকা অবিশ্যি এ নিয়ে খোলাখুলি কিছু বলেননি,

আর আমরাও জিজ্ঞেস করিনি। শুধু জানতুম যে তাঁর একটি ছেলে আছে রোমে। তা এখন যে এলেন, সেটা বোধ করি সম্পত্তির ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে তো লিখেছিলুম যে বছর দশেক আগে অবধি মাঝে মাঝে একটা করে কাকার পোস্টকার্ড পেয়েছি। তারপর আর পাইনি। কাজেই আইনের চোখে তাঁকে মৃত বলেই ধরে নেওয়া যায়। আপনি এ বিষয়ে উকিলের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা বেশ তো। আপনি কদিন থাকুন এখানে। সব দেখে-শুনে নিন। ওপরে কাকার স্টুডিও এখনও সেইভাবেই আছে। রং তুলি ছবি ক্যানভাস সবই আছে, আমরা কেউ হাত দিইনি। কী আছে না আছে সব দেখে নিন। ব্যাঙ্কের বই-টই সবই আছে। তবে, আপনাদের ইটালিতে কী রকম জানি না, আমাদের দেশে এসব ব্যাপারে লেখাপড়া হতে হতে ছ'মাস লেগে যায়। আপনি সময় হাতে নিয়ে এসেছেন আশা করি?'

'হ্যাঁ।'

'মাঝে মাঝে তো কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে; ট্যাক্সিটা রেখে দিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ড্রাইভারের থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে আমার লোক, কোনও অসুবিধা হবে না।'

'গ্রা—থ্যাঙ্কস।'

রুদ্রশেখর বলতে গিয়েছিলেন গ্রাৎসিয়ে, অর্থাৎ ইটালিয়ান ভাষায় ধন্যবাদ।

'ইয়ে, আপনি আমাদের দিশি খাবারে অভ্যস্ত কি? লন্ডনে তো শুনিচি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ, রোমেও আছে কি?'

'কিছু আছে।'

'বেশ, তা হলে আর চিন্তা নেই। গাঁয়ে দেশে আপনাকে যে

হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে দেব তারও তো উপায় নেই।—কী, জগদীশ—কী হল?'

একটি বৃদ্ধ ভৃত্য দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে বোঝা যায় সে কোনও রকমে অশ্রু সংবরণ করে আছে।

'হুজুর, ঠুংরী মরে গেছে।'

'মরে গেছে!'

'হাঁ হুজুর।'

'সেকী? ভিখু যে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোল!'

'ওরা কেউ ফেরেনি। তাই খুঁজতে গেলাম। বাঁশবনে মরে আছে হুজুর। ভিখু পালিয়েছে।'

সংগীতপ্রিয় সৌম্যশেখরের দুটি ফক্স টেরিয়ারের একটির নাম ছিল ঠুংরী, একটি কাজরী। কাজরী স্বাভাবিক কারণেই মারা গেছে দু বছর আগে। ঠুংরীর বয়স হয়েছিল এগারো। তবে আজ বিকেল অবধি সে ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ।

সৌম্যশেখরকে প্রিয় কুকুরের শোকে বিহ্বল দেখে সদ্য রোম থেকে আগত রুদ্রশেখর নিয়োগী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

এই বেলা তাঁর থাকার ঘরটা দেখে নিতে হবে।

॥ ২ ॥

শিবপুরের ট্র্যাফিক আর ঘন বসতি পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার সিক্স্-এ আমাদের গাড়িটা পড়তেই যেন একটা নতুন জগতে এসে পড়লাম। আমাদের গাড়ি মানে রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর সবুজ অ্যাম্বাসাডার। গাড়ি কেনার পয়সা ফেলুদার নিজের কোনও দিন হবে বলে মনে হয় না। এ দেশের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের রোজগারে গাড়ি বাড়ি হয় না। আমাদের রজনী সেন রোডের ফ্ল্যাট ছেড়ে ফেলুদা কিছুদিন থেকেই একটা নিজের ফ্ল্যাটে যাবার চিন্তা করছিল, বাবা সেটা জানতে পেরে এক ধমকে ফেলুদাকে ঠাণ্ডা করেছেন। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়', বললেন বাবা। 'যেই একটু রোজগার

বেড়েছে অমনি নিজের ফ্ল্যাটের ধান্দা। পরে পসার কমলে যদি আবার সুড়সুড় করে এই কাকার ফ্ল্যাটেই ফিরে আসতে হয়? সেটার কথা ভেবেছিস কি?' তারপর থেকে ফেলুদা চুপ।

আর গাড়ির ব্যাপারে জটায়ুর তো আগে থেকেই বলা আছে। 'ধরে নিন আমার গাড়ি ইজ ইকুয়াল টু আপনার গাড়ি। আপনি আমার এত উপকার করেছেন, এই সামান্য প্রিভিলেজটুকু তো আপনার ন্যায্য পাওনা মশাই।'

উপকারের ব্যাপারটা লালমোহনবাবুর ভাষাতেই বলা ভাল। ওঁর জীবনের অনেকগুলো বন্ধ দরজা নাকি ফেলুদা এসে খুলে দিয়েছে। তাতে নাকি উনি শরীরে নতুন বল মনে নতুন সাহস আর চোখে নতুন দৃষ্টি পেয়েছেন। 'আর, কত জায়গায় ঘোরা হল বলুন তো আপনার দৌলতে—দিল্লি, বোম্বাই, কাশী, সিমলা, রাজস্থান, সিকিম, নেপাল—ওঃ! ট্র্যাভেল ব্রডন্‌স দি মাইন্ড—এটা শুনে এসেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। এটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম তো আপনি আসার পর।'

এবারের ট্রাভেলটায় মনের প্রসার কতটা বাড়বে জানি না। ক্যালকাটা টু মেচেদা ভ্রমণ বলতে তেমন কিছুই নয়। তবে লালমোহনবাবুরই ভাষায় আজকাল কলকাতায় বাস করা আর ব্ল্যাক হোলে বাস করা নাকি একই জিনিস। সেই ব্ল্যাক হোল থেকে একটি দিনের জন্যও যদি বাইরে বেরিয়ে আসা যায় তা হলে খাঁটি অক্সিজেন পেয়ে মানুষের আয়ু নাকি কমপক্ষে তিন মাস বেড়ে যায়।

অনেকেই হয়তো ভাবছে এত জায়গা থাকতে মেচেদা কেন। তার কারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাস তিনেক হল এঁর কথা কাগজে পড়ার পর থেকেই লালমোহনবাবুর রোখ চেপেছে এঁর সঙ্গে দেখা করার।

এই ভবেশ ভটচায নাকি সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে লোকেদের নানা রকম অ্যাডভাইস দিয়ে তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। বড় বড় ব্যবসাদার, বড় বড় কোম্পানির মালিক, খবরের কাগজের মালিক, ফিল্মের প্রযোজক, বইয়ের প্রকাশক, উপন্যাসের লেখক,

উকিল, ব্যারিস্টার, ফিল্মস্টার—সব রকম লোক নাকি এখন তাঁর মেচেদার বাড়ির দরজায় কিউ দিচ্ছে। জটায়ুর শেষ উপন্যাসের কাটতি আগের তুলনায় কম—এক মাসে তিনটে এডিশনের বদলে দুটো এডিশন হয়েছে। জটায়ুর বিশ্বাস উপন্যাসের নামে গণ্ডগোল ছিল, তাই এবার ভটচায মশাইয়ের অ্যাডভাইস নিয়ে নতুন বইয়ের নামকরণ হবে, তারপর সেটা বাজারে বেরুবে। ফেলুদার মত অবিশ্যি আলাদা। গত উপন্যাসটা পড়েই ফেলুদা বলেছিল রংটা বেশি চড়ে গেছে।—'সাত-সাতটা গুলি খাওয়া সত্ত্বেও আপনার হিরোকে বাঁচিয়ে রাখাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, লালমোহনবাবু ?'

'কী বলছেন মশাই! একি যেমন-তেমন হিরো ? প্রখর রুদ্র ইজ এ সুপার-সুপার-সুপারম্যান' ইত্যাদি। এবারের গল্পটা ফেলুদার মতে বেশ জমেছে, নামের রদবদলে বিক্রির এদিক ওদিক হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাও লালমোহনবাবু একবার সংখ্যাতাত্ত্বিকের মত না নিয়ে ছাড়বেন না। তাই মেচেদা।

ন্যাশনাল হাইওয়ে সিক্স খুব বেশি দিন হল তৈরি হয়নি। এই রাস্তাই সোজা চলে গেছে বম্বে। গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোডের ধারে ধারে যেমন সব প্রাচীন গাছ দেখা যায়, এখানে তা একেবারেই নেই। বাড়ি-ঘরও বেশি নেই, চারিদিক খোলা, আশ্বিন মাসের প্রকৃতির চেহারাটা পুরোপুরি পাওয়া যায়। ড্রাইভার হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা আশি কিলোমিটারে রেখে দিয়ে দিব্যি চালাচ্ছেন গাড়ি। কলকাতা থেকে মেচেদা যেতে লাগবে দু ঘন্টা। আমরা বেরিয়েছি সকাল সাড়ে সাতটায় ; কাজ সেরে দেড়টা-দুটোর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারব।

কোলাঘাট পেরিয়ে মিনিট তিনেক যাবার পরেই একটা উদ্ভট গাড়ির দেখা পেলাম যেটা রাস্তার একপাশে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। মালিক করুণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ির পাশেই। আমাদের আসতে দেখে ভদ্রলোক হাত নাড়লেন, আর হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন।

'একটা বিশ্রী গোলমালে পড়েছি মশাই,' রুমালে ঘাম মুছতে

মুছতে বললেন ভদ্রলোক। 'টায়ারটা গেছে, কিন্তু জ্যাকটা বোধ হয় অন্য গাড়িতে রয়ে গেছে, হেঁ হেঁ...'

'আপনি চিন্তা করবেন না,' বললেন লালমোহনবাবু। 'দেখো তো হরিপদ।'

হরিপদবাবু জ্যাক বার করে নিজেই ভদ্রলোকের গাড়ির নীচে লাগিয়ে সেটাকে তুলতে আরম্ভ করে দিলেন।

'আপনার এ গাড়ি কোন ইয়ারের?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'থার্টি-সিক্স,' বললেন ভদ্রলোক, 'আর্মস্ট্রং সিড্‌লি।'

'লং রানে কোনও অসুবিধা হয় না?'

'দিব্যি চলে। আমার আরও দুটো পুরনো গাড়ি আছে। ভিনটেজ কার-র‍্যালিতে প্রতিবারই যোগ দিই আমি। ইয়ে, আপনারা চললেন কদ্দূর?'

'মেচেদায় একটু কাজ ছিল।'

'কতক্ষণের কাজ?'

'আধ ঘণ্টাখানেক।'

'তা হলে একটা কাজ করুন না। ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। মেচেদা থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরবেন—মাত্র আট কিলোমিটার। বৈকুণ্ঠপুর।'

'বৈকুণ্ঠপুর?'

'ওখানেই পৈত্রিক বাড়ি আমাদের। আমি অবিশ্যি থাকি কলকাতায়। তবে মা-বাবা ওখানেই থাকেন। দুশো বছরের পুরনো বাড়ি। আপনাদের খুব ভাল লাগবে। দুপুরে আমাদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে চলে আসবেন। আপনারা আমার যা উপকার করলেন। কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হত জানি না।'

ফেলুদা একটু যেন অন্যমনস্ক। বলল, 'বৈকুণ্ঠপুর নামটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেন্টলি?'

'ভূদেব সিং-এর লেখাতে কি? ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মাস দেড়েক আগে বেরিয়েছিল।'

'আমি শুনেছি লেখাটার কথা, কিন্তু পড়া হয়নি।'

ইলাস্ট্রেটেড উইকলি আমাদের বাড়িতে আসে না। ফেলুদা কোথায় পড়েছে জানি। হেয়ার কাটিং সেলুনে। একটা বিশেষ সেলুনে ও যায় আর ইয়াসিন নাপিত ছাড়া কাউকে দিয়ে চুল কাটায় না। ইয়াসিন যতক্ষণ ব্যস্ত থাকে ফেলুদা ততক্ষণ ম্যাগাজিন পড়ে।

'বৈকুণ্ঠপুরের নিয়োগী পরিবারের একজনকে নিয়ে লেখা,' বলল ফেলুদা, 'ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন। রোমে গিয়ে আঁকা শিখেছিলেন।'

'আমার দাদু চন্দ্রশেখর,' হেসে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি ওই পরিবারেরই ছেলে। আমার নাম নবকুমার নিয়োগী।'

'আই সি। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, আর ইনি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ।'

প্রদোষ মিত্র শুনে ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

'গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে তো আপনাদের আসতেই হবে। আপনি তো বিখ্যাত লোক মশাই। সত্যি বলতে কী, এর মধ্যে আপনার কথা মনেও হয়েছিল একবার।'

'কেন বলুন তো?'

'একটা খুনের ব্যাপারে। আপনি শুনলে হাসবেন, কারণ ভিকটিম মানুষ নয়, কুকুর।'

'বলেন কী? কবে হল এ খুন?'

'গত মঙ্গলবার। আমাদের একটা ফক্স টেরিয়ার। বাবার খুবই প্রিয় কুকুর ছিল।'

'খুন মানে?'

'চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি। চাকরও ফেরেনি। কুকুরের লাশ পাওয়া যায় বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে, একটা বাঁশবনে। মনে হয় বিষাক্ত কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। বিস্কুটের গুঁড়ো পড়ে ছিল আশেপাশে।'

'এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। এর কোনও কিনারা হয়নি?'

'উহুঁ। কুকুরের বয়স হয়েছিল এগারো। এমনিতেই আর বেশিদিন বাঁচত না। আমার কাছে ব্যাপারটা তাই আরও বেশি মিস্টিরিয়াস বলে মনে হয়। যাই হোক্, আপনাকে অবিশ্যি এ নিয়ে তদন্ত করতে হবে না, কিন্তু আপনারা এলে সত্যিই খুশি হব। দাদুর স্টুডিও এখনও রয়েছে, দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে,' বলল ফেলুদা। 'আমারও লেখাটা পড়ে যথেষ্ট কৌতূহল হয়েছিল নিয়োগী পরিবার সম্বন্ধে। আমরা কাজ সেরে সাড়ে দশটা নাগাত গিয়ে পড়ব।'

'মেচেদার মোড় থেকে দু-কিলোমিটার গেলে একটা পেট্রল পাম্প পড়ে। সেখানে জিজ্ঞেস করলেই বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তা বাতলে দেবে।'

টায়ার লাগানো হয়ে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ি আরও স্পিডে যাবে বলে ভদ্রলোক আমাদেরই আগে যেতে দিলেন। গাড়ি রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, 'কত যে ইন্টারেস্টিং বাঙালি চরিত্র আছে যাদের নামও আমরা জানি না। এই চন্দ্রশেখর নিয়োগী বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চব্বিশ বছর বয়সে রোমে চলে যান ওখানকার বিখ্যাত অ্যাকাডেমিতে পেন্টিং শিখতে। ছাত্র থাকতেই একটি ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেশে ফিরে আসেন। এখানে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে খুব নাম হয়। নেটিভ স্টেটের রাজ-রাজড়াদের ছবি আঁকতেন। একটি রাজার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়। তিনিই লিখেছেন প্রবন্ধটা। প্রৌঢ় বয়সে আঁকাটাকা সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান।'

'আপনি বলছেন চন্দ্রশেখরের কথা। আর আমি ভাবছি কুকুর খুন,' বললেন লালমোহনবাবু। 'এ জিনিস শুনেছেন কখনও?'

ফেলুদা স্বীকার করল সে শোনেনি।

'লেগে পড়ুন মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু 'শাঁসালো মক্কেল। তিন তিনখানা ভিনটেজ গাড়ি। হাতের ঘড়িটা দেখলেন? কমপক্ষে ফাইভ থাউজ্যান্ড চিপস। এ দাঁও ছাড়বেন না।'

॥ ৩ ॥

ভবেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পোস্টকার্ডে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, তাই তাঁর দর্শন পেতে দেরি হল না। ইস্কুল মাস্টার টাইপের চেহারা, চোখে মোটা চশমা, গায়ে ফতুয়ার উপর একটা এন্ডির চাদর, বসেছেন তক্তপোষে, সামনে ডেস্কের উপর গোটা পাঁচেক ছুঁচোলো করে কাটা পেনসিল, আর একটা খোলা খেরোর খাতা।

'লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ?'—পোস্টকার্ডে নামটা পড়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন। 'বয়স কত হল ?' লালমোহনবাবু বয়স বললেন। 'জন্মতারিখ ?' 'উনত্রিশে শ্রাবণ।'

'হুঁ...সিংহ রাশি। তা আপনার জিজ্ঞাসাটা কী ?'

'আজ্ঞে আমি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে উপন্যাস লিখি। আমার আগামী উপন্যাসের তিনটি নাম ঠিক করা আছে। কোনটা ব্যবহার করব যদি বলে দেন।'

'কী কী নাম ?'

'"কারাকোরামে রক্ত কার ?", 'কারাকোরামের মরণ কামড়", আর "নরকের নাম কারাকোরাম"।'

"হুঁ। দাঁড়ান।"

ভদ্রলোক নামগুলো খাতায় লিখে নিয়ে কীসব যেন হিসেব করলেন, তার মধ্যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই আছে। তারপর বললেন, 'আপনার নাম থেকে সংখ্যা পাচ্ছি একুশ, আর জন্ম-মাস এবং জন্মতারিখ মিলিয়ে পাচ্ছি ছয়। তিন সাতে একুশ, তিন দুগুণে ছয়। অর্থাৎ তিনের গুণণীয়ক না হলে ফল ভাল হবে না। আপনি তৃতীয় নামটাই ব্যবহার করুন। তিন আঠারং চুয়ান্ন। কবে বেরোচ্ছে বই ?'

'আজ্ঞে পয়লা জানুয়ারি।'

'উঁহু। তেসরা করলে ভাল হবে; অথবা তিনের গুণণীয়ক যে-কোনও তারিখ।'

'আর, ইয়ে—বিক্রিটা—?'

'বই ধরবে।'

একশোটি টাকা খামে পুরে দিয়ে আসতে হল ভদ্রলোককে। লালমোহনবাবুর তাতে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। উনি ষোল আনা শিওর যে বই হিট হবেই। বললেন, 'মনের ভার নেমে গিয়ে অনেকটা হাল্‌কা লাগছে মশাই।'

'তার মানে এবার থেকে কি প্রত্যেক বই বেরোবার আগেই মেচেদা— ?'

'বছরে দুটি তো! সাক্সেসের গ্যারান্টি যেখানে পাচ্ছি...'

ভটচায মশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে আমরা বৈকুণ্ঠপুর রওনা দিলাম। নবকুমারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী পেট্রল পাম্পে জিজ্ঞেস করে নিয়োগী প্যালেসে পৌঁছাতে লাগল বিশ মিনিট।

বাড়ির বয়স যে দুশো সেটা আর বলে দিতে হয় না। খানিকটা অংশ মেরামত করে রং করা হয়েছে সম্প্রতি, বাড়ির লোকজন বোধহয় সেই অংশটাতেই থাকে। দুদিকে পাম গাছের সারিওয়ালা রাস্তা পেরিয়ে বিরাট পোর্টিকোর নীচে এসে আমাদের গাড়ি থামল। নবকুমারবাবু গাড়ির আওয়াজ পেয়েই নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একগাল হেসে আসুন আসুন বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমরা কথা রাখব কি না এ বিষয়ে তাঁর খানিকটা সংশয় ছিল এটাও বললেন।

'বাবাকে আপনার কথা বলেছি,' সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বললেন ভদ্রলোক। 'আপনারা আসছেন শুনে উনি খুব খুশি হলেন।'

'আর কে থাকেন এ বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'সব সময় থাকার মধ্যে বাবা আর মা। মা-র জন্যেই থাকা। ওঁর শ্বাসের কষ্ট। কলকাতার ক্লাইমেট সহ্য হয় না। তা ছাড়া বঙ্কিমবাবু আছেন। বাবার সেক্রেটারি ছিলেন। এখন ম্যানেজার বলতে পারেন। আর চাকর-বাকর। আমি মাঝে মধ্যে আসি। এমনিতেও আমি ফ্যামিলি নিয়ে আর কদিন পরেই আসতাম। এ বাড়িতে পুজো হয়, তাই প্রতিবারই আসি। এবারে একটু আগে

এলাম কারণ শুনলাম বাড়িতে অতিথি আছে—আমার কাকা, চন্দ্রশেখরের ছেলে, রোম থেকে এসেছেন কদিন হল—তাই মনে হল বাবা হয়তো একা ম্যানেজ করতে পারছেন না।'

'আপনার কাকার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে বুঝি?'

'একেবারেই না। এই প্রথম এলেন। বোধহয় দাদুর সম্পত্তির ব্যাপারে।'

'আপনার দাদু কি মারা গেছেন?'

'খবরাখবর নেই বহুদিন। বোধহয় মৃত বলেই ধরে নিতে হবে।'

'উনি রোম থেকে ফিরে এসে এখানেই থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতায় না থেকে এখানে কেন?'

'কারণ উনি যাদের ছবি আঁকতেন তারা সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। নেটিভ স্টেটের রাজা-মহারাজা। কাজেই ওঁর পক্ষে কলকাতায় থাকার কোনও বিশেষ সুবিধে ছিল না।'

'আপনি আপনার দাদুকে দেখেছেন?'

'উনি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন আমার বয়স ছয়। আমায় ভালবাসতেন খুব এইটুকু মনে আছে।'

বৈঠকখানায় আসবাবের চেহারা দেখে চোখ টেরিয়ে গেল। মাথার উপরে ঘরের দুদিকে দুটো ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে যেমন আর আমি কখনও দেখিনি। একদিকের দেয়ালে প্রায় আসল মানুষের মতো বড় একটা পোর্ট্রেট রয়েছে একজন বৃদ্ধের—গায়ে জোব্বা, কোমরে তলোয়ার, মাথায় মণিমুক্তো বসানো পাগড়ি। নবকুমার বললেন ওটা ওঁর প্রপিতামহ অনন্তনাথ নিয়োগীর ছবি। চন্দ্রশেখর ইটালি থেকে ফিরে এসেই ছবিটা এঁকেছিলেন।—'ছেলে ইটালিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছে শুনে অনন্তনাথ বেজায় বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন আর কোনওদিন ছেলের মুখ দেখবেন না। কিন্তু শেষ বয়সে ওঁর মনটা অনেক নরম হয়ে যায়। দাদু বিপত্নীক অবস্থায় ফিরলে উনি দাদুকে ক্ষমা করেন, এবং উনিই দাদুর প্রথম সিটার।'

আমি একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

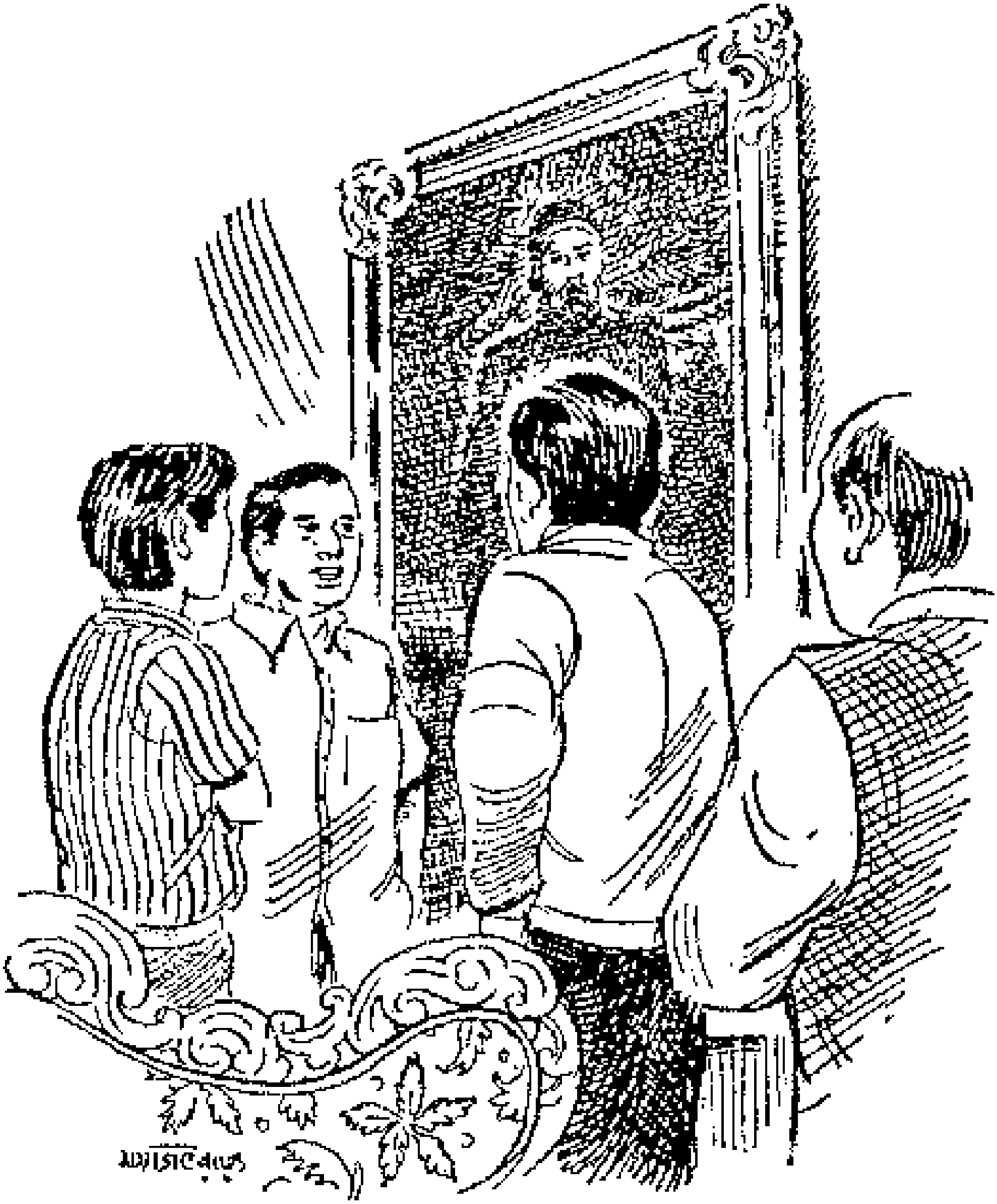

'এস, নিয়োগী লেখা দেখছি কেন? ওঁর নাম তো ছিল চন্দ্রশেখর।'

'রোমে গিয়ে ওঁর নাম হয় সান্‌ড্রো। সেই থেকে ওই নামই লিখতেন নিজের ছবিতে।'

পোর্ট্রেট ছাড়া ঘরে আরও ছবি ছিল এস নিয়োগীর আঁকা। আর্টের বইয়ে যে সব বিখ্যাত বিলিতি পেন্টারের ছবি দেখা যায়, তার সঙ্গে প্রায় কোনও তফাত নেই। বোঝাই যায় দুর্দান্ত শিল্পী

ছিলেন সান্‌ড্রো নিয়োগী।

একজন চাকর শরবত নিয়ে এল। ট্রে থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'ওই প্রবন্ধটাতে ভদ্রলোক লিখেছেন চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে নাকি কোনও বিখ্যাত বিদেশি শিল্পীর আঁকা একটি পেন্টিং ছিল। অবিশ্যি ভদ্রলোক শিল্পীর নাম বলেননি, কারণ চন্দ্রশেখরই নাকি ওঁকে বলতে বারণ করেছিলেন—বলেছিলেন "বললে কেউ বিশ্বাস করবে না"। আপনি কিছু জানেন এই পেন্টিং সম্বন্ধে?'

নবকুমারবাবু বললেন, 'দেখুন, মিস্টার মিত্র—পেন্টিং একটা আছে এটা আমাদের পরিবারের সকলেই জানে। বেশি বড় না। এক হাত বাই দেড় হাত হবে। একটা ক্রাইস্টের ছবি। সেটা কোনও বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কি না বলতে পারব না। ছবিটা দাদু নিজের স্টুডিওর দেয়ালেই টাঙিয়ে রাখতেন, অন্য কোনও ঘরে টাঙানো দেখিনি কখনও।'

'অবিশ্যি যিনি প্রবন্ধটা লিখেছেন তিনি জানেন নিশ্চয়ই।'

'তা তো জানবেনই, কারণ ভগওয়ানগড়ের এই রাজার সঙ্গে দাদুর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।'

'আপনার কাকা জানতেন না? যিনি এসেছেন?'

নবকুমার মাথা নাড়লেন।

'আমার বিশ্বাস বাপ আর ছেলের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তা ছাড়া কাকা বোধহয় আর্টের দিকে যাননি।'

'তার মানে ওই ছবির সঠিক মূল্যায়ন এ বাড়ির কেউ করতে পারবে না?'

'কাকা না পারলে আর কে পারবে বলুন। বাবা হলেন গানবাজনার লোক। রাতদিন ওই নিয়েই পড়ে থাকতেন। আর্টের ব্যাপারে আমার যা জ্ঞান, ওঁরও সেই জ্ঞান। আর আমার ছোটভাই নন্দকুমার সম্বন্ধেও ওই একই কথা।'

'তিনিও গানবাজনা নিয়ে থাকেন বুঝি?'

'না। ওর হল অ্যাকটিং-এর নেশা। আমাদের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে কলকাতায়। বাবাই করেছিলেন। আমরা দুজনেই

পার্টনার ছিলাম তাতে। নন্দ সেভেন্টি-ফাইভে হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে বম্বে চলে যায়। ওর এক চেনা লোক ছিল ওখানকার ফিল্ম লাইনে। তাকে ধরে হিন্দি ছবিতে একটা অভিনয়ের সুযোগ করে নেয়। তারপর থেকে ওখানেই আছে।'

সাকসেসফুল ?'

'মনে তো হয় না। ফিল্ম পত্রিকায় গোড়ার দিকের পরে তো আর বিশেষ ছবিটবি দেখিনি ওর।'

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?'

'মোটেই না। শুধু জানি নেপিয়ান সি রোডে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়ির নাম বোধহয় সি-ভিউ। মাঝে মাঝে ওর নামে চিঠি আছে। সেগুলো রিডাইরেক্ট করতে হয়। ব্যস্।'

শরবত শেষ করে আমরা নবকুমারবাবুর বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দক্ষিণের একটা চওড়া বারান্দায় একটা ইংরিজি পেপারব্যাক চোখের খুব কাছে নিয়ে আরাম কেদারায় বসে আছেন ভদ্রলোক।

আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভদ্রলোক ছেলেকে বললেন, 'টুমরীর কথা বলেছিস এঁকে ?'

নবকুমারবাবু একটু অপ্রস্তুত ভাব করে বললেন, 'তা বলেছি। তবে ইনি এমনি বেড়াতে এসেছেন, বাবা।'

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

'কুকুর বলে তোরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছিস না, এটা আমার মোটে ভাল লাগছে না। একটা অবোলা জীবকে যে-লেকে এভাবে হত্যা করে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত নয় ? শুধু কুকুরকে মেরেছে তা নয়, আমার চাকরকে শাসিয়েছে। তাকে মোটা ঘুষ দিয়েছে, নইলে সে পালাত না। ব্যাপারটা অনেক গণ্ডগোল। আমার তো মনে হয় যে-কোনও ডিটেকটিভের পক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। মিস্টার মিত্তির কী মনে করেন জানি না।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বলল ফেলুদা।

'যাক। আমি শুনে খুশি হলুম। এবং সে লোককে যদি ধরতে পারেন তো আরও খুশি হব। ভাল কথা—' সৌম্যশেখরবাবু

ছেলের দিকে ফিরলেন—'তোর সঙ্গে রবীনবাবুর দেখা হয়েছে ?'

'রবীনবাবু ?' নবকুমারবাবু বেশ অবাক। 'তিনি আবার কে ?'

'একটি জার্নালিস্ট ভদ্রলোক। বয়স বেশি না। আমায় লিখেছিল আসবে বলে। চন্দ্রশেখরের জীবনী লিখবে। একটা ফেলোশিপ না গ্রান্ট কী জানি পেয়েছে। সে দুদিন হল এসে রয়েছে। অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। ইটালিও যাবে বলে বলছে। বেশ চৌকস ছেলে। আমার সঙ্গে কথা বলে সকালে ঘণ্টাখানেক ধরে। টেপ করে নেয়।'

'তিনি কোথায় এখন ?'

'বোধহয় তার ঘরেই আছে। এক তলায় উত্তরের বেডরুমটায় রয়েছে। আরও দিন দশেক থাকবে। রাতদিন কাজ করে।'

'তার মানে তোমাকে দুজন অতিথি সামলাতে হচ্ছে ?'

'সামলানোর আর কী আছে। রোম থেকে আসা খুড়তুতো ভাইটিকে তো সারাদিন প্রায় চোখেই দেখি না। আর যখন দেখিও, দুচারটের বেশি কথা হয় না। এমন মুখচোরা লোক দুটি দেখিনি।'

'যখন কথা বলেন কী ভাষায় বলেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ইংরিজি বাংলা মেশানো। বললে চন্দ্রশেখর নাকি ওর সঙ্গে বাংলাই বলত। তবে সেও তো আজ প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর যখন দেশে ফেরে তখন ছেলের বয়স আঠারো-উনিশ। বাপের সঙ্গে বোধহয় বিশেষ বনত না। পাছে কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করি তাই বোধহয় কথা বলাটা অ্যাভয়েড করে। ভেবে দেখুন—আমার নিজের খুড়তুতো ভাই, তাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে বোঝাতে হল সে কে !'

'ইন্ডিয়ান পাস্‌পোর্ট কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তাই তো দেখলাম।'

নবকুমার বললে, 'তুমি ভাল করে দেখেছিলে তো ?'

'ভাল করে দেখার দরকার হয় না। সে যে নিয়োগী পরিবারের ছেলে সে আর বলে দিতে হয় না।'

'উনি সম্পত্তির ব্যাপারেই এসেছেন তো ?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'হ্যাঁ। এবং পেয়েও যাবে। সে নিজে তার বাবার কোনও খবরই জানত না। তাই রোম থেকে চিঠি লিখেছিল আমায়। আমিই তাকে জানাই যে দশ বছর হল তার বাপের কোনও খোঁজ নেই। তার পরেই সে এসে উপস্থিত হয়।'

ফেলুদা বলল, 'চন্দ্রশেখরের সংগ্রহে যে বিখ্যাত পেন্টিংটা আছে সেটা সম্বন্ধে উনি কিছু জানেন ? কিছু বলেছেন ?'

'না। ইনি নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর লোক। আর্টে কোনও ইন্টারেস্ট নেই।...তবে ছবিটার খোঁজ করতে লোক এসেছিল।'

'কে ?' জিজ্ঞেস করলেন নবকুমারবাবু।

'সোমানি না কী যেন নাম। বঙ্কিমের কাছে তার নাম ঠিকানা আছে। বললে এক সাহেব কালেক্টর নাকি ইন্টারেস্টেড। এক লাখ টাকা অফার করলে। প্রথমে পঁচিশ হাজার দেবে, তারপর সাহেব দেখে জেনুইন বললে বাকি টাকা। দিন পনেরো আগের ঘটনা। তখনও রুদ্রশেখর আসেনি, তবে আসবে বলে লিখেছে। সোমানিকে বললাম এ হল আর্টিস্টের ছেলের প্রপার্টি। সে ছেলে আসছে। যদি বিক্রি করে তো সেই করবে। আমার কোনও অধিকার নেই।'

'সে লোক কি আর এসেছিল ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এসেছিল বই কী। সে নাছোড়বান্দা। এবার রুদ্রশেখরের সঙ্গে কথা বলেছে।'

'কী কথা হয়েছিল জানেন ?'

'না। আর রুদ্র যদি বিক্রিও করতে চায়, আমাদের তো কিছু বলার নেই। তার নিজের ছবি সে যা ইচ্ছে করতে পারে।'

'কিন্তু সেটা সম্পত্তি পাবার আগে তো নয়,' বলল ফেলুদা।

'না, তা তো নয়ই।'

খাবার সময় দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা হল। রবীনবাবু সাংবাদিককে দেখে হঠাৎ কেন জানি চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। হয়তো কোনও কাগজে ছবি-টবি বেরিয়েছে কখনও। দাড়ি-গোঁফ কামানো, মাঝারি রং, চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি না। বললেন অদ্ভুত সব তথ্য বার করেছেন

চন্দ্রশেখর নিয়োগী সম্বন্ধে। স্টুডিওতে একটা কাঠের বাক্সে নাকি অনেক মূল্যবান কাগজপত্র আছে।

'রুদ্রশেখরবাবু থাকাতে আপনার খুব সুবিধে হয়েছে বোধহয়?' বলল ফেলুদা, 'ইটালির অনেক খবর তো আপনি এঁর কাছেই পাবেন।'

'ওঁকে আমি এখনও বিরক্ত করিনি,' বললেন রবীনবাবু, 'উনি নিজে ব্যস্ত রয়েছেন। আপাতত আমি চন্দ্রশেখরের ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরের অংশটা নিয়ে রিসার্চ করছি।'

রুদ্রশেখরের মুখ দিয়ে একটা হুঁ ছাড়া আর কোনও শব্দ বেরোল না।

বিকেলে নবকুমারবাবুর সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, কাছেই পোড়া ইটের কাজ করা দুটো প্রাচীন মন্দির আছে সেগুলো নাকি খুবই সুন্দর। ফটক দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় পড়তেই একটা কাণ্ড হল। পশ্চিম দিক থেকে ঘন কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই বজ্রপাতের সঙ্গে নামল তুমুল বৃষ্টি। লালমোহনবাবু বললেন এরকম ড্রামাটিক বৃষ্টি তিনি কখনও দেখেননি। সেটার একটা কারণ অবশ্য এই যে এ রকম খোলা প্রান্তরে বৃষ্টি দেখার সুযোগ শহরবাসীদের হয় না।

দৌড় দেওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির ফোঁটা এড়ানো গেল না। তারপর বুঝতে পারলাম যে এ বৃষ্টি সহজে ধরার নয়। আর আমাদের পক্ষে এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরাও সম্ভব নয়।

নবকুমারবাবু অবিশ্যি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন বাড়তি শোবার ঘর কম করে দশখানা আছে এ বাড়িতে। খাট বালিশ তোষক চাদর মশারি সবই আছে; কাজেই রাত্তিরে থাকার ব্যবস্থা করতে কোনওই হাঙ্গাম নেই। পরার জন্য লুঙ্গি দিয়ে দেবেন উনি, এমন কী গায়ের আলোয়ান, ধোপে কাচা পাঞ্জাবি, সবই আছে।—'আমাকে এখানে মাঝে মাঝে আসতে হয় বলে কয়েক সেট কাপড় রাখাই থাকে। আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না।'

উত্তরের দিকে পাশাপাশি দুটো পেল্লায় ঘরে আমাদের বন্দোবস্ত

হল। লালমোহনবাবু একা একটি জাঁদরেল খাট পেয়েছেন, বললেন, 'একদিন-কা সুলতানের গপ্পের কথা মনে পড়ছে মশাই।'

তা খুব ভুল বলেননি। দুপুরে শ্বেত পাথরের থালাবাটি গেলাসে খাবার সময় আমারও সে কথা মনে হয়েছিল। রাত্তিরে দেখি সেই সব জিনিসই রুপোর হয়ে গেছে।

'আপনার দাদুর স্টুডিওটা কিন্তু দেখা হল না,' খেতে খেতে বলল ফেলুদা।

'সেটা কাল সকালে দেখাব,' বললেন নবকুমারবাবু। 'আপনারা যে দুটো ঘরে শুচ্ছেন, ওটা ঠিক তারই উপরে।'

যখন শোবার বন্দোবস্ত করছি, তখন বৃষ্টিটা ধরে গেল। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ধ্রুবতারা দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রাজবাড়ির পিছনে বাগান, সামনে মাঠ। আমাদের ঘর থেকে বাগানটাই দেখা যাচ্ছে, তার গাছে গাছে জোনাকি জ্বলছে। অন্য কোনও বাড়ির শব্দ এখানে পৌঁছায় না, যদিও পুবে বাজারের দিক থেকে ট্রানজিস্টারের গানের একটা ক্ষীণ শব্দ পাচ্ছি।

সাড়ে দশটা নাগাদ লালমোহনবাবু গুডনাইট করে তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন। দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। ভদ্রলোক বললেন সেটা বেশ কনভিনিয়েন্ট।

এই দরজা দিয়েই ভদ্রলোক মাঝরাত্তিরে ঢুকে এসে চাপা গলায় ডাক দিয়ে ফেলুদার ঘুম ভাঙালেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি আমারও ঘুম ভেঙে গেল।

'কী ব্যাপার মশাই? এত রাত্তিরে?'

'শ্ শ্ শ্ শ্! কান পেতে শুনুন।'

কান পাতলাম। আর শুনলাম।

খচ্ খচ্ খচ্ খচ্...

মাথার উপর থেকে শব্দটা আসছে। একবার একটা খুট্ শব্দও পেলাম। কেউ হাঁটাচলা করছে।

মিনিট তিনেক পরে শব্দ থেমে গেল।

উপরেই সাশভ্রো নিয়োগীর স্টুডিও।

ফেলুদা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তোরা থাক, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

ফেলুদা খালি পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু আর আমি আমাদের খাটে বসে রইলাম। প্রচণ্ড সাসপেন্স, ফেলুদা না-আসা পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডটা ঠিক আলজিভের পিছনে আটকে রইল। প্রাসাদের কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। তারপর আরও দুটো ঘড়িতে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবার ঠিক তেমনি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল ফেলুদা।

'দেখলেন কাউকে?' চাপা গলায় ঘড়ঘড়ে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন।

'ইয়েস।'

'কাকে?'

'সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নেমে গেল।'

'কে?'

'সাংবাদিক রবীন চৌধুরী।'

॥ ৪ ॥

রাত্তিরের ঘটনাটা আর নবকুমারবাবুকে বলল না ফেলুদা। চায়ের টেবিলে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'স্টুডিওটা চাবি দেওয়া থাকে না?'

'এমনিতে সবসময়ই থাকে,' বললেন নবকুমারবাবু, 'তবে ইদানীং রবীনবাবু প্রায়ই গিয়ে কাজ করেন। রুদ্রশেখরবাবুও যান, তাই ওটা খোলাই থাকে। চাবি থাকে বাবার কাছে।'

চা খাওয়ার পর আমরা চন্দ্রশেখরের স্টুডিয়োটা দেখতে গেলাম।

তিনতলায় ছাত। তারই একপাশে উত্তর দিকটায় স্টুডিও। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে ঘুরে স্টুডিয়োতে ঢোকার দরজা।

উত্তরের আলো নাকি ছবি আঁকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল, তাই

স্টুডিওর উত্তরের দেয়ালটা পুরোটাই কাচ। বেশ বড় ঘরের চারদিকে ছড়ানো রয়েছে ডাঁই করা ছবি, নানান সাইজের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা ক্যানভাস, দুটো বেশ বড় টেবিলের উপর রং তুলি প্যালেট ইত্যাদি নানারকম ছবি আঁকার সরঞ্জাম, জানালার পাশে দাঁড় করানো একটা ইজেল। সব দেখেটেখে মনে হয় আর্টিস্ট যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়েছেন, আবার এক্ষুনি ফিরে এসে কাজ শুরু করবেন।

'জিনিসপত্তর সবই বিলিতি,' চারিদিক দেখে ফেলুদা মন্তব্য করল। 'এমন কি লিনসীড অয়েলের শিশিটা পর্যন্ত। রংগুলো তো দেখে মনে হয় এখনও ব্যবহার করা চলে।'

ফেলুদা দু'একটা টিউব তুলে টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল।

'হুঁ, ভাল কন্ডিশনে রয়েছে জিনিসগুলো। রুদ্রশেখর এগুলো বিক্রি করেও ভাল টাকা পেতে পারেন। আজকালকার যে কোনও আর্টিস্ট এসব জিনিস পেলে লুফে নেবে।'

ঘরের দক্ষিণ দিকের বড় দেয়ালে আট-দশটা ছবি টাঙানো রয়েছে। তার একটার দিকে নবকুমারবাবু আঙুল দেখালেন।

'ওটা দাদুর নিজের আঁকা নিজের ছবি।'

আর্টিস্টরা অনেক সময় আয়নার সামনে বসে সেলফপোর্ট্রেট আঁকতেন সেটা আমি জানি। চন্দ্রশেখর নিজেকে এঁকেছেন বিলিতি পোশাকে। চমৎকার শার্প, সুপুরুষ চেহারা। কাঁধ অবধি ঢেউখেলানো কুচকুচে কালো চুল, দাড়ি আর গোঁফও খুব হিসেব করে আঁচড়ানো বলে মনে হয়।

'এই ছবিটা ওই প্রবন্ধের সঙ্গে বেরিয়েছে,' বলল ফেলুদা।

'তা হবে,' বললেন নবকুমারবাবু, 'বাবার কাছে শুনেছিলাম ভূদেব সিং-এর এক ছেলে এখানে এসেছিল একদিনের জন্য। বাপের আর্টিকলের জন্য বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে যায়।'

'ভদ্রলোকের রং তো তেমন ফর্সা ছিল বলে মনে হচ্ছে না।'

'না,' বললেন নবকুমারবাবু। 'উনি আমার প্রপিতামহ অনন্তনাথের রং পেয়েছিলেন। মাঝারি।'

'সেই বিখ্যাত ছবিটা কোথায়?' এবার ফেলুদা প্রশ্ন করল।

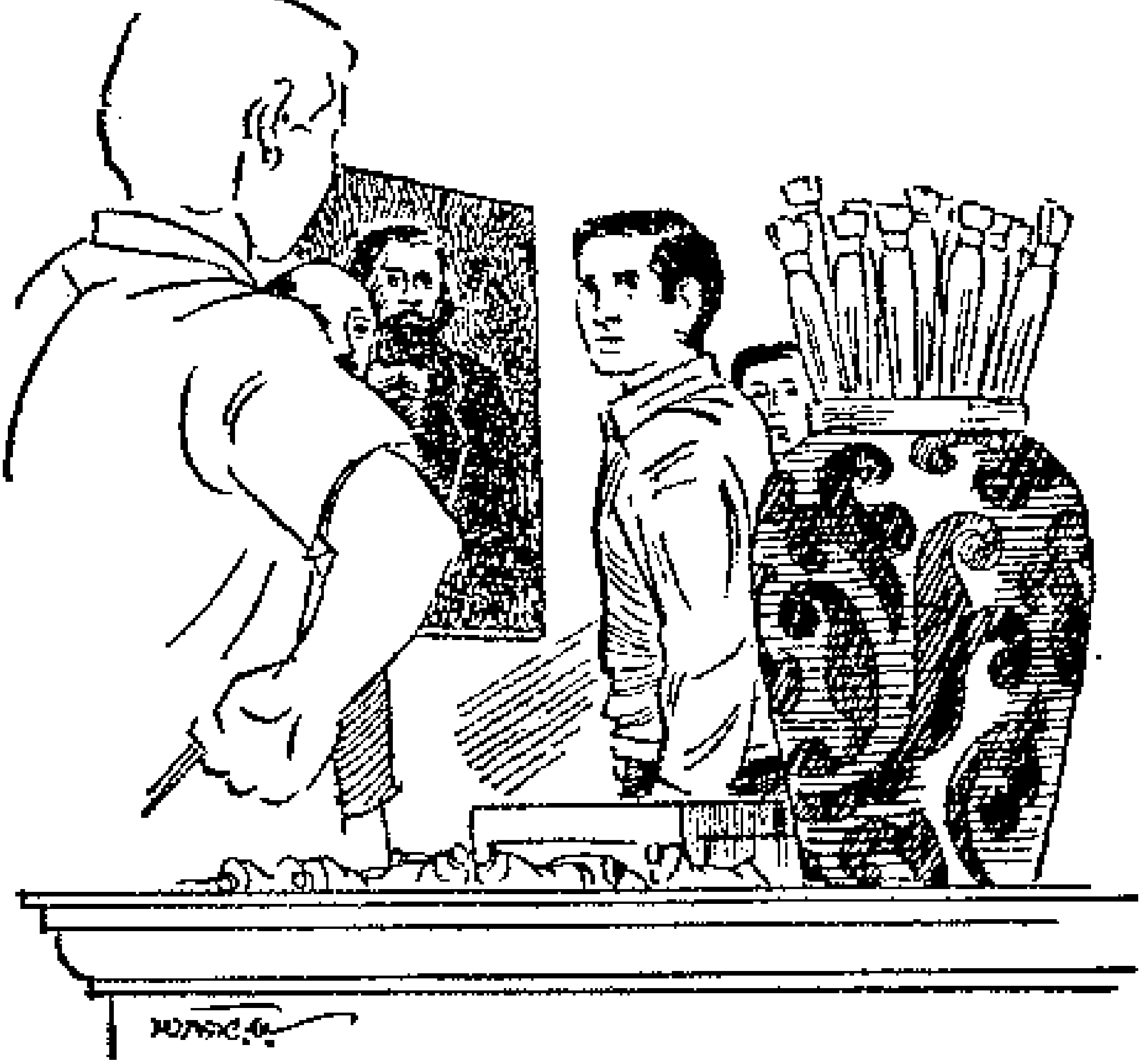

'এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।'

নবকুমারবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন দক্ষিণের দেয়ালের একেবারে কোণের দিকে।

গিল্টিকরা ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে যীশুখ্রিস্টের ছবিটা।

মাথায় কাঁটার মুকুট, চোখে উদাস চাহনি, ডান হাতটা বুকের উপর আলতো করে রাখা। মাথার পিছনে একটা জ্যোতি, তারও পিছনে গাছপালা-পাহাড়-নদী-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ মিলিয়ে একটা নাটকীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য।

আমরা মিনিটখানেক ধরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। কিছুই জানি না, অথচ মনে হল হাজার ঐশ্বর্য, হাজার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই ছবির মধ্যে।

মেজোবাবুর হাবভাবে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে বৈকুণ্ঠপুরের

নিয়োগীদের সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ নয়। নীচে এসেই ফেলুদা একটা অনুরোধ করল নবকুমারবাবুকে।

'আপনাদের একটা বংশলতিকা পাওয়া যাবে কি? অনন্তনাথ থেকে শুরু করে আপনারা পর্যন্ত জন্ম মৃত্যু ইত্যাদির তারিখ সমেত হলে ভাল হয়, আর আলাদা করে চন্দ্রশেখরের জীবনের জরুরি তারিখগুলো। অবিশ্যি যেসব তারিখ আপনাদের জানা আছে।'

'আমি বঙ্কিমবাবুকে বলছি। উনি খুব এফিশিয়েন্ট লোক। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি করে দেবেন আপনাকে।'

'আর, ইয়ে—যে ভদ্রলোক ছবি কিনতে এসেছিলেন তাঁর ঠিকানাটা। যদি বঙ্কিমবাবুর কাছে থাকে।'

বঙ্কিমবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ চালাক চেহারা। হাসলেই গোঁফের নীচে ধবধবে সাদা দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে। বললেন, বংশলতিকা একটা রবীনবাবুর জন্য করেছিলেন, তার কার্বন রয়েছে। সেটা পেতে দশ মিনিটের জায়গায় লাগল দু মিনিট।

যিনি ছবি কিনতে এসেছিলেন তাঁর একটা কার্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে ছিল, উনি সেটা এনে দিলেন ফেলুদাকে। দেখলাম নাম হচ্ছে হীরালাল সোমানি, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ২৩, লোটাস টাওয়ারস, আমীর আলি অ্যাভিনিউ।

কার্ডটা দেবার পর ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব। ফেলুদা বলল, 'কিছু বলবেন কি?'

'আপনার নাম শুনেছি,' বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি ডিটেকটিভ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি কি আবার আসবেন?'

'প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আসব। কেন বলুন তো?'

'ঠিক আছে,' ভদ্রলোকের এখনও সেই ইতস্তত ভাব।—'মানে, একটু ইয়ে ছিল। তা সে পরেই হবে।'

আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হল, যদিও পরে ফেলুদাকে বলাতে ও বলল, 'বোধহয় অটোগ্রাফ নেবার ইচ্ছে

ছিল, বলতে সাহস পেলেন না।'

গাড়িতে যখন উঠছি তখন ফেলুদা নবকুমারবাবুকে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার নিয়োগী। আপনাদের এখানে এসে সত্যিই ভাল লাগল। যা দেখলাম আর শুনলাম, তা খুবই ইন্টারেস্টিং। আমি যদি একটু এদিক ওদিক খোঁজখবর করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না তো?'

'মোটেই না।'

'একবার ভগওয়ানগড়ে ভূদেব সিং-এর কাছে যাবার ইচ্ছে আছে। ওই যীশুর বাজার দরটা কী হতে পারে সেটা একবার ওঁর কাছ থেকে জানা দরকার।'

'বেশ তো, চলে যান ভগওয়ানগড়। আমার আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

'আর আপনার বাবা কিন্তু ঠিকই বলেছেন; আপনাদের ফক্স-টেরিয়ার খুনের ব্যাপারটাকে কিন্তু আপনি মোটেই হালকা করে দেখবেন না। আমি ওটার মধ্যে গূঢ় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।'

'তা তো বটেই। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত নৃশংস বলে মনে হয়েছিল।'

ফেলুদা আর নবকুমারবাবুর মধ্যে কার্ড বিনিময় হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি প্রয়োজনে টেলিফোন করবেন, তেমন বুঝলে সোজা চলে আসবেন। আর ভগওয়ানগড়ে কী হল সেটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন।'

*

'ভগওয়ানগড় বলে যে একটা জায়গা আছে সেটাই জানা ছিল না, মশাই,' ফেরার পথে বললেন লালমোহনবাবু।

'জায়গাটা বোধহয় মধ্যপ্রদেশে,' বলল ফেলুদা। 'তবে আই অ্যাম নট শিওর। গিয়েই পুষ্পক ট্র্যাভেলসের সুদর্শন চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হতে হবে।'

'এম পি-টা দেখা হয়নি,' আপন মনে বললেন জটায়ু।

'অবিশ্যি এ যাত্রায় যে বিশেষ দেখা হবে সেটা মনে করবেন না। স্রেফ কতগুলো তথ্য জেনে নিয়ে ফিরে আসা। বৈকুণ্ঠপুরকে বেশিদিন নেগলেক্ট করা চলবে না।'

'এটা কেন বলছেন?'

'রুদ্রশেখরের পায়ের দিকে লক্ষ করেছেন?'

'কই, না তো?'

'নবীন চৌধুরীর খাওয়াটা লক্ষ করেছেন?'

'কই, না তো।'

'তা ছাড়া ভদ্রলোক রাত দুটোর সময় স্টুডিওতে কী করেন, বঙ্কিমবাবু কী বলতে গিয়ে বললেন না, একটা কুকুরকে কী কী কারণে খুন করা যেতে পারে—এসব অনেক প্রশ্ন আছে।'

আমি বললাম, 'কোনও বাড়ির কুকুর যদি ভাল ওয়াচডগ হয়, তা-হলে একজন চোর সে-বাড়ি থেকে কিছু সরাবার মতলব করে থাকলে আগে কুকুরকে সরাতে পারে।'

'ভেরি গুড। কিন্তু কুকুরকে মারা হয়েছে মঙ্গলবার আঠাশে সেপ্টেম্বর, আর আজ হল ৫ই অক্টোবর। কই, এখনও তো কিছু চুরি হয়েছে বলে জানা যায়নি। আর, এগারো বছরের বুড়ো ফক্স-টেরিয়ার কতই বা ভাল ওয়াচডগ হবে?'

'আমার কী আপশোস হচ্ছে জানেন তো?' বললেন লালমোহনবাবু।

'কী?'

'যে আর্টের বিষয় এত কম জানি।'

'বর্তমান ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে একজন প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত শিল্পীর ছবি যদি বাজারে আসে, তা হলে তার দাম লাখ দু' লাখ টাকা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'অ্যাঁ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তার মানে বলতে চান একটি লাখ টাকার ছবি আজ চল্লিশ বছর ধরে টাঙানো রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের ওই স্টুডিওর দেয়ালে, অথচ সেটা সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না?'

'ঠিক তাই। এবং সেইটে জানার জন্যেই ভগওয়ানগড় যাওয়া।'

॥ ৫ ॥

কলকাতায় ফিরে এসেই ফেলুদা প্রবন্ধের কথাটা উল্লেখ করে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে টেলিগ্রাম করে দিল ভগওয়ানগড়ের এক্স মহারাজা ভূদেব সিংকে। তার আগেই অবিশ্যি পুষ্পক ট্র্যাভেলসে ফোন করেছিল ফেলুদা। ও ঠিকই আন্দাজ করেছিল ; ভগওয়ানগড় মধ্যপ্রদেশেই, তবে আমাদের প্রথমে যেতে হবে নাগপুরে। সেখান থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে ছিন্দওয়ারা। ছিন্দওয়ারা থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পশ্চিমে হল ভগওয়ানগড়।

টেলিগ্রামের উত্তর এসে গেল পরের দিনই। এই সপ্তাহে যে-কোনওদিন গেলেই ভূদেব সিং আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। কবে যাচ্ছি জানিয়ে দিলে ছিন্দওয়ারাতে রাজার লোক গাড়ি নিয়ে থাকবে।

সুদর্শনবাবুকে ফোন করতে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের তাড়া থাকলে কাল বুধবার ভোরে একটা নাগপুর ফ্লাইট আছে। সাড়ে ছ'টায় রওনা হয়ে পৌঁছবেন সোয়া আটটায়। তারপর নাগপুর থেকে সাড়ে দশটায় ট্রেন আছে, সেটা ছিন্দওয়ারা পৌঁছবে বিকেল পাঁচটায়। ট্রেনের টিকিট আপনাদের ওখানেই কেটে নিতে হবে।'

'আর ফেরার ব্যাপারটা ?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আপনি বিষ্যুদবার রাত্রে আবার ছিন্দওয়ারা থেকে ট্রেন ধরতে পারবেন। সেটা নাগপুর পৌঁছবে শুক্রবার ভোর পাঁচটায়। সেদিনই কলকাতার ফ্লাইট আছে তিন ঘণ্টা পরে। সাড়ে দশটায় ব্যাক্ ইন ক্যালকাটা।'

সেইভাবেই যাওয়া ঠিক হল, আর রাজাকেও জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল।

আজকের বাকি দিনটা হাতে আছে, তাই ফেলুদা ঠিক করল এই ফাঁকে একটা জরুরি কাজ সেরে নেবে।

টেলিফোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমরা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলাম আমীর আলি অ্যাভিনিউতে লোটাস টাওয়ারসে হীরালাল সোমানির ফ্ল্যাটে।

বেল টিপতে একটি বেয়ারা এসে দরজা খুলে আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের সংগ্রহের বাতিক আছে, আর অনেক জিনিসেরই যে অনেক দাম সেটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। যেটা নেই সেটা হল সাজানোর পারিপাট্য।

ঝাড়া দশ মিনিট বসিয়ে রাখার পর সোমানি সাহেব প্রবেশ করলেন, আর করামাত্র একটা পারফিউমের গন্ধ ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি সবেমাত্র গোসল সেরে এলেন। সাদা ট্রাউজারের উপর সাদা কুর্তা। পায়ে সাদা কোলাপুরি চটি। পালিশ করে আঁচড়ানো চুলেও সাদার ছোপ লক্ষ করা যায়। যদিও সরু করে ছাঁটা গোঁফটা সম্পূর্ণ কালো।

ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোফায় বসে ফেলুদা ও লালমোহনবাবুকে সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—

'বলুন কী ব্যাপার।'

'আমি কয়েকটা ইনফরমেশন চাইছিলাম,' বলল ফেলুদা।

'বলুন যদি পসিব্‌ল হয় দেব।'

'আপনি রিসেন্টলি একটা ছবির খোঁজে বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিলেন। তাই না?'

'ইয়েস।'

'ওরা বিক্রি করতে রাজি হননি।'

'নো।'

'আপনি ছবির কথাটা কীভাবে জানলেন সেটা জানতে পারি কি?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, যেন ফেলুদা

বাড়াবাড়ি করছে, এবং উত্তর দেওয়া-না দেওয়াটা তাঁর মর্জি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তরটা এল।

'আমি জানিনি। আরেকজন জেনেছিলেন। আমি তাঁরই রিকোয়েস্টে ছবি কিনতে গিয়েছিলাম।'

'আই সি।'

'আপনি কি সেই ছবি আমায় এনে দিতে পারেন? তবে, জেনুইন জিনিস চাই। ফোর্জারি হলে এক পইসা ভি নহী মিলেগা।'

'জাল না আসল সেটা আপনি বুঝবেন কী করে?'

'আমি বুঝব কেন? যিনি কিনবেন তিনি বুঝবেন। হি হ্যাজ থার্টিফাইভ ইয়ারস এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ বাইয়ার অফ পেন্টিংস।'

'তিনি কি এদেশের লোক?'

সোমানি সাহেবের চোয়ালটা যেন একটু শক্ত হল। ভদ্রলোক ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি ফেলুদার দিক থেকে। এই প্রথম ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাস দেখা গেল।

'এ-ইনফরমেশন আমি আপনাকে দেব কেন? আমি কি বুদ্ধু?'

'ঠিক আছে।'

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় সোমানি বললেন, 'আপনি যদি আমাকে এনে দিতে পারেন, আমি আপনাকে কমিশন দেব।'

'শুনে সুখী হলাম।'

'টেন থাউজ্যান্ড ক্যাশ।'

'আর তারপর সেটা দশ লাখে বিক্রি করবেন?'

সোমানি কোনও উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ফেলুদার দিকে।

'ছবি পেলে আপনাকে দেব কেন, মিস্টার সোমানি?' বলল ফেলুদা। 'আমি সোজা চলে যাব আসল লোকের কাছে।'

'নিশ্চয় যাবেন, বাট ওনলি ইফ ইউ নো হোয়্যার টু গো।'

'জেনে নেব খুঁজে বার করার রাস্তা আছে, মিস্টার সোমানি। সকলের না

থাকলেও, আমার আছে। ...আমি আসি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'অনেক ধন্যবাদ।'

'গুডডে, মিস্টার প্রদোষ মিত্র।'

শেষ কথাটা ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন যেন উনি ফেলুদার নাম ও পেশা দুটোর সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত।

'একরকম মাংসাশী ফুল আছে না,' বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, লালমোহনবাবু, 'দেখতে খুব বাহারে, অথচ পোকা পেলেই কপ্ করে গিলে ফেলে?'

'আছে বই কী।'

'এ লোক যেন ঠিক সেইরকম।'

ফেলুদার উৎকণ্ঠার ভাবটা বুঝতে পারলাম যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসেই ও বৈকুণ্ঠপুরে একটা ফোন করল।

তবে নবকুমার বললেন আর নতুন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

বাড়িতে ফিরে বৈঠকখানায় বসে 'ভাই, শ্রীনাথকে একটু চা করতে বলো না,' বলে লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা বই বার করে সশব্দে টেবিলের উপর রাখলেন। বইটা হল 'সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস', লেখক অনুপম ঘোষদস্তিদার।

'কী বলছেন ঘোষদস্তিদার মশাই?' আড়চোখে বইটা দেখে প্রশ্ন করল ফেলুদা। ও নিজে আজই দুপুরে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গিয়ে দুটো মোটা আর্টের বই নিয়ে এসেছে সেটা আমি জানি।

'ওঃ, ভেরি ইউজফুল মশাই। আপনি আর রাজা কথা বলবেন আর্ট নিয়ে, আর আমি হংসমধ্যে বক যথা, এ হতে দেওয়া যায় না। এটা পড়ে নিলে আমিও পার্টিসিপেট করতে পারব।'

'গোটা বইটা পড়ার কোনও দরকার নেই; আপনি শুধু রেনেসাঁস অংশটা পড়ে রাখবেন। রেনেসাঁস আছে তো ও বইয়ে?'

'তা তো বলছে না।'

'তবে কী বলছে?'

'রিনেইসান্স।'

'ঘোষদস্তিদারের জবাব নেই।'

'জিনিসটা তো একই?'

'তা একই।'

'ইয়ে, রেনেসাঁস বলতে বোঝাচ্ছেটা কী?'

'পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দী। এই দেড়শো-দুশো বছর হল ইটালির পুনর্জন্মের যুগ। রেনেসাঁস হল পুনর্জন্ম, পুনর্জাগরণ।'

'কেন পুনঃ বলছে কেন? হোয়াই এগেইন?'

'কারণ প্রাচীন গ্রিক ও রোম্যান সভ্যতার আদর্শে ফিরে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল এই যুগে—যে আদর্শ মধ্যযুগে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই রেনেসাঁস। ইটালিতে শুরু হলেও রেনেসাঁসের প্রভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ইউরোপে। বহু প্রতিভা জন্মেছে এই সময়টাতে। শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে। ছাপাখানার উদ্ভব এই সময়; তার মানে শিক্ষার প্রসার এই সময়। কোপর্নিকাস, গ্যালিলিও, শেক্সপিয়র, দাভিঞ্চি, রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো—সব এই দেড়শো-দুশো বছরের মধ্যে।'

'তা আপনার কি ধারণা বৈকুণ্ঠপুরের যীশুও আঁকা হয়েছে এই রেনেসাঁসের যুগে?'

'তার কাছাকাছি তো বটেই। আগে নয় নিশ্চয়ই, বরং সামান্য পরে হতে পারে। মধ্যযুগের পেন্টিং-এ মানুষ জন্তু গাছপালা সব কিছুর মধ্যে একটা কেঠো-কেঠো, আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক ভাব দেখতে পাবেন। রেনেসাঁসে সেটা আরও অনেক জীবন্ত, স্বাভাবিক হয়ে আসে।'

'এই যে সব নাম দেখছি এ বইয়ে—গায়োট্টো—'

'গায়োট্টো লিখেছে নাকি?'

'তাই তো দেখছি। গায়োট্টো, বট্টিসেল্লি, মানটেগ্না'...

'আপনি ও বইটা রাখুন। আমি আর্টিস্টের নামের একটা তালিকা করে দেব—আপনি চান তো সে নামগুলো মুখস্থ করে রাখবেন। গায়োট্টো নয়। ইংরিজি উচ্চারণে জিয়োটো, ইতালিয়ানে জ্যোত্তো। জ্যোত্তো, বত্তিচেল্লী, মানতেন্যা...'

'এরা সব বলছেন জাঁদরেল আঁকিয়ে ছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই ! শুধু এঁরা কেন ? এ রকম অন্তত ত্রিশটা নাম পাবেন শুধু ইটালিতেই ।'

'আর এই ত্রিশ জনের মধ্যে একজনের আঁকা ছবি রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরে ? বোঝো !'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলুদা নিয়োগীদের বংশলতিকা খাটে বিছিয়ে সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সেই সঙ্গে অবিশ্যি চন্দ্রশেখরের জীবন সংক্রান্ত তারিখগুলোও ছিল। সে কার দাদু, কে কার কাকা, কে কার ভাই, এগুলো আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। এবার সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

দুটো জিনিসের চেহারা এই রকম—

১। বংশলতিকা

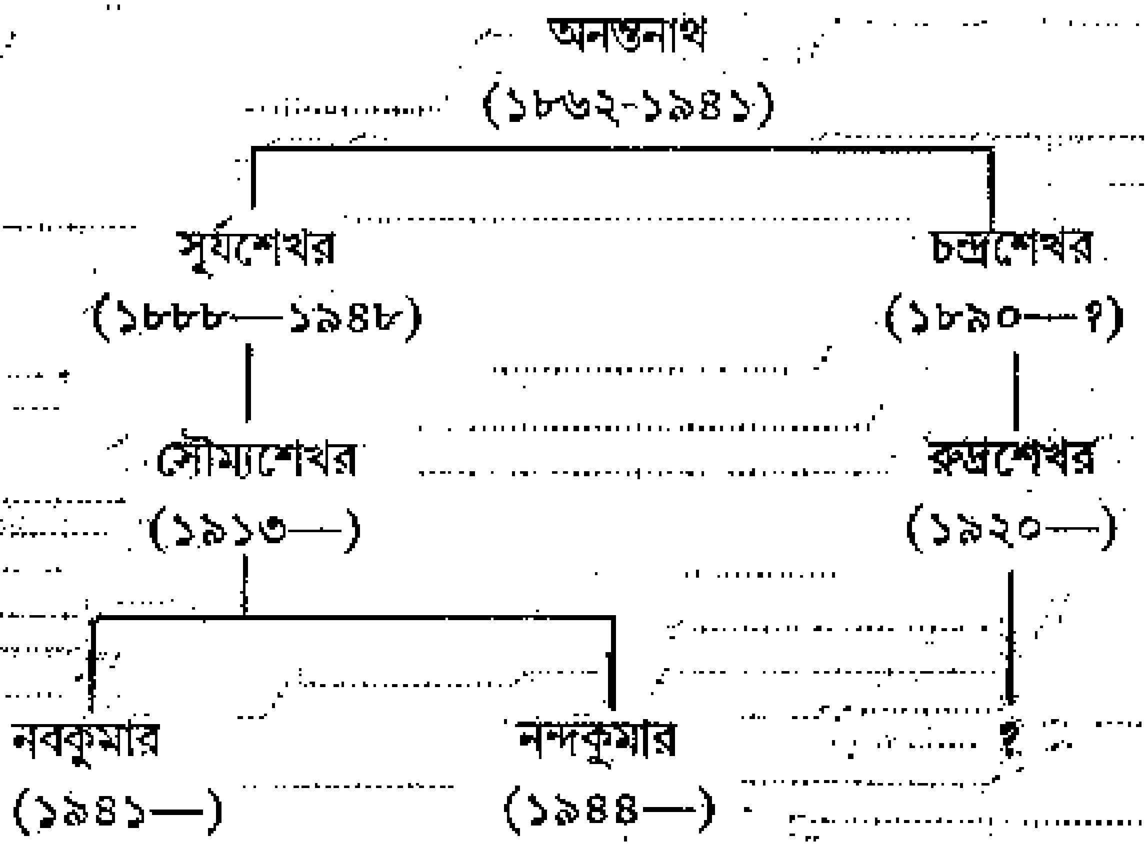

২। চন্দ্রশেখর নিয়োগী

১৮৯০ — জন্ম (বৈকুণ্ঠপুর)
১৯১২ — প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ
১৯১৪ — রোমযাত্রা। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ছাত্র
১৯১৭ — কার্লা ক্যাসিনিকে বিবাহ
১৯২০ — পুত্র রুদ্রশেখরের জন্ম
১৯৩৭ — কার্লার মৃত্যু
১৯৩৮ — স্বদেশে প্রত্যাবর্তন
১৯৫৫ — গৃহত্যাগ

॥ ৬ ॥

প্লেন নাগপুরে সাড়ে আটটার সময় পৌঁছে, সেখান থেকে দশটা পঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে ছিন্দওয়ারা পৌঁছতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। স্টেশনে শেভরোলে গাড়ি নিয়ে হাজির ছিলেন ভূদেব সিং-এর লোক। হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট মাঝবয়সি এই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ নাগপাল। চারজন গাড়িতে রওনা দিয়ে পৌনে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভগওয়ানগড়ের রাজবাড়ি।

নাগপাল বললেন, 'আপনাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে, আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন, সাড়ে সাতটার সময় রাজা আপনাদের মিট করবেন। আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব।'

ঘরের চেহারা দেখেই বুঝলাম যে আজ রাতটা আমাদের এইখানেই থাকার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। বিছানা, বালিশ, লেপ, মশারি, বাথরুমে তোয়ালে সাবান—সবই রয়েছে। যে কোনও ফাইভ-স্টার হোটেলের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। লালমোহনবাবু বললেন, এখানকার বাথরুমে নাকি তাঁর গড়পারের বাড়ির পাঁচটা বেডরুম ঢুকে যায়। 'নেহাত টাইম নেই, নইলে টবে গরম জল ভরে শুয়ে থাকতুম আধ ঘণ্টা।'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় মিঃ নাগপাল আমাদের রাজার সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। শ্বেতপাথরের মেঝেওয়ালা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন ভূদেব সিং। চেহারা যাকে বলে সৌম্যকান্তি। বয়স সাতাত্তর, কিন্তু মোটেও থুখুড়ে নন।

আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাজার সামনে তিনটে বেতের চেয়ারে বসলাম। হাসনাহানা ফুলের গন্ধে বুঝতে পারছি বারান্দার পরেই বাগান, কিন্তু অন্ধকারে গাছপালা বোঝা যাচ্ছে না।

কথাবার্তা ইংরিজিতেই হল, তবে আমি বেশির ভাগটা বাংলা করেই লিখছি। জটায়ু বলেছিলেন, পার্টিসিপেট করবেন। কতদূর করেছিলেন সেটা যাতে ভাল বোঝা যায় তাই নাটকের মতো করে লিখছি।

ভূদেব—আমার লেখাটা কেমন লাগল ?

ফেলুদা—খুবই ইন্টারেস্টিং। ওটা না পড়লে এরকম একজন শিল্পীর বিষয় কিছুই জানতে পারতাম না।

ভূদেব—আসলে আমরা নিজের দেশের লোকদের কদর করতে জানি না। বিদেশ হলে এ রকম কখনওই হত না। তাই ভাবলাম—আমার তো বয়স হয়েছে, সেভেনটি-সেভেন—মরে যাবার আগে এই একটা কাজ করে যাব। চন্দ্রশেখরের বিষয় জানিয়ে দেব দেশের লোককে। আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম বৈকুণ্ঠপুর। চন্দ্রর সেল্‌ফপোর্ট্রেট আমার কাছে ছিল না। সে আমাকে ছবি তুলে এনে দিল।

ফেলুদা—আপনার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের আলাপ হয় কবে ?

ভূদেব—দাঁড়ান, এই খাতাটায় সব লেখা আছে।...হ্যাঁ, ৫ই নভেম্বর ১৯৪২ সে আমার পোর্ট্রেট আঁকতে আসে এখানে। তার কথা আমি শুনি ভূপালের রাজার কাছ থেকে। রাজার পোর্ট্রেট চন্দ্র করেছিল। আমি

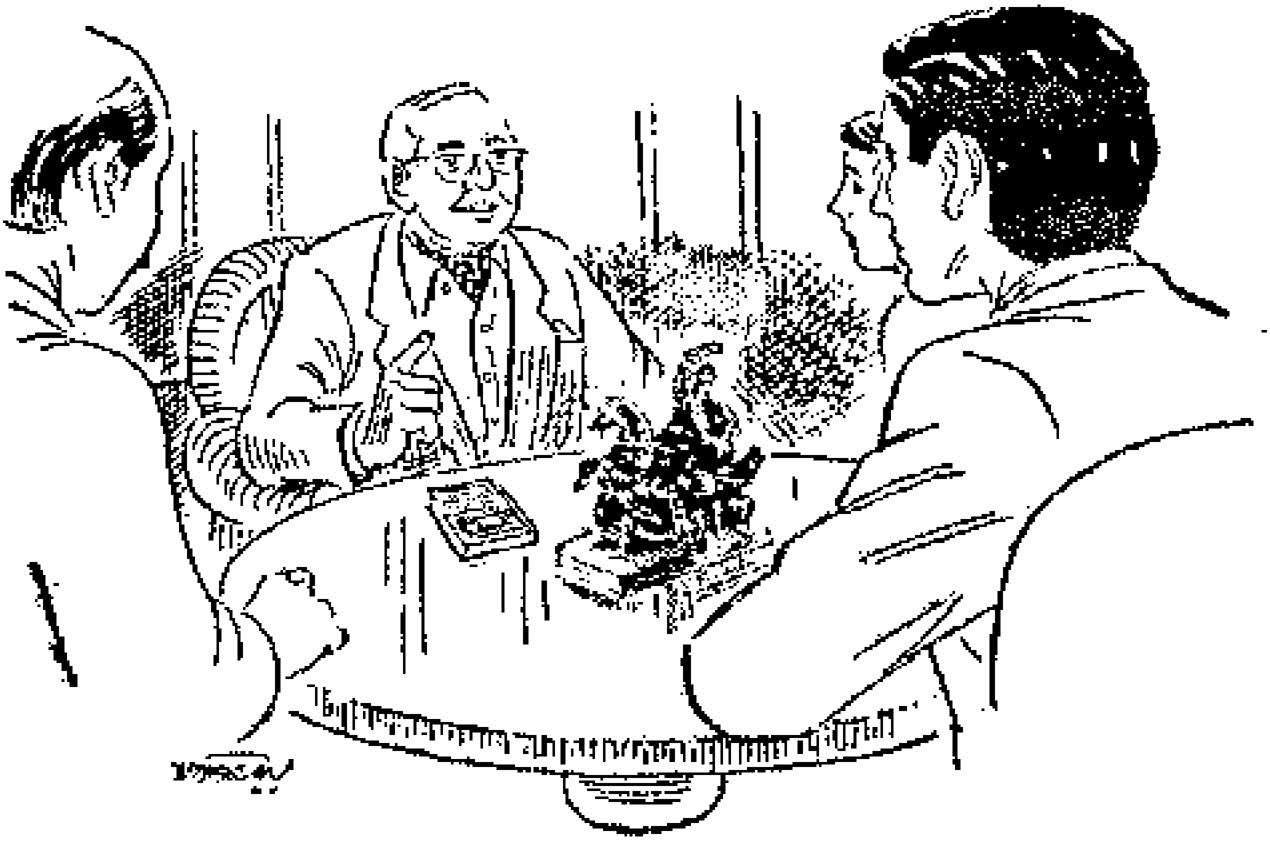

দেখেছিলাম। আমার খুব ভাল লেগেছিল। চন্দ্র হ্যাড ওয়াণ্ডারফুল স্কিল্।

জটায়ু—ওয়াণ্ডারফুল।

ফেলুদা—আপনার লেখায় পড়েছি তিনি ইটালিতে গিয়ে একজন ইটালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। এই মহিলা সম্বন্ধে আরেকটু কিছু যদি বলেন।

জটায়ু—সামথিং মোর...

ভূদেব—চন্দ্রশেখর রোমে গিয়ে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ভর্তি হয়। ওর ক্লাসেই ছিল কার্লা ক্যাসিনি। ভেনিসের অভিজাত বংশের মেয়ে। বাবা ছিলেন কাউন্ট। কাউন্ট আলবের্তো ক্যাসিনি। কার্লা ও চন্দ্রশেখরের মধ্যে ভালবাসা হয়। কার্লা তার বাবার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের পরিচয় করিয়ে দেয়। এখানে বলে রাখি, চন্দ্রশেখর আয়ুর্বেদ চর্চা করেছিল। ইটালি যাবার সময় সঙ্গে বেশ কিছু শিকড় বাকল নিয়ে গিয়েছিল। কার্লার বাপ ছিলেন গাউটের রুগি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগতেন। চন্দ্রশেখর তাঁকে ওষুধ দিয়ে

ভাল করে দেয়। বুঝতেই পারছ, এর ফলে চন্দ্রর পক্ষে কাউন্টের মেয়ের পাণিগ্রহণের পথ অনেক সহজ হয়ে যায়। ১৯১৭-তে বিয়েটা হয়, এবং এই বিয়েতে কাউন্ট একটি মহামূল্য উপহার দেন চন্দ্রকে।

ফেলুদা—এটা কি সেই ছবি?

জটায়ু—রেনেসাঁস?

ভূদেব—হ্যাঁ। কিন্তু এই ছবিটা সম্বন্ধে কতটা জানেন আপনারা?

ফেলুদা—ছবিটা দেখেছি, এই পর্যন্ত। মনে হয় রেনেসাঁস যুগের কোনও শিল্পীর আঁকা।

জটায়ু—(বিড়বিড় করে)—বত্তিজাত্তো...দাভিঞ্চেল্লি...

ভূদেব—আপনারা ঠিকই ধরেছেন, তবে যে-কোনও শিল্পী নয়। রেনেসাঁসের শেষ পর্বের অন্যতম সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্পী। টিনটোরেটো।

জটায়ু—ওফ্‌ফ্‌ফ!

ফেলুদা—টিনটোরেটোর নিজের আঁকা তো খুব বেশি ছবি আছে বলে জানা যায় না, তাই না?

ভূদেব—না। অনেক ছবিই আংশিক ভাবে টিনটোরেটোর আঁকা, বাকিটা এঁকেছে তার স্টুডিও বা ওয়র্কশপের শিল্পীরা। এটা তখনকার অনেক পেন্টার সম্পর্কেই খাটে। তবে কাজটা যে উঁচুদরের তাতে সন্দেহ নেই। সে ছবি চন্দ্র এনে আমাকে দেখিয়েছিল। টিনটোরেটোর সব লক্ষণই রয়েছে ছবিটায়। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ক্যাসিনি প্যালেসে ছিল ছবিটা।

ফেলুদা—তার মানে ওটা তো একটা মহামূল্য সম্পত্তি।

ভূদেব—ওর দাম বিশ-পঁচিশ লাখ হলে আশ্চর্য হব না।

জটায়ু—(নিশ্বাস টেনে)—হিঁ ইঁ ইঁ ইঁ ইঁ ইঁ!

ভূদেব—সেই জন্যেই তো আমি পেন্টারের নামটা বলিনি প্রবন্ধটায়।

ফেলুদা—কিন্তু তাও বৈকুণ্ঠপুরে লোক এসে খবর নিয়ে গেছে।

ভূদেব—কে ? ক্রিকোরিয়ান এসেছিল নাকি ?

ফেলুদা—ক্রিকোরিয়ান ? কই না তো। ও নামে তো কেউ আসেনি।

ভূদেব—আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক। আমার কাছে এসেছিল। ওয়লটার ক্রিকোরিয়ান। টাকার কুমির। হংকং-এর ব্যবসাদার এবং ছবির কালেক্টর। বলে ওর কাছে ওরিজিন্যাল রেমব্রান্ট আছে, টার্নার আছে, ফ্রাগোনার আছে। আমাদের বাড়িতে একটা বুশের-এর ছবি আছে, আমার ঠাকুরদাদার কেনা। সেটা কিনতে এসেছিল। আমি দিইনি। তারপর বলল ও আমার লেখাটা পড়েছে। জিজ্ঞেস করছিল নিয়োগীদের ছবিটার কথা। ও নিজে এত বড়াই করছিল যে আমি উল্টে একটু বড়াই করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বলে দিলাম টিনটোরেটোর কথা। ও তো লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে। আমি বললাম, ও ছবিও তুমি কিনতে পাবে না, কারণ পয়সার লোভের চেয়ে প্রাইড অফ পোজেশন আমাদের ভারতীয়দের অনেক বেশি। এটা তোমরা বুঝবে না। ও বললে, সে ছবি আমার হাতে আসবেই, তুমি দেখে নিয়ো। বলেছিল নিজেই যাবে বৈকুণ্ঠপুরে। হয়তো হঠাৎ কোনও কাজে ফিরে গেছে। তবে ওর এক দালাল আছে—

ফেলুদা—হীরালাল সোমানি ?

ভূদেব—হ্যাঁ।

ফেলুদা—ইনিই গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠপুরে।

ভূদেব—অত্যন্ত ঘুঘু লোক। ওকে যেন একটু সাবধানে হ্যান্ডল করে।

ফেলুদা—কিন্তু ও ছবি তো চন্দ্রশেখরের ছেলের সম্পত্তি। সে তো এখন বৈকুণ্ঠপুরে।

ভূদেব—হোয়াট ! চন্দ্রর ছেলে এসেছে ? এতদিন পরে ?

ফেলুদা—তাকে দেখে এলাম আমরা।

ভূদেব—ও! তাহলে অবিশ্যি সে ছবিটা ক্লেম করতে পারে। কিন্তু টিনটোরেটো তার হাতে চলে যাচ্ছে এটা ভাবতে ভাল লাগে না মিস্টার মিত্র।

ফেলুদা—এটা কেন বলছেন ?

ভূদেব—চন্দ্রর ছেলের কথা তো আমি জানি। চন্দ্রকে কত দুঃখ দিয়েছে তাও জানি। এসব কথা তো নিয়োগীরা জানবে না, কারণ চন্দ্র আমাকে ছাড়া আর কাউকে বলেনি। পরের দিকে অবিশ্যি ছেলের কথা আর বলতই না, কিন্তু গোড়ায় বলেছে। ছেলে মুসোলিনির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসোলিনি তখন ইটালির একচ্ছত্র অধিপতি। বেশির ভাগ ইটালিয়ানই তাকে পুজো করে। কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী—শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সংগীতকার—ছিলেন মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী। চন্দ্র ছিল এদের একজন। কিন্তু তার ছেলেই শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। তার এক বছর আগে কার্লা মারা গেছে ক্যানসারে। এই দুই ট্র্যাজিডির ধাক্কা চন্দ্র সইতে পারেনি। তাই সে দেশে ফিরে আসে। ছেলের সঙ্গে সে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। ভাল কথা, ছেলেকে দেখলে কেমন ? তার তো ষাটের কাছাকাছি বয়স হবার কথা।

ফেলুদা—বাষট্টি। তবে এমনিতে শক্ত আছেন বেশ। কথাবার্তা বলেন না বললেই চলে।

ভূদেব—বলার মুখ নেই বলেই বলে না।...স্ত্রীর মৃত্যু ও ছেলের বিপথে যাওয়ার দুঃখ চন্দ্র কোনওদিন ভুলতে পারেনি। শেষে তাই তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই নিয়ে অবশ্য তার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটিও হয়। তাকে বলি—তোমার মধ্যে এত ট্যালেন্ট আছে, এখনও কাজের ক্ষমতা আছে, তুমি

বিবাগী হবে কেন ? কিন্তু সে আমার কথা শোনেনি ।

ফেলুদা—আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন কি ?

ভূদেব—মাঝে মাঝে একটা করে পোস্টকার্ড লিখত, তবে অনেকদিন আর খবর পাইনি ।

ফেলুদা—শেষ কবে পেয়েছিলেন মনে আছে ?

ভূদেব—দাঁড়াও, এই বাক্সের মধ্যেই আছে তার চিঠিগুলো । হ্যাঁ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ । হৃষীকেশ থেকে লিখেছে এটা ।

ফেলুদা—অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে । তার মানে তো আইনের চোখে তিনি এখনও জীবিত ।

ভূদেব—সত্যিই তো ! এটা তো আমার খেয়াল হয়নি ।

ফেলুদা—তার মানে রুদ্রশেখর এখনও তার সম্পত্তি ক্লেম করতে পারেন না ।

পরদিন ভূদেব সিং গাড়িতে ঘুরিয়ে ভগওয়ানগড়ের যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখিয়ে দিলেন আমাদের । গড়ের ভগ্নস্তূপ, ভবানীর মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ গার্ডেনস, পিথৌরি লেক, জঙ্গলে হরিণের পাল—কিছুই বাদ গেল না ।

কথাই ছিল এবার শেভরোলে গাড়ি আমাদের একেবারে নাগপুর অবধি পৌঁছে দেবে, যাতে আমাদের আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঝক্কি পোয়াতে না হয় । গাড়িতে ওঠার আগে ভূদেব সিং ফেলুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন—

'সি দ্যাট দ্য টিনটোরেটো ডাজন্‌ট ফল ইনটু দ্য রং হ্যান্ডস ।

মিঃ নাগপালকে আগেই বলা ছিল; তিনি ওই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে ফেলুদাকে দিলেন, ফেলুদা সেটা সযত্নে ব্যাগে পুরে রাখল ।

পরদিন এগারোটায় বাড়ি ফিরে এক ঘন্টার মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর থেকে নবকুমারবাবুর টেলিফোন এল ।

'চট করে চলে আসুন মশাই । এখানে গণ্ডগোল ।'

আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

'ছবিটা কি লোপাট হয়ে গেল নাকি মশাই?' যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'সেইটেই তো ভয় পাচ্ছি।'

'অ্যাদ্দিন ছবির ব্যাপারটায় ঠিক ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলুম না, জানেন। এখন বইটা পড়ে, আর ভূদেব রাজার সঙ্গে কথা বলে কেমন যেন একটা নাড়ীর যোগ অনুভব করছি ওই টিরিনটোরোর সঙ্গে।'

ফেলুদা গম্ভীর, লালমোহনবাবুর ভুল শুধরোনোর চেষ্টাও করল না।

এবারে হরিপদবাবু স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও চড়িয়ে রাখায় আমরা ঠিক দুঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম।

নিয়োগীবাড়িতে এই তিনদিনে যেমন কিছু নতুন লোক এসেছে—নবকুমারবাবুর স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে—তেমনি কিছু লোক চলেও গেছে।

চন্দ্রশেখরের ছেলে রুদ্রশেখর আজ ভোরে চলে গেছেন কলকাতা।

আর বঙ্কিমবাবুও নেই।

বঙ্কিমবাবু খুন হয়েছেন।

কোনও ভারী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়, আর তার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেশ বেলা পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিস না পেয়ে খোঁজাখুঁজি পড়ে যায়। শেষে চাকর গোবিন্দ স্টুডিওতে গিয়ে দেখে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে মেঝেতে, মাথার চার পাশে রক্ত। পুলিশের ডাক্তার দেখে বলেছে মৃত্যু হয়েছে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে। সময়—আন্দাজ রাত তিনটে থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে।

নবকুমার বললেন, 'আপনাকে ফোনে পাওয়া গেল না, তাই বাধ্য হয়েই পুলিশে খবর দিতে হল।'

'তা ভালই করেছেন,' বলল ফেলুদা—'কিন্তু কথা হচ্ছে—ছবিটা

আছে কি ?'

'সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আততায়ী যে কে সেটা আন্দাজ করা তো খুব মুশকিল নয় ; ভদ্রলোকের হাবভাব এমনিতেই সন্দেহজনক মনে হত। বোঝাই যাচ্ছিল টাকার দরকার, অথচ আইনের পথে যেতে গেলে সম্পত্তি পেতে অন্তত ছ'সাত মাস তো লাগতই—'

'আরও অনেক বেশি,' বলল ফেলুদা, 'পাঁচ বছর আগেও ভূদেব সিং চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন।'

'তাই বুঝি ? তা হলে তো ভদ্রলোকের কোনও লিগ্যাল রাইটই ছিল না।'

'তাতে অবিশ্যি চুরি করতে কোনও বাধা নেই।'

'কিন্তু চুরি হয়নি ! ছবি যেখানে ছিল সেখানেই আছে।'

'তাজ্জব ব্যাপার,' বলল ফেলুদা। 'এ জাতীয় ঘটনা সমস্ত হিসেব-টিসেব গুলিয়ে দেয়। পুলিশে কী বলে ?'

'এক দফা জেরা হয়ে গেছে সকালেই। আসল কাজ তো হল, যে চলে গেছে তাকে খুঁজে পাওয়া। কারণ, কাল রাত্রে এ বাড়িতে ছিলাম আমি, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে, বাবা, মা, রবীনবাবু আর চাকর-বাকর।'

'রবীনবাবু ভদ্রলোকটি— ?'

'উনি প্রায় রোজ রাত দেড়টা-দুটো অবধি ওঁর ঘরে কাজ করেন। চাকরেরা ওঁর ঘরে বাতি জ্বলতে দেখেছে। তাই সকাল আটটার আগে বড় একটা ঘুম থেকে ওঠেন না। আটটায় ওঁর ঘরে চা দেয় গোবিন্দ। আজও দিয়েছে। রুদ্রশেখরও যে খুব সকালে উঠতেন তা নয়, তবে আজ সাড়ে ছ'টার মধ্যে উনি চলে গেছেন। উনি আর ওঁর সঙ্গে একজন আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট ?'

'আপনি যেদিন গেলেন সেদিনই এসেছেন কলকাতা থেকে। রুদ্রশেখরই গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। স্টুডিওর জিনিসপত্রের একটা ভ্যালুয়েশন করার জন্য। সব বিক্রি করে দেবেন বলে ভাবছিলেন বোধহয়।'

'ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করে যাননি ?'

'উঁহু। আমি তো জানি কলকাতায় যাচ্ছেন উকিল-টুকিলের সঙ্গে কথা বলতে ; কাজ হলেই আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু এখন তো আর মনে হয় না ফিরবেন বলে।'

আমরা এক তলার বৈঠকখানায় বসে কথা বলছিলাম। নবকুমারবাবু বোধহয় আমাদের দোতলায় নিয়ে যাবেন বলে সোফা ছেড়ে উঠতেই ফেলুদা বলল—

'রুদ্রশেখর যে ঘরটায় থাকতেন সেটা একবার দেখতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়ই। এই তো পাশেই।'

ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজা একটা দিয়ে আমরা মেঝেতে চীনে মাটির টুকরো বসানো একটা শোবার ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই মনে হল যেন উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পড়েছি। এমন খাট, খাটের উপর মশারি টাঙানোর এমন ব্যবস্থা, এমন ড্রেসিং টেবিল, এমন রাইটিং ডেস্ক, কাপড় রাখার এমন আলনা—কোনওটাই আর আজকের দিনে দেখা যায় না। নবকুমারবাবু বললেন, এ ঘরটাতে আগে চন্দ্রশেখরের ভাই সূর্যশেখর—অর্থাৎ নবকুমারবাবুর ঠাকুরদা—থাকতেন। 'ঠাকুরদাদা শেষের দিকে আর দোতলায় উঠতে পারতেন না। অথচ রোজ সকালে-বিকেলে মন্দিরে যাওয়া চাই, তাই একতলাতেই বসবাস করতেন।'

'বিছানা করা হয়নি দেখছি,' বলল ফেলুদা। সত্যি, মশারিটা পর্যন্ত এখনও ঝুলে রয়েছে।

'সকাল থেকেই বাড়িতে যা হট্টগোল, চাকরবাকররা সব কাজকর্ম ভুলে গেছে আর কী !'

'পাশের ঘরটায় কে থাকে ?'

'ওটায় থাকতেন বঙ্কিমবাবু।'

দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, কিন্তু সেটা বন্ধ। ফেলুদা রুদ্রশেখরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকল বঙ্কিমবাবুর ঘরে।

এঘরে স্বভাবতই জিনিসপত্র অনেক বেশি। আলনায়

জামা-কাপড়, তার নীচে চটি-জুতো, টেবিলের উপর কিছু বই, কলম, প্যাড, একটা রেমিংটন টাইপরাইটার। দেয়ালে টাঙানো কিছু ফোটোগ্রাফ, তার মধ্যে একটা একজন সন্ন্যাসী-গোছের ভদ্রলোকের। এ ঘরেও বিছানা করা হয়নি। মশারি ঝুলে রয়েছে।

ফেলুদা হঠাৎ খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে মশারিটা তুলে ধরল, তার দৃষ্টি বালিশের দিকে।

বালিশটা তুলতেই তার তলা থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল।

একটা ছোট্ট নীল বাক্সের মধ্যে একটা ট্র্যাভেলিং অ্যালার্ম ক্লক।

'এ জিনিস তো আমরাও এককালে করতুম মশাই' বললেন লালমোহনবাবু। 'আমার পাশের ঘরে ছোটকাকা শুতেন ; পরীক্ষার সময় অ্যালার্ম দিয়ে ভোরে উঠতুম, আর ওঁর যাতে ঘুম না ভাঙে তাই ঘড়িটা রাখতুম বালিশের নীচে।'

'হুঁ' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু ইনি অ্যালার্ম দিয়েছিলেন সাড়ে তিনটের।'

'সাড়ে তিনটে !'

নবকুমারবাবু অবাক।

'এবং সেই সময়ই বোধহয় গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরের স্টুডিওতে। মনে হয় ভয়ানক কিছু একটা সন্দেহ করছিলেন। সেই সন্দেহের কথাটাই বোধহয় আমায় বলতে চেয়েছিলেন গতবার।'

*

এই খুনের আবহাওয়াতেও লালমোহনবাবুর হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কারণ আর কিছুই না ; নবকুমারবাবুর এগারো বছরের ছেলে আর ন' বছরের মেয়ে দুজনেই বেরিয়ে গেল জটায়ুর অন্ধ ভক্ত। ভদ্রলোককে বৈঠকখানার সোফায় ফেলে দুজনেই চেপে ধরল—একটা গল্প বলুন ! একটা গল্প বলুন !

লালমোহনবাবু খুব স্পিডে উপন্যাস লেখেন ঠিকই, তাই বলে কেউ চেপে ধরলেই যে টুথপেস্টের টিউবের মতো গল গল করে নতুন গপ্প বেরিয়ে যাবে এমন নয়। 'আচ্ছা বলছি' বলে পর পর তিনবার খানিকদূর এগোতেই ভাই বোনে চেঁচিয়ে ওঠে—'আরে, এ তো সাহারায় শিহরন!' 'আরে, এ তো হনডুরাসে হাহাকার!' এ তো অমুক, এ তো তমুক...

শেষে ভদ্রলোকের কী অবস্থা হল জানি না, কারণ ফেলুদা নবকুমারবাবুকে বলল যে একবার খুনের জায়গাটা দেখবে।

লালমোহনবাবুকে দোতলায় রেখে আমরা তিনজনে গেলাম চন্দ্রশেখরের স্টুডিওতে।

প্রথমেই যেটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ফেলুদা থেমে গেল সেটা হল ঘরের মাঝখানের টেবিলটা।

'এর ওপর একটা ব্রঞ্জের মূর্তি ছিল না—একটা ঘোড়সওয়ার?'

'ঠিক বলেছেন। ওটা ইন্সপেক্টর মণ্ডল নিয়ে গেলেন আঙুলের ছাপ নেওয়ার জন্য। ওঁর ধারণা ওটা দিয়েই খুনটা করা হয়েছে।'

'হুঁ...'

এবার আমরা তিনজনেই দক্ষিণের দেয়ালের কোণের ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আজ যেন যীশুর জৌলুস আরও বেড়েছে। কেউ পরিষ্কার করেছে কি ছবিটাকে?

ফেলুদা এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে ছবিটার একেবারে কাছে দাঁড়াল। তারপর মিনিটখানেক সেটার দিকে চেয়ে থেকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল।

'ইটালিতে রেনেসাঁসের যুগে মিনি-শ্যামাপোকা ছিল কি?'

'মিনি-শ্যামাপোকা?' নবকুমারবাবুর চোখ কপালে উঠে গেছে।

'আজকাল তিনরকম শ্যামাপোকা হয়েছে জানেন তো? মিনি, মিডি আর ম্যাক্সি। ম্যাক্সিগুলো সাদা, সবুজ নয়। মিনিগুলো রেগুলার কামড়ায়। সবুজ মিডিগুলো অবিশ্যি চিরকালই ছিল। কিন্তু ষড়বিংশ শতাব্দীর ভেনিসে ছিল কি না সে বিষয় আমার সন্দেহ আছে।

'ভেনিসে না হোক, এই বৈকুণ্ঠপুরে তো আছেই। কাল রাত্রেও হয়েছিল।'

'তা হলে দুটো প্রশ্ন করতে হয়,' বলল ফেলুদা, 'প্রাচীন পেন্টিং-এর শুকনো রঙে সে পোকা আটকায় কী করে, আর যে ঘরে বাতি জ্বলে না সে ঘরে পোকা আসে কী করে।'

'তার মানে— ?'

'তার মানে এ ছবি আসল নয়, মিস্টার নিয়োগী। আসল ছবিতে যীশুর কপালে শ্যামাপোকা ছিল না, আর ছবির রংও এত উজ্জ্বল ছিল না। এ ছবি গত দু'এক দিনে আঁকা হয়েছে মূল থেকে কপি করে। কাজটা রাত্তিরে মোমবাতি বা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে হয়েছে, আর সেই সময় একটি শ্যামাপোকা ঢুকে যীশুর কপালের কাঁচা রঙে আটকে গেছে।'

নবকুমারবাবুর মুখ ফ্যাকাশে।

'তা হলে আসল ছবি— ?'

'আসল ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে মিস্টার নিয়োগী। খুব সম্ভবত আজ ভোরেই। এবং কে সরিয়েছে সেটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

॥ ৮ ॥

রুদ্রশেখরের কথা (২)

'গুড আফটারনুন, মিস্টার নিয়োগী।'

'গুড আফটারনুন।'

রুদ্রশেখর এগিয়ে এসে সোমানির বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মাঝখানে একটা প্রশস্ত আধুনিক ডেস্ক। আপিসঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও চারিদিক থেকে বন্ধ। তাই শহরের কোনও শব্দই এখানে পৌঁছায় না। পাশের শেলফের উপর ঘড়িটা ইলেকট্রনিক, তাই সেটাও নিঃশব্দ।

'আপনি কি ছবিটা পেয়েছেন ?' প্রশ্ন করলেন হীরালাল সোমানি।

রুদ্রশেখর নিয়োগী কোনও জবাব দেওয়ার পরিবর্তে বললেন, 'আপনি তো আরেকজনের হয়ে ছবিটা কিনতে চান, তাই না ?'

হীরালাল একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন রুদ্রশেখরের দিকে, ভাবটা যেন তিনি প্রশ্নটা শুনতেই পাননি।

'আমি সেই ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানাটা চাইতে এসেছি,' বললেন রুদ্রশেখর নিয়োগী।

হীরালাল ঠিক সেই ভাবেই চেয়ে থেকে বললেন, 'আমি আবার জিজ্ঞেস করছি মিঃ নিয়োগী—ছবিটা কি এখন আপনার হাতে ?'

'সেটা বলতে আমি বাধ্য নই।'

'তা হলে আমিও ইনফরমেশন দিতে বাধ্য নই।'

'এবার দেবেন কি ?'

রুদ্রশেখর বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে এখন একটি রিভলভার, সোজা হীরালালের দিকে তাগ করা।

'বলুন মিঃ সোমানি। আমার জানা দরকার। আমি আজই সে লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

টেবিলের তলায় সোমানি যে তাঁর বাঁ হাঁটু দিয়ে একটি বোতামে চাপ দিয়েছেন, এবং দেওয়ামাত্র রুদ্রশেখরের পিছনের একটি ঘরের দরজা খুলে গিয়ে দুটি লোক বেরিয়ে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে, সেটা তাঁর জানার উপায় ছিল না।

পরমুহূর্তেই রুদ্রশেখর দেখলেন যে তিনি মোক্ষম প্যাঁচে পড়েছেন।

একটি লোক তার ডান হাতটা ধরে তাতে মোচড় দেওয়াতে রিভলভারটা এখন তারই হাতে চলে গেছে, এবং সেটি এখন রুদ্রশেখরের দিকেই তাগ করা।

'পালাবার কোনও চেষ্টায় ফল হবে না মিঃ নিয়োগী। এই দুজন লোক আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে আসবে। আশা করি আপনি মূর্খের মতো বাধা দেবেন না।'

বিশ মিনিটের মধ্যে লোক দুজন সমেত রুদ্রশেখর একটি ফিয়াট গাড়িতে করে সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে পৌঁছে গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়—দুটি লোককে সঙ্গে

নিয়ে রুদ্রশেখর তাঁর ঘরে চলেছেন। দুজনের একজনের হাত কোটের পকেটে ঠিকই, কিন্তু সে হাতে যে রিভলভার ধরা সেটা বাইরের লোকে বুঝবে কী করে?

উনিশ নম্বর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার পর রিভলভার বেরিয়ে এল কোটের পকেট থেকে। রুদ্রশেখর বুঝলেন কোনও আশা নেই, তাঁকে আদেশ মানতেই হবে।

সুটকেস বিছানার উপর রেখে চাবি দিয়ে ডালা খুলে একটা খবরের কাগজে মোড়া পাতলা বোর্ড বার করে আনলেন চন্দ্রশেখর।

যে লোকটির হাতে রিভলভার নেই সে মোড়কটা ছিনিয়ে নিয়ে খবরের কাগজের র‍্যাপিং খুলতেই বেরিয়ে পড়ল যীশু খ্রিষ্টের ছবি।

লোকটা ছবিটা আবার কাগজে মুড়ে পকেট থেকে প্রথমে একটি সিল্কের রুমাল বার করে তাই দিয়ে রুদ্রশেখরের মুখ বাঁধল।

তারপর একটি মোক্ষম ঘুঁষিতে তাকে অজ্ঞান করে মেঝেতে ফেলে, নাইলনের দড়ির সাহায্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সেইভাবেই ফেলে রেখে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে যীশু খ্রিষ্টের ছবি হীরালাল সোমানির কাছে পৌঁছে গেল। সোমানি ছবিটার উপর চোখ বুলিয়ে দুটির একটি লোকের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা ভাল করে প্যাক করো।'

তারপর অন্য লোকটিকে বললেন, 'একটা জরুরি টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি। এখুনি পার্ক স্ট্রিট পোস্টাপিসে চলে যাও। টেলিগ্রাম আজকের মধ্যেই যাওয়া চাই।'

সোমানি টেলিগ্রাম লিখলেন—

মিঃ ওয়লটার ক্রিকোরিয়ান
ক্রিকোরিয়ান এন্টারপ্রাইজেজ
১৪ হেনেসি স্ট্রিট
হংকং
অ্যারাইভিং স্যাটারডে নাইনথ অক্টোবর
—সোমানি

॥ ৯ ॥

সন্ধের দিকে ইন্সপেক্টর মণ্ডল এলেন। মহাদেব মণ্ডল। নামটা শুনলেই যে একটা গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা মনে হয়, মোটেই সেরকম নয়। বরং একেবারেই উলটো। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন, 'নামের তিনভাগের দু'ভাগই যখন রোগা, তখন এটাই স্বাভাবিক, যদিও সচরাচর এটা হয় না।' এখানে অবিশ্যি নাম বলতে লালমোহনবাবু 'দারোগা' বোঝাতে চেয়েছিলেন।

দেখলাম ফেলুদার নাম যথেষ্ট জানা আছে ভদ্রলোকের।

'আপনি তো খড়্গপুরের সেই জোড়া খুনের রহস্যটা সমাধান করেছিলেন, তাই না? সেভেনটি এইটে?'

যমজ ভাইয়ের একজনকে মারার কথা, কোনও রিস্ক না নিয়ে দুজনকেই খুন করেছিল এক ভাড়াটে গুণ্ডা। ফেলুদার খুব নামডাক হয়েছিল কেসটাতে।

ফেলুদা বলল, 'বর্তমান খুনের ব্যাপারটা কী বুঝেছেন?'

'খুনি তো যিনি ভেগেছেন তিনিই,' বললেন ইন্সপেক্টর মণ্ডল। 'এ বিষয়ে তো কোনও ডাউট নেই, কিন্তু কথাটা হচ্ছে মোটিভ নিয়ে।'

'একটা মহামূল্য জিনিস নিয়ে খুনি ভেগেছেন সেটা জানেন কি?'

'এটা আবার কী ব্যাপার?'

'এটা আবিষ্কারের ব্যাপারে আমার সামান্য অবদান আছে।'

'জিনিসটা কী?'

'একটা ছবি। স্টুডিওতেই ছিল। সেই ছবিটা নেবার সময় বঙ্কিমবাবু গিয়ে পড়লে পরে খুনটা অসম্ভব নয়।'

'তা তো বটেই।'

'আপনি সাংবাদিক ভদ্রলোকটিকে জেরা করেছেন?'

'করেছি বইকী। সত্যি বলতে কী, দু'দুটি সম্পূর্ণ অচেনা লোক একই সঙ্গে বাড়িতে এসে রয়েছে এটা খুবই খটকার ব্যাপার। ওঁর ওপরেও যে আমার সন্দেহ পড়েনি তা না, তবে জেরা করে মনে

হল লোকটি বেশ স্ট্রেট-ফরওয়ার্ড, কথাবার্তাও পরিষ্কার। তা ছাড়া, যে মূর্তিটা মাথায় মেরে খুন করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস, তাতে স্পষ্ট আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে এনার আঙুলের ছাপ মেলে না।'

'রুদ্রশেখরবাবুর ট্যাক্সির খোঁজটা করেছেন? ডব্লু বি টি ফোর ওয়ান ডবল্ টু?'

'বা-বা, আপনার তো খুব মেমারি!—খোঁজ করা হয়েছে বই কী। পাওয়া গেছে সে ট্যাক্সি। রুদ্রশেখরকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে সদর স্ট্রিটে একটা হোটেলে নামায়। সে হোটেলে খোঁজ করে ভদ্রলোককে পাওয়া যায়নি। অন্য হোটেলগুলোতেও নাম এবং চেহারার বর্ণনা দিয়ে খোঁজ করা হচ্ছে, কিন্তু এখনও কোনও খবর আসেনি। মহামূল্য ছবি যদি নিয়ে থাকে তা হলে তো সেটাকে বিক্রি করতে হবে। সে কাজটা কলকাতায় হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'সে ব্যাপারে পুরোপুরি ভরসা করা যায় বলে মনে হয় না।'

'আপনি বলছেন শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

'দেশ ছেড়েও যেতে পারে।'

'বলেন কী!'

'আমার যদ্দুর ধারণা আজই হংকং-এ একটা ফ্লাইট আছে।'

'হংকং! এ যে আন্তর্জাতিক পুলিশের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে মশাই। হংকং চলে গেলে আর মহাদেব মণ্ডল কী করতে পারে বলুন!'

'হংকং যে গেছে এমন কোনও কথা নেই। তবে আপনি না পারলেও আমাকে একটা চেষ্টা দেখতেই হবে।'

'আপনি হংকং যাবেন?' বেশ কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন নবকুমারবাবু।

'আরও দু'একটা অনুসন্ধান করে নিই,' বলল ফেলুদা, 'তারপর ডিসাইড করব।'

'যদি যাওয়া স্থির করেন তো আমাকে জানাবেন। ওখানে একটি বাঙালি ব্যবসাদারের সঙ্গে খুব আলাপ আছে আমার। পূর্ণেন্দু

পাল। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। ভারতীয় হ্যান্ডিক্রাফ্‌টসের দোকান আছে। সিন্ধি-পাঞ্জাবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন্দ করছে না।'

'বেশ তো। আমি গেলে তাঁর ঠিকানা নিয়ে নেব আপনার কাছে।'

'ঠিকানা কেন ? আমি তাকে কেব্‌ল করে জানিয়ে দেব, সে আপনাদের এসে মিট করবে এয়ারপোর্টে। প্রয়োজনে তার ফ্ল্যাটেই থাকতে পারেন আপনারা।'

'ঠিক আছে, ঘুরে আসুন,' ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন মিঃ মণ্ডল, 'যদি পারেন আমার জন্য কিছু বিলিতি ব্লেড নিয়ে আসবেন তো মশাই। আমার দাড়ি বড় কড়া। দিশি ব্লেডে সানায় না।'

মিঃ মণ্ডল বিদায় নিলেন।

'যাক্, তা হলে শেষমেষ আমাদের পাস্‌পোর্টটা কাজে লাগল,' আমরা তিনজনে আমাদের ঘরে গিয়ে বসার পর বললেন লালমোহনবাবু। দু বছর আগে বম্বের প্রেসিডেন্ট হোটেলের একজন আরব বাসিন্দা খুন হয়। ফেলুদার বন্ধু বম্বের ইনস্পেক্টর পটবর্ধন মারফত কেসটা ফেলুদার হাতে আসে। সেই সূত্রেই আমাদের আবু ধাবি যাবার কথা হয়েছিল। সব ঠিক, পাসপোর্ট-টাসপোর্ট রেডি, এমন সময় খবর আসে খুনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।—'কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, তপেশ ভাই!' আক্ষেপ করে বলেছিলেন লালমোহনবাবু। 'কাঠমাণ্ডু ফরেন কান্ট্রি ঠিকই, কিন্তু পাসপোর্ট দেখিয়ে ফরেনে যাবার একটা আলাদা ইয়ে আছে।'

সেই ইয়েটা এবার হলেও হতে পারে।

লালমোহনবাবু হংকং-এর ক্রাইম রেট সম্বন্ধে কী একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজার বাইরে একটা মৃদু কাশির শব্দ পেলাম।

'আসতে পারি ?'

সাংবাদিক রবীন চৌধুরীর গলা।

ফেলুদা 'আসুন' বলাতে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন। আমার

আবার মনে হল এঁকে যেন আগে দেখছি, কিন্তু কোথায় সেটা বুঝতে পারলাম না।

ফেলুদা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে।

'আপনি শুনলাম ডিটেকটিভ ?' বসে বললেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটাই আমার পেশা।'

'জীবনী লেখার কাজটাও অনেক সময় প্রায় গোয়েন্দাগিরির চেহারা নেয়। এক-একটা নতুন তথ্য এক-একটা ক্লু-এর মতো নতুন দিক খুলে দেয়।'

'আপনি চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে নতুন কোনও তথ্য পেলেন নাকি ?'

'স্টুডিও থেকে চন্দ্রশেখরের দুটো বাক্স আমি আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে বেশির ভাগই চিঠি, দলিল, ক্যাশমেমো, ক্যাটালগ ইত্যাদি, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু খবরের কাগজের কাটিং-ও ছিল। তার মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দেখুন।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খবরের কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। তার একটা অংশ লাল পেনসিল দিয়ে মার্ক করা। তাতে লেখা—

La moglie Vittoria con in figlio Rajsekhar annuncio con profondo dolore la scomparsa del loro Rudrasekhar Neogi.

—Roma, Juli 27, 1955

'এ তো দেখছি ইটালিয়ান ভাষা,' বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি ডিকশনারি দেখে মানে করেছি। এতে বলছে—স্ত্রী ভিত্তোরিয়া ও ছেলে রাজশেখর গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে—"লা স্কমপারসা দেল লোরো রুদ্রশেখর নিয়োগী"—অর্থাৎ, দ্য লস্ অফ দেয়ার রুদ্রশেখর নিয়োগী।'

'মৃত্যু সংবাদ ?' ভুরু কুঁচকে বলল ফেলুদা।

'রুদ্রশেখর ডেড ?' চোখ কপালে তুলে বললেন জটায়ু।

'তা তো বটেই। এবং তিনি মারা যান ১৯৫৫ সালের সাতাশে জুলাই। তার সঙ্গে এটাও জানা যাচ্ছে যে তিনি বিয়ে করেছিলেন, এবং রাজশেখর নামে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল।'

'সর্বনাশ! এ যে বিস্ফোরণ!' ফেলুদা খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আমার নিজেরও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এই ভাবে হাতে-নাতে প্রমাণ পাওয়া যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। আপনি কবে পেলেন এটা?'

'আজই দুপুরে।'

'ইস্—লোকটা সটকে পড়ল। কী মারাত্মক ধাপ্পাবাজী!'

'আমি কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, কারণ আমি কোনও প্রশ্ন করলে হয় উনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, না হয় ভুল জবাব দিচ্ছিলেন। শেষে অবিশ্যি প্রশ্ন করা বন্ধই করে দিয়েছিলাম।'

'যাক্‌গে। এই নিয়ে এঁদের এখন কিছু জানিয়ে কোনও লাভ নেই। এখন লোকটাকে ধরা নিয়ে কথা। তারপর অবিশ্যি শাস্তি যেটা দরকার সেটা হবে। আপনি সত্যিই গোয়েন্দার কাজ করেছেন। অনেক ধন্যবাদ।'

রবীনবাবু চলে গেলেন। আমাদের অনেক উপকার করে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তাও ওঁর সম্বন্ধে খট্‌কা লাগছে কেন?

ওঁর শার্টের এক পাশে রক্তের দাগ কেন?

ফেলুদাকে বললাম।

লালমোহনবাবুও দেখেছেন দাগটা, এবং বললেন, 'হাইলি সাস্‌পিশাস।'

ফেলুদা শুধু গম্ভীরভাবে একটা কথাই বলল, 'দেখেছি।'

*

আমরা সন্ধে সাতটায় বৈকুণ্ঠপুর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রওনা দেবার ঠিক আগে নবকুমারবাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার করলেন। ফেলুদার হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এই নিন মশাই, সামনে আপনাদের অনেক খরচ আছে। এতে কিছু আগাম দিয়ে দিলাম। আমাদেরই হয়ে আপনি তদন্তটা করছেন এ ব্যাপারে আপনার মনে যেন কোনও দ্বিধা না থাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আর আমি পূর্ণেন্দুকে কাল একটা টেলিগ্রাম করে দেব। আপনি যদি যান তা হলে ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে এই ঠিকানায় ওকে একটা তার করে দেবেন। ব্যস্, আর কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

খামে ছিল পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক।

'জাল-রুদ্রশেখরকে খোঁজার কী করবেন?' ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'ওঁর পাত্তা পাবার আশা কম, যদি বা ভদ্রলোক হংকং গিয়ে থাকেন।'

'গেছে কি না-গেছে সেটা জানছেন কী করে?'

'জানার কোনও উপায় নেই। তাকে দেশের বাইরে যেতে হলে তার নিজের নামে যেতে হবে; তার পাসপোর্টও হবে নিজের নামে। নবকুমারবাবুর বাবাকে যে পাসপোর্ট দেখিয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটা জাল ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের পক্ষে সেটা ধরার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এয়ারপোর্টে তো আর সে ধাপ্পা চলবে না তার আসল নামটা যখন আমরা জানি না, তখন প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে কোনও লাভ নেই।'

'তা হলে?'

'একটা ব্যাপার হতে পারে। আমার মনে হয় সেই আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা নিতে জাল-রুদ্রশেখরকে একবার হীরালাল সোমানির কাছে যেতেই হবে। সোমানি সম্বন্ধে যা শুনলাম, এবং তাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় না সে নাম ঠিকানা দেবে। এত বড় দাঁও সে হাতছাড়া করবে না। ছলেবলে কৌশলে সে জাল-রুদ্রশেখরের হাত থেকে ছবিটা আদায় করবে। তারপর সেটা নিয়ে নিজেই হংকং যাবে সাহেবকে দিতে।'

'তা হলে তো সোমানির নাম খুঁজতে হবে প্যাসেঞ্জার লিস্টে।'

'তা তো বটেই। ওটার উপরই তো নির্ভর করছে আমাদের যাওয়া না-যাওয়া।'

লালমোহনবাবুর চট্ করে চোখ কপালে তোলা থেকে বুঝলাম উনি একটা ক্ষুইক্ প্রার্থনা সেরে নিলেন যাতে হংকং যাওয়া হয়।

যদি যাওয়া হয় তা হলে চীনে ভাষা শেখার প্রয়োজন হবে কি না জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, 'চীনে ভাষায় অক্ষর কটা আছে জানেন ?'

'কটা ?'

'দশ হাজার। আর আপনার জিভে প্লাস্টিক সার্জারি না করলে চীনে উচ্চারণ বেরোবে না মুখ দিয়ে। বুঝেছেন ?'

'বুঝলাম।'

পরদিন সকালে আপিস খোলার টাইম থেকেই ফেলুদা কাজে লেগে গেল।

আজকাল শুধু এয়ার ইন্ডিয়া আর থাই এয়ারওয়েজে হংকং যাওয়া যায় কলকাতা থেকে। এয়ার ইন্ডিয়া যায় সপ্তাহে একদিন—মঙ্গলবার, আর থাই এয়ারওয়েজ যায় সপ্তাহে তিনদিন—সোম, বুধ আর শনি—কিন্তু শুধু ব্যাংকক্ পর্যন্ত ; সেখান থেকে অন্য প্লেন নিতে হয়।

আজ শনিবার, তাই ফেলুদা প্রথমে থাই এয়ারওয়েজেই ফোন করল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্যাসেঞ্জার লিস্টের খবর জানা গেল।

আজই সকালে হীরালাল সোমানি হংকং চলে গেছেন।

আমরা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারি আগামী মঙ্গলবার, অর্থাৎ তরশু।

তার মানে হংকং-এ তিনটে দিন হাতে পেয়ে যাচ্ছে হীরালাল সোমানি।

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে আমরা যতদিনে পৌঁছাব ততদিনে ছবি সোমানির হাত থেকে সাহেবের হাতে চলে যাবে।

তা হলে আমাদের গিয়ে কোনও লাভ আছে কি ?

কথাগুলো অবিশ্যি ফেলুদাই বলছিল আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—

'টিনটোরেটোর ইটালিয়ান উচ্চারণটা কী মশাই ?'

'তিনতোরেত্তো,' বলল ফেলুদা।

'নামের গোড়াতেই যখন তিন, আর আমি যখন আছি আপনাদের

সঙ্গে, তখন মিশন সাক্‌সেসফুল না হয়ে যায় না।'

'যাবার ইচ্ছেটা আমারও ছিল পুরোমাত্রায়,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু যাবার এত বড় একটা জাস্টিফিকেশন খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না।'

॥ ১০ ॥

মঙ্গলবার ১২ই অক্টোবর রাত দশটায় এয়ার ইন্ডিয়ার ৩১৬নম্বর ফ্লাইটে আমাদের হংকং যাওয়া। বোইং ৭০৭ আর ৭৩৭-এ ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল এর আগে, এবার ৭৪৭ জাম্বো-জেটে চড়ে আগের সব ওড়াগুলো ছেলেমানুষি বলে মনে হল।

প্লেনের কাছে পৌঁছে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এত বড় জিনিসটা আকাশে উড়তে পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে যাত্রীর ভিড় দেখে সেটা আরও বেশি করে মনে হল। লালমোহনবাবু যে বলেছিলেন শুধু ইকনমি ক্লাসের যাত্রীতেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ভরে যাবে, সেটা অবিশ্যি বাড়াবাড়ি, কিন্তু একটা মাঝারি সাইজের সিনেমা হলের একতলাটা যে ভরে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

ফেলুদা গতকাল সকালেই পূর্ণেন্দুবাবুকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে। আমরা হংকং পৌঁছব আগামীকাল সকাল পৌনে আটটা হংকং টাইম—তার মানে ভারতবর্ষের চেয়ে আড়াই ঘণ্টা এগিয়ে।

যেখানে যাচ্ছি সেটা যদি নতুন জায়গা হয় তা হলে সেটা সম্বন্ধে পড়াশুনা করে নেওয়াটা ফেলুদার অভ্যাস, তাই ও গতকালই অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারি থেকে হংকং সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়েছে। আমি সেটা উলটে পালটে ছবিগুলো দেখে বুঝেছি হংকং-এর মতো এমন জমজমাট রংদার শহর খুব কমই আছে। লালমোহনবাবু উৎসাহে ফেটে পড়ছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে যাচ্ছেন সে-জায়গা সম্বন্ধে ধারণা এখনও মোটেই স্পষ্ট নয়। একবার জিজ্ঞেস করলেন চীনের প্রাচীরটা দেখে আসার কোনও সুযোগ হবে কি না। তাতে ফেলুদাকে বলতে হল যে চীনের প্রাচীর হচ্ছে

পিপ্‌লস রিপাবলিক অফ চায়নায়, পিকিং-এর কাছে, আর হংকং হল ব্রিটিশদের শহর। পিকিং হংকং থেকে অন্তত পাঁচশো মাইল।

আবহাওয়া ভাল থাকলে জাম্বো জেটের মতো এমন মোলায়েম ঝাঁকানিশূন্য ওড়া আর কোনও প্লেনে হয় না। মাঝরাত্রে ব্যাংককে নামে প্লেনটা, কিন্তু যাত্রীদের এয়ারপোর্টে নামতে দেবে না শুনে দিব্যি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম।

সকালে উঠে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি আমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি।

তারপর ক্রমে দেখা গেল জলের উপর উঁচিয়ে আছে কচ্ছপের খোলার মতো সব ছোট ছোট দ্বীপ। প্লেন নীচে নামছে বলে দ্বীপগুলো ক্রমে বড় হয়ে আসছে, আর বুঝতে পারছি তার অনেকগুলোই আসলে জলে-ডুবে-থাকা পাহাড়ের চুড়ো।

সেগুলোর উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলাম পাহাড়ের ঘন সবুজের উপর সাদার ছোপ।

আরও কাছে আসতে সেগুলো হয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো রোদে-চোখ-ঝলসানো বিশাল বিশাল হাইরাইজ।

হংকং-এ ল্যান্ডিং করতে হলে পাইলটের যথেষ্ট কেরামতির দরকার হয় সেটা আগেই শুনেছি। তিনদিকে সমুদ্রের মাঝখানে এক চিলতে ল্যান্ডিং স্ট্রিপ—হিসেবে একটু গণ্ডগোল হলে জলে ঝপাং, আর বেশি গণ্ডগোল হলে সামনের পাহাড়ের সঙ্গে দড়াম্।

কিন্তু এ দুটোর কোনওটাই হল না। মোক্ষম হিসেবে প্লেন গিয়ে নামল ঠিক যেখানে নামবার, থামল যেখানে থামবার, আর তারপর উলটো মুখে গিয়ে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর পাশে ঠিক এমন জায়গায় দাঁড়াল যে চাকার উপর দাঁড় করানো দুটো চারকোনা মুখ-ওয়ালা সুড়ঙ্গ এসে ইকনমি ক্লাস আর ফার্স্ট ক্লাসের দুটো দরজার মুখে বেমালুম ফিট করে গেল। ফলে আমাদের আর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হল না, সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর ভিতরে পৌঁছে গেলাম।

'হংকং-এর জবাব নেই,' বললেন চোখ-ছানাবড়া লালমোহনবাবু।

'এটা হংকং-এর একচেটে ব্যাপার নয় লালমোহনবাবু,' বলল ফেলুদা। 'ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর সব বড় এয়ারপোর্টেই প্লেন থেকে সোজা টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ ঢুকে যাবার এই ব্যবস্থা।'

হংকং-এ এক মাসের কম থাকলে ভিসা লাগে না, কাস্টমস-এও বিশেষ কড়াকড়ি নেই, তাই বিশ মিনিটের মধ্যে সব ল্যাঠা চুকে গেল। লাগেজ ছিল সামান্যই, তিন জনের তিনটে ছোট সুটকেস, আর কাঁধে একটা করে ছোট ব্যাগ। সব মাল আমাদের সঙ্গেই ছিল।

কাস্টমস থেকে বেরিয়ে এসে দেখি একটা জায়গায় লোকের ভিড়, তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা হাতলের মাথায় বোর্ডে লেখা 'পি. মিটার'। বুঝলাম ইনিই হচ্ছেন পূর্ণেন্দু পাল। পরস্পরের মুখ চেনা নেই বলে এই ব্যবস্থা।

'ওয়েলকাম টু হংকং', বলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন পাল মশাই। নবকুমারবাবুরই বয়স, অর্থাৎ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ-এর মধ্যেই। মাথায় টাক পড়ে গেছে, তবে দিব্যি চকচকে স্মার্ট চেহারা, আর গায়ের খয়েরি সুটটাও স্মার্ট আর চকচকে। ভদ্রলোক যে রোজগার ভালই করেন, আর এখানে দিব্যি ফুর্তিতে আছেন, সেটা আর বলে দিতে হয় না।

একটা গাঢ় নীল জার্মান ওপেল গাড়িতে গিয়ে উঠলাম আমরা। ভদ্রলোক নিজেই ড্রাইভ করেন। ফেলুদা ওঁর পাশে সামনে বসল, আমরা দুজন পিছনে। আমাদের গাড়ি রওনা দিয়ে দিল।

'এয়ারপোর্টটা কাউলূনে,' বললেন মিঃ পাল। 'আমার বাসস্থান এবং দোকান দুটোই হংকং-এ। কাজেই আমাদের বে পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।'

'আপনার উপর এভাবে ভর করার জন্য সত্যিই লজ্জিত,' বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক কথাটা উড়িয়েই দিলেন।

'কী বলছেন মশাই। এটুকু করব না? এখানে একজন বাঙালির মুখ দেখতে পেলে কীরকম লাগে তা কী করে বলে বোঝাব? ভারতীয় গিজগিজ করছে হংকং-এ, তবে বঙ্গসন্তান তো খুব বেশি

নেই !'

'আমাদের হোটেলের কোনও ব্যবস্থা—?'

'হয়েছে, তবে আগে চলুন তো আমার ফ্ল্যাটে। ইয়ে, আপনি তো ডিটেকটিভ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনও তদন্তের ব্যাপারে এসেছেন তো ?'

'হ্যাঁ। একদিনের মামলা। কাল রাত্রেই আবার এয়ার ইন্ডিয়াতেই ফিরে যাব।'

'কী ব্যাপার বলুন তো।'

'নবকুমারবাবুদের বাড়ি থেকে একটি মহামূল্য পেন্টিং চুরি হয়ে এখানে এসেছে। এনেছে সোমানি বলে এক ভদ্রলোক। হীরালাল সোমানি। সেটা চালান যাবে এক আর্মেনিয়ানের হাতে। জিনিসটার দাম বেশ কয়েক লাখ টাকা।'

'বলেন কী !'

'সেইটেকে উদ্ধার করতে হবে।'

'ওরে বাবা, এ তো ফিল্মের গপ্পো মশাই। তা এই আর্মেনিয়ানটি থাকেন কোথায় ?'

'এঁর আপিসের ঠিকানা আছে আমার কাছে।'

'সোমানি কি কলকাতার লোক ?'

'হ্যাঁ, এবং তিনি এসেছেন গত শনিবারের ফ্লাইটে। সে ছবি ইতিমধ্যে সাহেবের কাছে পৌঁছে গেছে।'

'সর্বনাশ ! তা হলে ?'

'তা হলেও সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে ব্যাপারটা বলতে হবে। চোরাই মাল ঘরে রাখা তার পক্ষেও নিরাপদ নয়। সেইটে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'হুঁ...'

পূর্ণেন্দুবাবুকে বেশ চিন্তিত বলে মনে হল।

লালমোহনবাবুকে একটু গম্ভীর দেখে গলা বেশি না তুলে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার।

'হংকংকে কি বিলেত বলা চলে ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

বললাম, 'তা কী করে বলবেন। বিলেত তো পশ্চিমে। এটা তো ফার ইস্ট। তবে বিলেতের যা ছবি দেখেছি তার সঙ্গে এর কোনও তফাত নেই।'

ফেলুদার কান খাড়া, কথাগুলো শুনে ফেলেছে। বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, লালমোহনবাবু। আপনার গড়পারের বন্ধুদের বলবেন হংকংকে বলা হয় প্রাচ্যের লন্ডন। তাতেই ওরা যথেষ্ট ইমপ্রেস্ড হবেন।'

'প্রাচ্যের লন্ডন! গুড।'

ভদ্রলোক 'প্রাচ্যের লন্ডন' বলে বিড়বিড় করছেন, এমন সময় আমাদের গাড়িটা গোঁৎ খেয়ে একটা চওড়া টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। সারবাঁধা হলদে বাতিতে সমস্ত টানেলের মধ্যে একটা কমলা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ণেন্দুবাবু বললেন আমরা নাকি জলের তলা দিয়ে চলেছি। আমাদের মাথার উপর হংকং বন্দর। আমরা বেরোব একেবারে হংকং-এর আলোয়।

লালমোহনবাবু বললেন, 'এমন দুর্দান্ত শহর, তার নামটা এমন হুপিং কাশির মতো হল কেন?'

'হংকং মানে কী জানেন তো?' জিজ্ঞেস করলেন পূর্ণেন্দুবাবু।

'সুবাসিত বন্দর,' বলল ফেলুদা। বুঝলাম ও খবরটা পেয়েছে ওই বইটা থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ এই পথে চলার পর টানেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম ছোট বড়-মাঝারি নানারকম জলযান সমেত পুরো বন্দরটা আমাদের পাশে বিছিয়ে রয়েছে, আর তারও পিছনে দূরে দেখা যাচ্ছে ফেলে আসা কাউলূন শহর।

আমাদের বাঁয়ে এখন বিশাল হাইরাইজ। কোনওটা আপিসে, কোনওটা হোটেল, প্রত্যেকটারই নীচে লোভনীয় জিনিসে ঠাসা দোকানের সারি। পরে বুঝেছিলাম পুরো হংকং শহরটা একটা অতিকায় ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মতো। এমন কোনও জিনিস নেই যা হংকং-এ পাওয়া যায় না।

কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে দুটো হাইরাইজের মাঝখান দিয়ে আমরা আরেকটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম।

এমন রাস্তা আমি কখনওই দেখিনি।

ফুটপাথ দিয়ে চলেছে কাতারে কাতারে লোক, আর রাস্তা দিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট গাড়ি আর ডবলডেকার-ট্রাম। ট্রামের মাথা থেকে ডাণ্ডা বেরিয়ে তারের সঙ্গে লাগানো, কিন্তু রাস্তায় লাইন বলে কিছু নেই। রাস্তার দুপাশে রয়েছে দোকানের পর দোকান। তাদের সাইনবোর্ডগুলো দোকানের গা থেকে বেরিয়ে আমাদের মাথার উপর এমন ভাবে ভিড় করে আছে যে আকাশ দেখা যায় না। চীনে ভাষা লেখা হয় ওপর থেকে নীচে, তাই সাইনবোর্ডগুলোও ওপর থেকে নীচে, তার একেকটা আট-দশ হাত লম্বা।

ট্র্যাফিক প্রচণ্ড, আমাদের গাড়িও চলেছে ধীরে, তাই আমরা আশ মিটিয়ে দেখে নিচ্ছি এই অদ্ভুত শহরের অদ্ভুত রাস্তার চেহারাটা। কলকাতার ধরমতলাতেও ভিড় দেখেছি, কিন্তু সেখানে অনেক লোকের মধ্যেই যেন একটা যাচ্ছি-যাব ভাব, যেন তাদের হাতে অনেক সময়, রাস্তাটা যেন তাদের দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার জায়গা। এখানের লোকেরা কিন্তু সকলেই ব্যস্ত, সকলেই হাঁটছে, সকলেরই তাড়া। বেশির ভাগই চীনে, তাদের কারুর চীনে পোশাক, কারুর বিদেশি পোশাক। এদেরই মধ্যে কিছু সাহেব-মেমও আছে। তাদের হাতে ক্যামেরা, চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরানো থেকেই বোঝা যায় এরা টুরিস্ট।

অবশেষে এ-রাস্তাও পিছনে ফেলে একটা সরু রাস্তা ধরে একটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি অঞ্চলে এসে পড়লাম আমরা। পরে জেনেছিলাম এটার নাম প্যাটারসন স্ট্রিট। এখানেই একটা বত্রিশ তলা বাড়ির সাত তলায় পূর্ণেন্দুবাবুর ফ্ল্যাট।

গাড়ি থেকে যখন নামছি তখন আমাদের পাশ দিয়ে একটা কালো গাড়ি হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল আর ফেলুদা কেমন যেন একটা টান হয়ে গেল। এই গাড়িটাকে আমি আগেও আমাদের পিছনে আসতে দেখেছি। এদিকে পূর্ণেন্দুবাবু নেমেই এগিয়ে গেছেন কাজেই আমাদেরও তাঁকে অনুসরণ করতে হল।

'একটু হাত পা ছড়িয়ে বসুন স্যার,' আমাদের নিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকেই বললেন পূর্ণেন্দুবাবু। 'দুঃখের বিষয় আমার এক ভাগনের বিয়ে, তাই আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে এই সেদিন রেখে এসেছি কলকাতায়। আশা করি আতিথেয়তার একটু-আধটু ত্রুটি হলে মাইন্ড করবেন না। —কী খাবেন বলুন।'

'সবচেয়ে ভাল হয় চা হলে,' বলল ফেলুদা।

'টি-ব্যাগস-এ আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না।'

ঘরের উত্তর দিকে একটা বড় ছড়ানো জানালা দিয়ে হংকং শহরের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। লালমোহনবাবু দৃশ্য দেখছেন, আমি দেখছি সোনি কালার টেলিভিশনের পাশে আরেকটা যন্ত্র, সেটা নিশ্চয়ই ভিডিও। তারই পাশে তিন তাক ভরা ভিডিও ফিল্ম। তার মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দি, আর অন্য পাশে টেবিলের উপর ডাঁই করা ম্যাগাজিন। ফেলুদা তারই খানকতক টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে আরম্ভ করেছে। মিঃ পাল ঘরে নেই তাই এই ফাঁকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'গাড়িতে কে ছিল ফেলুদা?'

'যে না-থাকলে আমাদের আসা বৃথা হত।'

'বুঝেছি।'

হীরালাল সোমানি।

'কিন্তু লোকটা কী করে জানল যে আমরা এসেছি?'

'খুব সহজ,' বলল ফেলুদা। 'আমরা যে ভাবে ওর আসার ব্যাপারটা জেনেছি সেই ভাবেই। প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করেছে। এয়ারপোর্টে ছিল নিশ্চয়ই। ওখান থেকে পিছু নিয়েছে।'

লালমোহনবাবু জানলা থেকে ফিরে এসে বললেন, 'ছবি যদি পাচার হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে আর আমাদের পিছনে লাগার কারণটা কী?'

'সেটাই তো ভাবছি।'

'আসুন স্যার!'

পূর্ণেন্দুবাবু ট্রে-তে চা নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে বিলিতি বিস্কুট।

টেবিলের উপর ট্রে-টা রেখে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি যে মান্ধাতার আমলের ফিল্মের পত্রিকায় মশগুল হয়ে পড়লেন।'

ফেলুদা একটা ছবি বেশ মন দিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'স্ক্রিন ওয়ার্লডের এই সংখ্যাটা কি আপনার খুব কাজে লাগছে? এটা সেভেনটি-সিক্স-এর।'

'মোটেই না। আপনি স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন। ওগুলো আমি দেখি না মশাই, দেখেন আমার গিন্নি। একেবারে ফিল্মের পোকা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তোপ্‌সে, এই পত্রিকাটা আমার ব্যাগের মধ্যে ভরে দে তো। ইয়ে, আপনাদের এখানকার আপিস-টাপিস খোলে কখন?'

'আর মিনিট দশেকের মধ্যেই খুলে যাবে। আপনি সেই সাহেবকে ফোন করবেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নম্বর আছে?'

'আছে।'

ফেলুদা নোটবুক বার করল।—'এই যে—৫-৩১,১৬৮৬।'

'হুঁ। হংকং-এর নম্বর। আপিসটা কোথায়?'

'হেনেসি স্ট্রিট। চোদ্দো নম্বর।'

'হুঁ। আপনি দশটায় ফোন করলেই পাবেন।'

'আমাদের হোটেল কোনটা ঠিক করেছেন জানতে পারি কি?'

'পার্ল হোটেল। এখান থেকে হেঁটে পাঁচ মিনিট। তাড়া কীসের? দুপুরের খাওয়াটা সেরে যাবেন এখন। কাছেই খুব ভাল ক্যান্টনিজ রেস্টোরান্ট আছে। তারপর, আপনাদের মিশন যদি আজ সাক্সেসফুল হয়, তা হলে কাল নিয়ে যাব কাউলুনের এক রেস্টোরান্টে। এমন একটা জিনিস খাওয়াব যা কখনও খাননি।'

'কী জিনিস মশাই?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। 'এরা তো আরসোলা-টারসোলাও খায় বলে শুনিচি।'

'শুধু আরসোলা কেন,' বলল ফেলুদা, 'আরসোলা, হাঙরের পাখনা, বাঁদরের ঘিলু, এমন কী সময় সময় কুকুরের মাংস পর্যন্ত।'

'না, একেবারে অন্য জিনিস,' বললেন পূর্ণেন্দুবাবু। 'ফ্রাইড

স্নেক।'

'স্-স্-স্-স্নেক?' লালমোহনবাবুর চোখ-নাক সব একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

'স্নেক।'

'মানে সাপ? সর্প?'

'সর্প। সাপের সুপ, সাপের মাংস, ফ্রাইড স্নেক—সব পাওয়া যায়।'

'খেতে ভাল?'

'অপূর্ব। ব্যাঙের মাংস তো অতি সুস্বাদু জিনিস, জানেন বোধহয়। তা ব্যাঙের ভক্ষক কেন ভাল হবে না খেতে বলুন।'

লালমোহনবাবু যদিও বললেন 'তা বটে,' কিন্তু যুক্তি পুরোপুরি মানলেন বলে মনে হল না।

ফেলুদা উঠে পড়েছে।

'যদি কিছু মনে না করেন—আপনার টেলিফোনটা...'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা আর্মেনিয়ান সাহেবের নম্বরটা ডায়াল করল। এ ডায়ালিং আমাদের মতো ঘুরিয়ে ডায়ালিং নয়। এটা বোতাম টিপে ডায়ালিং। টেপার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নম্বরে বিভিন্ন সুরে একটা 'পিঁ' শব্দ হয়।

'আমি একটু ক্রিকোরিয়ান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'তিনি তো নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'তাইওয়ান।'

'কবে?'

'গত শুক্রবার। আজ সন্ধ্যায় ফিরবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফেলুদা ফোন রেখে তারপর কী কথা হয়েছে সেটা বলল আমাদের।

'তার মানে সে ছবি তো এখনও সোয়ানির কাছেই আছে,' বললেন পূর্ণেন্দুবাবু।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল, ফেলুদা। 'তার মানে আমাদের এখানে আসাটা ব্যর্থ হয়নি।'

॥ ১১ ॥

ইয়ুং কী রেস্টোরান্টে আমাদের দুর্দান্ত ভাল চীনে খাবার খাইয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'আপনাদের তিনটের আগে যখন হোটেলে যাবার দরকার নেই তখন কিছু কেনাকাটার থাকলে এই বেলা সেরে নিন। অবিশ্যি কালকেও সময় পাবেন। আপনাদের ফ্লাইট তো সেই রাত দশটায়।'

'কিনি বা না কিনি, দু'একটা দোকানে অন্তত একটু উঁকি দিতে পারলে ভাল হত,' বলল ফেলুদা।

'আমার দোকানে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু সে তো ভারতীয় জিনিস। আপনাদের ইন্টারেস্ট হবে না বোধহয়।'

লালমোহনবাবুর একটা পকেট ক্যালকুলেটার কেনার শখ—বইয়ের বিক্রির হিসেবটা নাকি চেক করতে সুবিধে হয়—তাই ইলেকট্রনিক্সের দোকানেই যাওয়া স্থির হল।

'আমার চেনা দোকানে নিয়ে যাচ্ছি,' বললেন পূর্ণেন্দুবাবু, 'জিনিসও ভাল পাবেন, দামেও এদিক ওদিক হবে না।'

ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দুজনেই তাদের প্রাপ্য পাঁচশো ডলার নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। তাই হংকং-এর মতো জায়গা থেকে কিছু কেনা হবে না এটা হতেই পারে না।

লী ব্রাদারসে ইলেকট্রনিক্স-এর সব কিছু ছাড়াও ক্যামেরার জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে ফেলুদার পেনট্যাক্স, তার জন্য কিছু রঙিন ফিল্ম কিনে নিলাম। আজ আর সময় হবে না, কিন্তু কাল মা-বাবার জন্যে কিছু কিনে নিতে হবে। লালমোহনবাবু যে ক্যালকুলেটারটা কিনলেন সেটা এত ছোট আর চ্যাপ্টা যে তার মধ্যে কোথায় কী ভাবে ব্যাটারি থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। ফেলুদা একটা ছোট্ট সোনি ক্যাসেট রেকর্ডার কিনে আমাকে দিয়ে বলল, 'এবার থেকে মক্কেল এলে এটা অন করে

দিবি। কথাবার্তা রেকর্ড করা থাকলে খুব সুবিধে হয়।'

দোকানের পাট সেরে তিনটে নাগাদ আবার পূর্ণেন্দুবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমাদের মালপত্র তুলে রওনা দিলাম। পূর্ণেন্দুবাবুকে একবার দোকানে যেতে হবে, এবং সেটা আমাদের হোটেলের উলটো দিকে, তাই আমরা ট্যাক্সিতেই যাব পার্ল হোটেলে।

'আমি কিন্তু চিন্তায় থাকব মশাই,' বললেন পূর্ণেন্দুবাবু। 'কী হল না-হল একটা ফোন করে জানিয়ে দেবেন।'

রাস্তায় বেরিয়ে সামনেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। মাথাটা রুপোলি, গা-টা লাল—এই হল হংকং ট্যাক্সির রং। লম্বা আমেরিকান গাড়ি, তিনজনে উঠে পিছনে বসলাম।

'পার্ল হোটেল,' বলল ফেলুদা।

ট্যাক্সি ফ্ল্যাগ ডাউন করে চলতে আরম্ভ করল।

লালমোহনবাবুর কিছুক্ষণ থেকেই একটা ঝিম-ধরা নেশা-করা ভাব লক্ষ করছিলাম। জিজ্ঞেস করাতে বললেন সেটা অল্প সময়ে মনের প্রসার প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ার দরুন। আর বাড়লে নাকি সামলানো যাবে না। —'কলকাতায় কেবল চীনে ছুতোর মিস্ত্রি আর চীনে জুতোর দোকানের কথাই শুনিচি। তারা যে এমন একখানা শহর গড়তে পারে সেটা চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করতুম না মশাই।'

পূর্ণেন্দুবাবু বলেছিলেন পায়ে হেঁটে পার্ল হোটেলে যেতে লাগে পাঁচ মিনিট। অলি গলি দিয়ে দশ মিনিট চলার পরেও যখন পার্ল হোটেল এল না, তখন বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপার কী? ফেলুদা আরেকবার গলা চড়িয়ে বলে দিল, 'পার্ল হোটেল। উই ওয়ন্ট পার্ল হোটেল।'

উত্তর এল—'ইয়েস, পার্ল হোটেল।' কালো কোট, কালো চশমা পরা ড্রাইভার, ভুল শুনেছে এটাও বলা চলে না, আর একই নামে দুটো হোটেল থাকবে সেটাও অবিশ্বাস্য।

প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পর ট্যাক্সিটা একটা রাস্তার মোড়ে এসে থামল।

এটা যে একেবারে চীনে পাড়া তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাস্তার দু'দিকে সারবাঁধা আট-দশ তলা বাড়ি। সেগুলোর প্রত্যেকটির জানালায় ও ছোট ছোট ব্যালকনিতে কাপড় শুকোচ্ছে, বাইরে থেকেই বোঝা যায় ঘরগুলোতে বিশেষ আলো বাতাস ঢোকে না। দোকান যা আছে তার মধ্যে টুরিস্টের মাথা-ঘোরানো হংকং-এর কোনও চিহ্ন নেই। সব দোকানের নামই চীনে ভাষায় লেখা, তাই বাইরে থেকে কীসের দোকান তা বোঝার উপায় নেই।

'পার্ল হোটেল—হোয়্যার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল সামনের ডাইনের গলিটায় যেতে হবে।

মিটারে ভাড়া বলছে হংকং ডলারে, সেটা হিসেব করে দাঁড়ায় প্রায় একশো টাকার মতো। উপায় নেই। তাই দিয়ে আমরা তিনজন মাল নিয়ে নেমে পড়লাম। আমি আর লালমোহনবাবুর দিকে চাইছি না, জানি তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হংকং-এ ক্রাইমের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছেন সবই এখন বিশ্বাস করছেন।

যে গলিটার দিকে ড্রাইভার দেখিয়েছে সেটায় সূর্যের আলো কোনওদিন প্রবেশ করে কি না জানি না; অন্তত এখন তো নেই।

আমরা মোড় ঘুরে গলিটায় ঢুকলাম, আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে কারা যেন এসে আমাদের ঘিরে ফেলল, আর তার পরমুহূর্তেই মাথায় একটা মোক্ষম বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক-আউট।

যখন জ্ঞান হল তখন বুঝতে পারলাম একটা ঘুপচি ঘরের মেঝেতে পড়ে আছি। ফেলুদা আমার পাশে একটা কাঠের প্যাকিং কেসের উপর বসে চারমিনার খাচ্ছে। একটা অদ্ভুত গন্ধে মাথাটা কীরকম ভার ভার লাগছে। পরে জেনেছিলাম সেটা আফিং-এর গন্ধ। ব্রিটিশরা নাকি ভারতবর্ষের আফিং চীনে বিক্রি করে প্রচুর টাকা করেছিল, আর সেই সঙ্গে চীনেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আফিং-এর নেশা।

লালমোহনবাবু এখনও অজ্ঞান, তবে মাঝে মাঝে নড়ছেন-চড়ছেন, তাই মনে হয় এবার জ্ঞান ফিরবে।

আমাদের মালপত্র নেই।

ঘরে গোটাপাঁচেক ছোট বড় প্যাকিং কেস, একটা কাত হয়ে পড়ে থাকা বেতের চেয়ার, দেয়ালে একটা চীনে ক্যালেন্ডার—ব্যস, এ ছাড়া কিচ্ছু নেই। বাঁ দিকের দেয়ালে প্রায় দেড় মানুষ উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা, তাই দিয়ে ধোঁয়া মেশানো একটা ফিকে আলো আসছে। বোঝা যাচ্ছে দিনের আলো এখনও ফুরোয়নি। ডাইনে আর সামনে দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। চীনেরা খাঁচায় পাখি রাখে এটা অনেক জায়গায় লক্ষ করেছি, এমন কী দোকানেও।

'উঠুন লালমোহনবাবু,' বলল ফেলুদা, 'আর কত ঘুমোবেন ?'

লালমোহনবাবু চোখ খুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ কুঁচকোনোতে বুঝলাম মাথার যন্ত্রণাটা বেশ ভাল ভাবেই অনুভব করছেন।

'উঃ, কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা !' কোনওমতে উঠে বসে বললেন ভদ্রলোক। 'এ কোথায় এনে ফেলেছে আমাদের ?'

'গুম ঘর,' বলল ফেলুদা। 'একেবারে আপনার গপ্পের মতো, তাই না ?'

'আমার গপ্প ? ছোঃ !'

ছোঃ বলতেই বোধহয় মাথাটা একটু ঝন্ঝন্ করে উঠেছিল, তাই নাকটা কুঁচকে একটু থেমে এবার গলাটা খানিকটা নামিয়ে নিয়ে বললেন—

'যা ঘটল তার কাছে গপ্প কোন ছার ? সব ছেড়ে দোব মশাই। ঢের হয়েছে। হনডুরাস ড্যাড্যাড্যাং, ক্যাম্বোডিয়ায় কচকচি আর ভ্যানকুভারের ভ্যানভ্যানানি—দুর্ দুর্ !'

'আর লিখবেন না বলছেন ?'

'নেভার।'

'আপনার এই স্টেটমেন্ট কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেল। এর পরে আবার লিখলে কিন্তু কথার খেলাপ হবে।'

ফেলুদার পাশেই রাখা আছে তার নতুন কেনা ক্যাসেট রেকর্ডার। আর কিছু করার নেই তাই ওটা নিয়েই খুটুর খাটুর করছে। রেকর্ডিং-এর কথাটা যে মিথ্যে বলেনি সেটা ও প্লে-ব্যাক

করে জানিয়ে দিল।

'এ তো সোমানিরই কীর্তি বলে মনে হচ্ছে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'নিঃসন্দেহে। এখন আমাদের লাগেজটা ফেরত পেলে হয়। রিভলভারটা গেছে। কী ভাগ্যি রেকর্ডারটা নেয়নি।'

'দুটো যে দরজা দেখছি, দুটোই কি বন্ধ?'

'সামনেরটা বন্ধ। পাশেরটা খোলা যায়। ওটা বাথরুম।'

'ওটাতে পালাবার পথ নেই বোধহয়?'

'দরজা একটা আছে। বাইরে থেকে বন্ধ। জানালা দিয়ে মাথা গলবে, ধড় গলবে না।'

লালমোহনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের উপর মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লেন।

মিনিট খানেক পরে দেখি ভদ্রলোক গুনগুন করে গান গাইছেন। অনেক কষ্টে চিনতে পারলাম গানটা। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।

'কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কী ভাবছেন মশাই?'

'মাথায় ঘা খেয়ে অজ্ঞান হয়েও যে লোকে স্বপ্ন দেখে সেটা এই এক্সপেরিয়েন্সটা না হলে জানতুম না।'

'কী স্বপ্ন দেখলেন?'

'এক জায়গায় ডজনখানেক বাঁদর বিক্রি হচ্ছে, আর একটা লোক ডুগডুগি বাজিয়ে বলছে—রেনেসাঁসকা সুবাসিত বান্দর—রেনেসাঁসকা সুবাসিত বান্দর—দো দো ডলার—দো দো—'

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে লোক। তার মানে বাইরে বারান্দা।

সামনের দরজা চাবি দিয়ে খোলা হল।

একজন কালো সুট পরা ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। পিছনে আবছা অন্ধকারে আরও দুটো লোক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তিনজনেই ভারতীয়।

যিনি ঢুকলেন তিনি হচ্ছেন হীরালাল সোমানি। চোখে মুখে

বিশ্রী একটা বিদ্রূপের হাসি।

'কী মিস্টার মিত্তির ? কেমন আছেন ?'

'আপনারা যেমন রেখেছেন।'

'আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিইনি আমি। আমার কাম হয়ে গেলেই খালাস করে দেব।'

'আমাদের মালগুলো সরিয়ে রাখার কী কারণ বুঝতে পারলাম না।'

'দ্যাট ওয়জ এ মিসটেক। কান্‌হাইয়া। কান্‌হাইয়া!'

দু'জন লোকের একজন কোথায় চলে গিয়েছিল, সে ডাক শুনে ফিরে এল। এতক্ষণে বুঝতে পারছি যে অন্য লোকটি সোমানির পিছনে দাঁড়িয়ে রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে।

'ইনলোগকা সামান লাকে রখ্ দো ইস্ কামরেমে,' কান্‌হাইয়াকে আদেশ করলেন হীরালাল। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে ডিনারের অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু মুশকিল হবে। আজ রাতটা

ফাস্ট করুন। কাল থেকে আবার খাবেন, কেমন ?'

কান্‌হাইয়া লোকটা আমাদের ব্যাগগুলো এবার ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'বেশি ঝামেলা করবেন না মিস্টার মিত্তির। রাধেশ্যাম হ্যাজ ইওর রিভলভার। উয়ো আলতু ফালতু আদমি নহী হ্যায়। গোলি চালাতে জানে। আর মনে রাখবেন কি হংকং ইজ নট ক্যালকাটা। প্রদোষ মিটার ইজ নোবডি হিয়ার। আমি চলি। কাল সকালে দশটার সময় এসে এরা আপনাদের ফ্রি করে দেবে। গুড নাইট।'

ঘরের আলো ইতিমধ্যে অনেক কমে গেছে। বুঝতে পারছি সূর্য ডুবে গেছে। এ ঘরে বাল্‌বের হোলডার আছে, কিন্তু বাল্‌ব নেই।

হীরালাল চলে গেলেন। কান্‌হাইয়া এগিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করার জন্য পাল্লাটা টানল।

'কান্‌হাইয়া! কান্‌হাইয়া!'

মনিবের ডাক শুনে কান্‌হাইয়া 'হুজুর' বলে ডাইনে বেরিয়ে গেল, রাধেশ্যাম এগিয়ে এল তার কাজটা শেষ করে দেবার জন্য, আর সেই মুহূর্তে ঘটে গেল এক তুলকালাম কাণ্ড।

ফেলুদার সামনে ওর কাঁধের ব্যাগটা পড়ে ছিল, ও সেটাকে চোখের নিমেষে তুলে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ল দরজার দিকে, আর সেই সঙ্গে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধেশ্যামের উপর।

ফেলুদার সঙ্গে থেকে আমারও একটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এসে গেছে, আমিও লাফিয়ে এগিয়ে গেছি।

ইতিমধ্যে ফেলুদা জাপটে ধরেছে রাধেশ্যামকে, তার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেছে মেঝেতে। ফেলুদা 'ওটা তোল' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি রিভলভারটা হাতে নিয়ে নিয়েছি—আমার হাতের রিভলভার তার দিকে তাগ করা। ছেলেবেলা এয়ার গান চালিয়েছি, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে মিস করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

রাধেশ্যাম লোকটা তাগড়াই, সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে ফেলুদার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। এমন সময় হঠাৎ দেখি লালমোহনবাবু ঘর থেকে একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস তুলে

এনে সেটা দুহাতে ধরে তিড়িং-তিড়িং এদিক-ওদিক লাফাচ্ছেন রাধেশ্যামের মাথায় সেটাকে মারার সুযোগের জন্য।

সুযোগ মিলল। প্যাকিং কেসের একটা কোনা রাধেশ্যামের ঘন কালো চুল ভেদ করে তার ব্রহ্মতালুতে এক মোক্ষম আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। এক ঝলক দেখলাম লোকটার চুল থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে মেঝের উপর।

ফেলুদা আমার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে নিল। সেটা

কান্‌হাইয়ার দিক থেকে এক চুলও নড়েনি।

'ব্যাগগুলো বাইরে আন। আমার ছোট ব্যাগটা আমার কাঁধে ঝুলিয়ে দে। বড়টা তুই হাতে নে।'

আমি আর লালমোহনবাবু মিলে আমাদের মাল বাইরে নিয়ে এলাম।

রাধেশ্যাম মেঝেতে পড়ে আছে; এবার ফেলুদার একটা আপার কাটে কান্‌হাইয়াও তার পাশেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যতক্ষণে এদের জ্ঞান হবে ততক্ষণে আমরা আউট অফ ডেনজার।

আমরা এতক্ষণ ছিলাম তিনতলায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখি চারিদিক জ্বলন্ত নিয়নে ছেয়ে আছে। চীনে ভাষায় দশ হাজার অক্ষরের সব অক্ষরই যেন আমাদের গিলে ফেলতে চাইছে চতুর্দিক থেকে। তবে এটা কোনও মেন রোড নয়। পিছন দিকের একটা মাঝারি রাস্তা। এখানে ট্রাম নেই, বাসও নেই; আছে ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি আর মানুষ।

আমরা প্রথম দুটো ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তৃতীয়টায় উঠলাম। উঠেই ফেলুদাকে প্রশ্নটা করলাম।

'কান্‌হাইয়াকে ডাকার ব্যাপারটা কি তোমার ক্যাসেটে বাজল?'

'ঠিক ধরেছিস। হীরালাল আসতেই রেকর্ডারটা আবার অন করে দিয়েছিলাম। কান্‌হাইয়া বলে যখন দু'বার ডাকল, তার পরেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মন বলছিল ডাক দুটো কাজে লাগতে পারে। আর সত্যিই তাই হল।'

'আপনার জবাব নেই,' বলল লালমোহনবাবু।

'আপনারও,' বলল ফেলুদা। আমি জানি ফেলুদা কথাটা অন্তর থেকে বলেছে।

পার্ল হোটেল পৌঁছাতে লাগল দশ মিনিট, ভাড়া উঠল সাড়ে সাত ডলার।

আমাদের ঘরে গিয়েই পূর্ণেন্দুবাবুকে একটা ফোন করল ফেলুদা। ভদ্রলোক জানালেন ফেলুদাকে নাকি অনেক চেষ্টা করেও পাননি।—'হোটেলে বলল আপনারা নাকি আসেননি। আমি তো চিন্তায় পড়ে গেসলাম মশাই।'

'একবার আসতে পারবেন ?'

'পারি বই কী। তা ছাড়া আপনাদের জন্য খবর আছে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে পূর্ণেন্দুবাবু চলে এলেন। ফেলুদা সংক্ষেপে আমাদের ঘটনাটা বলল।

'এইসব শুনলে বাঙালির জন্য গর্বে বুকটা দশ হাত হয়ে ওঠে মশাই। যাক্‌গে, এখন আমার খবরটা বলি। সেই ক্রিকোরিয়ান কোথায় থাকে সেটা তো টেলিফোনের বই দেখেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু হীরালাল সোমানির হদিসও পেয়েছি।'

'কী করে ?'

'এখানে আরও পাঁচজন সোমানি থাকে। তাদের এক-এক করে ফোন করে বেরিয়ে গেল হীরালাল হচ্ছে কেশব সোমানির খুড়তুতো ভাই। কেশবের কাপড়ের দোকান আছে কাউলুনে। কাউলুনেই তার বাড়ি, আর হীরালাল সেখানেই উঠেছে। আপনার আর্মেনিয়ান তো সন্ধেবেলা আসছে। তাইওয়ানের প্লেন এসে গেছে এতক্ষণে। হীরালাল নিশ্চয়ই আজই ছবি পাচার করবে। আমি ওয়াং শূ-কে পাঠিয়ে দিয়েছি সোমানির বাড়ির উপর চোখ রাখতে। আমাদের আপিসের এক ছোকরা। খুব স্মার্ট। তাকে বলা ছিল সোমানির বাড়ি থেকে কোনও গাড়ি বেরোতে দেখলেই যেন আমাকে ফোন করে।'

'ক্রিকোরিয়ান কোথায় থাকে ?'

'ভিকটোরিয়া হিল। হংকং-এ। অভিজাত পাড়া। সোমানি রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা রওনা দিলে ওর আগেই ভিকটোরিয়া হিল পৌঁছে যাব। তখন আপনি ইচ্ছে করলে ওকে মাঝপথে রুখতে পারেন। অবিশ্যি আপনার নিজের প্ল্যানটা কী সেটা আমার জানা ছিল না।'

ফেলুদা পূর্ণেন্দুবাবুর পিঠ চাপড়ে দিল।

'আপনি তো মশাই সাংঘাতিক বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন! আপনার রাস্তা ছাড়া আর রাস্তাই নেই। কিন্তু সেই ছোকরার কাছ থেকে ফোন পেয়েছেন কি ?'

'আমি এখানে আসার ঠিক আগেই করেছিল। অর্থাৎ মিনিট

কুড়ি আগে। গাড়ি রওনা হয়ে গেছে। যিনি আসছেন তাঁর হাতে একটা ফ্ল্যাট কাগজের প্যাকেট।'

তিন মিনিটের মধ্যে আমরা পূর্ণেন্দুবাবুর গাড়িতে করে রওনা দিয়ে দিলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়ি প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। যেন হিল-স্টেশনে যাচ্ছি। হংকং এখন আলোয় আলো, আর যত উপরে উঠছি ততই সমুদ্র পাহাড় রাস্তা গাড়ি হাইরাইজ সমেত সমস্ত শহরটা আরও বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে, আর লালমোহনবাবু খালি বলছেন, 'স্বপ্ন রাজ্য, স্বপ্ন রাজ্য'।

আরও কিছুক্ষণ যাবার পর পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'এইবার বাড়ির নম্বরটা দেখে নিতে হবে।'

গাছপালা বাগানে ঘেরা দারুণ সুন্দর সুন্দর সব পুরনো বাড়ি, দেখলেই মনে হয় সাহেবদের জন্য সাহেবদেরই তৈরি। তারই একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে নম্বর দেখে বুঝলাম ক্রিকোরিয়ানের বাড়িতে এসে গেছি। আর এসেই দেখলাম ভিতরে পোর্টিকোর এক পাশে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যেটা আমাদের চেনা। আমরা যখন সকালে পূর্ণেন্দুবাবুর গাড়ি থেকে নামছি, তখন এই গাড়িটাই আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

হীরালাল সোমানির গাড়ি।

আমাদের গাড়িটা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় পার্ক করে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, 'সাহেবের বাড়িটার দিকে চোখ রাখার জন্য একটা গোপন জায়গা বার করতে হবে।'

সেরকম একটা জায়গা পেয়েও গেলাম।

তবে বেশিক্ষণ আড়ি পাততে হল না।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বাড়ির সামনের দরজাটা খুলে যাওয়াতে তার থেকে একটা চতুষ্কোণ আলো বেরিয়ে পড়ল বাগানের ঘাসের উপর, আর তার পরেই নেপথ্যে বলা গুড নাইটের সঙ্গে সঙ্গে হীরালাল নিজেই বেরিয়ে এসে তাঁর গাড়িতে উঠলেন, আর গাড়িও

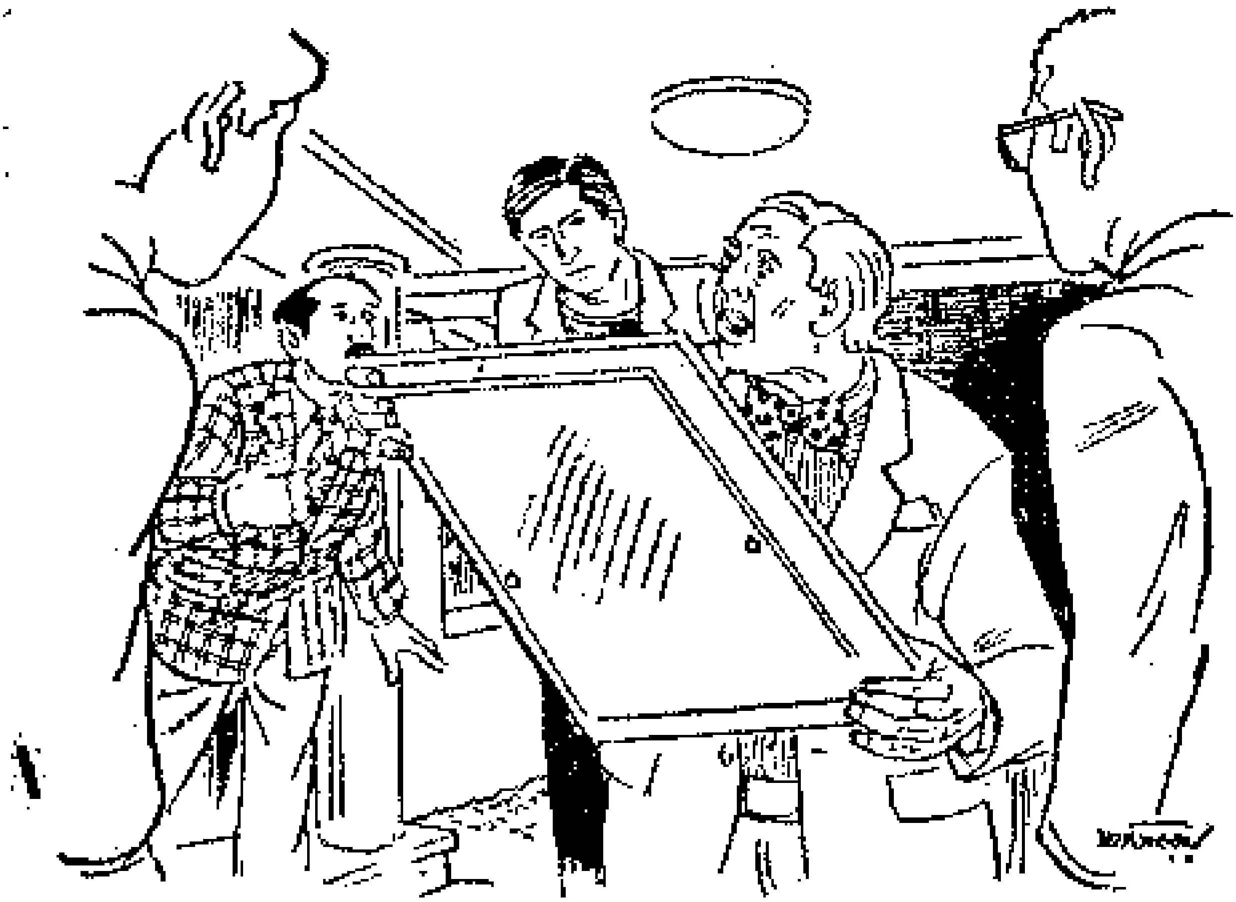

রওনা দিল বিলিতি এঞ্জিনের মৃদু গম্ভীর শব্দ তুলল।

'এবার কী করবেন?' ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন পূর্ণেন্দুবাবু।

'সাহেবের সঙ্গে দেখা করব,' বলল ফেলুদা।

আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে সাহেবের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

পোর্টিকোর দিকে এগোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার হল।

বাড়ির দরজা আবার খুলে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সাহেব স্বয়ং বেরিয়ে এসে আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। সাহেবের হাতে গিল্টিকরা নতুন ফ্রেমে বাঁধানো টিনটোরেটোর যীশু।

গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে একবার চেয়ে মাথায় হাত দিয়ে সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—'স্কাউন্ড্রেল! সুইন্ডলার! স্যান-অফ-এ-বিচ!'

তারপর আমাদের দিকে ফিরে দিশেহারা আধ-পাগলা ভাব করে বললেন, 'হি হ্যাজ জাস্ট সোল্ড মি এ ফেক—অ্যান্ড আই পেড

ফিফ্‌টি থাউজ্যান্ড ডলারস ফর ইট !'

অর্থাৎ লোকটা আমাকে এক্ষুনি একটা জাল ছবি বিক্রি করে গেল, আর আমি ওকে তার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দিলাম।

আমরা কে, কেন এসেছি তার বাড়িতে, এসব জানার কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না সাহেব।

'তুমি কি টিনটোরেটোর ছবিটার কথা বলছ ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। সাহেব আবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

'টিনটোরেটো ? টিনটোরেটো মাই ফুট। এসো, তোমাকে দেখাচ্ছি, এসো !'

সাহেব দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন পোর্টিকোর দিকে। আমরা চারজন তাঁর পিছনে।

পোর্টিকোর আলোতে সাহেব ছবিটা তুলে ধরলেন।

'লুক অ্যাট দিস্ ! থ্রি গ্রিন ফ্লাইজ স্টিকিং টু দ্য পেন্ট—থ্রি গ্রিন ফ্লাইজ ! এই পোকা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে ! সেই পোকা আটকে আছে এই ছবির ক্যানভাসে। আর লোকটা বলে কিনা ছবিটা জেনুইন।—হি ফুলড মি, বিকজ ইট্‌স এ গুড কপি—বাট ইট্‌স এ কপি !'

'ঠিক বলেছ,' বলল ফেলুদা, 'ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালিতে এ পোকা থাকা সম্ভব না।'

পোর্টিকোর আলোতে দেখতে পাচ্ছি সাহেবের সাদা মুখ লাল হয়ে গেছে।—'দ্যাট ডার্টি ডাব্‌ল ক্রসিং সোয়াইন ! লোকটার ঠিকানাটা পর্যন্ত জানি না।'

'ঠিকানা আমি জানি,' বললেন পূর্ণেন্দুবাবু।

'জান ?' সাহেব যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন।

'হ্যাঁ, জানি। কাউলুনে থাকেন ভদ্রলোক। হ্যানয় রোড।'

'গুড। দেখি ব্যাটা কী ভাবে পার পায়। আই'ল স্কিন হিম অ্যালাইভ।'

তারপর সাহেব হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'হু আর ইউ ?'

'আমরা জানতাম ছবিটা জাল, তাই আপনাকে সাবধান করে

দিতে আসছিলাম'—অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল ফেলুদা।

'কিন্তু তাকে তো ধরা যেতে পারে' হঠাৎ বললেন পূর্ণেন্দুবাবু, 'এক্ষুনি চলুন না। আমার গাড়ি আছে। লোকটা এখনও বেশি দূর যায়নি।'

সাহেবের চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল।

'লেট্‌স গো!'

আসবার সময় চড়াই বলে বেশি স্পিড দেওয়া সম্ভব হয়নি; উৎরাই পেয়ে পূর্ণেন্দুবাবু দেখিয়ে দিলেন তারাবাজি কাকে বলে। সোমানির পকেটে পঞ্চাশ হাজার ডলারের চেক, তার কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে, তার আর তাড়া থাকবে কেন? পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা মোড় ঘুরেই দেখতে পেলাম চেনা গাড়িটাকে।

পূর্ণেন্দুবাবু আরেকটু স্পিড বাড়িয়ে গাড়িটার একেবারে পিছনে এসে পড়লেন। তারপর বার কয়েক হর্ন দিতেই সোমানির গাড়ি পাশ দিল। পূর্ণেন্দুবাবু ওভারটেক করে নিজের গাড়িটাকে টেরচাভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা দেখে সোমানি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে, ক্রিকোরিয়ানও নেমেছেন ছবিটা হাতে নিয়ে, আর সেই সঙ্গে ফেলুদাও।

'এক্সকিউজ মি!'

ফেলুদা ক্রিকোরিয়ানের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে নিল। ক্রিকোরিয়ান যেন বাধা দিতে গিয়েও পারল না।

তারপর বড় বড় পা ফেলে সোমানির দিকে এগিয়ে গিয়ে কী হচ্ছে সেটা বোঝার আগেই দেখলাম ছবি সমেত ফেলুদার হাত দুটো মাথার উপর উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে নেমে এল সোমানির মাথার উপর।

দিশি ক্যানভাস ফুঁড়ে সোমানির মাথাটা বেরিয়ে এল বাইরে, আর ছবির গিল্টিকরা ফ্রেমটা হয়ে গেল হতভম্ব ভদ্রলোকের গলার মালা।

'এবার উনি আপনাকে আপনার চেকটা ফেরত দেবেন।'

ফেলুদার হাতে এখন রিভলভার।

সোমানির হতভম্ব ভাবটা এখনও কাটেনি, কিন্তু ফেলুদার কথা বুঝতে ওঁর কোনও অসুবিধে হল না।

কাঁপা হাত পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে চেকটা বার করে ক্রিকোরিয়ানের দিকে এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

সাহেব যখন চেকটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরছেন, তখন সোমানির হাঁ করা মুখ আরও হাঁ করিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল—

'এই যে আপনার সর্বনাশটা হল, হীরালালজী, এর জন্য কিন্তু আমি দায়ী নই, দায়ী তিনটি সবুজ পোকা।'

॥ ১২ ॥

সবচেয়ে যেটা অবাক লাগছিল সেটা হল দ্বিতীয় ছবিটাও জাল বেরিয়ে পড়া। কিন্তু আশ্চর্য, এটা নিয়ে ফেলুদা কোনও মন্তব্যই করল না। এমনিতে ছবিটা দেখে একেবারেই জাল বলে মনে হয়নি। লালমোহনবাবু তো বললেন, 'ইটালিতে চারশো বছর আগে শ্যামাপোকা ছিল না—এ ব্যাপারে আপনি এত শিওর হচ্ছেন কী করে? হয়তো পশ্চিম থেকেই আমদানি হয়েছে এই পোকার। শুনিটি তো কচুরিপানাও এদেশে এককালে ছিল না, সেটা নাকি এসেছে এক মেমসাহেবের সঙ্গে।'

এতেও ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা ছাড়া কোনও মন্তব্য করল না।

পরদিন পূর্ণেন্দুবাবু এয়ারপোর্টে এলেন আমাদের সী-অফ্ করতে। ফেলুদা তাঁকে একটা ভাল টাই কিনে উপহার দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'চব্বিশ ঘণ্টায় একটা ছোটখাটো ঝড় বইয়ে দিলেন মশাই হংকং-এ। তবে এর পরের বার আরেকটু বেশি দিন থাকতে হবে। আপনাদের সাপের মাংস না খাইয়ে ছাড়ছি না।'

হংকং ছাড়তে সত্যিই ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আমি জানি ফেলুদা যে-কয়েকটা মন্ত্রে বিশ্বাস করে তার মধ্যে একটা হল 'ডিউটি ফার্স্ট'। এত রহস্যের সমাধান বাকি আছে—নকল যীশুর রহস্য, বঙ্কিমবাবু খুনের রহস্য, কুকুল খুনের রহস্য—এগুলির একটা গতি

না করে হংকং-ভোগ ফেলুদার ধাতে নেই।

বুধবার রাত্রে রওনা হয়ে বিষ্যুদবার দুপুর সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম কলকাতা। এয়ারপোর্টেই লালমোহনবাবুকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে আজকের দিনটা বিশ্রাম। কাল সকাল আটটা নাগাদ ট্যাক্সিতে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে যাব, সেখান থেকে ওঁর গাড়িতে বৈকুণ্ঠপুর। ফেরার পথে ফেলুদা একবার পার্ক স্ট্রিট পোস্টআপিসে থামল। বলল, একটা জরুরি টেলিগ্রাম করার আছে; কাকে সেটা বলল না।

বাকি দিনটা ফেলুদার পেট থেকে আর কোনও কথা বার করা গেল না। ওর এই মৌনী অবস্থাটা আমার খুব ভাল জানা আছে। এটা হচ্ছে ঝড়ের থমথমে পূর্বাবস্থা। আমি নিজে অনেক ভেবেও কূলকিনারা পাইনি। এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে। তার উপর একদিনের হংকং-এর ধাক্কায় এমনিতেই সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, চোখ বুজলেই এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আকাশের গায়ে ঝুলছে লম্বা লম্বা চীনে অক্ষর।

পরদিন বৈকুণ্ঠপুর পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় এগারোটা হয়ে গেল।

নবকুমারবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে হংকং-এর কথা জিজ্ঞেস করতে ফেলুদার মাথা নাড়তে হল।

'ছবি পাওয়া যায়নি?'

'যেটা ছিল সেটাও জাল,' বলল ফেলুদা।

'সে কী করে হয় মশাই? দু দুটো জাল? তা হলে আসলটা গেল কোথায়?'

আমরা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। ফেলুদা বলল, 'ওপরে চলুন। বৈঠকখানায় বসে কথা হবে।'

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি মহাদেব মণ্ডল বসে লেবুর শরবত খাচ্ছেন।

'কী মশাই—মিশন সাকসেসফুল?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'চোরাই মাল পাওয়া যায়নি। তবে সেটা আমারই ভুল। অন্য দিক দিয়ে সাকসেসফুল বই কী।'

'বটে ? খুনি ?'

'সে হয়তো নিজেই ধরা দেবে।'

'বলেন কী !'

ফেলুদা আর চেয়ারে বসল না। আমাদের জন্যও ট্রে-তে শরবত এসেছিল, একটা গেলাস তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রেখে ফেলুদা পকেট থেকে খাতাটা বার করল। আমরা সবাই ওকে ঘিরে সোফায় বসেছি।

'আমার মনে হয় শুরু থেকেই শুরু করা ভাল,' বলল ফেলুদা। তারপর খাতাটা একটা বিশেষ পাতায় খুলে সেটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—

'২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বৈকুণ্ঠপুরে দুটো ঘটনা ঘটে—নবকুমারবাবুদের ফক্স টেরিয়ার ঠুমরীকে কে জানি বিষ খাইয়ে মারে, আর চন্দ্রশেখরের ছেলে রুদ্রশেখর বৈকুণ্ঠপুরে আসেন। এটা একই দিনে ঘটায় আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে কি না। একটা পোষা কুকুরকে কে মারতে পারে এবং কেন মারতে পারে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে দুটো উত্তর পেলাম। কোনও বাড়ির কুকুর যদি ভাল পাহারাদার হয়, তা হলে সে বাড়ি থেকে কিছু চুরি করতে হলে চোর কুকুরকে আগে থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এখানে চুরি যেটা হয়েছে সেটা কুকুর মারা যাবার অনেক পরে। তাই আমাকে দ্বিতীয় কারণটার কথা ভাবতে হল। সেটা হল, কোনও ব্যক্তি যদি তার পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে কোনও বাড়িতে আসতে চায়, এবং সে ব্যক্তি যদি সে বাড়ির কুকুরের খুব চেনা হয়, তা হলে কুকুর ব্যাঘাতের সৃষ্টি করতে পারে। এবং সেই কারণে কুকুরকে সরানোর প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, কুকুর প্রধানত মানুষ চেনে মানুষের গায়ের গন্ধ থেকে, এবং এই গন্ধ ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না।

'তখনই মনে হল রুদ্রশেখর হয়তো আপনাদের চেনা লোক হতে পারে। তার হাবভাবেও এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হল। তিনি কথা প্রায় বলতেন না, ঘোলাটে চশমা ব্যবহার করতেন, পারতে কারুর সামনে বেরোতেন না। তা হলে এই রুদ্রশেখর আসলে কে ? তিনি

ইটালি থেকে এসেছেন, অথচ পায়ে বাটার জুতো পরেন। তিনি তাঁর পাসপোর্ট আপনার বাবাকে দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনার বাবা চোখে ভাল দেখেন না, এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে পাসপোর্ট খুঁটিয়ে দেখবেন না, তাই জাল পাসপোর্ট চালানো খুব কঠিন নয়।

'অথচ পাসপোর্ট যদি জাল হয়, তা হলে চন্দ্রশেখরের সম্পত্তি পাবার ব্যাপারেও তিনি ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ উকিলের কাছে তিনি কোনওদিনও প্রমাণ করতে পারবেন না যে তিনি চন্দ্রশেখরের ছেলে।

'তা হলে তিনি এলেন কেন? কারণ একটাই—চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মহামূল্য ছবিটি হাত করার জন্য। ভূদেব সিং-এর প্রবন্ধের দৌলতে এ ছবির কথা আজ ভারতবর্ষের অনেকেরই জানা।

'যিনি রুদ্রশেখরের ভেক ধরে এসেছিলেন, তিনি একটা কথা জানতেন না, যে কথাটা আমরা জেনেছি চন্দ্রশেখরের বাক্সে পাওয়া একটি ইটালিয়ান খবরের কাগজের কাটিং থেকে। এই খবরে বলা হয়েছে, আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে রোম শহরে রুদ্রশেখরের মৃত্যু হয়।'

'অ্যাঁ!'—নবকুমারবাবু প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, নবকুমারবাবু। আর খবরটার জন্য আমি রবীনবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।'

'তা হলে এখানে এসেছিল কে?'

ফেলুদা এবার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। একটা ম্যাগাজিনের পাতা।

'হংকং-এ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এই পত্রিকার পাতাটা আমার চোখে পড়ে যায়। এই ভদ্রলোকের ছবিটা একবার দেখবেন কি নবকুমারবাবু? "মোম্বাসা" নামক একটি হিন্দি ফিল্মের ছবি এটা। ১৯৭৬-এর ছবি। এই ছবির অনেক অংশ আফ্রিকায় তোলা হয়েছিল। এতে ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এই শ্মশ্রু-গুম্ফ বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি। দেখুন তো এঁকে চেনেন কি না।'

কাগজটা হাতে নিয়ে নবকুমারবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

'এই তো রুদ্রশেখর !'

'নীচে নামটা পড়ে দেখুন।'

নবকুমারবাবু নীচের দিকে চাইলেন।

'মাই গড ! নন্দ !'

'হ্যাঁ, নবকুমারবাবু। ইনি আপনারই ভাই। প্রায় এই একই মেক-আপে তিনি এসেছিলেন রুদ্রশেখর সেজে। আসল দাড়ি-গোঁফ, নকল নয়। কেবল চুলটা বোধহয় ছিল পরচুলা। আসবার আগে তাঁর কোনও চেনা লোককে দিয়ে রোম থেকে একটা চিঠি লিখিয়েছিল সৌম্যশেখরকে। এ কাজটা করা অত্যন্ত সোজা।'

নবকুমারবাবুর অবস্থা শোচনীয়। বার বার মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নন্দটা চিরকালই রেকলেস।'

ফেলুদা বলল, 'আসল ছবি হঠাৎ মিসিং হলে মুশকিল হত, তাই উনি কলকাতা থেকে আর্টিস্ট আনিয়ে তার একটা কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। কোনও কারণে বোধহয় বঙ্কিমবাবুর সন্দেহ হয়, তাই যেদিন ভোরে নন্দকুমার যাবেন সেদিন সাড়ে তিনটায় অ্যালার্ম লাগিয়ে স্টুডিওতে গিয়েছিলেন। এবং তখনই তিনি নিহত হন।'

বৈঠকখানায় কিছুক্ষণের জন্য পিন-ড্রপ সাইলেন্স। তারপর ফেলুদা বলল, 'অবিশ্যি একজন ব্যক্তি নন্দবাবুকে আগেই ধরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি কারণ তাঁর বোধহয় লজ্জা করছিল। তাই নয় কি ?'

প্রশ্নটা ফেলুদা করল যাঁর দিকে চেয়ে তিনি মিনিটখানেক হল ঘরে এসে এক কোনায় একটা সোফায় বসেছেন।

সাংবাদিক রবীন চৌধুরী।

'সত্যিই কি ? আপনি সত্যিই পারতেন নন্দকে ধরিয়ে দিতে ?' নন্দকুমারবাবু প্রশ্ন করলেন।

রবীনবাবু একটু হেসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'এতদূর যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও আপনিই বলুন না।'

'আমি বলতে পারি, কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই রবীনবাবু। সেখানে আপনার আমাকে একটু সাহায্য করতে

হবে।'

'বেশ তো, করব। আপনার কী কী প্রশ্ন আছে বলুন।'

'এক—আপনি যে সেদিন বললেন ইটালিয়ান কাগজের খবরটা পড়তে আপনার ডিকশনারির সাহায্য নিতে হয়েছিল, সেটা বোধহয় মিথ্যে, না?'

'হ্যাঁ, মিথ্যে।'

'আর আপনার শার্টের বাঁ দিকে যে লাল রংটা লেগে রয়েছে, যেটাকে প্রথম দেখে রক্ত বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে অয়েল পেন্ট, তাই না?'

'তাই।'

'আপনি পেন্টিং শিখেছিলেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'সুইটজারল্যান্ডে। বাবা মারা যাবার পর মা আমাকে নিয়ে সুইটজারল্যান্ডে চলে যান। মা নার্সিং শিখেছিলেন, জুরিখে একটা হাসপাতালে যোগ দেন। আমার বয়স তখন তেরো। আমি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্ট অ্যাকাডেমিতে ক্লাস করি।'

'কিন্তু বাংলাটা শিখলেন কোথায়?'

'সেটা আরও পরে। ১৯৬৬-তে আমি প্যারিসে যাই একটা আর্ট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। ওখানে কিছু বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বাংলা শেখার ইচ্ছে হয়। শেষে সোরবো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ক্লাসে যোগ দিই। ভাষার উপর আমার দখল ছিল, কাজেই শিখতে মুশকিল হয়নি। বছর দু' এক হল চন্দ্রশেখরের জীবনী লেখা স্থির করি। রোমে যাই। ভেনিসেও গিয়ে ক্যাসিনি পরিবারের সঙ্গে আলাপ করি। সেখানেই টিনটোরেটোর ছবিটার কথা জানতে পারি।'

'তার মানে আপনিও একটি কপি করেছিলেন টিনটোরেটো ছবির। এবং সেই কপিই হীরালাল সোমানি নিয়ে গিয়েছিল হংকং-এ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে আসলটা কোথায় ?' চেঁচিয়ে উঠলেন নবকুমারবাবু।

'ওটা আমার কাছেই আছে,' বললেন রবীনবাবু।

'কেন, আপনার কাছে কেন ?'

'ওটা আমার কাছে আছে বলেই এখনও আছে, না হলে হংকং চলে যেত। এখানে এসেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ওটাকে সরাবার মতলব করছেন জাল-রুদ্রশেখর। তাই ওটার একটা কপি করে, আসলটাকে আমার কাছে রেখে কপিটাকে ফ্রেমে ভরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আসলটা তো আপনারই নেবার ইচ্ছে ছিল, তাই না ?'

'নিজের জন্য নয়। আমি ভেবেছিলাম ওটা ইউরোপের কোনও মিউজিয়ামে দিয়ে দেব। পৃথিবীর যে-কোনও মিউজিয়াম ওটা পেলে লুফে নেবে।'

'আপনি মিউজিয়ামে দেবেন মানে ?' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন নবকুমারবাবু। 'ওটা তো নিয়োগী পরিবারের সম্পত্তি।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন নবকুমারবাবু,' বলল ফেলুদা, 'কিন্তু উনিও যে নিয়োগী পরিবারেরই একজন।'

'মানে ?'

'আমার বিশ্বাস উনি রুদ্রশেখরের পুত্র ও চন্দ্রশেখরের নাতি—রাজশেখর নিয়োগী। অর্থাৎ আপনার আপন খুড়তুতো ভাই। ওঁর পাসপোর্টও নিশ্চয়ই সেই কথাই বলছে।'

নবকুমারবাবুর মতো আমরা সকলেই থ।

রবীন—থুড়ি, রাজশেখরবাবু বললেন, 'পাসপোর্টটা কোনওদিন দেখাতে হবে ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম ছদ্মনামে এখানে থেকে ঠাকুরদাদা সম্বন্ধে রিসার্চ করে চলে যাব, আর যেহেতু ছবিটা উত্তরাধিকারসূত্রে আমারই প্রাপ্য, ওটা নিয়ে যাব। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং প্রদোষবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির জন্য—আসল পরিচয়টা দিতেই হল। আশা করি আপনারা অপরাধ নেবেন না।'

ফেলুদা বলল, 'এখানে একটা কথা বলি রাজশেখরবাবু—পাঁচ

বছর আগে পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের চিঠি পেয়েছেন ভুদেব সিং। কাজেই আইনত ছবিটা এখনও আপনার প্রাপ্য নয়। কিন্তু আমার মতে ছবি আপনার কাছেই থাকা উচিত। কারণ আপনিই সত্যি করে এটার কদর করবেন। কী বলেন নবকুমারবাবু?'

'একশোবার। কিন্তু মিস্টার মিত্তির, আপনার সন্দেহটা হল কী করে বলুন তো? আমার কাছে তো সমস্ত ব্যাপারটা ভেলকির মতো।'

ফেলুদা বলল, 'উনি যে বাংলাদেশের বাঙালি নন সেটা সন্দেহ হয় সেদিন দুপুরে ওঁর খাওয়া দেখে। সুক্তো কখন খেতে হয় সেটা বাংলার বাঙালিরা ভাল ভাবেই জানে। ইনি দেখলাম বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে প্রথমে খেলেন ডাল, তারপর মাছ, সব শেষে সুক্তো! তা ছাড়া, সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ হল—'

এবার ফেলুদা যে ব্যাপারটা করল সেটা একেবারে ম্যাজিক।

উত্তরের দেয়ালের দিকে গিয়ে চন্দ্রশেখরের আঁকা তাঁর বাবা অনন্তনাথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুটো হাত ছবির গোঁফে আর দাড়ির উপর চাপা দিতেই দেখা গেল মুখটা হয়ে গেছে রবীন চৌধুরীর!

লালমোহনবাবু ক্ল্যাপ দিয়ে উঠলেন, আর আমি অ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলাম রবীনবাবুকে দেখে কেন চেনা চেনা মনে হত।

কিন্তু চমকের এখানেই শেষ না।

একটি চাকর কিছুক্ষণ হল একটা টেলিগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সেটা নবকুমারবাবুর হাতে এল।

ভদ্রলোক সেটা খুলে পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আশ্চর্য! নন্দ লিখেছে আজ সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় আসছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'ওটার জন্য আমিই দায়ী, মিস্টার নিয়োগী। আপনার নাম করে কাল আমিই ওঁকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।'

'আপনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম সৌম্যশেখরবাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কন্ডিশন ক্রিটিক্যাল। কাম ইমিডিয়েটলি।'

*

নবকুমারবাবুর কাছ থেকে আরও টাকা নেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি করেছিল ফেলুদা। বলল, 'দেখলেন তো, তদন্তর ফলে বেরিয়ে গেল আপনার নিজের ভাই হচ্ছেন অপরাধী।' তাতে নবকুমারবাবু বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, 'ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আপনি আমাদের হয়ে তদন্ত করেছেন। ফলাফলের জন্য তো আপনি দায়ী নন। আপনার প্রাপ্য আপনি না নিলে আমরা অসন্তুষ্ট হব। সেটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।'

নিজের ভাই অপরাধী প্রমাণ হলেও, সেই সঙ্গে যে খুড়তুতো ভাইটিকে পেলেন নবকুমারবাবু, তেমন ভাই সহজে মেলে না। টিনটোরেটোর যীশু যে এখন উপযুক্ত লোকের হাতেই গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ইউরোপের কোনও বিখ্যাত মিউজিয়ামের দেয়ালে শোভা পাবে।

আমরা আর একদিন ছিলাম বৈকুণ্ঠপুরে। ফেরার পথে লালমোহনবাবুর অনুরোধে একবার ভবেশ ভট্টাচার্যের ওখানে ঢুঁ মারতে হল। সামনের বছর বৈশাখের জন্য জটায়ু যে উপন্যাসটা লিখবেন সেটার নাম 'হংকং-এ হিমসিম' হলে সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে ঠিক হবে কি না সেটা জানা দরকার।

দার্জিলিং জমজমাট

১

'সুখবর বলে মনে হচ্ছে ?'

লালমোহনবাবু ঘরে ঢুকতেই ফেলুদা তাঁকে প্রশ্নটা করল। আমি নিজে অবিশ্যি সুখবরের কোনও লক্ষণ দেখতে পাইনি। ফেলুদা বলে চলল, 'দু' বার পর পর বেল টেপা শুনেই বুঝেছিলাম, আপনি কোনও সংবাদ দিতে ব্যগ্র, তবে সেটা সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বুঝতে পারিনি। এখন স্পষ্ট বুঝছি সুসংবাদ।'

'কী করে বুঝলেন ?' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি তো হাসিনি।'

'এক নম্বর, আপনার মাজা দেওয়া চেহারা। হলদে পাঞ্জাবিটা নতুন, দাড়ি কামিয়েছেন নতুন ব্লেড দিয়ে, আফটার-শেভ লোশনের গন্ধে ঘর মাতোয়ারা, তারপর আপনি সচরাচর নটার আগে আসেন না ; এখন নটা বাজতে সতেরো।'

লালমোহনবাবু হেসে ফেললেন। 'ঠিকই ধরেছেন মশাই ! আপনাকে ব্যাপারটা না বলা অবধি সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না। সেই পুলক ঘোষালকে মনে আছে তো ?'

'চিত্র পরিচালক ? যিনি আপনার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে থেকে হিন্দি ছবি করেছিলেন ?'

'শুধু ছবি নয়, হিট ছবি। তখন থেকেই বলে রেখেছিল ভবিষ্যতে আবার আমার গল্প থেকে ছবি করবে। অ্যাদ্দিনে সেটা ফলেছে।'

'এটা কোন্‌টা ?'

'সেই কারাকোরামের গল্পটা। অবিশ্যি কারাকোরাম আর নেই ; সেখানে হয়ে গেছে দার্জিলিং।'

'কোথায় কারাকোরাম, আর কোথায় দার্জিলিং!'

'তবু নেই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো মশাই। আর আমার রেটও তো বেড়ে গেছে অনেক। ফর্টি থাউজ্যান্ড!'

'বলেন কি? আমার দু বছরের রোজগার।'

'তা, যেখানে ছাপ্পান্ন লাখ টাকা বাজেট—সেখানে রাইটারকে ফর্টি থাউজ্যান্ড দেবে না? ওখানে টপ অভিনেতারা কত পায় জানেন?'

'তা মোটামুটি জানি বইকি!'

'তবে? আমার এ ছবিতে হিরো করছে রাজেন রায়না। সে নিচ্ছে বারো লাখ। আর ভিলেন করছে মহাদেব ভার্মা। এর রেট আরও বেশি। সবে পাঁচখানা ছবি করেছে, কিন্তু পাঁচখানাই সিলভার জুবিলি হিট।'

'তা, পুলক ঘোষাল আপনার এত পেয়ারের, আপনাকে দার্জিলিং-এ ডাকল না?'

'সেইটে বলতেই তো আসা! ডাকবে না মানে? ওর গ্র্যান্ডফাদার ডাকবে। আর আমাকে একা নয়, আমাদের তিনজনকেই ডেকেছে। অবিশ্যি আমি বলিচি ইনভিটেশনের দরকার নেই—আমরা এমনিই যাব। কী—ঠিক বলিনি?'

শেষ কবে গেছি দার্জিলিং? মনেই নেই; শুধু এইটুকু মনে আছে যে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির শুরু দার্জিলিং-এ। আমি ছিলাম খুব ছোট, আর ওর নরম-গরম ধমক প্রায়ই শুনতে হত। এখন ফেলুদা আমাকে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে পরিচয় দেয়। তখন সেটা করতে গেলে লোকে হাসত। বেশ কিছু দিন থেকেই মনে হয়েছে যে আবার দার্জিলিং গেলে বেশ হয়, কিন্তু গত পাঁচ-ছ' বছরে ফেলুদার পসার বেড়েছে অনেক। সেই সঙ্গে অবিশ্যি রেটও বেড়েছে। আজকাল ওর দিব্যি চলে যায়। গত ছ' মাসে পাঁচটা তদন্ত করতে হয়েছে ওকে। তার মধ্যে চন্দননগরের একটা জোড়া খুনের কেস ছাড়া সব কটাতেই ও সফল হয়েছে, তারিফ পেয়েছে, পয়সা কামিয়েছে। তিন মাস আগে একটা কালার টি ভি কিনেছে ও। তা ছাড়া ওর পুরনো বইয়ের শখ, সেই সব বই বিস্তর কিনে ও

তাক ভরিয়েছে। এটা আমি বুঝেছি যে ফেলুদা খরুচে লোক। টাকা জমানোর দিকে ততটা আগ্রহ নেই। যা ঘরে আসে তার বেশির ভাগই খরচ হয়ে যায়, আর সেটা যে শুধু নিজের পিছনে, তা নয়। লালমোহনবাবু আমাদের জন্য এত করেন বলে ফেলুদা সুযোগ পেলেই তাঁকে কিছু না কিছু দেয়। আফটার-শেভ লোশনটা ওরই দেওয়া। সেটা 'স্পেশাল অকেশনে' লালমোহনবাবু ব্যবহার করেন। বোঝাই যাচ্ছে আজকে সে রকমই একটা দিন।

সামনে পুজো, ফেলুদা ঠিকই করেছিল মাস কয়েক আর কোনও কাজ নেবে না। কাজেই দার্জিলিং যাওয়ায় তার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। এমনিতেই দার্জিলিং ওর খুব প্রিয় জায়গা। ও বলে, বাংলা দেশটা ভারতবর্ষের কটিদেশে হওয়াতে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে—বাংলার উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটা ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে নেই। এটা নাকি একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট অফ জিয়োগ্রাফি'। 'এত বৈচিত্র্য আর কোনও একটা প্রদেশে পাবি না', বলে ফেলুদা। 'শস্য-শ্যামলাও পাবি, রুক্ষতাও পাবি, সুন্দরবনের মতো জঙ্গল পাবি, গঙ্গা পদ্মা মেঘনার মতো নদী পাবি, সমুদ্র পাবি, আবার উত্তরে হিমালয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও পাবি।'

'বলুন মশাই, যাবেন কি না', শ্রীনাথের আনা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে বললেন লালমোহনবাবু।

'দাঁড়ান, আর একটা ডিটেল জেনে নিই।'

'বলুন কী জানতে চান।'

'গেলে কবে যাওয়া?'

'ওদের একটা দল অলরেডি দার্জিলিং পৌঁছে গেছে। তবে আগামী শুক্রবারের আগে কাজ আরম্ভ হচ্ছে না। আজ হল রবি।'

'শুটিং দেখার ব্যাপারে আমার তেমন কোনও উৎসাহ নেই। কাজটা কি মাঠে-ঘাটে হচ্ছে, না বাড়ির ভিতর?'

'বিরূপাক্ষ মজুমদারের নাম শুনেছেন?'

'বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর?'

'ছিলেন, এখন আর নেই। একটা মাইল্ড সেরিব্রাল স্ট্রোকের

পর বাহান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করেন।'

'তা ছাড়া ওঁর তো আরও অনেক গুণপনা আছে না? 'ভদ্রলোক স্পোর্টসম্যান ছিলেন তো?'

'এককালে ভারতবর্ষের বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। শিকারও বোধহয় করতেন।'

'ওঁর একটা শিকারকাহিনী একটা পত্রিকায় পড়েছি।'

'খুব বড় ফ্যামিলির ছেলে। এঁর পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে নয়নপুরের জমিদার ছিলেন। দার্জিলিং-এ ওঁদের একটা পুরনো বাড়ি আছে। একতলা বাংলো টাইপের ছড়ানো বাড়ি, ষোলটা ঘর। বিরূপাক্ষ মজুমদার রিটায়ার করার পর সেখানে গিয়েই থাকেন। ওঁদের বাড়ির দু'খানা ঘরে কিছু শুটিং হবে। পারমিশন হয়ে গেছে। বাকি শুটিং বাইরে নানান জায়গায় ছড়িয়ে। এরা মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে রয়েছে। আমরা অন্য কোনও হোটেলে থাকতে পারি।'

'সেই ভালো। ফিল্ম পার্টির সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখিটা আমার পছন্দ হয় না। দার্জিলিং-এ ইদানীং অনেক নতুন হোটেল হয়েছে। তার একটাতে থাকলেই হল।'

আমি বললাম, 'হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি কাগজে।'

'ঠিক বলেছিস', বলল ফেলুদা। 'আমিও দেখেছি।'

'তা হলে আর কী', বললেন লালমোহনবাবু, 'ব্যবস্থা করে ফেললেই হয়।'

ব্যবস্থা তিন দিনের মধ্যেই হয়ে গেল। বিষ্যুদবার ত্রিশে সেপ্টেম্বর দুপুরে এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, আমাদের সঙ্গে পুলক ঘোষালও চলেছেন। আর সে-সঙ্গে চলেছে ছবির হিরো, হিরোইন আর ভিলেন। লালমোহনবাবুর গল্পে কোনও হিরোইন ছিল না; সেটা বুঝলাম এঁরা ঢুকিয়েছেন। পুলক ঘোষাল ফেলুদাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, 'লালুদার গল্প হওয়াতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভেরি লাকি। তবে আশা করি, আগের বারের মতো এবারও আপনাকে তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হবে না।'

হিরো রাজেন রায়না, হিরোইন সুচন্দা সেন আর ভিলেন মহাদেব ভার্মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন পুলক ঘোষাল। সুচন্দাকে দেখতে ভালো, তবে রং একটু বেশি মেখেছেন, রাজেন রায়নার ছবি আমি আগেই দেখেছি—বেশ স্মার্ট, হাসিখুশি ভদ্রলোক, একটা দাড়ি আছে বেশ ছোট করে আর যত্ন করে ছাঁটা, লম্বায় ফেলুদারই মতো, আর শরীরটাকেও বেশ ফিট বলেই মনে হল। ইনি নবাগত হলেও বয়স অন্তত চল্লিশ তো হবেই; তবে সেটা মেক-আপ দিলে ক্যামেরায় আর ধরা পড়বে বলে মনে হয় না। লালমোহনবাবু ওঁর হিরো প্রখর রুদ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন—লম্বায় সাড়ে ছ ফুট, পঞ্চাশ ইঞ্চি ছাতি, খাঁড়ার মতো নাক, আর চোখ দেখলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে—সে-রকম চেহারার কোনও অভিনেতা কোনও দেশে আছে বলে আমার জানা নেই।

আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগল মহাদেব ভার্মাকে। ইনি হলেন যাকে ইংরিজিতে বলে পালিশ করা ভিলেন। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, নাকের নীচে সরু চাড়া-দেওয়া গোঁফ, দেখে মনে হয় প্রয়োজনে খুন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। তার উপর দেখলাম ভদ্রলোক পারফিউম ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা যায় ইনি শৌখিনও বটে। পারফিউম অবিশ্যি রাজেন রায়নাও মেখেছেন, তবে তার গন্ধ অন্য। ফেলুদা পরে বলেছিল যে মহাদেব ভার্মার সেন্টটা হচ্ছে ডেনিম, আর রায়নারটা হল ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার।

এয়ারপোর্টেই লাউড স্পিকারে বলল যে বাগডোগরার প্লেন এক ঘণ্টা লেট আছে। তাই আমরা সকলেই রেস্টোরান্টে চা-কফি খেতে চলে গেলাম। এ ব্যবস্থাটা অবিশ্যি পুলক ঘোষালই করলেন, আর আমরা তাঁর অতিথি হয়েই গেলাম।

রেস্টোরান্টে মহাদেব ভার্মার সঙ্গে ফেলুদার কথা হল। আমি ফেলুদার পাশেই বসেছিলাম, তাই সব কথাই শুনতে পেলাম।

ফেলুদাই প্রথম শুরু করল, বলল, 'আপনি তো বোধহয় কয়েক বছর হল এ লাইনে এসেছেন?'

ভার্মা বললেন, 'হ্যাঁ, সবে তিন বছর হয়েছে। তার আগে আমার

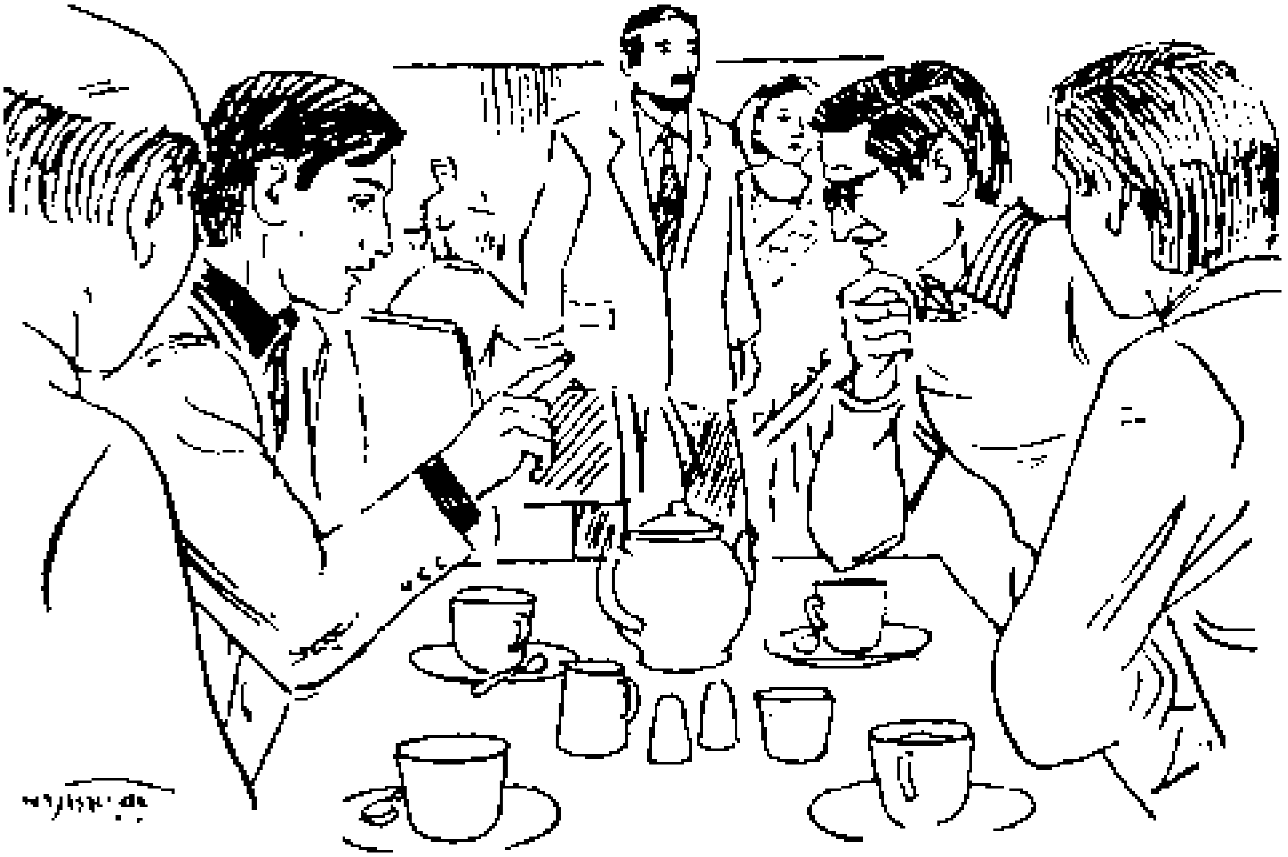

ছিল ভ্রমণের নেশা। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি ; এমন কি বছর পাঁচেক আগে লে-লাদাক পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। সেখান থেকে যাই কাশ্মীর। শ্রীনগরে একটা শুটিং হচ্ছিল, সেই ছবির পরিচালকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয় ; তিনিই আমাকে ছবিতে অফার দেন। এখন অবিশ্যি আর ফিল্ম ছাড়ার কথা ভাবাই যায় না।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন, এবার তাঁর প্রশ্নটা করে ফেললেন। 'আপনি যে চরিত্রটা করছেন, সেটা আপনার কেমন লাগল ?'

'খুব জোরদার চরিত্র', বললেন মহাদেব ভার্মা। 'বিশেষ করে আমি যেখানে হিরোইনকে আমার সামনে ধরে হিরোর প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছি, আর হিরো হাতে রিভলভার নিয়েও কিছু করতে পারছে না, সে দৃশ্যটা সত্যি নাটকীয়।'

অবিশ্যি এমন কোনও দৃশ্য বইয়ে নেই। লালমোহনবাবুর মুখের হাসিটা তাই কেমন যেন শুকিয়ে গেল।

এবার মহাদেব ভার্মা ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি তো গোয়েন্দা বলে শুনলাম। তা গোয়েন্দারা তো

শুনেছি, একজন মানুষকে দেখেই তার বিষয়ে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। আপনি আমাকে দেখে কিছু বলুন তো দেখি।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'গোয়েন্দারা অবশ্যই জাদুকর নন। তাঁরা যেটুকু বোঝেন তার কিছুটা পর্যবেক্ষণের জোরে, আর কিছুটা মনস্তত্ত্বের সাহায্যে। এ দুটোর ভিত্তিতে এটুকু বলতে পারি যে আপনি কিছুটা নিরাশ বোধ করছেন।'

'কেন?'

'কারণ আপনি প্রায়ই কথা বলতে বলতে এদিক-ওদিক দেখছেন আর বেশ বুঝতে পারছেন যে, এই লোক-ভর্তি রেস্টোরান্টে আপনাকে অনেকেই চিনতে পারছে না। একটু আগেই লক্ষ করলাম যে, আপনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অথচ হিরো রাজেন্দ্র রায়নাকে অনেকেই চিনেছে, অনেকেই এগিয়ে এসে তার অটোগ্রাফ নিয়েছে। শেষে দেখলাম, আপনি আপনার কালো চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন, যদি তার ফলে কেউ চেনে; কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না দেখে আপনি আবার চশমাটা পরে নিলেন।'

মহাদেব ভার্মা এবার আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক বলেছেন। বম্বেতে আমাকে পাবলিক প্লেসে দেখলে রীতিমতো হই-চই পড়ে যায়। আপনাদের বাঙালিরা বোধহয় বেশি হিন্দি ছবি দেখেন না।'

'যথেষ্ট দেখেন', বললেন লালমোহনবাবু, 'কিন্তু আপনার তিনখানা ছবি এখনও এখানে রিলিজ় হয়নি। অবিশ্যি আমি যে সিনেমার খুব খবর রাখি তা নয়, তবে আমার গল্পে যিনি ভিলেনের পার্ট করছেন, তাঁর বিষয়ে গত ক' দিনে কিছু খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম ফিল্ম পত্রিকাগুলো থেকে।'

'আই সি', খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন মিঃ ভার্মা। 'যাই হোক, মিঃ মিত্তিরের অবজারভেশন যে দারুণ শার্প, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

ফেলুদার পর্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা অবিশ্যি দার্জিলিং-এ খুব ভালোভাবেই হয়েছিল, কিন্তু সে কথা, যাকে বলে, 'যথাস্থানে'

বলব। আপাতত প্লেন এসে গেছে, আমাদের ডাক পড়ে গেছে, তাই উঠে পড়তে হল। এখন সিকিউরিটি খুব কড়া, আমি জানি ফেলুদা তাই তার কোল্ট রিভলভারটা সুটকেসে চালান দিয়েছে, সেটা ইতিমধ্যে আমাদের অন্য মালের সঙ্গে প্লেনে উঠে গেছে। আজকাল ফেলুদা আর কোনও রিস্ক নেয় না; স্রেফ ছুটি ভোগ করতে গিয়েও তাকে এত বার তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যে, ও রিভলভার ছাড়া কোথাও যায় না।

সিকিওরিটি থেকে লাউঞ্জে গিয়ে বসার দশ মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল—'দ্য ফ্লাইট টু বাগডোগরা ইজ রেডি ফর ডিপারচার'। আমরা তিনজন আর সেই সঙ্গে শুটিং-এর দল, প্লেনে গিয়ে উঠলাম। এখন আমরা সমতল ভূমিতে, কিন্তু আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উঠে যাব ৬০০০ ফুট উঁচুতে। অক্টোবরে দার্জিলিং-এ বেশ ঠাণ্ডা, ভাবতেই মনটা নেচে উঠছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে সামনে অ্যাডভেঞ্চার আছে, যদিও সেটা ফেলুদাকে বলায় ও দাবড়ানি দিয়ে বলে দিল, 'তার কোনও ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কাজেই তোর আশা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

এর পরে আর আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে যাইনি।

২

কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলটা দিব্যি ছিমছাম। ঘরে ঘরে টেলিফোন, হিটার, স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা-গরম জলের ব্যবস্থা, বিছানার চাদর, বালিশ পরিষ্কার—মোট কথা সব কিছু দেখে মনটা যাকে বলে বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। দিন দশেকের জন্য এসেছি, তাই থাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি ভালো না হলে মনটা খুঁতখুঁত করে।

পথে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। সোনাদা এসে পর লালমোহনবাবু তাঁর রাজস্থান থেকে কেনা কান-ঢাকা চামড়া আর পশমের টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নিলেন। পথের দুধারে পাহাড়ের দৃশ্য দেখে উনি কতবার যে 'বাঃ' বলেছেন, তার হিসেব নেই। [illegible] কার্শিয়াং রেলওয়ে রেস্টোরান্টে চা খাবার সময় ভদ্রলোক

সত্যি কথাটা বলে ফেললেন। সেটা হল এই যে, তিনি এই প্রথম দার্জিলিং-এ চলেছেন।

ফেলুদার চোখ কপালে উঠে গেল।

'সে কি, আপনি এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘাই দেখেননি?'

'নো স্যার।' একগাল হেসে জিভ কেটে বললেন লালমোহনবাবু।

'ইস্—আপনাকে প্রচণ্ড হিংসে হচ্ছে।'

'কেন?'

'প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার যে কী অদ্ভুত অনুভূতি, সেটা তো আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই বুঝবেন! ইউ আর ভেরি লাকি, মিস্টার গাঙ্গুলি।'

আকাশ পরিষ্কার থাকলে কার্শিয়ং থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, কিন্তু আজ মেঘলা। ঘুম যখন পৌঁছলাম তখন আলো পড়ে আসছে, আর তখনও মেঘ কাটেনি। মোট কথা লালমোহনবাবুর ভাগ্যে ব্যাপারটা এখনও ঘটেনি। এটা অবিশ্যি দার্জিলিং-এর বিখ্যাত ঘটনা। এমনও হতে পারে যে এই দশ দিনের এক দিনও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে না। তা হলে অবিশ্যি খুবই খারাপ হবে। আমি নিজে এর আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে থাকলেও আবার নতুন করে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। এই একটা দৃশ্য, যা কোনও দিনও পুরনো হবার নয়।

হোটেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেল থেকে মিনিট পাঁচেক খাড়াই উঠেই ম্যাল। যখন পৌঁছলাম, তখন দোকানের আর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার মশাই, গাড়িটাড়ি দেখছি না কেন?' ফেলুদাকে বুঝিয়ে দিতে হল, দার্জিলিং-এর বেশ খানিকটা অংশে গাড়ি চলা নিষিদ্ধ। ম্যালটা হল সে রকম একটা জায়গা। এখানে শুধু হাঁটা চলে আর ঘোড়ায় চড়া চলে। 'আপনি ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'নাঃ', বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে উটেই যখন চড়া আছে,

তখন ঘোড়া তো তার কাছে নস্যি।'

আগেই বলেছি যে বিরূপাক্ষ মজুমদার বলে একজনের বাড়িতে শুটিং হবার কথা আছে। আশ্চর্য এই যে, প্রথম দিনই ম্যালে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সেটা হল পুলক ঘোষালের মারফত। শুটিং পার্টি ম্যালে বেড়াতে বেরিয়েছে, পুলক ঘোষাল একবার আগেই দার্জিলিং এসে বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়ি দেখে পছন্দ করে গেছেন, ভদ্রলোকও কোনও আপত্তি করেননি। ফেলুদাকে দেখেই পুলকবাবু এগিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে একজন ফেল্ট হ্যাট আর স্যুট পরা ভদ্রলোক।

'এঁর বাড়িতেই আমরা শুটিং করছি', বললেন পুলকবাবু, 'ইনি হলেন মিস্টার বিরূপাক্ষ মজুমদার।'

তার পর পুলকবাবু আমাদের তিন জনের পরিচয় দিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে।

'আপনার সঙ্গে শুটিং-এর কী সম্পর্ক?' ফেলুদাকে জিগ্যেস করলেন মিঃ মজুমদার।

ফেলুদা বলল, 'আমার কোনও সম্পর্ক নেই, তবে আমার এই বন্ধুটি একজন বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক। এঁরই একটি গল্প থেকে ছবিটা হচ্ছে।'

'বাঃ, ভেরি গুড! ইনি ক্রাইম রাইটার, আর আপনি গোয়েন্দা—ভেরি গুড! প্রদোষ মিত্র নামটা তো জানা বলে মনে হচ্ছে। আপনার নাম তো কাগজে বেরিয়েছে কয়েকবার, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বলল ফেলুদা। 'গত বছর বোসপুকুরে একটা খুনের ব্যাপারে আমি কিছুটা সাহায্য করেছিলাম।'

'দ্যাট্‌স রাইট', বলে উঠলেন ভদ্রলোক, 'তাই চেনা চেনা লাগছিল। আমার আবার একটা বাতিক আছে; আমি খবরের কাগজের খবর সংগ্রহ করি। আমার সতের বছর বয়স থেকে এই হবি। সব খবর নয়, যাকে বলা যায় একটু গরম খবর। একত্রিশটা খণ্ড হয়েছে সেই খবরের খাতার। এখন তো রিটায়ার করেছি; মাঝে মাঝে সেই সমস্ত পুরনো খাতার পাতা উল্টে উল্টে দেখি। লোকে গল্পের বই পড়ে, আর আমি পুরনো খবর পড়ি। এখন অবিশ্যি আমার একজন হেল্‌পার হয়েছে। রজত—আমার সেক্রেটারি—আমার কাটিংগুলো খাতায় সেঁটে দেয়। আপনার কাটিংও আছে তার মধ্যে।'

আমরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিলাম ম্যালের মুখে ফোয়ারাটা ছাড়িয়ে মেন রোডের দিকে। মিঃ মজুমদার বললেন, 'আমার একটা ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, কেনা দরকার। চলুন না ওই কেমিস্টের দোকানে।'

আমরা গিয়ে দোকানে ঢুকলাম। ভদ্রলোক টফ্রানিল নামে রাংতায় মোড়া একত্রিশটা বড়ি কিনলেন। বললেন, 'এ হল অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিল্‌স্—আমার এক মাসের স্টক। রোজ একটি করে না খেলে আমার ঘুম হয় না।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'একদিন গিয়ে আপনার খাতাগুলো একটু দেখব।'

'একশোবার।' বললেন ভদ্রলোক। 'ছুটি আর মোল্ট

ওয়েলকাম। এও আপনাকে দেখিয়ে দেব যে, এখনও কিনারা হয়নি এমন পুরনো তদন্তের খবরও আমার খাতায় সাঁটা আছে। আমি বলছি প্রায় বিশ বছর আগের কথা।'

'খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।' বলল ফেলুদা।

'অবিশ্যি আমার নিজের জীবনটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়,' বললেন ভদ্রলোক। 'এক এক সময় ইচ্ছে করে আত্মজীবনী লিখি, কিন্তু তার পরেই মনে হয়—সবগুলো সত্যি কথা তো লিখতে পারব না। আত্মজীবনী লিখতে গিলে কোনও কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। যাক্ গে—একদিন আসবেন।'

'কোন্ সময় গেলে আপনার ব্যাঘাত হবে না?'

'দ্য বেস্ট টাইম ইজ ইন দ্য মর্নিং। আমি বিকেলে একটু ঘুরতে বেরোই। মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল ছাড়িয়ে একটু গেলে বাঁয়ে একটা রাস্তা পাবেন যেটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। সেটা দিয়ে কিছু দূর গেলেই দেখবেন, গেটে "নয়নপুর ভিলা" লেখা একটা বাগানে ঘেরা বাংলো। সেটাই আমার বাড়ি।'

ভদ্রলোক হাত তুলে গুড বাই করে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘোড়ায় চাপলেন, সঙ্গে একজন সহিস। ফেলুদা বলল, 'রুগী মানুষ, খাড়াই ওঠা বারণ, তাই নিশ্চয়ই ঘোড়া ব্যবহার করেন। তবে বেশ লোক, তাতে সন্দেহ নেই।'

শুটিং পার্টির সকলে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে দেখছে। পুলকবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'মজুমদার মশাইকে কেমন লাগল?'

'খুব ভালো', বলল ফেলুদা। 'অসুখ হলে কী হবে, এখনও বেশ তাজা আছেন।'

'আর সব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট। শুটিং-এর বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করছিলেন।'

'উনি ছাড়া আর কে থাকেন ওঁর বাড়িতে?'

'ওঁর সেক্রেটারি আছেন, রজত বোস। এ ছাড়া জনা তিনেক চাকর, মালি আর সহিস আছে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। ওঁর ছেলে আসছেন কলকাতা থেকে। অন্তত আসার তো কথা। একটিই

ছেলে। মেয়ে আছে দুটি, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কলকাতায় থাকে না।'

'ভদ্রলোকের হবিটা কিন্তু খুব চিত্তাকর্ষক।'

'কাটিং জমানোর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। অনেকটা আমাদের সিধু জ্যাঠার কথা মনে পড়ছে।'

আমারও যে তা মনে হয়নি তা নয়, তবে সিধু জ্যাঠা শুধু খুনখারাপির খবরই জমান না; ইন্টারেস্টিং খবর হলেই সেটা সেঁটে রাখেন।

কথা আর বেশি দূর এগলো না। পুলকবাবু বললেন শুটিং-এর অনেক তোড়জোড় আছে, এবার হোটেলে ফিরতে হবে। আগামীকাল নাকি খুব হাল্‌কা আউটডোরের কাজ রাখা হয়েছে; তার পরদিন থেকে আর্টিস্ট নিয়ে কাজ শুরু হবে, আর প্রথমেই বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে কাজ।

পুলক ঘোষাল সমেত ফিল্‌মের দল চলে যাবার পর আমরা ম্যালের কাছেই কেভেনটারের দোকানের খোলা ছাতে বসে হট চকোলেট খেলাম। লালমোহনবাবু খুব তৃপ্তি সহকারে চকোলেটে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মশাই, আমার মন কিন্তু একটা কথা বলছে।'

'কী বলছে?'

'বলছে এ যাত্রা বৃথা যাবে না।'

'বৃথা কেন যাবে? দার্জিলিং-এ এসেছি চেঞ্জে, এমন চমৎকার ক্লাইমেট, বৃথা কখনও যেতে পারে? পলিউশন-ফ্রি আবহাওয়া—শরীর সারতে বাধ্য।'

'আমি সেদিক দিয়ে বলছি না', একটা বিজ্ঞ হাসি হেসে বললেন জটায়ু।

'তবে কোন দিকে দিয়ে বলছেন?'

'আমি আপনার পেশার কথা ভাবছি।'

'আমার পেশা?'

'আমার মন কেন যেন বলছে যে, আপনাকে কাজে লেগে পড়তে হবে।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'আসলে মুশকিলটা

করতে আমার পেশা নয়, আপনার পেশা। আপনার স্বভাবই হল অলিতে গলিতে রহস্যের গন্ধ পাওয়া। অবিশ্যি যদি তেমন কিছু ঘটেই বসে, মানে সত্যিই, তা হলে ফেলু মিত্তির হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'এই তো চাই! এই তো এ. বি. সি. ডি.-র পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনোভাব!'

এইখানে বলে রাখি, এ. বি. সি. ডি. হল ফেলুদাকে দেওয়া লালমোহনবাবুর খেতাব। এর মানে হল এশিয়াজ বাইগেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর। কাজেই উনি ফেলুদাকে মাঝে মাঝে এ. বি. সি. ডি. বলে সম্বোধনও করে বসেন।

আমি জানি না, কিন্তু বিরূপাক্ষ মজুমদারের সঙ্গে সেটুকু আলাপ হল, তাতে আমারও ভদ্রলোককে বেশ রহস্যজনক চরিত্র বলে মনে হল। বছরের পর বছর প্রায় একাই দার্জিলিং-এ পড়ে আছেন, খাতায় গরম গরম খবর সাঁটছেন, আর পুরনো খবর পড়ে দেখছেন। অবিশ্যি তার মানেই যে তাঁকে ঘিরে কোনও ক্রাইম ঘটবে, সেটা ভাবার কোনও যুক্তি নেই। আসল কথাটা হচ্ছে কি—ফেলুদা চেঞ্জে গেলেও সেখানে শেষ পর্যন্ত তাকে গোয়েন্দার ভূমিকা নিতেই হয়। এটা এতবার দেখেছি যে, মন বলছে এবারও সেটা না হয়ে যায় না।

দেখা যাক, কপালে কী আছে।

৩

'সাব্লাইম' কথাটা লালমোহনবাবুকে এই প্রথম ব্যবহার করতে শুনলাম। অবিশ্যি শুধু সাব্লাইম নয়, তার সঙ্গে স্বর্গীয়, হেভেনলি, অপার্থিব অনির্বচনীয় ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে এথিনিয়াম ইস্কুলের কবি মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা একটি ৮' লাইনের কবিতা আবৃত্তি করে ফেললেন ভদ্রলোক। ঘটনা আর কিছুই না, দ্বিতীয় দিন ভোরে উঠে ভদ্রলোক তাঁর ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েই দেখেন যে সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, আর তাতে সবে সূর্যের

গোলাপি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে তাঁর পাশে দাঁড় করালেন। বললেন, 'এ জিনিস কারুর সঙ্গে শেয়ার না করলে মজাই নেই।' আর তার পরেই বিশেষণের তোড়, আর সব শেষে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করা কবিতা—

'অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে!
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে—
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।'

আবৃত্তি শেষ করে দম নিয়ে বললেন, 'সম্বোধনে আ-কারটা এ-কার হয়ে যায়—সেটাকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন কবি, দেখছ তপেশ?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'দেখেছি', যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণটা ভালো জানা নেই বলে ভদ্রলোক ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

'এটাই গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ', বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদাও অবিশ্যি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিল, তবে সেটা হোটেলের বাইরে থেকে। ও ভোরে উঠে যোগব্যায়াম সেরে আমি ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। তার পর ম্যাল থেকে অবজারভেটারি হিলের চারিদিকে চক্কর মেরে চায়ের ঠিক আগে ফিরে এসেছিল। বলল, 'যতবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি, ততবার বয়সটা যেন কিছুটা কমে যায়। আর সবচেয়ে ভাল কথা—যেখানে-সেখানে বাড়ি উঠে শহরটার অনেক ক্ষতি করলেও অবজারভেটারি হিলের রাস্তাটার কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

'আমারও আজ প্রথম মনে হল যেন জন্ম সার্থক', বললেন লালমোহনবাবু।

'যাক!' বলল ফেলুদা। 'এত গাঁজাখুরি গল্প লিখেও যে

আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো টিকে আছে, সেটা জেনে খুব ভালো লাগল।'

'আজ তা হলে আমরা কী করছি?'

আমরা হোটেলের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করছিলাম; ফেলুদা কাঁটা দিয়ে ওমলেটের খানিকটা অংশ মুখে পুরে বলল, 'আজ সকালে একবার মজুমদার মশাইয়ের ওখানে যাবার ইচ্ছে আছে। কাল থেকে ওঁর বাড়িতে শুটিং আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন বড্ড ভিড়। আজ মনে হয় নিরিবিলি বসে একটু কথা বলা যাবে। এমন লোককে কালটিভেট করাটা আমি কর্তব্যের মধ্যে ধরি।'

'তথাস্তু', বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাল থেকে নেমে দাশ স্টুডিও আর কেভেনটারের পাশ দিয়ে নেহরু রোড ধরে সোজা তিন কোয়ার্টার মাইল গেলে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল। সেটা ছাড়িয়ে গেলেই পাব আমরা মিঃ মজুমদারের বাড়ির রাস্তা।

সেই রাস্তা ধরে কিছু দূর উঠতেই একজন বাঙালি ভদ্রলোককে জিগ্যেস করতে উনি বলে দিলেন যে, আর মিনিট খানেক হাঁটলেই আমরা নয়নপুর ভিলাতে পৌঁছে যাব।

বাড়ি খুঁজে পেতে কোনই অসুবিধা হল না। লাল টালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলো বাড়ি, বেশ ছড়ানো, তিন দিক ঘিরে রয়েছে সুন্দর বাগান, আর পিছনে পুব দিকে ঘন ঝাউবনের পরেই উঠেছে খাড়াই পাহাড়।

বাগানে একটা মালি কাজ করছিল, সে আমাদের দেখেই এগিয়ে এল।

'মিঃ মজুমদার আছেন?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'কী নাম বলব?'

'বল যে, কাল যাঁর সঙ্গে সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছিল, সেই মিত্তিরবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

মালি খবর দিতে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে বাড়িটার শোভা দেখছিলাম। উত্তরে চাইলেই সোজা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। এখন ঝলমলে রুপোলি। যিনিই বাড়িটা বানিয়ে থাকুন, তাঁর রুচির

তারিফ করতে হয়।

মালির পিছন পিছন দেখি, মিঃ মজুমদার নিজে বেরিয়ে এসেছেন।

'গুড মর্নিং! আসুন আসুন, ভিতরে আসুন!'

আমরা তিনজন বাড়ির নাম লেখা সাদা কাঠের গেট খুলে ভিতরে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন, সেটা দিনের আলোতে দেখে বুঝতে পারছি। দেখে অসুস্থ বলে মনেই হয় না। মিঃ মজুমদারের সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিলেন, জানলাম তিনিই হলেই সেক্রেটারি রজত বসু। খয়েরি ট্রাউজারের উপর গাঢ় নীল পোলো-নেক পুলোভার পরেছেন, মাঝারি হাইট, রং বেশ পরিষ্কার।

আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন মিঃ মজুমদার। আমরা ভাগাভাগি করে দুটো সোফায় বসলাম। ঘরের এক পাশে একটা কাচের আলমারিতে গুচ্ছের ছোট-বড় রুপোর কাপ সাজানো রয়েছে। বোঝা যায় সেগুলো মিঃ মজুমদার নানান সময়ে নানান স্পোর্টস প্রতিযোগিতাতে পেয়েছেন। মাটিতে একটা লেপার্ডের ছাল, আর দেওয়ালে দুটো হরিণ আর একটা বাইসনের মাথাও দেখলাম।

'আজ সন্ধ্যায় আমার ছেলে সমীরণ আসবে', বললেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। 'বাপ-ছেলের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না। সে ব্যবসাদার, শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে।'

'তিনি কি ছুটিতে আসছেন, না কোনও কাজে?'

'সাতদিনের ছুটিতে। অন্তত বলছে তো তাই, তবে ও চুপচাপ বসে ছুটি ভোগ করার ছেলে নয়। ভয়ানক ছটফটে। ত্রিশ হতে চলল, এখনও বিয়ে করেনি। আর কবে করবে জানি না। যাকগে—এখন আপনাদের কথা বলুন।'

'আমরা বরং আপনার কথা শুনতে এসেছি', বলল ফেলুদা।

'আমার কথার তো শেষ নেই,' বললেন মিঃ মজুমদার। 'আই হ্যাভ লেড এ ভেরি কালারফুল লাইফ। অবিশ্যি পরের দিকে সেটল করে গিয়েছিলাম। একটা ব্যাঙ্কের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে

আমার ঘাড়ে। স্বভাবতই তখন অনেকটা সামলে নিতে হয়। তরুণ বয়সটা—শুধু তরুণ কেন, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত—খুব হই-হল্লোড় করেছি। খেলাধুলো, আউটডোর-ইনডোর, শিকার, কিছুই বাদ দিইনি।'

'আর তার সঙ্গে আপনার কাটিং জমানোর হবি।'

'হ্যাঁ, সেটা কখনও বাদ পড়েনি। রজত আপনাকে একটা নমুনা দেখিয়ে দেবে।'

ভদ্রলোক সেক্রেটারির দিকে ইঙ্গিত করাতে তিনি উঠে গিয়ে ভিতরের ঘর থেকে একটা মোটা বড় খাতা এনে ফেলুদার হাতে দিলেন। আমি আর লালমোহনবাবু উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম।

বিচিত্র খাতা, তাতে সন্দেহ নেই।

'আপনি দেখছি লন্ডনের কাগজ থেকেও কাটিং রেখেছেন,' বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ', বললেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। 'লন্ডনে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে। তাকে বলাই আছে—কোনও সেনসেশন্যাল খবর পেলেই যেন আমাকে কেটে পাঠিয়ে দেয়।'

'খুন রাহাজানি অ্যাক্সিডেন্ট অগ্নিকাণ্ড আত্মহত্যা—কিছুই বাদ নেই দেখছি।'

'তা নেই', বললেন মিঃ মজুমদার।

'কিন্তু আপনি কী একটা ক্রাইমের কথা বলেছিলেন, যেটার কোনও কিনারা হয়নি?'

'হ্যাঁ—তেমন একটা ক্রাইম আছে বটে। সেটার খবর আপনি খাতায় পাবেন; আর-একটি আছে যেটা খাতায় পাওয়া যাবে না, কারণ সেটা খবরের কাগজের কানে পৌঁছায়নি।'

'সেটা কী ব্যাপার?'

'সেটা আমায় জিগ্যেস করবেন না, কারণ তার উত্তর আমি দিতে পারব না। আমায় মাপ করবেন। যাই হোক, রজত—একবার যাও তো সিক্সটি নাইনের ভল্যুমটা নিয়ে এস।'

রজতবাবু এবার আর একটা খাতা নিয়ে এসে ফেলুদাকে দিলেন।

'খাতার মাঝামাঝি পাবেন খবরটা', বললেন মিঃ মজুমদার। 'জুন মাসে ঘটে ঘটনাটা। স্টেটস্ম্যানের খবর, হেডিং হচ্ছে, যত দূর মনে পড়ে—"এমবেজ্‌লার আনট্রেসড"।'

'পেয়েছি' বলল ফেলুদা। তার পর কিছুটা পড়েই বলল, 'এ যে দেখছি আপনাদেরই ব্যাঙ্কের ঘটনা!'

'সেই জন্যেই তো ওটা ভুলতে পারি না', বললেন মিঃ মজুমদার। 'পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমাদেরই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে, নাম জি বালাপোরিয়া—প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে হাতিয়ে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ বিস্তর চেষ্টা করেও তার আর সন্ধান পায়নি।

আমি তখন ছিলাম ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।'

ফেলুদা বলল, 'যদিও অনেক দিনের ঘটনা, তাও আমার ব্যাপারটা আবছা আবছা মনে আছে। গোয়েন্দা হবার আগে এই ধরনের ক্রাইমের খবর আমিও খুঁটিয়ে পড়তাম।'

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু আর আমিও খবরটা পড়ে ফেলেছি।

বিরূপাক্ষবাবু বললেন, 'তখনই আমার একবার মনে হয়েছিল যে, শার্লক হোম্‌স বা এরকুল পোয়ারোর মতো একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা থাকলে হয়তো ব্যাপারটার একটা সুরাহা হত। পুলিশের উপর আমার নিজের যে খুব একটা আস্থা আছে, তা নয়।'

ফেলুদা কিছুক্ষণ খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে ধন্যবাদ দিয়ে ফেরত দিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। বেয়ারাটির বেশ ভদ্র চেহারা, হঠাৎ দেখলে চাকর বলে মনে হয় না। আমরা ট্রে থেকে কফি তুলে নিলাম।

ফেলুদা বলল, 'বাইরে আপনার ঘোড়াটা দেখলাম ; আপনি বুঝি ওটাতেই চলা-ফেরা করেন ?'

মিঃ মজুমদার বললেন, 'চলা-ফেরা মানে আমি শুধু বিকেলে একবার বেরোই। বাকি সময়টা আমি বাড়িতেই থাকি। আমার অভ্যাসগুলো ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয়। রিটায়ার করার পর থেকে আমার রুটিনটা একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে। আমার ইনসম্‌নিয়া আছে, সে কথা আগেই বলেছি। আমি ঘুমোই দুপুরবেলা, তাও এক গেলাস দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি খেয়ে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুই, উঠি ঠিক পাঁচটায়। তার পর চা খেয়ে বেরোই। রাত্তিরটা আমি বই পড়ি।'

'একদমই ঘুমোন না রাত্রে ?' ফেলুদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'একদমই না', বললেন ভদ্রলোক। 'অবিশ্যি, এককালে আমার ঠাকুরদাদারও শুনেছি এই বাতিক ছিল। তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর রাতটা ছিল দিন, আর দিনটা রাত। জমিদারীর কাজকর্ম তিনি রাত্রেই দেখতেন, আর সারা দুপুর আফিং খেয়ে

ঘুমোতেন। ভালো কথা, আপনার ধূমপানের প্রয়োজন হলে আমার সামনেই করতে পারেন; আই ডোন্ট মাইন্ড।'

'থ্যাঙ্ক ইউ', বলে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। বিরূপাক্ষবাবুর যাটের কাছে বয়স হলেও তাঁকে বৃদ্ধ বলে মোটেই মনে হয় না।

'কাল থেকে তো আপনার বাড়িতে শুটিং শুরু হবে', বলল ফেলুদা। 'আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল যাবে।'

'আই ডোন্ট মাইন্ড', বললেন ভদ্রলোক। আমি থাকব বাড়ির উত্তর প্রান্তে, কাজ হবে দক্ষিণ দিকটায়। পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বেশ ভালো লাগল, তাই আর না করলাম না।'

এই কথা বলতে বলতেই একটা জিপের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দেখি ফিল্মের দল এসে গেছে। বাগান পেরিয়ে দরজার মুখে এসে টোকা মারলেন পুলক ঘোষাল।

'কাম ইন স্যার', বলে উঠলেন বিরূপাক্ষ মজুমদার।

পুলক ঘোষাল ঢুকে এলেন, তাঁর পিছনে মহাদেব ভার্মা আর রাজেন রায়না।

'আমরা শুটিং-এ বেরোচ্ছি', বলল পুলক ঘোষাল, 'তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। কাল থেকে তো আপনার এখানেই কাজ, তা ছাড়া এই দুটি অভিনেতার সঙ্গে আপনার আলাপও হয়নি। ইনি হলেন ছবির নায়ক রাজেন রায়না, আর ইনি হলেন ভিলেন মহাদেব ভার্মা।'

'বসুন, বসুন', বললেন মিঃ মজুমদার। 'যখন এলেন, তখন একটু কফি খেয়ে যান।'

'না স্যার! আজ আর বসব না। কাল থেকে তো প্রায় সারাটা দিনই এখানে থাকতে হবে। ভালো কথা, আপনার সেক্রেটারি বলছিলেন আপনি নাকি দুপুরটা ঘুমোন। তা, দুপুরে তো আমাদের কাজ হবে, এ বাড়ি থেকে একটু দূরে আমাদের জেনারেটর চলবে। তাতে আপনার ব্যাঘাত হবে না তো?'

'মোটেই না', বললেন মিঃ মজুমদার। 'আমি দরজা-জানলা ভেজিয়ে পরদা টেনে শুই। বাইরের কোনও আওয়াজ ঘরে ঢোকাই

না।'

লক্ষ করছিলাম ভদ্রলোক কথা বলার সময় বায়না আর ভাসির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। বললেন, 'যাক, এবার তা হলে বলতে পারব যে, ফিল্মস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অ্যাদ্দিন এ সৌভাগ্যটা হয়নি।'

এবার পুলক ঘোষাল লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

'লালুদা, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট ছিল।'

'কী ভাই?'

'আমার মেমরি খুব শার্প, লালুদা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, নাইনটিন সেভেনটিতে গড়পারে ফ্রেন্ডস ক্লাবে "ভুশণ্ডীর মাঠে" প্লে হয়েছিল। সরস্বতী পুজোয়। আপনার মনে পড়ছে?'

'বিলক্ষণ!'

'আপনি তাতে নদু মল্লিকের পার্ট করেছিলেন, মনে আছে?'

'বাবা, সে কি ভুলতে পারি! পাখোয়াজের বোলটা পর্যন্ত এখনও মনে আছে—ধা ধা ধিন্‌তা কত্তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তাকে!—ওঃ! সে কি ভোলা যায়? জীবনে আমার প্রথম এবং শেষ অভিনয়।'

'না না, শেষ নয়।'

'মানে?'

'এখানকার বেঙ্গলি ক্লাব আমাদের ডুবিয়েছে। বলেছিল দু-একটা ছোট পার্টের জন্য লোক দেবে, এখন বলছে তারা কলকাতায় চলে গেছে ছুটিতে। বিশেষ করে একটি পার্ট—বুঝেছেন লালুদা, ভিলেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান—'

'কে—অঘোরচাঁদ বাটলিওয়ালা?'

'হ্যাঁ দাদা!'

'কিন্তু তার তো বেশি কিছু করার নেই; শুধু দুটো সিন।'

'সেই দুটো সিন আমাদের একটু উদ্ধার করে দিতে হবে দাদা! কথা খুব কম। আজ বিকেলে গিয়ে আপনাকে ডায়ালগ দিয়ে আসবে। এ কাজটা কাইন্ডলি আপনি করে দিন। সবসুদ্ধ তিন দিনের কাজ।'

'আমরা কিন্তু আর দশ দিন মাত্র আছি।'

'এক উইকের মধ্যে আপনার কাজ শেষ করে দেব।'

'কিন্তু এই চেহারা নিয়ে—'

'আপনাকে মেক-আপ দেবো। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর একটা পরচুলা। ফার্স্টক্লাস মানাবে। কেয়া ভাই মহাদেব, মেরা চয়েস মে কুছ গলতি হ্যায় ?'

'নেহি নেহি ভাই', বললেন মহাদেব ভার্মা।

'আপনার সিগার খাওয়ার অভ্যেস আছে ?' লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করলেন পুলক ঘোষাল।

'ধূমপান করতুম এককালে', হাত কচলাতে কচলাতে বললেন লালমোহনবাবু, 'কিন্তু সিগারেট ছেড়েছি দশ বছর হল।'

'তাতে কী হল ? আর হ্যাঁ, চোখে একটা কালো চশমা।'

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, লালমোহনবাবু ব্যাপারটাতে ক্রমেই মেতে উঠছিলেন। এবার বললেন, 'ওক্কে ! যখন এত করে বলছ, তখন "না" করব না। আমার নিজের গল্পে একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স থাকলে মন্দ কী ? কিন্তু একটা কথা।'

'কী ?'

'আমার নামের পাশে যেন একটা "অ্যাঃ" থাকে। পেশাদারী অভিনেতা হতে আমি নারাজ। হলে অ্যামেচার, আর না হলে নয়। ঠিক তো ?'

'ওক্কে !' বললেন পুলক ঘোষাল।

এই সুযোগে আমিও একটা ব্যাপার সেরে নিলাম। পুলক ঘোষালকে জিগ্যেস করলাম, 'আমি শুটিং দেখতে আসতে পারি তো ?'

'একশোবার, ভাই, একশোবার', বললেন পুলক ঘোষাল।

পুলক ঘোষালের দল তাদের কথা সেরে শুটিং-এর তোড়জোড় করতে চলে গেল। আমাদের কফি খাওয়া শেষ, তাই আমরাও আর বসলাম না। ফেলুদাই প্রথমে উঠে পড়ে বলল, 'আজ তাহলে আসি ?'

'অ্যাঁ ?'

ভদ্রলোক যেভাবে প্রশ্নটা করলেন তাতে বুঝতেই পারলাম, তিনি কোনও একটা কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। পরমুহূর্তেই অবিশ্যি নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বললেন, 'উঠবেন ? ঠিক আছে। রয়েছেন যখন ক' দিন, তখন দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

আমরা তিনজনে নয়নপুর ভিলা থেকে বেরিয়ে উৎরাই দিয়ে হোটেলমুখো রওনা দিলাম।

ফেলুদা পথে কিছুই বলল না। কেন যেন, ও-ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। দুপুরে লাঞ্চ খাবার সময় লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কী মশাই, আমাদের অ্যাদ্দিনের আলাপ, আর এমন একটা খবর আপনি বেমালুম চেপে গেস্লেন ? ভুশণ্ডীর মাঠে-তে নদু মল্লিক ? বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার, আর আপনি সেই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ?'

লালমোহনবাবু একটা ফিশ ফ্রাইয়ের টুকরো মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'আরে মশাই, সে-রকম বলতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে হয়। নর্থ ক্যালকাটায় ক্যারম চ্যাম্পিয়ন ছিলুম ফিফটি নাইনে—এ খবর জানতেন ? এনডিওরেন্স সাইক্লিং-এ আমার কত কীর্তি আছে, সে সব আপনি জানেন ? আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মেডেল পেয়েছি—একবার নয়, থ্রি টাইমস্। দেবতার গ্রাস পুরো মুখস্থ ছিল। ফিল্মে অফার বিশ বছর আগেও পেয়েছি—তখন আমার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল—ভাবতে পারেন ? কিন্তু সে অফার নিইনি। তখন থেকেই মাইন্ড মেক আপ করেছি যে লেখক হব। শখের লেখক নয়, পেশাদারী লেখক। স্রেফ লিখে পয়সা করা যায়

কিনা দেখব। তার পরের ইতিহাস অবিশ্যি খুব সহজ। খগেন জ্যোতিষী বলেছিল—তোমার কলমে জাদু আছে, তুমি লেখো। তবে এতটা যে সাকসেস হবে, তা অবিশ্যি ভাবতে পারিনি।'

'একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি', বলল ফেলুদা।

'কী ?'

'এরা আপনাকে দিয়ে চুরুট খাওয়াবে। আপনি দশ বছর হল স্মোকিং ছেড়েছেন। সুতরাং একটা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে।'

'বলছেন ?'

'বলছি। এক কাজ করবেন। আজই একটা চুরুট কিনে ধোঁয়াটা পেটে না নিয়ে খাওয়া অভ্যাস করুন। পেটে গেলেই কিন্তু কাশির দমকের চোটে শট একেবারে মাটিংচকার হয়ে যাবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি অ্যাডভাইস, স্যার।'

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাত আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজ অবজারভেটরি হিলটায় একটা চক্কর মারার ইচ্ছে আছে। পাহাড়ের উত্তর দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়।

লালমোহনবাবু প্রথম যে সিগারেটের দোকানটা পেলেন, সেখান থেকেই একটা চুরুট কিনে নিলেন। প্রথম টানে ধোঁয়া পেটে চলে গিয়ে সত্যিই একটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা কোনও-মতে সামলে নিয়ে তার পর থেকে খুব সাবধানে ধোঁয়া টানামাত্র সেটা ছেড়ে দিতে লাগলেন। চুরুট হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের পার্সোনালিটির একটা বদল লক্ষ করছিলাম। বেশ একটা মিলিটারি মেজাজ, জুতোর গোড়ালি দিয়ে শব্দ তুলে হাঁটা, ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি নিয়ে এদিক-ওদিক চাওয়া। বুঝলাম, ভদ্রলোক অঘোরচাঁদ বাটলিওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে চলেছেন।

অবজারভেটরি হিলের পুবের রাস্তাটা দিয়ে গিয়ে যেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছি, অমনি সামনে দেখি বিকেলের পড়ন্ত রোদে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সোনার রঙ ধরতে শুরু করেছে। লালমোহনবাবুর আবার কাব্যের মেজাজ এসে পড়ল, 'অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে' বলে আর বাকি কবিতাটা

বললেন না। আমরা পুরো পাহাড়টা চক্কর দিয়ে আবার যখন ম্যালে ফিরে এলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে, সূর্য পাহাড়ের পিছনে চলে গেছে। পুবে জালাপাহাড় রোডের দিকে চেয়ে দেখি ঘোড়ার স্ট্যাণ্ডের সামনে দিয়ে শুটিং-এর দল মালপত্তর কাঁধে নিয়ে ফিরছে, তার পিছনে লোকের ভিড়। তবে এ ভিড় মোটামুটি ভদ্র, বেশি উৎপাত করবে বলে মনে হল না। রায়না আর ভার্মা দুজনকেই কিছু অটোগ্রাফে সই দিতে হল সেটা দেখলাম। তার পর দলটা বাঁয়ে নেহরু রোড ধরে বোধহয় সোজা হোটেলের দিকে চলে গেল।

'গুড ইভনিং!'

ঘোড়ার পিঠে বিরূপাক্ষ মজুমদার। আমাদের দেখে নেমে এলেন।

'একটা কথা আজ সকালে আপনাকে বলা হয়নি', মিঃ মজুমদার ফেলুদাকে উদ্দেশ করে গলা নামিয়ে কথাটা বললেন। তার পর আরও কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'এ খবরটা আমার মালির কাছ থেকে শোনা। কত দূর রিলায়েব্‌ল তা বলতে পারব না।'

'কী খবর?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ক' দিন থেকেই নাকি একটি লোককে আমাদের গেটের বাইরে বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।'

'বলেন কী।'

'মালিও তাই বলে। লোকটা পুরনো, তার কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'লোকটার কোনও বর্ণনা দিয়েছে?'

'বলছে মাঝারি হাইট, রং মাঝারি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে। মুখ ভালো করে দেখেনি, কারণ চোখে চোখ পড়তেই লোকটা গাছের আড়ালে চলে যায়। তবে সিগারেট বা বিড়ি খায় এটা মালি বলল, কারণ গাছের পিছন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেছে।'

'এইভাবে দৃষ্টি রাখার কোনও কারণ খুঁজে বার করতে পারেন আপনি?'

'তা পারি। আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে।

অষ্টধাতুর তৈরি একটা বালগোপাল। আমাদের পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের মধ্যে ছিল এটা। নয়নপুরে। জিনিসটা খুবই ভ্যালুয়েব্‌ল। আর সেটা এখানে অনেকেই দেখেছে।'

'সেটা কোথায় থাকে?'

'আমার শোবার ঘরে তাকের উপর।'

'খোলা অবস্থায়?'

'আমি তো রাত্রে জেগে থাকি, আর আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে, কাজেই চোর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।'

'আর কোনও কারণে লোক হানা দিতে পারে?'

'আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমার অনিষ্ট করতে চাইবে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়। এটা কেন বলছি তার কারণ জিগ্যেস করবেন না। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে, তা হলে আপনার সাহায্য আশা করতে পারি তো?'

'দ্যাট গোজ উদাউট সেইং', বলল ফেলুদা।

'তা হলেই নিশ্চিন্ত,' বললেন ভদ্রলোক।

এমন সময় একটি বছর ত্রিশের ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'এসো সমীরণ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,' বললেন মিঃ মজুমদার। 'ইনি হচ্ছেন আমার একমাত্র পুত্র সমীরণ, আর ইনি প্রদোষ মিত্র, আর ইনি লালচাঁদ—স্যরি, লালমোহন...গাঙ্গুলি তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর ইনি প্রদোষবাবুর কাজিন।'

সমীরণ মজুমদার বেশ স্মার্ট দেখতে, তার উপর একটা গাঢ় লাল জার্কিন পরাতে আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে। বললেন, 'আপনি তো বিখ্যাত ডিটেকটিভ?'

'বিখ্যাত কিনা জানি না', বলল ফেলুদা, 'তবে ডিটেকশন আমার পেশা বটে।'

'আমি আবার খুব গোয়েন্দাকাহিনীর ভক্ত। আপনার সঙ্গে একদিন বসে কথা বলার ইচ্ছা রইল।'

'নিশ্চয়ই।'

'আজ একটু শপিং-এ বেরিয়েছি। এক্সকিউজ মি।'

সমীরণবাবু চলে গেলেন।

'আমিও আসি।' ঘোড়ার পিঠে চড়ে বললেন মিঃ মজুমদার। 'আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।'

'প্রয়োজনে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবেন না,' বলল ফেলুদা। 'আমরা উঠেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে।'

ইতিমধ্যে একটি অচেনা ছেলে এসে লালমোহনবাবুর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা নাকি ওঁর আগামীকালের ডায়ালগ। 'হিন্দি ডায়ালগ বাংলা অক্ষরে লিখে দিয়েছে, সুবিধাই হল।'

'অনেক কথা আছে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সাড়ে তিন লাইন,' শুকনো গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

'হোটেলে ফিরে গিয়ে একবার দেবেন তো আমাকে ডায়ালগটা', বলল ফেলুদা। 'আপনাকে একটু তালিম দিয়ে দেব। আপনার হিন্দিতে বড্ড বেশি শ্যামবাজারের টান এসে পড়ে।'

আমরা গতকালের মতো আজকেও ফেরার আগে একবার কেভেনটারসের ছাতে গিয়ে বসলাম হট চকোলেট খাবার জন্য। ঠাণ্ডা বেশ কনকনে, তার উপর মেঘ নেই বলে শীত আরও বেশি। এর মধ্যেই অনেক তারা বেরিয়ে পড়েছে আকাশে; আর তার সঙ্গে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ছায়াপথটা।

'এখানে বসতে পারি ?'

আমরা তিনজন একটা টেবিলে বসেছিলাম। আমাদের পাশে একটা চেয়ার খালি ছিল ; এবার দেখলাম একজন বছর যাটেকের বাঙালি ভদ্রলোক সেটার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাসি-হাসি মুখ করে চেয়ে আছেন। চোখে চশমা, কাঁচা-পাকা মেশানো গোঁফ আর মাথার চুল।

'বসুন', বলল ফেলুদা।

'আপনার পরিচয় আমার জানা আছে,' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার একটা ছবি সমেত সাক্ষাৎকার বোধহয় একটা বাংলা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বছর খানেক আগে।'

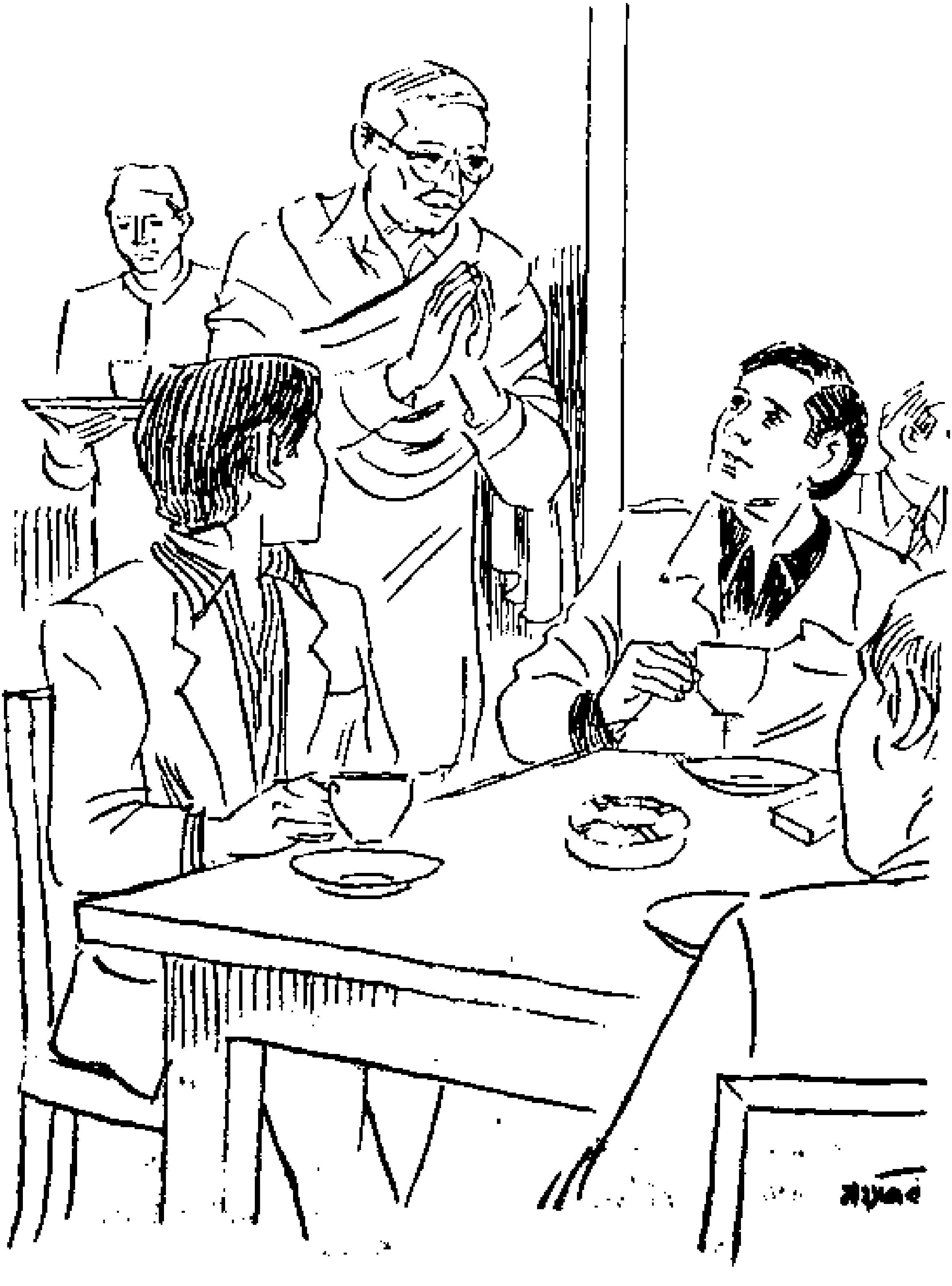

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু এঁকে তো— ?'

'ইনি ঔপন্যাসিক লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।'

'কিছু মনে করবেন না—এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম—কিন্তু আজ আপনাদের দেখলাম আমার পাশের বাড়িতে ঢুকতে। আমি নয়নপুর ভিলার উত্তরের বাড়িটায় থাকি। বাড়িটার নাম দ্য রিট্রিট, আর আমার নাম হরিনারায়ণ মুখার্জি।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার—ইয়ে, আপনি কি কোনও তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন ?'

'আজ্ঞে না। এসেছি ছুটি কাটাতে।'

'না, মানে, বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা ঢুকছে দেখলে মনে হয়...'

'কেন ? উনি কি কোনও গোলমালে জড়িয়ে আছেন নাকি ?'

'ইয়ে, ওঁর সম্বন্ধে পাঁচ রকম গুজব শোনা যায় তো !'

'ওঃ, তাই বলুন ! না, উনি কোনও গোলমালে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হল না। আর গুজবে কান দেওয়াটা আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না।'

'তা তো বটেই। তা তো বটেই।'

আমার মনে হল, ফেলুদা ইচ্ছে করেই মিঃ মজুমদারের লেটেস্ট ব্যাপারটা চেপে গেল। ইনি কোথাকার কে, তা কে বলতে পারে ? আর ভদ্রলোক সত্যিই তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

কেভেনটারসের ছাতে আলো অল্পই, কিন্তু তার মধ্যেই দেখেছিলাম লালমোহনবাবু পকেট থেকে তাঁর কাগজটা বার করে ডায়লগটা আউড়ে দেখছেন।

'তা হলে উঠি ? আলাপ করে খুব ভালো লাগল !'

হরিনারায়ণ মুখার্জি চলে গেলেন।

'মনে হল ভদ্রলোক এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা', ফেলুদা মন্তব্য করল।

'সেটা আবার কী করে বুঝলেন মশাই ?'

'আমাদের চেয়ে শীতটা বেশি সহ্য করতে পারেন। সুতির শার্টের উপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পায়ে মোজাও পরেননি। ভদ্রলোককে একটু কালটিভেট করতে পারলে মন্দ হত না।'

'কেন?'

'আজ জানান দিয়ে গেলেন যে ওঁর কাছে খবর আছে।'

কেন জানি না, হট চকোলেটটা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল যে, ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, যে-সব লোকের সঙ্গে আলাপ করে যে-সব খবর জানতে পারছি, তার থেকে একটা বিস্ফোরণ ঘটা খুব আশ্চর্য নয়। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে, সেটা ভাবতেই পারিনি।

৫

পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতে পুলক ঘোষালের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসে গেল লালমোহনবাবুর জন্য। আগের দিন রাত্রে ফেলুদার কাছ থেকে তালিম নিয়ে লালমোহনবাবু তাঁর সাড়ে তিন লাইন ডায়ালগটা তৈরি করে নিয়েছিলেন। যে লোকটি তাঁকে নিতে এল সে বাঙালি, নাম নীতিশ সোম। সে বলল আজ প্রথম দিন, তাই শুটিং আরম্ভ হতে হতে বারোটা হবে। কিন্তু লালমোহনবাবুর মেক-আপ আছে। তাই তাঁকে আগে প্রয়োজন। জামাকাপড়ের কথা পুলকবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন ফোন করে; লালমোহনবাবু নিজের কোট-প্যান্টই পরবেন, তবে কী রঙের সেটা এখনও ঠিক হয়নি, তাই তিনি সঙ্গে যা এনেছেন সবই নিয়ে যেতে হবে। আমিও যেতে চাই শুনে নীতিশবাবু বললেন, 'আপনি বরং এগারোটা নাগাত আসবেন। ততক্ষণে আমাদের তোড়জোড় প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আজ তো মহরত, তাই একটা ছোট অনুষ্ঠান আছে। সেটা এগারোটায় এলে দেখতে পাবেন। আপনি দুপুরের লাঞ্চটাও না হয় আমাদের সঙ্গেই করবেন; হোটেল থেকে প্যাকড লাঞ্চ আসবে।'

সাড়ে আটটার মধ্যেই একটা সুটকেস নিয়ে 'দুগ্‌গা' বলে লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

আমি আর ফেলুদা ন'টা নাগাত হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমরা একটু জালাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটব। ফেলুদা বলল, 'দার্জিলিং-এ এসে সকালটা হোটেলে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।'

আজকের দিনটাও রোদ-ঝলমল, উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যালের বেঞ্চিতে লোক ভর্তি, কারণ পুজোয় অনেক চেঞ্জার এসেছে। আমরা ঘোড়ার স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে জালাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদা সিগারেট খাওয়া অনেক কমিয়ে দিলেও ব্রেকফাস্টের পর একটা না খেয়ে পারে না। একটা চারমিনার ধরিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমাকে প্রশ্ন করল, 'হালচাল কি-রকম বুঝছিস?'

আমি বললাম, 'এখন পর্যন্ত বিরূপাক্ষ মজুমদারকেই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'সেটা ঠিক। অবিশ্যি তার একটা কারণ হচ্ছে যে, একমাত্র এই ভদ্রলোক সম্বন্ধেই আমরা বেশ কিছু তথ্য জেনেছি, আর সেগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। যে লোক দিনে ঘুমোয় আর রাতে জাগে, যে লোক গরম গরম খবর কাগজ থেকে কেটে খাতায় সেঁটে রাখে, যে বলে যে তার জীবনে একটা রহস্য আছে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না, আর যে একটা মহামূল্য জিনিস সিন্দুকে না রেখে তার ঘরের তাকে রাখে, তাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা চলে না।'

'ওঁর ছেলে তো প্রায় কথাই বললেন না।'

'হ্যাঁ। আমার কাছে ভদ্রলোককে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হল। ভাবটা যেন বেশি কথা বললে কোনও রহস্য প্রকাশ পেয়ে যাবে, তাই সামলে চলছে।'

'আর রজতবাবু?'

'তোর কী মনে হল?'

'মনে হল যে লোকটার চোখ খারাপ কিন্তু চশমা নেয়নি।

একটা মোড়ায় ধাক্কা খেলেন দেখলে না?'

'একসেলেন্ট! একদম ঠিক বলেছিস। চশমাটা হয়তো ভেঙেছে; আর মাইনাস পাওয়ার তাতে সন্দেহ নেই—অর্থাৎ দূরের জিনিস দেখতে পায় না, কাছের জিনিস পায়—তা না হলে ঠিকঠিক খাতাগুলো আনতে পারত না।'

'আর বম্বের হিরো আর ভিলেন?'

'তোর কী মনে হয়? আজকে তোর পরীক্ষাই হোক।'

'কাল একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম।'

'কী?'

'লালমোহনবাবু যখন নদু মল্লিকের পাখোয়াজের বোলটা বলছিলেন, তখন রায়না আর ভার্মা দুজনের ঠোঁটের কোণেই হাসি দেখা দিল।'

'এটাও দুর্দান্ত বলেছিস।'

'তার মানে কি ওরা বাংলা জানে?'

'আসলে বম্বের ফিল্ম-জগতে এত বাঙালি কাজ করে যে, বাংলাটা অল্পবিস্তর অনেকেই বুঝতে পারে, বলতে না পারলেও।'

'ওদের দুজনকে দেখে মিঃ মজুমদার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, সেটা লক্ষ করেছিলে নিশ্চয়ই।'

'তা তো বটেই।'

'অবিশ্যি মিঃ মজুমদারের মনটা যেন মাঝে মাঝেই অন্য দিকে চলে যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ, লোকটা সব সময় যেন কিছু একটা ভাবছে। সেটা হয়তো বোঝা যাবে ওঁর সম্বন্ধে গুজবটা কী সেটা জানলে।'

আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘোরার পর হোটেলে ফিরলাম। ফেলুদা বলল, 'তুই আজ মনের আনন্দে শুটিং দেখিস; আমার কথা চিন্তা করিস না। আমি ভাবছি, একবার অবজারভেটারি হিলের মাথায় গুম্‌ফাটা দেখে আসব।'

আমি ঠিক সময়ে সাড়ে এগারটায় বেরিয়ে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে নয়নপুর ভিলায় পৌঁছে গেলাম। ফট ফট শব্দ শুনে বুঝলাম যে জেনারেটর চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা যে কোথায় রাখা হয়েছে,

তা বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ওদের দলের একজন এগিয়ে এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। এ দিকটা বাড়ির দক্ষিণ দিক, এ দিকে কাল আসিনি। একটা ঘরের মধ্যে কাজ হচ্ছে, সেখানে জোরালো স্টুডিওর আলো জ্বলছে। জানালা বন্ধ করে বাইরে থেকে দিনের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝলাম দৃশ্যটা বোধহয় রাত্রের দৃশ্য, যদিও তোলা হচ্ছে দিনের বেলা।

কিন্তু আমাদের জটায়ু কোথায় ?

ও মা—ওই তো ভদ্রলোক! কিন্তু প্রথমে দেখে একেবারেই চিনতে পারিনি—দাড়ি আর পরচুলায় চেহারা এত বদলে গেছে। দিব্যি ভিলেন-ভিলেন লাগছে ভদ্রলোককে। আমায় দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে বেশ ভারিক্কি চালে জিগ্যেস করলেন, 'কী মনে হচ্ছে ? চলবে ?'

আমি ভদ্রলোকের চেহারার তারিফ করে বললাম, 'আপনার কথাগুলো মনে আছে তো ?'

'আলবৎ!' ভীষণ কনফিডেন্সের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক।

অন্য একটা সোফায় বসে মহাদেব ভার্মা তাঁর গোঁফে চাড়া দিচ্ছিলেন। এবার পুলক ঘোষালের গলা পেলাম।

'লালুদা!'

লালমোহনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর চেয়ারে বসলেন। আমি একটা সুবিধের জায়গা বেছে নিয়ে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

পুলক ঘোষাল এবার লালমোহনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

'লালুদা, আপনি প্রথমে বুক পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে মুখে পুরবেন ; সেই সঙ্গে মহাদেবও একটা সিগারেট মুখে পুরবে। তার পর আপনি পকেট থেকে দেশলাই বার করে মহাদেবের সিগারেটটা ধরিয়ে দেবেন, তার পর নিজের চুরুটটা ধরাবেন। তার পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন। তখন আমি "ইয়েস" বলব। তাতে আপনি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আপনার প্রথম কথাটা

বলবেন। এর পরেই শট্ শেষ। এই শট্টা কিন্তু প্রধানত আপনারই শট। ক্যামেরা আপনারই মুখ দেখছে, আর মহাদেবের দেখছে পিঠ। বুঝেছেন ?'

'ইয়েস,' বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে একটা কথা।'

'বলুন।'

'এ দেশলাইটা জ্বলবে তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। একেবারে টাট্‌কা। আজই সকালে কেনা।'

'ভেরি গুড।'

মিনিটখানেক আরও আমড়াগাছির পর শট্ আরম্ভ হল। ক্যামেরা আর সাউন্ড চালু হল, আর পুলকবাবু বলে উঠলেন, 'অ্যাকশন !'

লালমোহনবাবু মুখে চুরুট পুরলেন ঠিকই, কিন্তু দেশলাইটা ধরাতে গিয়ে বারুদের দিকটা হাতে ধরে উল্টো দিকটা ঘষতে লাগলেন দেশলাইয়ের গায়ে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্—দেশলাই আর জ্বলে না, এ দিকে ক্যামেরা চলেছে ঘড়ঘড় শব্দ করে।

'কাট, কাট !' চেঁচিয়ে উঠলেন পুলক ঘোষাল। 'লালুদা, আপনার বোধহয়—'

'সরি ভাই, ভেরি সরি। এবার আর ভুল হবে না।'

দ্বিতীয়বার অবিশ্যি চুরুট আর সিগারেট ঠিকই জ্বলল, কিন্তু চুরুটে টানটা একটু বেশি মাত্রায় হওয়ায় লালমোহনবাবুর বিষম লেগে শট্টা নষ্ট হয়ে গেল, আর পুলক ঘোষালকে আবার চেঁচিয়ে বলতে হল, 'কাট, কাট !'

তিনবারের বার আর কোনও ভুল হল না। 'ও. কে !' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন পুলক ঘোষাল, আর সকলে লালমোহনবাবুকে তারিফ করে হাততালি দিয়ে উঠল।

আশ্চর্য এই যে, আরও পাঁচ ঘন্টা লালমোহনবাবুকে নিয়ে কাজ হল আর তার মধ্যে ভদ্রলোক একটাও ভুল করলেন না। এর মধ্যে অবিশ্যি ভদ্রলোককে দু'বার বাথরুমে যেতে হয়েছিল ; সেটা শীতের জন্যও হতে পারে আবার নার্ভাসনেসের জন্যও হতে পারে। মোট কথা, পুলক ঘোষাল স্যাটিসফাইড।

'কাল আবার সেম টাইমে লোক যাবে কিন্তু,' বললেন পুলকবাবু।

'লোক যাবার কোনও দরকার ছিল না ভাই,' বললেন লালমোহনবাবু। 'আমি এমনিই চলে আসতে পারতাম।'

'না না, তা কি হয়?' বললেন পুলকবাবু। 'আমরা সকলের জন্যই লোক পাঠাই। ওটা আমাদের একটা নিয়ম।'

লালমোহনবাবুর মেক-আপ তুলতে লাগল দশ মিনিট, তার পর প্রোডাকশনের একটা জিপে করে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম।

নিজের ঘরে না গিয়ে আমাদের ডাবল রুমে এসে লালমোহনবাবু বিছানায় চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি ফেলুদাকে বলে দিলাম লালমোহনবাবুর কাজ খুব ভালো হয়েছে আর সকলে খুব তারিফ করেছে।

'বাঃ, তাহলে আর কী,' বলল ফেলুদা, 'তাহলে তো বাজিমাৎ। একটা নতুন দিক খুলে গেল। এবার আর শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক নয়, চলচ্চিত্রাভিনেতাও বটে।'

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চোখ বুজে পড়ে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে উঠে বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখছেন, আরেকটু হলে ভুলেই যাচ্ছিলাম। আপনাকে যে একটা অত্যন্ত জরুরী কথা বলার আছে।'

'কী ব্যাপার?'

'শুনুন মন দিয়ে। আজ দেড়টায় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। আমি সেই ফাঁকে টুক করে একবার স্মল ওয়র্ক সারতে গিয়েছিলাম বাথরুমে। বাড়ির দক্ষিণে আমাদের কাজ হচ্ছে; সে দিকে বাথরুম আছে, কিন্তু তার ভেতর এরা শুটিং-এর যাবতীয় মালপত্তর রেখেছে; তাই আমাকে যেতে হল উত্তর দিকে—অর্থাৎ যে দিকে মিঃ মজুমদার থাকেন। প্রোডাকশনের একজন লোকই আমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল। আমি গেলুম। এটা একটা আলাদা বাথরুম, বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ্ড নয়। আমি কাজ সেরে হাত ধুয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, বাইরে এসেই কানে কোনও

একটা ঘর থেকে শুনি মিঃ মজুমদারের গলা। ভদ্রলোক কাকে যেন কড়া গলায় শাসনের সুরে বলছেন, "ইউ আর এ লায়ার ; তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।" যদিও গলার স্বর চাপা, কিন্তু তাতে যে ঘোর বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'বাংলায় বললেন কথাটা ?'

'ঠিক আমি যেমন বললাম। প্রথম অংশ ইংরিজি, বাকিটা বাংলা।'

'তার মানে ভদ্রলোক তখনও ঘুমোননি ?'

'না ; কারণ কাল যখন লাঞ্চ ব্রেক হয়, তখনও ভদ্রলোককে দক্ষিণের বারান্দায় দেখেছি। উনি শুটিং দেখতে এসেছিলেন। সকালে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি দেড়টায় বড়িটা খান, তার পর ঘুমোন। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন দেড়টা বেজে মিনিট সাতেক হয়ে গেছে।'

'ভদ্রলোকের কথার উত্তরে অন্য লোকটি কিছু বললেন না ?'

'বলে থাকলেও সেটা এত চাপা গলায় যে, আমি শুনতে পাইনি। আমার আবার তখন তাড়া—লাঞ্চ রেডি—তাই আর অপেক্ষা না করে চলে এলাম। কিন্তু মিঃ মজুমদারই যে কথাটা বলেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তার মানে হয় রজত বোস, নয় নিজের ছেলে সমীরণ মজুমদারকে বলেছেন কথাটা।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'তবে একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে মশাই। এই সব বোম্বাই-অভিনেতাদের বিষয়ে যত কিছু শোনা যায়, আসলে তত কিছু নয়।'

'এটা কেন বলছেন ?'

'লাঞ্চের পর রায়নার সঙ্গে একটা শট ছিল, সেটা জোকারের ভুলের জন্য পাঁচবার করে নিতে হল। সামান্য ডায়ালগ, তবু বার বার ভুল করছে।'

'ও রকম হয়েই থাকে,' বলল ফেলুদা, 'সেরা অভিনেতারও হঠাৎ হঠাৎ নার্ভ ফেল করতে পারে।'

সব শেষে জটায়ু বললেন, 'যেটুকু নার্ভাসনেস ছিল, আজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আর কোনও ভাবনা নেই।'

৬

বজ্রপাতটা হল পরের দিন, তবে আসল ঘটনাটা সরাসরি না বলে আগে দিনটা কিভাবে গেল বলি।

দিনটা মেঘলা, তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা রয়েছে আড়ালে। আমি ফেলুদার সঙ্গে সকালে বেরিয়ে একটু কেনাকাটা সেরে, বার্চ হিল রোড দিয়ে খানিকদূর বেড়িয়ে এগারোটা নাগাত রওনা দিলাম নয়নপুর ভিলায়। গতকাল রাত্রেও ফেলুদা লালমোহনবাবুকে তালিম দিয়েছে। এবারে সাড়ে তিনের জায়গায় সবসুদ্ধ পাঁচ লাইন ডায়ালগ। আজ আর চুরুট-সিগারেট ধরানোর ব্যাপার নেই, তাই সেদিক থেকে বাঁচোয়া।

লালমোহনবাবুর সাতটা শট ছিল। সাড়ে নটায় কাজ আরম্ভ হয়েছে। আড়াইটেয় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। লাঞ্চের আগে চারটে, পরে তিনটে শট হয়ে সাড়ে চারটের সময় লালমোহনবাবু ফ্রি হয়ে গেলেন। পুলক ঘোষাল বলল, 'জিপের ব্যবস্থা আছে লালুদা, আপনি এনি টাইম যেতে চাইলে যেতে পারেন।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আজ যখন তাড়াতাড়ি শেষ হল, তখন ভাবছি হেঁটেই বাড়ি ফিরব ; গাড়ির দরকার নেই।'

'জাস্ট অ্যাজ ইউ লাইক,' বলল পুলক ঘোষাল।

পুলক ঘোষাল চলে গেলে পর লালমোহনবাবু বললেন, 'এদের চা-টা বেশ ভালো ; এক্ষুনি চা দেবে, সেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

দেড় মাইলের উপর রাস্তা, তাই চা খেয়ে পাঁচটা নাগাত বেরিয়ে হোটেল পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই দেখি ফেলুদা গায়ে জ্যাকেট চাপাচ্ছে।

'বেরোচ্ছ নাকি ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

ফেলুদা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'তোরা ছিলি না ওখানে ? তোরা শুনিসনি ?'

'আমরা তো আধ ঘন্টা হল বেরিয়েছি, তখন পর্যন্ত তো কিছু শুনিনি। কী ব্যাপার ?'

'মিঃ মজুমদার খুন হয়েছেন।'

'অ্যাঁ !'

আমরা দুজনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ভদ্রলোক সাড়ে বারোটা নাগাত আমায় ফোন করেছিলেন। বললেন আমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, সেটা সন্ধ্যায় আমার এখানে এসে বলবেন। আর তার পর এই ব্যাপার।'

'তুমি খবর পেলে কী করে ?'

'ওঁর ছেলে ফোন করেছিলেন এই পাঁচ মিনিট আগে। পুলিশে খবর দিয়েছেন, কিন্তু আমাকেও যেতে বললেন। পাঁচটার পরেও ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙছে না দেখে সমীরণবাবু ওঁর ঘরে ঢোকেন ; বাবাকে কী যেন একটা বলার ছিল। দরজাটা কেবল ভেজানো ছিল ; মিঃ মজুমদার ছিটকিনি লাগাতেন না কখনো। ঢুকে দেখেন রক্তাক্ত কাণ্ড। বুকে ছোরা মেরেছে ঘুমন্ত অবস্থায়। ওঁর বাড়ির ডাক্তার এসে বলে গেছেন ছুরির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। শুটিং অবশ্যই বন্ধ হয়ে গেছে, এবং স্বভাবতই কিছু দিন বন্ধ রাখতে হবে। কারণ পুলিশ তদন্ত করবে। যাই হোক—আমি তো চললাম। তোরা কি থাকবি, না আমার সঙ্গে যাবি ?'

'থাকব কী !' বললেন লালমোহনবাবু। 'এরপরে কি আর থাকা যায় ? চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

আমরা তিনজন যখন নয়নপুর ভিলা পৌঁছালাম, তখন সোয়া ছটা। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশে মেঘ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শুটিং-এর দলের সকলেই রয়েছে। পুলক ঘোষাল কাছেই ছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো ! ভারি মাই ডিয়ার লোক ছিলেন মিঃ মজুমদার। এক কথায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন।'

বাড়ির বাইরে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

আমরা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনের বারান্দায়

একজন ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন। বছর চল্লিশেক বয়স, ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি। আমি ইন্সপেক্টর যতীশ সাহা।'

করমর্দন শেষ হবার পর ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার? কী বুঝলেন?'

'ঘুমের মধ্যেই খুনটা হয়েছে, যত দূর মনে হয়।'

'কী দিয়ে মেরেছে?'

'একটা ভুজালি। সেটা বুকেই ঢোকানো রয়েছে। ওটা নাকি মিঃ মজুমদারের ঘরেই থাকত।'

'আপনাদের ডাক্তার এসেছেন কি?'

'এই এলেন বলে। আসুন না ভিতরে।'

মিঃ মজুমদারের শোবার ঘরটা বেশ বড়। আমি আর লালমোহনবাবু দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইলাম, ফেলুদা ভিতরে গেল। মৃতদেহ সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে।

'একটা কথা আপনাকে বলে দিই,' ফেলুদাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন যতীশ সাহা, 'আমরা তো যথারীতি আমাদের ইনভেসটিগেশন চালিয়ে যাব, তবে আপনি যখন এখানে রয়েছেন, তখন আপনিও আপনার নিজের তরফ থেকে যা করতে চান, করতে পারেন। কেবল আমাদের যা কিছু ফাইন্ডিংস পরস্পরকে জানালে বোধহয় কাজের দিক দিয়ে সুবিধা হবে।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' বলল ফেলুদা। 'আর আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি এগোতেই পারব না।'

সমীরণবাবু এসেছেন ঘরে; তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, চুল উসকোখুসকো।

ফেলুদা তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাপারটা তো আপনিই ডিসকাভার করেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললেন সমীরণবাবু। 'বাবা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ঠিক পাঁচটায় উঠে গিয়ে বারান্দায় বসতেন। তার পর লোকনাথ চা এনে দিত। আজ সোয়া পাঁচটায় বাবাকে জায়গায় না দেখে ভাবলাম ব্যাপার কী। খটকা লাগল, তার পর বাবার শোবার ঘরে

গেলাম। ঘরে ঢুকেই দেখি এই কাণ্ড।'

'এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে? আপনার নিজের কোনও ধারণা হয়েছে এ সম্বন্ধে?'

ফেলুদা প্রশ্ন করতে করতে ঘরটা পায়চারি করে দেখছে, কোনও কিছুই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

'কেবল একটা কথা বলার আছে,' বললেন সমীরণবাবু।

'কী?'

'ঘরে একটা জিনিস মিসিং।'

'কী জিনিস?'

আমরা সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টি দিলাম ভদ্রলোকের দিকে।

'অষ্টধাতুর একটা বালগোপাল,' বললেন সমীরণবাবু। 'এটা ছিল আমাদের নয়নপুরের বাড়ির মন্দিরে। অনেক দিনের সম্পত্তি, এবং অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস।'

'কোথায় থাকত এটা?'

'ওই তাকের উপর। ভুজালিটার পাশেই।'

সমীরণবাবু ঘরের একটা সেলফের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

যতীশ সাহা বললেন, 'এমন একটা জিনিস সিন্দুকে না রেখে বাইরে রাখা হত কেন?'

'তার কারণ বাবা তো রাত্রে ঘুমোতেন না, আর সঙ্গে রিভলবার থাকত, তাই কোনও বিপদ আছে বলে মনে করেননি।'

'তা হলে তো রবারি-ই মোটিভ বলে মনে হচ্ছে', বললেন সাহা। 'জিনিসটার দাম কত হবে?'

'তা ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার তো হবেই। সোনার অংশ বেশ বেশি ছিল।'

ফেলুদা খাটের পাশের টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে বলল, 'শিসটা ভাঙা, এবং ভাঙা টুকরোটা পাশেই পড়ে আছে।'

আমি দেখলাম পেনসিলের পাশে একটা ছোট্ট প্যাডও রয়েছে।

ফেলুদা নিচু হয়ে প্যাডের উপরের কাগজটা দেখছিল। তার পর বিড়বিড় করে বলল, 'ওপরের কাগজটা ছিঁড়েছে বলে মনে হচ্ছে...'

এবারে ও আরও নিচু হয়ে টেবিলের চার পাশের মেঝেটা

দেখতে লাগল। তার পর মেঝে থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে বলল, 'পেয়েছি।'

আমি দূর থেকেই বুঝলাম প্যাডের কাগজের উপর কী যেন একটা লেখা রয়েছে।

কাগজটা নিজে ভালো করে দেখে ফেলুদা সেটা সাহার দিকে এগিয়ে দিল। সাহা কাগজটা হাতে নিয়ে লেখাটা পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বিষ?'

'তাই তো লিখছেন ভদ্রলোক', বলল ফেলুদা। 'আর যে ভাবে "ষ"-এর পেট কাটা হয়েছে, মনে হয় তার পরেই মৃত্যুটা হয়, এবং শিস ভেঙে পেনসিলটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর কাগজটাও প্যাড থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে।'

'কিন্তু বিষ কথাটা লিখবার অর্থ কী?' বললেন সাহা, 'যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে?'

'সেটাই তো ভাবছি,' ভ্রূকুটি করে বলল ফেলুদা। তার পর সমীরণবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'মিঃ মজুমদারের ঘুমের ওষুধ কোথায় থাকত, জানেন?'

'ডাইনিং রুমে একটা বোতলের মধ্যে', বললেন সমীরণবাবু। 'দোকান থেকে এলেই লোকনাথ টিন-ফয়েল ছিঁড়ে বড়িগুলো বার করে বোতলে রেখে দিত।'

'সেই বোতলটা একবার আনতে পারেন?'

সমীরণবাবুর ফিরে আসতে যেন একটু বেশি সময় লাগল। আর যখন এলেন, তখন ভদ্রলোকের মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'বোতল নেই', ধরা গলায় বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদার ভাব দেখে মনে হল, সে যেন এটাই আশা করছিল। বলল, 'গত পরশু সন্ধ্যায় আমাদের সামনেই ভদ্রলোক একমাসের স্টক কিনলেন ওই ওষুধের।' তার পর সাহার দিকে ফিরে বলল, 'এই বড়ির খান ত্রিশেক একসঙ্গে একজন মানুষকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হতে পারে না?'

'এটা কী বড়ি?'

'টফ্রানিল। অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট পিল্‌স।'

'তা নিশ্চয়ই হতে পারে', বললেন সাহা।

'এবং তখন সে বড়িকে বিষ বলা যেতে পারে না?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে বিষ কথাটার একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে, যদিও...'। ফেলুদার যেন খট্‌কা লাগছে। একটু ভেবে বলল, 'যে লোককে খুন করা হচ্ছে, সে যদি মরার পূর্বমুহূর্তে কিছু লিখে যায়, তা হলে কী ভাবে তাকে মারা হচ্ছে সেটা না লিখে সে যাকে আততায়ী বলে সন্দেহ করছে তার নামটাই লিখে যাবে না কি?'

'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন', বললেন সাহা, 'কিন্তু এক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেটা করেননি সেটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।...ভালো কথা, একবার বেয়ারা লোকনাথকে ডাকলে হত না?'

ফেলুদা প্রস্তাবটা সমর্থন করে সমীরণবাবুর দিকে চাইল। সমীরণবাবু ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে লোকনাথের খোঁজে বেরিয়ে

গেলেন।

ফেলুদার চোখ থেকে যে ভ্রূকুটি যাচ্ছে না সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'লোকনাথ দেড়টা নাগাত একবার দক্ষিণের বারান্দায় এসেছিল মিঃ মজুমদারকে ডাকতে। কিন্তু মিঃ মজুমদার তৎক্ষণাৎ যাননি।'

'তার মানে আজকে তাঁর নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়েছিল,' বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ', বললেন লালমোহনবাবু। 'মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক শুটিং-এর ব্যাপারটাতে বেশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলেন। রায়না আর ভার্মাকে সুযোগ পেলেই নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন।'

সমীরণবাবু ঘরে ফিরলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝলাম, খবর ভালো না। কিন্তু যা শুনলাম, ততটা তাজ্জব খবর আমি আশা করিনি।

'লোকনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না', বললেন সমীরণবাবু।

'পাওয়া যাচ্ছে না?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'না', বললেন সমীরণবাবু। 'সে দেড়টার কিছু পর থেকেই মিসিং। চাকররা দুটো নাগাত খেতো—লোকনাথ খায়ওনি। কোথায় গেছে, কখন গেছে, কেউ বলতে পারছে না।'

'রজতবাবু তাকে কোথাও পাঠাননি তো?'

'না। উনি কিছু জানেনই না। বললেন, দুপুরের খাবার পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেই উনি ঝাউবনে বেড়াতে যান। এটা ওঁর একটা বাতিক আছে। উনি দুপুরে ঘুমোন না।'

কথাটা যে সত্যি সেটা জানি। কারণ শুটিং-এ লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি একবার ঝাউবনে গিয়েছিলাম ছোট কাজ সারতে। তখন রজতবাবু ঝাউবন থেকে ফিরছিলেন।

'এই লোকনাথ বেয়ারা কতদিনের?' জিগ্যেস করলেন সাহা।

'বছর চারেক', বললেন সমীরণবাবু। 'আগের বেয়ারা রজলাল খুব পুরনো লোক ছিল। সে হঠাৎ হেপাটাইটিসে মারা যায়। লোকনাথ খুব ভালো রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল। একটু লিখতে-পড়তেও পারত। খাবার ছবির ব্যাপারে রজতবাবুকে ও

সাহায্য করত।'

'তা হলে তো মনে হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে', বললেন সাহা। 'আপনাদের টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই', বলে সমীরণবাবু সাহাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-টা কেন দেওয়া হল, সেটা তো বুঝতে পারছি না ফেলুবাবু', বললেন লালমোহনবাবু। 'চুরিই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে তো সে কাজটা ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে বেহুঁশ করেই হয়ে যায়। আবার ছোরা কেন?'

ফেলুদা বলল, 'মনে হয় শুধু বড়িতে আততায়ী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। হয়তো যে সময় মূর্তিটা চুরি করতে এসেছিল, সেই সময় মজুমদার একটু নড়াচড়া করেছিলেন। বড়ির অ্যাকশন হতে তো সময় লাগে! এই নড়াচড়া দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে ছোরাটা মারা হয়েছে। এবং তার পর মূর্তিটা সরানো হয়েছে।'

'কিন্তু তা হলে "বিষ"টা কখন লেখা হল?'

'সেটা অবিশ্যি ছোরা মারার আগেই হয়েছে—যখন মজুমদার প্রথম বুঝেছেন যে, তাঁকে কিছু একটা খাইয়ে বেহুঁশ করার চেষ্টা হয়েছে। লেখাটা লিখেই উনি অন্তত সাময়িকভাবে সংজ্ঞা হারান। এ ছাড়া আর কোনও সমাধান আপাতত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ফেলুদা যে খুশি নয় সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম।

সাহা ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে এসেছিলেন; বললেন, 'আমার কাছে ইট সার্টেনলি মেক্‌স সেন্‌স। ...যাক্ যে, আমি লোক লাগিয়ে দিয়েছি। ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমার অন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমি এ বাড়ির এবং ফিল্মের দলের সকলকে জেরা করতে চাই।'

'একটা কথা', বললেন লালমোহনবাবু। 'ফিল্মের দলের মধ্যে সকলের কিন্তু বাড়ির উত্তর দিকের বাথরুম ব্যবহার করার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ছিল পরিচালক পুলক ঘোষালের, ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ, রায়না, ভার্মা, আর আমার।'

'তা হলে শুধু তাদেরই জেরা করা হবে', বললেন সাহা।

'মানে, আমাকেও?' ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'তা তো বটেই', বলল ফেলুদা। 'সুযোগ যাদের ছিল, তাদের মধ্যে আপনি তো একজন বটেই।'

সাহা বললেন, 'এ ছাড়া আছে বাড়ির লোক। অর্থাৎ—' ভদ্রলোক সমীরণবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

সমীরণবাবু বললেন, 'অর্থাৎ আমি, রজতবাবু, চাকর বাহাদুর, আর রান্নার লোক জগদীশ।'

'ভেরি গুড।'

৭

পরদিন সকালে সাড়ে নটায় পুলক ঘোষাল আমাদের হোটেলে এলেন। 'আপনাদের জেরা শেষ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল ভদ্রলোককে।

'তা শেষ', বললেন পুলক ঘোষাল। 'কাল রাত সাড়ে নটায় ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু কী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল দেখুন তো। যদ্দিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে, তদ্দিন তো ও-বাড়িতে শুটিং বন্ধ। অবিশ্যি সমীরণবাবু বলেছেন যে সব মিটে গেলে ওঁদের বাড়িতে আবার কাজ করতে দেবেন, কিন্তু সেটা কবে তা কে বলতে পারে? কত টাকা লস্ হল আমাদের ভাবতে পারেন?'

লালমোহনবাবু চুকচুক করে সহানুভূতি জানালেন।

'তবে এটা ঠিক', বললেন পুলকবাবু, 'একটা প্রোডাকশনে বাধা পড়লে সচরাচর সে ছবি হিট হয়। আর, একটা কথা আপনি জানবেন লালুদা—আপনার গল্পের মার নেই।'

পুলকবাবু চলে যাবার আধ ঘন্টার মধ্যেই ইনস্পেক্টর যতীশ সাহা এলেন। বললেন, 'নো পাত্তা অফ লোকনাথ বেয়ারা। আমরা শিলিগুড়িতে পর্যন্ত লোক লাগিয়ে দিয়েছি। তবে আমার মনে হয় ইট্‌স এ ম্যাটার অফ টাইম। এখন হয়তো কোনও তুচ্ছিয়া বস্তিতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে; সুনার অর লেটার ধরা পড়তে বাধ্য।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোকটা কলকাতায় মাবার প্ল্যান করেছে; সেইখানেই ও মূর্তিটা পাচার করবে। আশ্চর্য—বিদেশী মানুষও লোভে পড়লে কি রকম বেঁকে যায়!'

'আপনার জেরা তো হয়ে গেছে শুনলাম,' বলল ফেলুদা।

'তা হয়েছে', বললেন সাহা। 'এতে একটা জিনিস প্রমাণ হল যে, ফিল্ম শুটিং-এর ব্যাপারে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বেশ কিছুটা করে সময় কাটিয়েছে শুটিং দেখে। মিঃ মজুমদার তাঁর রুটিন ব্রেক করলেন—ভাবতে পারেন? অথচ ওঁর জীবনটা চলত ঘড়ির কাঁটার মতো!'

ফেলুদা বলল, 'সুযোগের ব্যাপারটা কী মনে হল? মোটিভটা এখন থাক।'

'এখানে অবিশ্যি দুটো ব্যাপার দেখতে হবে', বললেন সাহা। 'এক, দুধে বড়ি মেশানো, আর দুই, ছোরা মেরে মূর্তি চুরি। দশটা নাগাত লোকনাথ দুধ রেডি করে মজুমদারকে খবর দিতে গেল। সে নিজেই তাতে বড়ি মেশাতে পারে। অথবা সে যখন ছিল না, তখন অন্য লোক কাজটা করতে পারে। রুদ্রবাবু বললেন তখন উনি নিজের ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন। সমীরণবাবুও বললেন তিনি নিজের ঘরে ছিলেন। এ সবের অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই। চাকর বাহাদুর আর রান্নার লোক জগদীশ শুটিং দেখছিল। দিস ইজ এ ফ্যাক্ট।'

'আপনাদের ডাক্তার খুনের টাইম সম্বন্ধে কী বলেন?'

'বলছেন আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে। ছুরিকাঘাতেই যে মৃত্যু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তা না হলে এতো ব্লিডিং হত না।'

'লোকনাথ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল?'

'কেউ না। আমাদের সকলেরই মনই শুটিং-এর দিকে পড়ে ছিল।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন; এবার বললেন, 'আমার জেরাটা এখন সেরে নিলেই ভাল হত না?'

'নিয়মমতো কালকেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল।' বললেন

ইন্সপেক্টর সাহা, 'কিন্তু আপনি মিঃ মিত্তিরের বন্ধু বলে আর ইনসিস্ট করিনি। যাই হোক, এবার আপনি বলুন গতকালের ঘটনাগুলো।'

'আমি পৌঁছেছি নটায়', বললেন লালমোহনবাবু। 'তার পর মেক-আপ করতে লেগেছে এক ঘণ্টা। যে ঘরে শুটিং, তার পাশেই দক্ষিণের বারান্দা; আমরা অভিনেতারা আমাদের ডাকের অপেক্ষায় সেখানেই বসেছিলাম। সেখানে একটা ব্যাপার হয়। মিঃ মজুমদার সাড়ে দশটা নাগাত একবার এসে রায়না আর ভার্মাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে যান মিনিট পাঁচেকের জন্য। পরে রায়না আমাকে বলে যে, মজুমদার তাঁদের একটা মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি সেটা ছিল ওই বালগোপালটা।'

'তার পর?' প্রশ্ন করলেন সাহা।

'তার পর এগারোটার সময় আমার আর ভার্মার ডাক পড়ে। আমরা দুজনে শুটিং-এর ঘরে গিয়ে হাজির হই। দশ মিনিটের মধ্যে শট আরম্ভ হয়। লাঞ্চের আগে চারটে শট হয়। তার মধ্যে দ্বিতীয় শটের পর সাড়ে বারোটা নাগাত আমি একবার বাথরুমে যাই।'

'তখন আর কাউকে দেখেছিলেন কি?'

'না। বাথরুম থেকে ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে রিহার্সালের জন্য ডাকা হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিন নম্বর শট হয়। তার পর আমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছিল। সেই সময়টা আমি দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলাম।'

'একা?'

'আমার সঙ্গে রায়না আর ভার্মা ছিল, আর মিঃ মজুমদার এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। ওঁকে লোকনাথ খবর দিতে আসে ওঁর দুধ রেডি আছে বলে। তার পাঁচ-সাত মিনিট পরে মজুমদার চলে যান। পৌনে দুটোর সময় আমার ডাক পড়ে চার নম্বর শটের জন্য। এটা ছিল শুধু আমার একার শট। এর পরেই আড়াইটার লাঞ্চ ব্রেক হয়। তখন আমি একবার বাথরুম যাই হাত ধুতে। আমার সঙ্গে রায়না আর ভার্মাও গিয়েছিল।'

'কে প্রথমে হাত ধোয়?'

'আমি। তার পর আমি চলে আসি। খেতে সবসুদ্ধ মিনিট কুড়ি লাগে। তার পর আমি বারান্দাতেই বসেছিলাম। তপেশ ছিল আমার সঙ্গে।'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

লালমোহনবাবু বলে চললেন, 'এই সময়টা রায়না আর ভার্মা কোথায় ছিল লক্ষ করিনি। তিনটের সময় আবার কাজ শুরু হয়। আমার পাঁচ নম্বর শট শেষ হয়ে সাড়ে তিনটেয়। তার পর আলো চেঞ্জ করার জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের একটা বিরতি ছিল।'

'তখন আপনি কী করছিলেন?'

'আমি, রায়না আর ভার্মা দক্ষিণের বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। তপেশও ছিল কাছাকাছি বসে।'

আমি আবার সায় দিলাম।

'ভার্মা ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। ওঁর অভিজ্ঞতা বলছিলেন আমাদের।'

'এই পুরো সময়টাই কি আপনারা তিনজনে একসঙ্গে ছিলেন?'

লালমোহনবাবু একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন। তার পর বললেন, 'ভার্মা বোধ হয় একবার উঠে গিয়েছিল মিনিট পাঁচেকের জন্য। তখন রায়না বোম্বাই ফিল্ম জগতের গসিপ্ শোনাচ্ছিলেন। তার পর—'

'আর দরকার নেই, এতেই হবে', বললেন ইন্সপেক্টর। 'তবে লোকনাথকে যে বিকেলের দিকে আর দেখেননি, সেটা আপনার মনে আছে?'

'লোকনাথ...লোকনাথ...উঁহু, লোকনাথকে আর দেখিনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার', বলে সাহা উঠে পড়লেন। তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমিও তো ছিলে ওখানে?'

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

'তোমার কিছু বলার আছে?'

'লালমোহনবাবু যা বলেছেন, সবই ঠিক বলেছেন। আমি শুধু একবার আড়াইটের সময় পিছনে ঝাউবনে যাই বাথরুম সারতে। তখন রজতবাবুকে দেখি, উনি বাড়ির দিকে ফিরছেন। দেখে মনে

হল যেন একটু হাঁপাচ্ছেন।

সাহা বললেন, 'ভদ্রলোক জেরাতেও বলেছিলেন যে, মাঝে মাঝে দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে উনি বাগানে বেড়িয়ে আসেন। গতকালও গেছেন বলে বলছিলেন। ভালো কথা, দুপুরে যে পার্টিটা হত, তাতে কি শুধু ফিল্মে যারা কাজ করছে তারাই অংশগ্রহণ করত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন লালমোহনবাবু। 'সমীরণবাবু আর রজতবাবুকেও অফার করেছিল পুলক, কিন্তু ওঁরা রাজি হননি।'

'ভালো কথা', বললেন সাহা। 'ভুজালির হাতলে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা বোধহয় আশাও করা যায়নি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে।'

'কী প্রশ্ন?'

'খুনের টাইমটা সাড়ে চারটে হওয়ার চেয়ে আড়াইটা হওয়াই বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয় না কি?'

'কেন বলুন তো?'

ধরুন যদি লোকনাথই অপরাধী হয়, সে স্বভাবতই যত তাড়াতাড়ি পারে তার কাজ সেরে ফেলবে। দেড়টায় সে বড়ি মিশিয়েছে দুধে—আটাশখানা—তার পর তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে কেন? যদি মূর্তিটা নেবার সময় সে ছোরা মেরে থাকে—যেটা স্বাভাবিক—তা হলে সেটা এত পরে করবে কেন?'

'গুড পয়েন্ট', বললেন সাহা। 'অবিশ্যি আড়াইটায় খুনটা হলে সেটা ডাক্তারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যায় না।'

ইনস্পেক্টর সাহা উঠে পড়লেন। বললেন, তাঁকে একবার নয়নপুর ভিলায় যেতে হবে। ঘর থেকে বেরোবার সময় ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার চোখ থেকে ভ্রূকুটি যাচ্ছে না কেন বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'ওটা কিছু না। আসলে আমি খুব জটিল কেস হ্যান্ডেল করে অভ্যস্ত। এটা কেমন যেন বেশি সরল বলে মনে হচ্ছে। এটা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তাই সেটাকে

সহজে গ্রহণ করতে পারছি না।'

'এ আবার আপনার বাড়াবাড়ি মশাই', বললেন সাহা। 'আমরা সহজ কেস হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, আর আপনি দেখছি তার ঠিক উল্টো। এইখানেই পুলিশ আর শখের গোয়েন্দার তফাত।'

সাহা চলে গেলেন, কিন্তু ফেলুদার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা রয়েই গেল। ও শেষে বলল, 'একটা সামান্য সহজ জিনিস নিয়ে এত ভাবার কোনও মানেই হয় না। লোকনাথকে খুঁজে বার করবে পুলিশ; সেখানে আমার কিছু করারই নেই। চল, একটু বেড়িয়ে আসি ম্যালে।'

আজকের দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন, তার ফলে শীতটাও একটু বেশি, তাই বোধহয় ম্যালে বেশি লোক নেই। আমরা তিনজন এগিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসলাম।

ভারী অদ্ভুত লাগছে কুয়াশার মধ্যে ম্যালটাকে। এতই কুয়াশা যে দশ হাত দূরের লোককে দেখা যায় না। কাছে এলে মনে হয় হঠাৎ যেন শূন্য থেকে বেরিয়ে এল। সেই ভাবেই বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর তিনি এগিয়ে এলেন আমাদের দিকেই। তার পর ফেলুদার দিকে চেয়ে হাত দুটো জোড় করে বললেন, 'নমস্কার!'

৮

ফেলুদাও প্রতিনমস্কার করল। ভদ্রলোক বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় কেভেন্টারসে সামান্য পরিচয় হয়েছিল আমাদের—আপনার মনে আছে বোধ হয়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনার নাম তো হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়?'

'বাঃ, আপনার মেমরি তো বেশ শার্প দেখছি। তা, একটু বসতে পারি আপনাদের পাশে?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা ওর নিজের আর লালমোহনবাবুর মাঝখানে একটু জায়গা করে দিল। ভদ্রলোক বসলেন।

'আপনি তো নয়নপুর ভিলার পাশেই থাকেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। উত্তর দিকের বাড়িটা আমার। আমি আছি এখানে প্রায় এগারো বছর।'

'আপনার বাড়ির পাশেই তো একটা ট্র্যাজিডি হয়ে গেল।'

'তা তো বটেই', বললেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু এর একটা আঁচ তো আগে থেকেই পাওয়া গেসল, তাই নয় কি ?'

'আপনার তাই মনে হয় ?'

'এ কথা বলছি, কারণ বিরূপাক্ষ মজুমদারকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি। ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল বলতে পারি না, কারণ মজুমদার যে খুব মিশুকে লোক ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমি জানি অনেক দিন থেকেই।'

'কী করে জানলেন ?'

'আমি এককালে বছর দশেক ছিলাম মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। আমার পেশা ছিল জিওলজি। ইঁট পাথর নিয়ে কারবার ছিল আমার। সেই নীলকণ্ঠপুরে একবার আসেন বিরূপাক্ষ মজুমদার। তখন ওঁর বয়স ছিল হয়তো পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। শিকারের খুব শখ ছিল ভদ্রলোকের। নীলকণ্ঠপুরের রাজা পৃথ্বী সিং মজুমদারকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর জঙ্গলে গিয়ে শিকার করার জন্য। পরস্পর আলাপ ছিল আগে থেকেই। এই দুই শিকারীর মধ্যে একটা মিল ছিল। সেটা এই যে, কেউই মাচার উপর থেকে শিকার করতে চাইতেন না। এমন কি হাতির পিঠ থেকেও না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিটারদের সাহায্য না নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে বাঘ শিকার করা। এই শিকার থেকেই হয় এক চরম দুর্ঘটনা।'

'কি রকম ?'

'বাঘের বদলে মানুষের উপর গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার।'

'সে কি !'

'ঠিকই বলছি।'

'মানে, কোনও স্থানীয় অধিবাসী-টাসী— ?'

'না। তা হলে তো তবু কথা ছিল। যিনি মরেছিলেন, তিনি

ছিলেন ভদ্রলোক এবং বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। বাঙালি হলেও বাপের আমল থেকে মধ্যপ্রদেশবাসী। পেশা ছিল নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের প্রফেসারি, কিন্তু প্রচণ্ড শখ ছিল কবিরাজীর। রাজা এবং মজুমদার যে সময় বাঘ খুঁজছিলেন, সেই সময় ব্রহ্ম ঘুরছিলেন জঙ্গলে গাছড়ার অনুসন্ধানে। তাঁর গায়ে একটা গেরুয়া চাদর ছিল। একটা ঝোপের পাতা নড়তে দেখে আর ঝোপের ফাঁক দিয়ে গেরুয়া দেখে বাঘ ভেবে গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার। সে গুলি গিয়ে লাগে সুধীর ব্রহ্মের পেটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

'এ খবর যাতে না ছড়ায়, তার জন্য বিস্তর টাকা খরচ করাতে হয়েছিল পৃথ্বী সিং-কে। আমি নিজে জানি, কারণ আমি ছিলাম ব্রহ্মের বন্ধুস্থানীয়। মজুমদার কলঙ্কের হাত থেকে পার পায় ঠিকই, কিন্তু সে যে অপরাধী, সে যে হত্যাকারী, বাঘ মারতে সে যে মানুষ মেরে ফেলেছিল, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই! এই অপরাধের বোঝা বয়ে মানুষ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে?'

'আপনার কি মনে হয়, এবার যে-খুন হয়েছে, তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনও যোগ আছে?'

'একটা ব্যাপার আছে। আপনি গোয়েন্দা, আপনি হয়তো বর্তমানে হত্যা নিয়ে ভাবছেন, তাই আপনাকে বলছি। সুধীর ব্রহ্মর একটি ছেলে ছিল, নাম রমেন ব্রহ্ম। এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে, তখন ছেলেটির বয়স ষোল। সে কিন্তু এই ধামা চাপা দেওয়ার ব্যাপারটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি। আমাকে কাকা বলে সম্বোধন করত রমেন। সেই সময়ই সে বলেছিল যে বড় হয়ে সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। এখন তার বয়স হওয়া উচিত আটত্রিশ।'

'আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছিল?'

'না। আমি নীলকণ্ঠপুর ছাড়ি আজ থেকে বিশ বছর আগে। কিছুকাল ছোট নাগপুরে ছিলাম। তার পর রিটায়ার করে চলে আসি দার্জিলিং-এ। আমার বাড়িটা আপনার চোখে পড়েছে কিনা জানি না। ছোট্ট কটেজ বাড়ি। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। আমার একটি ছেলে, সে কলকাতায় প্লিডার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে

বাইরে রয়েছে।'

'আপনার কি ধারণা, সুধীর ব্রহ্মের সেই ছেলে এখন এখানে রয়েছে?'

'তা বলতে পারব না; আর বাইশ বছর পরে তাকে দেখলে হয়তো চিনতেও পারব না। কিন্তু সে বাপের হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল সে কথা আমি জানি।'

ভদ্রলোক যে ঘটনাটা বললেন, সেটা যে খুবই আশ্চর্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা বুঝতে পারছিলাম যে, এ কাহিনী ফেলুদাকে নতুন করে ভাবাবে।

ফেলুদা বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সে ছেলে যদি এখন এখানে নাও থাকে, মিঃ মজুমদারের জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে এটা শুনে খুবই অবাক লাগছে। তাঁর জীবনে যে কোনও একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছিল সে রকম ইঙ্গিত দু'-একবার পেয়েছি, এমন কি আপনিও দিয়েছেন, কিন্তু সেটা যে এমন একটা ঘটনা, তা ভাবতে পারিনি। আর আপনি নিজেই যখন সে সময় নীলকণ্ঠপুরে উপস্থিত ছিলেন, তখন এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।'

হরিনারায়ণবাবুর সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। ফেলুদার কপালে নতুন করে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে। আমার মন বলছে এবার আর কেসটাকে তেমন সহজ বলে মনে হচ্ছে না ফেলুদার। খানিকটা পথ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ও বলল, 'এই কাহিনী আমার চিন্তাকে সাহায্য করবে না ব্যাহত করবে সেটা বুঝতে পারছি না। এখন এই শহরের অবস্থা যেমন, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। একরাশ কুয়াশা এসে চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যদি একটু সূর্যের আলো দেখতে পেতাম!'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে অবজারভেটরি হিল রোডের পুব দিকটায় এসে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম ফেলুদার মনের ভিতরটা ছটফট করছে, তাই সে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

কুয়াশার মধ্যেই একজন নেপালি একটা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে

এল, পিঠে কোনও সওয়ার নেই। 'বাবু ঘোড়া লেগা, ঘোড়া ?' বলে উঠল লোকটা, কিন্তু আমরা তাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম। সামনে বাঁয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটা, ডাইনে খাদ, আমরা সে খাদ বাঁচিয়ে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে চলেছি। রাস্তার পাশের রেলিংটা প্রায় দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায়। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে সামনে উত্তরে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইনটা দেখা যায় ; আজ আমাদের চার দিক থেকে ঘিরে রয়েছে একটা দুর্ভেদ্য সাদা দেয়াল।

এবার পাশের রেলিংটা ফুরিয়ে গেছে। এখন ডাইনে রাস্তার ধারেই খাদ। আমরা এখনও পাহাড়ের দিক ঘেঁষে চলেছি, যদিও দেখছি ফেলুদা, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে একটু বেশি ডান দিকে চলে যাচ্ছে। লালমোহনবাবু খালি বলছেন, 'মিস্টিরিয়াস, মিস্টিরিয়াস'...। তার পর একবার বললেন, 'মশাই, মিস্ট থেকেই মিস্ট্রি আর মিস্টিরিয়াস এসেছে নাকি ?'

হঠাৎ আমাদের পিছনে ফিরতে হল, কারণ দ্রুত পায়ের শব্দ পেয়েছি। কিন্তু কই, এখনো তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না ! অথচ পায়ের শব্দটা এগিয়ে আসছে। তার পর হঠাৎ কুয়াশার ভিতর থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। তার মুখ ভালো করে দেখার আগেই সে মূর্তি ফেলুদাকে সজোরে মারল একটা ধাক্কা খাদের দিকে। ফেলুদা টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল—চারিদিক কুয়াশায় কুয়াশা !

ইতিমধ্যে মূর্তিও আবার কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তার দ্রুত পায়ের শব্দ।

লালমোহনবাবুর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, কী সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটে গেল।

আর সেই সঙ্গে দুটো নেপালি সামনের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে এল, আর আমাদের দেখেই জিগ্যেস করল, 'কেয়া হুয়া, বাবু ?'

আমরা বললাম কী হয়েছে। আমাদের সঙ্গের লোক খাদে পড়ে গেছে জেনেই তারা দুজন অনায়াসে পাহাড়ের গা দিয়ে নীচে নেমে গেল—'এক মিনিট ঠাহরিয়ে বাবু, হাম্ দেখ্‌তা হ্যায় কেয়া হুয়া।'

লোক দুটোও কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু মুহূর্তেই

কুয়াশাও হঠাৎ পাতলা হয়ে চারদিকে সব কিছু যেন আবছা আবছা দেখা যেতে লাগল। কে যেন একটা ফিনফিনে চাদর টেনে সরিয়ে নিচ্ছে সমস্ত দৃশ্যের উপর থেকে।

নীচে ওটা কী?

একটা গাছ। রডোডেনড্রন বলেই তো মনে হচ্ছে। তার গুঁড়ির সঙ্গে লেগে একটা মানুষ পড়ে আছে। ফেলুদা! ওই যে তার খাকি জার্কিন আর লাল-কালো চেক্ মাফলার।

নেপালি দুটো মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে গেছে, তার পর ফেলুদাকে দু' হাতে ধরে তুলতেই যেন ফেলুদারও হুঁশ ফিরে এসেছে।

'ফেলুদা!'

'ফেলুবাবু!'

আমাদের দুজনের ডাকের উত্তরে ফেলুদা তার ডান হাতটা তুলে আশ্বাস দিল যে, সে ঠিকই আছে।

তার পর সে খাড়াই দিয়ে উঠে এল দুই নেপালির সাহায্যে—আমাদের চরম বিপদের সময় দুই আচমকা বন্ধু।

পাঁচ মিনিটের কসরৎ ও চেষ্টার পর ফেলুদা পৌঁছে গেল আমাদের কাছে—সে হাঁপাচ্ছে, তার কপাল ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, হাতেও আঁচড় লেগেছে, তাতে রক্তের আভাস।

'বহুৎ সুক্রিয়া!' ফেলুদা বলল তার উদ্ধারকারীদের।

তারা দুজনে চাপড় মেরে ফেলুদার গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বলল, ম্যালের মোড়েই ডাক্তারখানা আছে, সেখানে এক্ষুনি গিয়ে যেন ফেলুদা ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করে।

আমাদেরও সে মতলব ছিল। আমরা হাঁটা দিলাম আবার ম্যালের দিকে।

'লোকটা কে ছিল বুঝতে পারলে তপেশ?' লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন। আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি বলতে কি, চাপ দাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি আমি। আর দাড়িটাও মনে হচ্ছিল নকল। 'কি রকম বোধ করছেন?' জটায়ু জিগ্যেস করলেন ফেলুদাকে।

'বিধ্বস্ত', বলল ফেলুদা। 'ওই গাছটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, না হলে হাড়গোড় সব চুরমার হয়ে যেত। কিন্তু মনে হচ্ছে, এবার আস্তে আস্তে মাথা খুলে যাবে। একটা জোরালো ক্লু তো এর মধ্যেই পেয়েছি। আমার এ রকমই হয়, জানেন, এ রকমই হয়। এটার দরকার ছিল। আর এটাও বুঝলাম যে, কেসটা মোটেই সরল নয়।'

৯

ফেলুদার জখম যে তেমন গুরুতর হয়নি সেটা ডাক্তারখানায় গিয়েই বোঝা গেল। ডাক্তার বর্ধন বসেন ডিসপেনসারিতে, তিনিই ফার্স্ট এড দিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক স্বভাবতই ঘটনাটা জানতে চাইলেন, আর আমাদেরও বলতে হল।

'কিন্তু আপনার ওপর এ আক্রমণের কারণ কী?' জিগ্যেস করলেন বর্ধন।

এর ফলে ফেলুদাকে নিজের পরিচয় দিতে হল। তাতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'আপনিই স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র? আমি তো আপনার অনেক কীর্তির বিষয়ে পড়েছি মশাই! চাক্ষুষ পরিচয় যে হবে, সেটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।...কিন্তু আপনি কি মিঃ মজুমদারের খুনের তদন্ত করছেন নাকি?'

'ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে', বলল ফেলুদা।

'ভদ্রলোক তো আমারই পেশেন্ট ছিলেন', বললেন ডাঃ বর্ধন।

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস। আশ্চর্য মনের জোর ছিল মিঃ মজুমদারের। দেখে বোঝাই যেত না যে ওঁর ওপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গেছে, এবং এখনও যাচ্ছে। নিজের ছবি নিয়ে মেতে থাকতেন, আর ঘোড়া চড়ে ঘুরে বেড়াতেন।'

'কিন্তু ঝড়ের কথা কী বলছেন একটু জানতে পারি কি?'

'একে তো ওঁর নিজের অসুখ ছিল। তার পর স্ত্রীকে হারান বছর

সাতেক আগে। ভদ্রমহিলার ক্যানসার হয়েছিল। তার উপর পুত্রের সমস্যা।'

'সমীরণবাবুর কথা বলছেন?'

'এত গুণ ছিল ছেলেটির, কিন্তু শেয়ার বাজারের খেলা খেলতে গিয়ে সব গেছে। এখন দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছে। একটিমাত্র ছেলে, তাই ভাবতে কষ্ট হয়। আমি তো ওঁর ডাক্তার ছিলাম, তাই সুখ-দুঃখের অনেক কথাই আমাকে বলতেন। এবারও যে ছেলে এসেছে, আই অ্যাম শিওর তার কারণ বাপের কাছে হাত পাতা। কিন্তু আমি যত দূর জানি বাবা সম্প্রতি ছেলের উপর রীতিমতো বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। একটা আলটিমেটাম দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হব না। সমস্ত ব্যাপারটা কালিমাময়, আনপ্লেজেন্ট। আমার ভালো লাগছে না। খুনের কথাটা শুনে অবধি আমার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমি সেটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

'ভদ্রলোক উইল করে গেছেন কিনা জানেন?'

'তা জানি না। তবে করে থাকলে ছেলেকেই নিশ্চয় সব কিছু দিয়ে গেছেন—যদি না ইতিমধ্যে উইল বদলে থাকেন।'

ফেলুদা ডাঃ বর্ধনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ভদ্রলোক একটি পয়সাও নিলেন না। আসবার সময় ফেলুদা বলল, 'আপনি যে আমার কত উপকার করেছেন, তা আপনি জানেন না। ফার্স্ট এড নিতে এসেছিলাম, তার সঙ্গে আরও অনেক এড পেয়ে গেলাম।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'তোরা যদি বিশ্রাম করতে চাস তো হোটেলে ফিরে যেতে পারিস। আমি কিন্তু এখন একটু নয়নপুর ভিলায় যাব। আজকের জানা সব নতুন তথ্য মাথায় রেখে নতুন করে তদন্ত শুরু করতে হবে। আমার চোখে কেসটা এখন একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে।'

আমরাও দুজনেই অবিশ্যি সঙ্গেই যেতে চাইলাম। ও যদি এত ধকলের পরও বিশ্রাম ছাড়া চলতে পারে, তা হলে আমরা তো পারবই। সত্যি, আশ্চর্য শক্ত শরীর ফেলুদার। পাহাড়ের গা গড়িয়ে প্রায় একশো ফুট নীচে চলে গিয়েছিল।

আমরা নয়নপুর ভিলায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। সমস্ত বাড়িটায় একটা থমথমে ভাব, যদিও চারিদিকের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য যেমন ছিল তেমনই আছে। নুড়ির ওপর আমাদের পায়ের শব্দ শুনেই বোধ হয় রঞ্জনবাবু ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আপনার যে হাত খালি খালি লাগছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আমাদের কতকগুলো কাজ ছিল, সেই ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন...'

'কী কাজ বলুন।'

'আমরা একবার মিঃ মজুমদারের কাজের ঘরটা দেখতে চাই। তার পর আপনার ঘরটাও একটু দেখব। অবিশ্যি তার সঙ্গে কিছু প্রশ্নও করতে হবে।'

'বেশ তো, চলুন।'

'সমীরণবাবুকে দেখছি না— ?'

'উনি বোধ হয় স্নান করতে গেছেন।'

'তা হলে চলুন মিঃ মজুমদারের স্টাডিতেই বসা যাক্।'

আমরা চারজনে বাড়ির উত্তর দিকের পিছনের অংশে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। বেশ সুসজ্জিত, পরিষ্কার ঘর, পুবের জানলা দিয়ে বাড়ির পিছনের ঝাউবন দেখা যায়। জানালার সামনে একটা বেশ বড় মেহগনি টেবিল, তার পিছনে একটা আর সামনে দুটো ভারী চেয়ার। এ ছাড়া, ঘরের পশ্চিম অংশেও আলাদা বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা সোফা আর দুটো মুখোমুখি আর্ম চেয়ার। আমরা সেখানেই বসলাম। ফেলুদার বসবার তাড়া নেই, সে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। টেবিলের উপর থেকে পেপারকাটার তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

'এটায় তো বেশ ধার দেখছি', বলল ফেলুদা, 'এই দিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।'

লালমোহনবাবু বললেন, ওর একটা জোড়া নাকি ওঁদের শুটিং-এ ব্যবহার হচ্ছে। 'এটা দিয়ে ভিলেনকে পিঠ চুলকোতে দেখানো হয়েছে।'

সত্যিই ছুরিটাকে দেখলে বেশ শানালো মনে হয়। ফেলুদা সেটা আবার টেবিলের উপর রেখে দিল।

ঘরের এক দিকে একটা বুক শেলফে সারি সারি বড় খাতা দাঁড় করানো রয়েছে, তার দুটো আমরা এর আগেই দেখেছি। এগুলোতেই সেই সব খুনখারাবির খবর সাঁটা আছে। ফেলুদা তার আরও দু'-একটা উল্টোপাল্টে দেখল। তার পর প্রশ্ন করল, 'আপনি আসার আগে এগুলো কে সাঁটত?'

'মিঃ মজুমদার নিজেই।'

'আপনি আসার পর থেকে তো উনি সে কাজটা আপনার উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তবে আমাকে লোকনাথ মাঝে মাঝে সাহায্য করত।'

'লোকনাথ বেয়ারা?'

'হ্যাঁ। লোকনাথ স্কুল ফাইনালে পাশ করেছে। সে রীতিমতো লিখতে-পড়তে পারে।'

'এটা একটা অপ্রত্যাশিত খবর। তবে, পড়াশুনা করে সে বেয়ারার কাজ কেন নিল, সেটা বলতে পারেন?'

'মিঃ মজুমদার ওকে খুব ভালো মাইনে দিতেন।'

'আর সে বেয়ারাই শেষকালে এমন একটা কাজ করল?'

'ফেলুদা ঘুরে ঘুরে এটা সেটা দেখছে আর প্রশ্ন করে চলেছে।

'আপনি এখানে আসার আগে কী করতেন?'

'একটা দিশি ফার্মে চাকরি করতাম।'

'কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'ক' বছর করেছিলেন এই কাজ?'

'সাত বছর।'

'মিঃ মজুমদার কি সেক্রেটারি চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কদ্দুর পড়েছেন?'

'আমি বি-কম পাশ।'

'আপনার ফ্যামিলি নেই?'

'আমি বিয়ে করিনি। বাবা-মা মারা গেছেন।'

'ভাই-বোন নেই?'

'না।'

'তার মানে আপনি একা মানুষ?'

'হ্যাঁ।'

'এই ছবিটা কী ব্যাপার?'

একটা শেল্ফের উপর একটা বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল। একটা গ্রুপ ছবি; দেখে মনে হয় আপিসের গ্রুপ, সবসুদ্ধ জনা পঁয়ত্রিশ লোক, কিছু পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে, বাকি সামনের চেয়ারে বসে।

'ও ছবিটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তোলা', বললেন রজতবাবু। 'একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেবার দিন ছবিটা তোলা হয়েছিল। মিঃ মজুমদার তখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন।'

ফেলুদা ছবিটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখল।

'কোনজন কে—সেটা লেখা নেই ছবিতে? মিঃ মজুমদারকে তো চিনতেই পারছি।'

'ছবির তলার দিকে থাকতে পারে। হয়তো বাঁধানোর সময় মাস্কের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে।'

'এটা আমার কাছে দু-তিন দিন রাখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা ছবিটা আমার হাতে চালান দিল। আমি আর লালমোহনবাবু সেটা দেখলাম। আপিসের গ্রুপ যেমন হয় তেমনই ব্যাপার। মিঃ মজুমদার প্রথম সারিতে চেয়ারে বসে আছেন বোধ হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাশে।

ফেলুদা বলল, 'খুনের দিন সকাল বেলা আপনি কখন কী করছিলেন সেটা জানা দরকার।'

প্রশ্নটা করে ফেলুদা কোটের পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে একটা পাতা খুলে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তার পর বলল, 'সাড়ে এগারোটার সময় মিঃ মজুমদার তাঁর স্টাডিতে

আসতেন। তখন আপনার তাঁর সঙ্গে থাকতে হত। সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ চলত, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন কী কাজ ছিল ?'

'মিঃ মজুমদারের অনেক চেনা পরিচিত ছিল দেশ-বিদেশে। উনি তাঁদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন। তাতেই বেশির ভাগ সময় কেটে গেছিল সে দিন।'

'সাড়ে এগারোটার আগে সকালে আপনি কী করছিলেন ?'

'ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই শুটিং-এর দল আসতে শুরু করে। আমি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে ওঁদের তোড়জোড়ের কাজ দেখছিলাম।'

'কোনও শট নেওয়া দেখছিলেন ?'

'প্রথমটা দেখেছিলাম। মিঃ গাঙ্গুলি আর মিঃ ভার্মাকে নিয়ে শট।'

লালমোহনবাবুর মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম, তিনি রজতবাবুর কথাটার সমর্থন করছেন।

'সেটা কটা নাগাত ?'

'আন্দাজ এগারোটা। আমি ঘড়ি দেখিনি। তার কিছু পরেই আমি মিঃ মজুমদারের কাজের ঘরে চলে আসি।'

'কাজের পর তো লাঞ্চ খেতেন আপনারা ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনারা তিনজনে এক সঙ্গে খেতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়ার পর কী করেন ?'

'লাঞ্চ শেষ হয় প্রায় একটার সময়। তার পর আমি নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বই পড়ি।'

'কী বই ?'

'বই না, পত্রিকা। রিডারস্ ডাইজেস্ট।'

'তার পর ?'

'তার পর দুটো নাগাত একটু কাউবনে ঘুমতে বেরোই।

ঝাউবনটা খুব সুন্দর। আমি ফাঁক পেলেই ও দিকটা একবার ঘুরে আসি।'

'তার পর ?'

'আড়াইটে নাগাত আমি ফিরে আসি। তার পর বিকেল চারটে অবধি বিশ্রাম করে আর একবার শুটিং দেখতে যাই। তখন মিঃ গাঙ্গুলির একটা শট হচ্ছিল।'

লালমোহনবাবু আবার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'মিঃ মজুমদার যখন পাঁচটার পরেও ঘর থেকে বেরোলেন না তখন আপনার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি ?'

'আমি ঘড়ি দেখিনি। বাড়িতে হট্টগোল, জেনারেটর চলছে, আমার সময়ের খেয়াল ছিল না।'

'মিঃ মজুমদার বস্ হিসেবে কি রকম লোক ছিলেন।'

'খুব ভালো।'

'আপনার উপর চোটপাট করেননি কখনও ?'

'না।'

'মাইনে যা পেতেন, তাতে আপনি খুশি ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'খুনের আগের দিন লালমোহনবাবু দুপুরের দিকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ মজুমদারের গলা শুনতে পান। তিনি কাউকে বলছিলেন, "ইউ আর এ লায়ার। আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"—এই কথাটা উনি কাকে বলতে পারেন, সে ধারণা আছে আপনার ?'

'একমাত্র ওঁর ছেলে ছাড়া আর কারুর কথা তো মনে পড়ছে না।'

'ওঁর ছেলের সঙ্গে মিঃ মজুমদারের সদ্ভাব ছিল না ?'

'ছেলের সম্বন্ধে কতকগুলো ব্যাপারে ওঁর আক্ষেপ ছিল।'

'সেটা আপনি কি করে জানলেন ?'

'আমার সামনে দু-একবার বলেছেন—"সমুটা বড় রেকলেস হয়ে পড়ছে"—বা ওই জাতীয় কথা। উনি ছেলেকে ভালোও বাসতেন, আবার সেই সঙ্গে শাসনও করতেন।'

'উনি কোনও উইল করে গেছেন বলে আপনি জানেন ?'

'যদ্দুর জানি করেননি।'

'কেন বলছেন এ কথা ?'

'কারণ একদিন আমাকে বলেছিলেন—"এখন তো দিব্যি আছি ; আরেকটু শরীরটা ভাঙুক, তার পর উইল করব"।'

'তার মানে ওঁর সম্পত্তি ওঁর ছেলেই পাচ্ছেন ?'

'তাই তো হয়ে থাকে।'

'এবার আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি ?'

'আসুন।'

রজতবাবুর শোবার ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। একটা খাট, একটা ছোট আলমারি, একটা তাক, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। দেয়ালে আলনা রয়েছে একটা, তাতে একটা শার্ট, একটা খয়েরি পুলোভার আর একটা তোয়ালে ঝুলছে। ঘরের একপাশে একটা সুটকেস রয়েছে, তাতে আর. বি. লেখা।

টেবিলের উপর তিন-চারখানা ইংরিজি পেপার ব্যাক আর গোটা পাঁচেক পত্রিকা রয়েছে।

'হিন্দি পত্রিকা দেখছি যে ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আমার ছেলেবেলা কানপুরে কেটেছে', বললেন রজতবাবু, 'বাবা ওখানকার ডাক্তার ছিলেন। ইস্কুলে হিন্দি শিখেছিলাম। বাবা মারা যাবার পর কলকাতায় মামা বাড়িতে চলে আসি।'

আমরা চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'মিঃ মজুমদার ঘুমের আগে একটা বড়ি খেতেন, সেটা আপনি জানতেন ?'

'হ্যাঁ। আমি অনেকবার গিয়ে সে বড়ি এনে দিয়েছি। টফ্রানিল। পুরো মাসের স্টক একবারে কিনে নিতেন।'

'হুঁ...এবার একটু সমীরণবাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

সমীরণবাবু স্নান সেরে তাঁর ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অশৌচ অবস্থা, তাই দাড়ি কামাননি ভদ্রলোক। ওঁর সঙ্গে কথা বলে খুব বেশি কিছু জানা গেল না। ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে ওঁর বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত।

'বাবা আগে এ রকম ছিলেন না', বললেন ভদ্রলোক। 'অসুখের পর থেকে এ রকম হয়ে গিয়েছিলেন।'

'আপনার দিক থেকে কি কোনও পরিবর্তন হয়নি, যাতে আপনার বাবা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন ?'

'আমার দু'-একটা ভুল স্পেকুলেশন হয়েছে সেটা ঠিকই, কিন্তু সে রকম তো ব্যবসায় হতেই পারে।'

'খুনের আগের দিন দুপুরে দেড়টা নাগাত আপনার সঙ্গে মিঃ মজুমদারের কোন রকম কথা কাটাকাটি হয়েছিল ?'

'কই, না তো !'

'আপনার বাবার কাছ থেকে কি আপনার মাঝে মাঝে টাকা চাইতে হত ?'

'তা চাইব না কেন ? আমার বাবা অনেক পয়সা করেছিলেন।'

'আপনার বাবা যে উইল করে যাননি, সেটা আপনি জানতেন ?'

'জানতাম। বাবা একদিন আমাকে রাগ করে বলেছিলেন উইল করলে আমাকে এক পয়সাও দেবেন না।'

'কিন্তু এখন তো আপনি সব কিছুই পাচ্ছেন ?'

'তা পাচ্ছি।'

'এতে আপনার অনেক সমস্যা মিটে যাবে—তাই না ?'

'তা যাবে, কিন্তু এটার জন্য তো আমি দায়ী নই। আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে আমি বাবাকে খুন করেছি ?'

'ধরুন যদি তাই করি। সুযোগ ও কারণ—দুটোই তো আপনার ছিল !'

'ঘুমের বড়ি খাওয়ানোর সুযোগ আমার কী করে থাকবে ? সে বড়ি তো দিত লোকনাথ।'

'কিন্তু সে দিন লোকনাথ দুধটা রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে চলে গিয়েছিল, এটা ভুলবেন না। আর ছুরি বসানোর সুযোগও আপনার ছিল। আপনার বাবার ঘরেই এ কাজের জন্য একটি উত্তম অস্ত্র ছিল—যেটা সত্যি করেই ওই কাজে লাগানো হয়।'

সমীরণবাবু একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'এ সব কী বলছেন আপনি ? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? মূর্তি চুরির কথাটা

ভাবছেন না কেন ? বাবা মরলেই তো আমি টাকা পাব, সেখানে আর বালগোপালের দরকার কী ?'

'আপনার হয়তো তাড়া ছিল। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো আর আপনার হাতে টাকা আসবে না ; তার তো একটা লিগ্যাল প্রোসেস আছে !'

'তা হলে লোকনাথ গেল কোথায় ? যে আসল লোক, তার সম্বন্ধে তদন্ত না করে আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন ?'

'সেটার কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও সেটা প্রকাশ্য নয়।'

'ঠিক আছে, আপনি আপনার গোপন কারণ নিয়ে থাকুন, কিন্তু জেনে রাখুন যে, আমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে একেবারেই ঘটনাচক্রে। আসল অপরাধীকে পেতে হলে আপনার অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। এর বেশি আর আমি কিছু বলতে চাই না।'

১০

দুপুরে লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল যে-গ্রুপ ছবিটা ও মিঃ মজুমদারের স্টাডি থেকে এনেছে, সেটা নিয়ে ওকে একবার ফোটোগ্রাফির দোকান দাশ স্টুডিওতে যেতে হবে। 'তা ছাড়া, একবার থানায় গিয়ে সাহার সঙ্গে দেখা করাও দরকার। কতকগুলো জরুরী ইনফরমেশন চাই, সে কাজটা আমার চেয়ে পুলিসের পক্ষে অনেক বেশি সহজ। তোরা এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসতে চাস তো আসতে পারিস। আমি বাড়ি ফিরে আর বেরোব না। কারণ আমার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। কেসটা এখনও ঠিক দানা বাঁধেনি।'

ফেলুদা বেরিয়ে গেল। কী আর করি—আমরাও দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, হাঁটতে কোনও অসুবিধা নেই।

হোটেলের বাইরে এসে আমি লালমোহনবাবুকে বললাম, 'আপনার একটা জিনিস এখনও দেখা হয়নি ; সেটা আমি দেখেছি।

সেটা হল মজুমদারের বাড়ির পিছনের ঝাউবন। অবিশ্যি আমিও গেছি মাত্র দু মিনিটের জন্য, কিন্তু তাতেই মনে হয়েছে বনটা দারুণ। যাবেন ?'

'সেটা যেতে হলে মজুমদারের বাড়ির ভিতর দিয়ে যেতে হয় ?'

আমি বললাম, 'তা কেন ? ওদের বাড়িতে পৌঁছবার আগেই মেন রোড থেকে একটা রাস্তা বাঁ দিকে বেরিয়ে বনের দিকে চলে গেছে—দেখেননি ?'

আমরা দুজন রওনা দিয়ে দিলাম। ফেলুদার কথাটা মন থেকে দূর করতে পারছি না। ও যে কয়েকটা ক্লু পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো যে কী সেটা এখন আমাদের বলবে না। ওর হালচাল আমার খুব ভালো করেই জানা আছে। এখন ওর চিন্তা করা আর ইনফরমেশন জোগাড় করার সময়। সব সূত্র খুঁজে পেয়ে কেসটা মাথায় পরিষ্কার হলে তার পর বম্ব-শেলটা ছাড়বে।

পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এখানে যে রহস্যটা কোথায়, সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না, তপেশ। লোনাথ বেয়ারা খুন করে মূর্তি চুরি করে পালিয়েছে—ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। তোমার দাদা এত যে কী সাতপাঁচ ভাবছেন ! বাকিটা তো পুলিসের ব্যাপার। তারা কালপ্রিটকে খুঁজে পেলেই খেল খতম্।'

আমি বললাম, 'আপনি ফেলুদাকে এত দিন চেনেন, আর এটুকু বুঝছেন না যে, কোথাও একটা গণ্ডগোল না থাকলে ফেলুদা মিথ্যে ভাবত না ! এক তো চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে, ওঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা হল খাদে ফেলে। সেটা নিশ্চয়ই লোকনাথ বেয়ারা করেনি। তা ছাড়া, মিঃ মজুমদারের জীবনে একটা কেলেঙ্কারি রয়েছে। উনি নিজে একজনকে অজান্তে খুন করেছিলেন। তার পর তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে একজন টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তাকে ধরা যায়নি। তার পর আপনি নিজে সে দিন শুনলেন মজুমদার একজনকে ধমক দিচ্ছেন, সেটা যে কে সেটা এখনও বোঝা যায়নি। এত রকম জিলিপির প্যাঁচ সত্ত্বেও আপনি বলছেন, কেসটা সহজ ?'

সত্যি বলতে কি, আমার নিজের মনের মধ্যে সব কিছু এমন

তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল যে আমি কোনওটার সঙ্গে কোনওটার যোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কাজেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে, ভাবার কাজটা ফেলুদার উপরেই ছেড়ে দেব।

ঝাউবনটাতে একবার ঢুকেই বুঝেছিলাম যে সেটা একটা আশ্চর্য জায়গা। আজ ভালো করে দেখে আসল ব্যাপার বুঝতে পারলাম। এটাকে ঝাউবন বলা ঠিক নয়, কারণ এখানে পাইন, ফার, রডোডেনড্রন ইত্যাদি অনেক রকম চেনা-অচেনা গাছই আছে। গাছের মাঝে মাঝে ঝোপ রয়েছে, তাতে আবার লাল নীল হলদে ফুল। আজ দিনটা মেঘলা, তাই সমস্ত বনটাই আবছা অন্ধকারে ঢাকা। মনে হয়, অজস্র থামওয়ালা একটা বিরাট গির্জার মধ্যে আমরা এসেছি। যেখান দিয়ে এখন হেঁটে চলেছি, সেখান থেকে পশ্চিমে চাইলে গাছের ফাঁক দিয়ে নয়নপুর ভিলা দেখা যায়। অবিশ্যি বনের মধ্যে দিয়ে যতই এগোচ্ছি, ততই বাড়িটা দূরে সরে গিয়ে গাছপালায় ঢেকে যাচ্ছে। এটা মানতেই হবে যে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে এই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গা-টা বেশ ছমছম করছিল। লালমোহনবাবু তাই বোধ হয় একবার বললেন, 'এখানে কাউকে খুন করলে লাশ আবিষ্কার করতে মাসখানেক অন্তত লাগবে।'

আমরা আরও এগিয়ে চললাম। এবার আর নয়নপুর ভিলা দেখা যাচ্ছে না। একটা মাত্র পাখির ডাক কিছুক্ষণ থেকে কানে আসছে, কিন্তু সেটা যে কী পাখি তা জানি না।

উত্তর দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ দেখি, মেঘ সরে গিয়ে দুটো পাইন গাছের মধ্য দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আমি লালমোহনবাবুকে সেই দিকে দেখতে বলব বলে ডাইনে ঘুরেই দেখি, ভদ্রলোক চোখ বড়-বড় করে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। কী দেখছেন ভদ্রলোক ?

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পুবে চাইতেই বুঝলাম ব্যাপারটা কী।

একটা গাছের গুঁড়ির পাশে একটা ঝোপ, আর সেই ঝোপের পিছনে এক জোড়া জুতো-পরা পা দেখা যাচ্ছে।

'এগিয়ে গিয়ে দেখবে ?' ফিসফিসে গলায় জিগ্যেস করলেন

লালমোহনবাবু।

আমি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওই জুতো জোড়া আমি আগে দেখেছি।

ঝোপটা পেরোতেই ব্যাপারটা বুঝলাম।

একটা লাশ পড়ে আছে মাটিতে।

একে আমরা চিনি।

এ হল লোকনাথ বেয়ারা।

একেও বুকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে, যদিও অস্ত্রটা কাছাকাছির মধ্যে নেই।

তার বদলে আছে একটা পাথরের সামনে একটা ভাঙা বোতল, আর সেই বোতলের চারিদিকে ছড়ানো গোটা ত্রিশেক বড়ি। সেই বড়ি এককালে সাদা ছিল, কিন্তু এখন জল আর মাটি লেগে সেটা আর সাদা নেই।

আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা ফিরে এলাম হোটেলে। ফেলুদাও বলল সে ফিরেছে মিনিট পাঁচেক আগে। লালমোহনবাবু 'সেনসেশন্যাল ব্যাপার—' বলে নাটক করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি ওঁকে থামিয়ে এক কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম।

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাহাকে নিয়ে দুটো জিপ চলে এল, একটায় চারজন কনস্টেবল।

আমরা আবার ফিরে গেলাম ঝোপঝাড়ে যেখানে লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই জায়গায়।

'ইনিও দেখছি ছুরিকাঘাতে মৃত', বললেন সাহা। 'আমলে আমরা খুঁজছিলাম লোকালয়ে, ভাবছিলাম লোকটা কোনও গোপন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছে। এই ডিসকভারির জন্য পুরো ক্রেডিট পাবেন মিস্টার মিত্তিরের বন্ধু এবং কাজিন। সত্যিই আপনারা কাজের কাজ করেছেন।'

মৃতদেহ চলে গেল পুলিসের জিম্মায়, আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

'এ যে মোড় ঘুরে গেল।' আমাদের ঘরে এসে খাটের উপর ধপ্

করে বসে বললেন লালমোহনবাবু।

'ঘুরেছে ঠিকই', বলল ফেলুদা, 'কিন্তু অন্ধকারের দিকে নয়, আলোর দিকে। এখন শুধু কয়েকটা খবরের অপেক্ষা। তার পর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।'

সন্ধ্যায় এল ফেলুদার টেলিফোন—সাহার কাছ থেকে। একপেশে কথা শুনে, আর ফেলুদার গোটা বিশেক 'হ্যাঁ' 'আই সি' আর 'ভেরি গুড' শুনে আন্দাজ করলাম যে, খবরটা যা আসবার তা এসে গেছে। শেষে ফেলুদা বলল, 'তা হলে কাল সকাল দশটার সময় সকলকে বলুন যেন মিঃ মজুমদারের বৈঠকখানায় জমায়েত হয়। নয়নপুর ভিলার সকলে এবং মাউন্ট এভারেস্টের পুলক ঘোষাল, রাজেন রায়না, মহাদেব ভার্মা আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ। আপনাদের উপস্থিতি তো অবশ্যই এসেনশিয়াল।'

১১

পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের হোটেলের ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। আমরা দুজনেই আগেই উঠে পড়েছিলাম, সবে বেড-টি খাওয়া হয়েছে, ফেলুদা বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলল। ওকে শুধু দুটো কথা বলতে শুনলাম—'বলেন কী!' আর 'আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

ফোনটা রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, 'লালমোহনবাবুকে বল তৈরি হয়ে নিতে—এক্ষুনি!'

কী ব্যাপার, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? সেটা পুলিসের জিপে উঠে বুঝলাম। আজ সকাল সকাল পুলিসের জিপ নয়নপুর ভিলায় গিয়েছিল ওদের মিটিং সম্বন্ধে খবর দিতে। গিয়ে শুনল সমীরণবাবু নাকি একটা জরুরী টেলিফোন পেয়ে পনের মিনিট আগে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেছেন। অথচ ফেলুদার মতে মিটিং-এ তাঁকে ছাড়া চলবে না।

আমাদের জিপ শিলিগুড়ির রাস্তা ধরল।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এই স্পিডে কোনও দিন চলেছি বলে মনে

পড়ে না। দেখতে দেখতে ঘুম সোনাদা টুং ছাড়িয়ে গেল। তবু ভাগ্যি ভালো এখন অবধি তেমন কুয়াশা পাইনি। নইলে জিপের স্পিড তোলা যেত না। অসম্ভব তুখোড় ড্রাইভার, তাই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা আধ ঘণ্টায় পেরিয়ে গেল।

সাহা অবশ্যি কার্সিয়ং আর শিলিগুড়িতেও খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সমীরণবাবুর গাড়ি তারা আটকায়। কিন্তু ট্যাক্সির নম্বরটা দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেটা বার করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যেত।

কার্সিয়ং পর্যন্ত গিয়েও সমীরণবাবুর ট্যাক্সির কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। সাহা ড্রাইভারকে বললেন, 'এবার পাংখাবাড়ির শর্টকাটটা ধরো।'

আমাদের দুটো জিপ ছিল; একটা সাধারণ রাস্তা দিয়ে গেল, আর অন্যটা—যাতে আমরা রয়েছি—সেটা শর্টকাটটা ধরল।

পাংখাবাড়ির রাস্তা যে কী ভয়ানক প্যাঁচালো, সেটা যে না দেখেছে তাকে বোঝানো অসম্ভব। লালমোহনবাবু তো চোখ বন্ধ করে রইলেন। বললেন, 'অন্য গাড়ির দেখা পেলে ব'লো, তপেশ। আমি তার আগে আর চোখ খুলছি না; খুললেই গা গুলোবে।'

পনের মিনিট সাপের মতো প্যাঁচানো উৎরাই দিয়ে যাবার পর একটা হেয়ারপিন বেন্ড ঘুরেই দেখা গেল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি। বোঝাই যাচ্ছে টায়ার পাংচার। গাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে সিগারেট টানছেন সমীরণ মজুমদার।

আমাদের জিপ দেখেই ভদ্রলোক কেমন যেন হকচকিয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেন।

আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নামলাম। ফেলুদা আর সাহা এগিয়ে গেল সমীরণবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'কী—কী ব্যাপার?'

'কিছুই না', বলল ফেলুদা, 'হয়েছে কি, আপনি যে মিটিংটা

অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন কলকাতা, তার চেয়েও ঢের জরুরি মিটিং রয়েছে আজই, সকাল দশটায় আপনাদের নয়নপুর ভিলাতে। সেখানে আপনার থাকা একান্তই প্রয়োজন। অতএব আর বাক্যব্যয় না করে আপনার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ুন আমাদের জিপে। সঙ্গে আপনার সুটকেসটাও অবিশ্যি নেওয়া চাই।'

তিন মিনিটের মধ্যে আমরা আবার রওনা হলাম উল্টো মুখে। পথে কোনও কথা হল না। ফেলুদা চুপ, সাহা চুপ, সমীরণবাবুও চুপ।

নয়নপুর ভিলা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে দশটা।

বাড়ির ভিতর ঢুকে ফেলুদা সমীরণবাবুকে বলল, 'আপনার লোকনাথ বেয়ারা যখন আর নেই, তখন আপনার অন্য চাকর বাহাদুরকে বলুন কফি করতে। অন্তত বারো কাপ।'

আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। পাশের ঘর থেকে আরও চেয়ার এনে রাখা হয়েছে। সবাই যাতে বসতে পারে।

কফি আসার সঙ্গে সঙ্গেই এভারেস্ট হোটেলের দলও চলে এল। পুলক ঘোষাল একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী লালুদা?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'তুমি যেই তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে। তবে যত দূর জানি, রহস্যে আলোকপাতের জন্যেই এই মিটিং-এর ব্যবস্থা। আলোকসম্পাত করবেন শ্রীপ্রদোষ মিত্র।'

'আমাদের শুটিং আবার চালু করতে পারব তো?'

'সে তো ভাই বলতে পারব না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে।'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা।...বারো বছর এ লাইনে আছি, সতেরোখানা ছবি ডাইরেক্ট করেছি, কিন্তু এ হুজ্জতে পড়িনি কখনও।'

পুলক ঘোষালের কাঁচুমাচু ভাব দেখে আমার মায়া হল। ছাপ্পান্ন লাখ খরচ হবার কথা ছবিটাতে। সেটা এখন বেড়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে?

সবাই চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল। সকলেরই অস্বস্তি ভাব। আমি একবার সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার ডাইনে

বসেছেন লালমোহনবাবু, আর বাঁয়ে ফেলুদা। ফেলুদার পরে পর-পর গোল হয়ে বসেছেন ইনস্পেক্টর সাহা, সমীরণবাবু, রজতবাবু, পুলক ঘোষাল, মহাদেব ভার্মা, রাজেন্দ্র রায়না আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ। এ ছাড়া ঘরে দাঁড়িয়ে আছে নেপালি চাকর বাহাদুর, রান্নার লোক জগদীশ, আর চারজন কনস্টেবল। চারজনই রয়েছেন ঘরের দরজার মুখটাতে।

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হল। শেলফে রাখা একটা বাহারের ঘড়িতে টিং টিং করে দশটা বাজল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। সমস্ত ঘরে একমাত্র ফেলুদার মধ্যেই কোনও অস্বস্তির ভাব নেই। ইনস্পেক্টর সাহাকেও একবার আঙুল মটকাতে লক্ষ করেছি।

বোম্বাইয়ের অভিনেতা দুজন রয়েছে বলে ফেলুদা ইংরিজিতে কথা বলল, আমি সেটা বাংলা করে লিখছি।

ফেলুদা আরম্ভ করল—

'গত ক'দিনে এ বাড়িতে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো ঠিক এইভাবে এগুলো ঘটত না, কিন্তু এ বাড়িতে একটা ফিল্মের শুটিং চলাতে দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, এবং অনেক লোকের মনই পড়ে ছিল এই শুটিং-এর দিকে—যার ফলে কতকগুলি ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

'প্রধান ঘটনা হল—বাড়ির যিনি কর্তা—বিরূপাক্ষ মজুমদার—তিনি খুন হন। আমি নিজে একজন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটার; আমার কাছে হত্যাটা খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল। খুনের প্রধান উদ্দেশ্য যদি মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে থাকে, তা হলে লোকনাথ বেয়ারার উপর সন্দেহ পড়াটা খুব স্বাভাবিক, কারণ সে খুনের পর থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মন এটা মানতে চাইছিল না—কেন, সেটা ক্রমে প্রকাশ করছি। প্রথমে, যিনি খুন হয়েছিলেন তাঁকে জড়িয়ে দুটো ঘটনা আমি আপনাদের বলতে চাই।

'একটা ঘটে যখন তিনি কলকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি তরুণ

কর্মচারী—নাম ভি. বালাপোরিয়া—তহবিল তছরূপ করে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাত করে বেপাত্তা হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

'দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে। ওখানকার রাজা পৃথ্বী সিং-এর আমন্ত্রিত হয়ে বিরূপাক্ষ মজুমদার সেখানে যান বাঘ শিকার করতে। সেখানে জঙ্গলে ঝোপের পিছনে বাঘ ভেবে তিনি একটি মানুষের উপর গুলি চালান। তার ফলে সেই মানুষের মৃত্যু হয়। যিনি মরেন, তিনি ছিলেন বাঙালি। নাম সুধীর ব্রহ্ম। নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর একটি শখ ছিল, সেটা হল কবিরাজী গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করা। এই কাজ করতেই তিনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁর মৃত্যু হয়। এই হত্যার খবর যাতে সম্পূর্ণ গোপন থাকে, তার জন্য পৃথ্বী সিংকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

'যিনি মারা গিয়েছিলেন, সেই সুধীর ব্রহ্মের একটি ছেলে ছিল, নাম রমেন ব্রহ্ম। স্বভাবতই রমেন ব্রহ্ম এই ঘটনায় খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বড় হয়ে তিনি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। এখানে বলে রাখি, এই ঘটনা আমি শুনি দার্জিলিং-এর বাসিন্দা এবং মিঃ মজুমদারের প্রতিবেশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি সেই সময় নীলকণ্ঠপুরে থাকতেন এবং সুধীর ব্রহ্মের পরিবারকে চিনতেন। এই ঘটনার অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর জীবনে যে একটা কলঙ্কময় ঘটনা ঘটেছিল এবং সেটা যে খবরের কাগজ থেকে চেপে রাখা হয়েছিল, সে ইঙ্গিত বিরূপাক্ষ মজুমদার নিজেই আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ আমি দেখি না।

'এবার বিরূপাক্ষবাবুর হত্যার ঘটনায় আসা যাক। তাঁকে মারবার কারণ ও সুযোগ কার থাকতে পারে এটা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তাঁর ছেলে সমীরণবাবুর কথা। সমীরণবাবু শেয়ার মার্কেটে অনেক লোকসান দিয়েছেন, এ খবর আমরা পেয়েছি। এটা কি সমীরণবাবু অস্বীকার করতে পারেন?'

সমীরণবাবু মাথা নেড়ে 'না' বললেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে।

'আর তিনি যে তাঁর পিতার মৃত্যুতে আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হলেন, সেটা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন?'

সমীরণবাবু এবারও মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

'ভেরি গুড', বলল ফেলুদা। 'এবার আমরা খুনের চেহারাটা দেখব।

'বিরূপাক্ষবাবু দুধে মিশিয়ে ট্রফ্রানিল বলে একটা বড়ি খেয়ে দুপুরে ঘুমোতেন। এই দুধ তাঁকে এনে দিত তাঁর বেয়ারা লোকনাথ। এই বড়ি মৃত্যু দু' দিন আগে পুরো এক মাসের স্টক, অর্থাৎ একত্রিশটা, কেনেন বিরূপাক্ষবাবু। তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খুনের পর দেখা যায় যে, তার একটিও অবশিষ্ট নেই। আমাদের স্বভাবতই মনে হবে যে এই বড়িগুলির সবই তাঁর দুধের সঙ্গে মেশানো হয়েছিল। ত্রিশটা ট্রফ্রানিল একসঙ্গে খেলে একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় এই দেখে যে, বিরূপাক্ষবাবু একটা কাগজে কাঁপা হাতে "বিষ" কথাটা লিখে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা ব্যাপার দেখা গেল এই যে, তাঁকে যে শুধু বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল তা নয়। সেই সঙ্গে তাঁকে ছোরাও মারা হয়েছিল। এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, "বিষ" কথাটা লেখার পরে তাঁকে ছোরা মারা হয়েছিল। মনে হয়, বড়িতে কাজ দেবে না মনে করে আততায়ী পরে আর একবার এসে ছোরা মেরে খুনটাকে আরও নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করে।

'এখানে প্রশ্ন আসে—এই খুনের মোটিভ কী? এরও উত্তর পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। বিরূপাক্ষবাবুর ঘরে অষ্টধাতুর একটি মহামূল্য মূর্তি ছিল। সেটি এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

'এখানে আমার মনে খটকা যাই থাকুক না কেন, পুলিশের বিশ্বাস হয় যে, বেয়ারা লোকনাথ মূর্তিটা হাত করার জন্য মনিবকে ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে তার পর খুনটাকে আরও জোরদার করার জন্য তাঁর

বুকে ছুরি মেরে মূর্তিটাকে নিয়ে পালায়। গতকাল কিন্তু জানা যায় যে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলি ও ভাই তপেশ গতকাল বিকেলে এই বাড়ির পিছনের ঝাউবনে বেড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ লোকনাথ বেয়ারার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। তাকেও ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; মৃতদেহের পাশে ছড়ানো ছিল খান ত্রিশেক টফ্রানিলের বড়ি। অর্থাৎ লোকনাথ শুধু যে খুন বা চুরি করেনি তা নয়, যাতে তার মনিবকে বড়ি খাইয়ে হত্যা না করা হয়, সেইজন্য সে বড়িগুলো নিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময় কেউ তাকে খুন করে।

'অর্থাৎ এও জানা যাচ্ছে যে বিরূপাক্ষ মজুমদারের মৃত্যু হয় একমাত্র ছুরির আঘাতেই, বড়ি খেয়ে নয়।

'ইতিমধ্যে আমার নিজের কতকগুলো অভিজ্ঞতা হয়—যে-সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলতে চাই।

'নয়নপুর ভিলার একজন বাসিন্দা হিসাবে রজত বোস সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল ছিল, যদিও প্রথম দিকে তাঁর উপর সন্দেহ পড়ার কোনও কারণ ছিল না। তাঁকে জেরা করে আমি জানতে পাই যে, তিনি ফিফটি সেভনে বি-কম পাশ করেন।

'এ ব্যাপারে আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, রজত বোস নামে কোনও ছাত্র ওই বছর বি. কম পাশ করেনি।'

আমি রজতবাবুর দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ যেন কেমন মুষড়ে পড়েছেন। ফেলুদার দৃষ্টি তখন রজতবাবুর দিকে। সে বলল, 'এই গোলমালটা কেন হল বলতে পারেন?'

রজতবাবু দু' বার গলা খাকরে চুপ করে গেলেন। তার পর যেন নিজের মনকে শক্ত করে একটা বড় রকম নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি বিরূপাক্ষ মজুমদারকে খুন করিনি, কিন্তু করতে চেয়েছিলাম—একশোবার চেয়েছিলাম। হি কিল্‌ড মাই ফাদার! তার পর ঘুষ দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করেন। হি ওয়াজ এ ক্রিমিন্যাল!'

ফেলুদা বলল, 'সে ব্যাপারে আপনার উপর আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করতে

চাই—সত্যি কি মিথ্যে বলুন।'

'কী কথা ?'

রজতবাবু এখনও হাঁপাচ্ছেন।

ফেলুদা বলল, 'সে দিন লোকনাথ রোজকার মতো দুধে বড়ি মিশিয়ে তার মনিবকে খবর দিতে গিয়েছিল। মজুমদার সেই সময় শুটিং দেখছিলেন। তখন দুধের গেলাস আর বড়ির বোতল খাবার ঘরে পড়ে ছিল। আপনি সুযোগ বুঝে দুধে আরও বেশি করে বড়ি মেশাতে গিয়েছিলেন—তাই নয় কি ?'

রজতবাবু বললেন, 'আমি তো বলেইছি—আমি আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু আপনি কাজটা করার আগেই ঘরে লোকনাথ ফিরে আসে—ঠিক কি না ? এবং সে আপনাকে ওখানে ওইভাবে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে। আপনি তার মুখ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন।'

'হি ওয়াজ এ ফল !' চেঁচিয়ে উঠলেন রজতবাবু। 'আমি ওকে দলে টানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও রাজি হয়নি।'

'তাই আপনি তাকে আক্রমণ করেন। সে আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বড়ি সমেত বোতল নিয়ে ঝাউবনে পালায়। আপনি তার পিছু নেন ; আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল—মিঃ মজুমদারের পেপার কাটার। আপনি তাকে ধরে ফেলেন, কিন্তু আপনি ছুরি মারার আগে সে তার হাতের বোতল মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

এতক্ষণ দৃঢ়ভাবে থাকলেও রজতবাবু হঠাৎ ভেঙে পড়ে দু' হাতে মুখ গুঁজে নিলেন।

দু'জন কনস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

'আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন', বলল ফেলুদা, 'আপনার সুটকেসে যে আর. বি. লেখা আছে, সেটা তো আসলে রমেন ব্রহ্ম, এবং সেই জন্যেই পরে রজত বোস নাম নিয়েছিলেন ?'

রজতবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা আবার তার কথা শুরু করল।

'এর মধ্যে গতকাল আবার একটা ঘটনা ঘটে। একজন লোক

কুয়াশার মধ্যে আমাকে খাদে ফেলে মারতে চেষ্টা করে।'

সমস্ত ঘর চুপ। সকলেই ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। ফেলুদা বলে চলল—

'লোকটিকে ভালো করে দেখা যায়নি কুয়াশার জন্য, তবে তার চাপ দাড়িটা যে কৃত্রিম, সেটা সন্দেহ করেছিলাম। সে লোকটি যখন আমাকে ঠেলা মারে, তখন আমি একটা সেন্টের গন্ধ পাই। সেটা ছিল ইয়ার্ডলি ল্যাভেণ্ডার এবং সে গন্ধ আমি আর একবার একজনের গায়ে পেয়েছিলাম—দমদম এয়ারপোর্টে রেস্টোরান্টে বসে।'

এখানে হঠাৎ রাজেন রায়না কথা বলে উঠল।

'আমি নিজে ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করি, কিন্তু মিস্টার মিত্তির যদি বলেন যে আমি ছাড়া সে সেন্ট কেউ ব্যবহার করে না, তা হলে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন।'

ফেলুদার ঠোঁটের কোণে হাসি।

'আপনি যে এ কথা বলবেন তা আমি জানতাম', বলল ফেলুদা। 'কিন্তু আমার কথা বলা তো এখনও শেষ হয়নি, মিঃ রায়না।'

'বলুন কী বলবেন।'

ফেলুদা এবার সাহার কাছ থেকে একটা পোর্টফোলিও নিয়ে তার ভিতর থেকে একটা খাম বার করল। আর সেই সঙ্গে একটা বাঁধানো ছবি। এটা সেই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গ্রুপ ফোটো।

'এই গ্রুপ ছবিটার কথা কি আপনার মনে আছে, মিঃ রায়না?'

'আই হ্যাভ নেভার সিন ইট বিফোর।'

'কিন্তু এতে যে আপনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন!'

'মানে?'

এইবার ফেলুদা খাম থেকে একটা ছবি বার করল। এটা একটা মুখের এনলার্জমেন্ট।'

'এই ছবিটার উপর আমার একটু কলম চালাতে হয়েছে', বলল ফেলুদা, 'কারণ তখন আপনার দাড়ি ছিল না, এখন হয়েছে। দেখুন তো এঁকে চিনতে পারেন কিনা। এটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টস্

ডিপার্টমেন্টের ভি. বালাপোরিয়ার ছবি।'

রায়না আর হাতে নিয়ে ছবিটা দেখল না। সে একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছছে। আমি দেখতে পাচ্ছি ছবিটার সঙ্গে রায়নার হুবহু সাদৃশ্য।

'যাঁর বাড়িতে আপনার শুটিং হবে তিনি যে আপনার এককালের বস্, এবং তিনি যে আপনাকে চিনে ফেলবেন, এটা আপনি কী করে জানবেন ? আর, একবার যদি সত্য কথা প্রকাশ পেয়ে যায়, তা হলে সেই কলঙ্কের চাপে আপনার ফিল্ম কেরিয়ারের কী দশা হবে সেটা তো আপনি বুঝতেই পারছিলেন। মিঃ মজুমদার আপনাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন। আপনি অস্বীকার করেন। তাতে তিনি বলেন, "ইউ আর এ লায়ার !" আর তার পর বাংলায় বলেন, "আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না"। আপনি এগারো বছর বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, কাজেই আপনি বাংলা যথেষ্ট ভালো ভাবেই জানতেন।

'আর খুনের সুযোগের কথাই যদি হয়, তা হলে লাঞ্চের সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ বন্ধ ছিল ; সেই ফাঁকে মিঃ মজুমদারের ঘরে যাওয়া আপনার সম্ভব ছিল ; আর মিঃ মজুমদার যখন আপনাদের তাঁর বালগোপালকে দেখাতে নিয়ে যান, তখন তার পাশেই যে একটি ভুজালি রয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।'

সাহা এবার রায়নার দিকে রওনা দিলেন। পুলক ঘোষাল মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মনের কী অবস্থা, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। লালমোহনবাবু এবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'কিন্তু মজুমদার "বিষ" কথাটা কেন লিখলেন—'

লালমোহনবাবুর কথা শেষ হল না, কারণ ফেলুদা আবার মুখ খুলেছে। সে বলল—

'আমি আরও বলছি, মিঃ রায়না। মিঃ মজুমদারকে যখন আপনি খুন করতে যান, তখন তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আপনাকে দেখেছিলেন। ছুরির আঘাতের পরও তিনি কয়েক মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন। কারণ ছুরি ঠিক মোক্ষম জায়গায় লাগেনি। মিঃ মজুমদার

আপনার নামটা লিখে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুরোটা লিখতে পারেননি। সে নামটা কী আপনি বলবেন ?'—রায়না চুপ।

'আমি বলি ?'

রায়না চুপ।

'আমরা খবর নিয়ে জেনেছি যে, ভি. বালাপোরিয়া হচ্ছে বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া। বিষ্ণুদাসের "বিষ"-টুকু মজুমদার লিখতে পেরেছিলেন, আর পারেননি।'

'আই অ্যাম সরি, আই অ্যাম সরি!' বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া ওরফে রাজেন রায়না।

ফেলুদা এবার সমীরণবাবুর দিকে চাইল। সমীরণবাবু বললেন, 'আমি তো এদের কাছে শিশু!'

'তা বটে', বলল ফেলুদা। 'এবার সুটকেসটা খুলুন তো দেখি ; খুলে অষ্টধাতুর বালগোপালটা বার করে দিন।'

বিকেলে কেভেনটারসের ছাতে বসে কথা হচ্ছিল। আমরা তিনজন আর পুলক ঘোষাল।

'দার্জিলিংটা বড় অপয়া জায়গা, লালুদা', বললেন পুলক ঘোষাল। 'তার চেয়ে ভাবছি, সিমলায় করব শুটিংটা। রাজেন রায়নার জায়গায় অর্জুন মেরহোত্রা। কেমন মানাবে?'

'দুর্দান্ত', বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে আমার অংশটা বাদ পড়বে না তো!'

'পাগল!—নভেম্বরেই শুটিং আরম্ভ করে ফেলব, আর ফেব্রুয়ারিতে শেষ। আরও চারখানা ছবি আছে আমার হাতে, সব এইট্টি সেভেনের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে।'

'চারখানা ছবি! পর পর ?'

'তা আপনাদের আশীর্বাদে মোটামুটি চলছে ভালোই, লালুদা!'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'এঁকেও তা হলে এ. বি. সি.ডি. বলা চলে, তাই না ?'

'কি-রকম ?' চোখ কপালে তুলে জিগ্যেস করলেন জটায়ু।

'এশিয়াজ বিজিয়েস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর!'

নয়ন
রহস্য

নয়ন রহস্য

সত্যজিৎ রায়

॥ ১ ॥

ফেলুদাকে বেশ কিছুদিন থেকেই মনমরা দেখছি। আমি বলছি মনমরা। সেই জায়গায় লালমোহনবাবু অন্তত বারো রকম বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—একেক দিনে একেক রকম। তার মধ্যে হতোদ্যম, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ইত্যাদি ত আছেই। এমন কি মেদামারা পর্যন্ত আছে। এর কোনোটাই অবিশ্যি উনি ফেলুদাকে বলেননি, বলেছেন আমাকে। আজ আর থাকতে না পেরে সোজাসুজি ফেলুদাকেই প্রশ্ন করে বসলেন, 'মশাই, আপনাকে কদিন থেকে এত ম্রিয়মাণ দেখছি কেন?'

ফেলুদা সোফায় হেলান দিয়ে সামনের কফি টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল মেঝের দিকে তাকিয়ে, লালমোহনবাবুর প্রশ্নের পরও সেই একইভাবে বসে রইল।

'এটা কিন্তু মশাই আনফেয়ার', অভিমানের সুরে বললেন জটায়ু। 'আমার এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। আপনি দিনের পর দিন এমন বেজার ভাব করলে ত আসা বন্ধ করে দিতে হয়! একটু আলোকপাত করুন, যাতে কী হয়েছে আঁচ করতে পারি। এমন ত হতে পারে যে আপনার এই কন্ডিশনের রেমিডি হয়ত আমি সাপ্লাই করতে পারি। আগে ত আমি ঘরে ঢুকলেই আপনার ভুরু নেচে উঠত, আজকাল দেখছি আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেন।'

'সরি', মেঝের দিকে চেয়েই মৃদুস্বরে বলল ফেলুদা।

'নো নীড টু অ্যাপলজাইজ, ফেলুবাবু; আপনি কেন গুমরোচ্ছেন সেইটে বলুন, তারপর বাকি কথা হবে। কাইন্ডলি বলুন। এত আনন্দের স্মৃতিভরা ঘর এমন গুমোট মেরে যাবে এটা বরদাস্ত করা যায় না। বলবেন কী হয়েছে?'

'চিঠি', বলল ফেলুদা।

'চিঠি?'

'চিঠি।'

'কার চিঠি? এমন কী থাকতে পারে চিঠিতে যা আপনার মনে অন্ধকার আনবে? কার চিঠি মশাই?'

'পাঠক।'

'কিসের পাঠক ?'

'শ্রীমান তপেশের লিপিবদ্ধ করা প্রদোষচন্দ্র মিত্রের কীর্তিকলাপ।'

'পাঠক কি তাতে অবজেকশন নিয়েছে ?'

'পাঠক সিঙ্গুলার নয়, লালমোহনবাবু ; পাঠক প্লুর্যাল। গুনে দেখেছি ছাপ্পান্নখানা চিঠিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা।'

আমি কিন্তু এইসব চিঠিপত্রের কথা কিছুই জানি না। ফেলুদা রোজই চার-পাঁচটা করে চিঠি পায় সেটা জানি, কিন্তু সেগুলো কী চিঠি সেটা কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি।

'একই কথা মানে ?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু। 'কী কথা ?'

'ফেলু মিত্তিরের মামলা আর তেমন জমাটি হচ্ছে না, জটায়ু আর তেমন হাসাতে পারছেন না, তপেশের বিবরণ বিবর্ণ হয়ে আসছে...' লালমোহনবাবু হঠাৎ খেপে উঠলেন। —'হাসাতে পারছেন না ? জটায়ু হাসাতে পারছেন না ? আমি কি সং ?'

'না না', ফেলুদা বলে উঠল, 'আপনি সং হতে যাবেন কেন ? সং, ভাঁড়, ক্লাউন, জোকার—এসব অত্যন্ত অপমানকর কথা। আপনি হলেন বিদূষক। এইভাবে নিজেকে কল্পনা করে নিলে দেখবেন আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।'

কথাটায় লালমোহনবাবুর রাগ ত গেলই না, বরং তিনি বেশ বিরক্তির সঙ্গে ফেলুদার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আই অ্যাম রিয়েলি ডিস্যাপয়েন্টেড। ছ্যা ছ্যা ছ্যা—এইসব চিঠি আপনি জমিয়ে রেখেছেন ? পাওয়ামাত্র দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করেননি ?'

'না, করিনি', গম্ভীরভাবে বলল ফেলুদা, 'কারণ এইসব পাঠকই এতকাল আমাকে সাপোর্ট করেছে ; এখন যদি তারা বলে যে, থ্রী মাসকেটিয়ার্স-এর অকাল বার্ধক্য দেখা দিয়েছে, তাহলে কথাটা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।'

'অকাল বার্ধক্য !' হাঁটুতে চাপড় মেরে চোখ কপালে তুলে বললেন জটায়ু। 'তপেশের কথা ছেড়েই দিলাম—আপনি ত সুপারফিট চিরতরুণ। তপেশও আপনারই মতো রেগুলার যোগব্যায়াম করে। শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। আর আমি যে আমি—এখনও—এই সেদিনও—আমার পড়শী—সেভেনটীন ইয়ারস মাই জুনিয়র—সোমেশ্বর হাজরাকে পাঞ্জায় কাত করে দিলুম—সেটা কি বার্ধক্যের লক্ষণ ? বয়স ত মানুষের বাড়বেই, কিন্তু সেই সঙ্গে যে আক্কেলও বাড়ে, অভিজ্ঞতাও বাড়ে তার কি কোনো দাম নেই ?'

'এটা বোঝাই যাচ্ছে যে, সে সবের কোনো পরিচয় পাঠকরা পাচ্ছে না।'

'এও ত এক রহস্য। এর কিনারা করতে পারলেন ?'

ফেলুদা টেবিল থেকে পা দুটো নামিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'শুনুন, লালমোহনবাবু—জনপ্রিয়তার লেজুড় হিসেবে বেশ কিছু ঝক্কি এসে পড়ে সেটা আপনারও অজানা নয়। প্রকাশকের চাপ আপনাকে ভোগ করতে হয় না ?'

'ওরেব্বাস—সে ত ট্রিমেন্ডাস ব্যাপার !'

'জানি। কিন্তু ফেলুদার জনপ্রিয়তা আর প্রখর রুদ্রের জনপ্রিয়তা এক জিনিস নয়। আপনার উপর চাপ এলে আপনি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সাপ-ব্যাঙ-বিচ্ছু যা হয় একটা দাঁড় করিয়ে প্রকাশকের চাহিদা মেটাতে পারেন। কিন্তু তোপশের উপর যখন চাপ আসে তখন কল্পনার আশ্রয় নিলে চলে না। বাস্তবে আমার মামলায় যা ঘটেছে, সেটাকেই একটু পালিশ করে উপন্যাসের আকারে প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে হয়। তার মাস খানেকের মধ্যেই ফেলুদার একটি টাট্কা নতুন অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের বাজার দখল করে বসে। তার একটা ফল হয় এই ছাপ্পান্নখানা চিঠি। কারণ আর কিছুই নয় ; প্রতি বছরই যে আমার হাতে এমন একটি মামলা আসবে যা থেকে জমাটি উপন্যাস হয় তার কী গ্যারান্টি আছে ? এটা ভুললে চলবে না যে, আমার পাঠক প্রধানত কিশোর-কিশোরী। আমার এমন অনেক মামলার উদাহরণ দিতে পারি যেগুলো চিত্তাকর্ষক হলেও তাতে এমন সব উপাদান থাকে যা কখনওই কিশোরদের পাতে দেওয়া চলে না।'

'যেমন লখাইপুরের সেই জোড়া খুনের মামলা ?'

'তা ত বটেই ! সেটাতে ত তোপশেকে আমার ধারে-পাশেই আসতে দিইনি—যদিও সে এখন আর খোকাটি নেই, এবং বয়সের তুলনায় অনেক বেশি জানে-বোঝে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে, তোপশের বাছাইয়ে গলদ রয়েছে ?'

'সেটা হত না যদি না ও প্রকাশকের তাগিদের চোটে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। ওকে দোষ দিই কী করে বলুন ? আমার মামলা থেকে ও যা খাড়া করে তাকে কিশোর উপন্যাসই বলা হয়ে থাকে। এইসব উপন্যাস যদি শুধু কিশোররাই পড়ত তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা ছিল না ; আসলে যেটা ঘটে সেটা হল, কিশোরদের সঙ্গে তাদের মা, বাবা, মাসি, পিসি, খুড়ো, জ্যাঠা সকলেই এসব উপন্যাস পড়ে। একসঙ্গে এত স্তরে চাহিদা মেটানো কি চাট্টিখানি কথা ?'

'আপনি তপেশকে একটু গাইড করুন না।'

'সেটা করব। আগে করতাম, ইদানীং করি না। আবার করব। তবে তার আগে প্রকাশকের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করা দরকার। তাদের

বোঝাতে হবে যে, দাগসই মামলা পেলেই তারা উপন্যাস পাবে, নচেৎ নয়। তাতে যদি একটা বছর ফেলুদা বাদও যায়, সেটাও তাদের মেনে নিতে হবে। তারা ঘোর ব্যবসাদার ; আমার মান-ইজ্জত নিয়ে তারা চিন্তিত নয়—সে চিন্তা আমাদেরই করতে হবে।'

'পাঠকদের সঙ্গেও ত একটা মোকাবিলার প্রয়োজন। তাই নয় কি? এই যে সব যারা রাগী-রাগী চিঠি দিল?'

'এরা বোকা নয়, লালমোহনবাবু। এদের চাহিদা অত্যন্ত সঙ্গত। সেটা মেটাতে পারলেই এরা আবার আমাকে তুলে ধরবে।'

'শুধু আপনাকে? আমাকে নয়?'

'একশোবার! আপনি-আমি ত পরস্পরের পরিপূরক। সোনায় সোহাগা। অ্যারাল্‌ডাইট দিয়ে আমার সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন আপনি সেই সোনার কেল্লার সময় থেকেই। আমাকে ছাড়া আপনার অস্তিত্বই নেই—অ্যান্ড ভাইসি ভারসা।'

লালমোহনবাবু আমার দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বি ভেরি কেয়ারফুল, তপেশ।'

এটা বলার কোনো দরকার ছিল না, কারণ ফেলুদা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এবার থেকে কেয়ারফুল হবার অর্ধেক দায়িত্ব ওর।

কথার ফাঁকে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়েছিল। এবার সেটা আধ পোড়া অবস্থায় অ্যাশ ট্রেতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'সোজা নিয়ম, বুঝলি তোপ্‌শে : এবার থেকে আমার গ্রীন সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত তুই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবি। ঠিক হ্যায়?'

আমি হেসে মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম ঠিক হ্যায়।

॥ ২ ॥

এই যে এতক্ষণ পাঁয়তারা করলাম, তা থেকে বোঝাই যাবে যে, ফেলুদা আমায় গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে। শুধু ফেলুদা কেন, নয়নের মামলা নিয়ে লিখছি শুনে জটায়ু একটা কান-ফাটানো হাততালি দিয়ে বললেন, 'গ্রেট! গ্রেট! ইয়ে, আমার ভূমিকাটা ইনট্যাক্ট থাকবে ত? সব কিছু মনে আছে ত?' আমি বললাম, 'কোনো চিন্তা নেই; সব নোট করা আছে।'

আসল মামলায় পৌঁছতে অবিশ্যি আরো কিছুটা সময় লাগবে। কোথায় শুরু করব জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, 'তরফদারের শো। দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট।' আমি ওর কথামতোই স্টার্ট করছি।

তরফদার হলেন ম্যাজিশিয়ান। পুরো নাম সুনীল তরফদার। শোয়ের নাম 'চমকদার তরফদার'। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো ম্যাজিশিয়ান গজাচ্ছে এই পশ্চিম বাংলায়। এর মধ্যে কিছু আছে যারা সত্যিই ম্যাজিক নিয়ে সাধনা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে অনেককেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়। যারা টিকে থাকে তাদের মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। ইয়াং বয়সে ফেলুদার ম্যাজিকের নেশা ছিল, সেটা আমিই একটা গল্পে জানিয়ে ফেলেছিলাম। ফলে এসব উঠতি ম্যাজিশিয়ানদের অনেকেই ওর কাছে আসে শোয়ে নেমন্তন্ন করার জন্য। আমরা কয়েকবার গিয়েছি, আর গিয়ে হতাশ হইনি।

সুনীল তরফদারও এই উঠতিদের মধ্যে একজন। বছর খানেক হল শো করছেন। এখনো তেমন নাম করেননি, যদিও দু-একটা কাগজে বেশ প্রশংসা বেরিয়েছে। গত ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে একদিন সকালে ইনি আমাদের বাড়িতে এসে ফেলুদাকে টিপ্ করে এক প্রণাম করলেন। কেউ ওর পায়ে হাত দিলে ফেলুদা ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে; তরফদারের প্রণামে ও হাঁ হাঁ করে উঠল।

ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়, লম্বা একহারা চেহারা, ঠোঁটের উপরে একটা সরু সাবধানে ছাঁটা গোঁফ। প্রণাম সেরে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'স্যার, আমি আপনার একজন গ্রেট ফ্যান। আমি জানি এককালে আপনার নিজেরই ম্যাজিকের শখ ছিল। আমার শো হচ্ছে

মহাজাতি সদনে। আপনাদের জন্য তিনটে ফার্স্ট রোয়ের টিকিট দিয়ে যাচ্ছি। আগামী রবিবার সাড়ে ছটায় যদি আপনারা আসেন তাহলে আমি সত্যিই খুশি হব।'

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হ্যাঁ না কিছুই বলছে না দেখে ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে ফেলুদার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমি আপনাদের রোববার ডাকছি এই কারণে যে, সেদিন আমার প্রোগ্রামে একটা নতুন আইটেম অ্যাড করছি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এ জিনিস আর কেউ কখনো স্টেজে দেখায়নি।'

ফেলুদা যাব বলে কথা দিয়েছিল। রবিবার বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় লালমোহনবাবু তাঁর সবুজ অ্যাম্বাসাডর নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এলেন। চা-ডালমুট খেয়ে আমরা ছটায় রওনা হয়ে শোয়ের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে মহাজাতি সদনে পৌঁছে গেলাম। কাগজে বেশ চোখে পড়ার মতো একটা বিজ্ঞাপন দুদিন আগেই বেরিয়েছিল, ভিড় দেখে মনে হল সেটায় কাজ দিয়েছে। আমরা মাঝের প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনের সারির মাঝামাঝি পাশাপাশি তিনটে চেয়ারে বসলাম।

'কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলেন ?' ফেলুদার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

'দেখেছি', বলল ফেলুদা।

'তাতে যে বলছে অভূতপূর্ব নতুন আকর্ষণ জ্যোতিষ্ক—এই জ্যোতিষ্কটি কী বস্তু, মশাই ?'

'একটু ধৈর্য ধরুন—যথাসময়ে জানতে পারবেন।'

তরফদার দেখলাম পাংচুয়ালি সাড়ে ছটায় শো আরম্ভ করে দিলেন। পর্দা সরতেই ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখ নিজের রিস্টওয়াচের দিকে, ভুরু ঈষৎ তোলা, আর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আমি ত জানি ও পাংচুয়ালিটির উপর কত জোর দেয়। ও বলে বাঙালিদের উন্নতির পথে একটা বড় রকম বাধার সৃষ্টি করে এই সময়ানুবর্তিতার অভাব। তরফদার যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সেটা দেখেই ফেলুদা খুশি।

শো কিছুক্ষণ চলার পরেই বুঝতে পারলাম যাদুকরের ঝলমলে পোশাক ছাড়া আজকের সফল ম্যাজিশিয়ানদের তুলনায় ইনি জাঁকজমকের দিকটায় একটু কম দৃষ্টি দেন। এও লক্ষ করলাম যে, এমন অনেক আইটেম আছে যাতে নতুনত্ব বলে বিশেষ কিছু নেই।

ইন্টারভ্যালের পর প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অংশে এল প্রথম চমক। এটা স্বীকার করতেই হল যে হিপনটিজ্‌ম বা সম্মোহনে তরফদারের সমকক্ষ বাঙালি যাদুকরদের মধ্যে আর নেই বললেই চলে। তিনজন দর্শককে পর পর স্টেজে এনে চোখের দৃষ্টি আর আঙুল-ছড়ানো দুই হাতের আন্দোলনের জোরে সম্মোহিত করে তাদের দিয়ে যা-খুশি-তাই করিয়ে

ভদ্রলোক প্রচুর হাততালি পেলেন।

কিন্তু তার পরেই তরফদার একটা বেচাল চাললেন। ফেলুদার দিকে চেয়ে দর্শকদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি এবার প্রথম সারিতে বসা স্বনামধন্য গোয়েন্দাপ্রবর শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্রকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসতে।'

ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে জটায়ুর দিকে দেখিয়ে বলল, 'আমাকে না ডেকে এই ভদ্রলোককে ডাকুন। আমাকে ডাকলে বিপত্তির সম্ভাবনা আছে।'

তরফদারের বয়স বেশি না বলেই হয়ত তিনি একটু একরোখা। একটা ভয়ংকর রকম কনফিডেন্ট হাসি হেসে বললেন, 'না স্যার, আমি চাই আপনিই আসুন।'

বিপত্তি কথাটা ভুল নয়। তরফদারের বার বার নানারকম চেষ্টা সত্ত্বেও ফেলুদা যেমন সজাগ তেমনই সজাগ রয়ে গেল। এদিকে আমার অপ্রস্তুত লাগছে; হল ভর্তি লোক, তার মধ্যে ম্যাজিশিয়ানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। শেষে তরফদার যেটা করলেন সেটাই বোধহয় এই অবস্থায় মান বাঁচানোর একমাত্র উপায়।

তিনি সবিনয়ে হার স্বীকার করে দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, 'ফেলু মিত্তির বস্তুটা যে কী, সেটা আপনাদের দেখানর জন্যই আমি এঁকে মঞ্চে ডেকেছিলাম। এঁর কাছে হার স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। আমি চাই আপনারা এই আশ্চর্য মানুষটিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখান।'

হল হাততালিতে ফেটে পড়ল। ফেলুদা স্টেজ থেকে নেমে নিজের জায়গায় এসে বসতে লালমোহনবাবু তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'আপনার মশাই ফিজিয়লজিটাই আলাদা।'

কিন্তু একটা চূড়ান্ত চমক—যেটা আমার হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল—এখনও বাকি ছিল। সেটাই তরফদারের নতুন এবং শেষ আইটেম।

যাকে নিয়ে এই আইটেম, সে হল আট-ন বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে—যাকে সঙ্গে নিয়ে তরফদার মঞ্চে হাজির হলেন। একটা বেশ বাহারের চেয়ার স্টেজের মাঝখানে রাখা ছিল, ছেলেটিকে তাতে বসিয়ে তরফদার দর্শকদের দিকে ঘুরে বললেন, 'এই বালকের নাম জ্যোতিষ্ক; এর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় আপনারা এখনই পাবেন। আমি স্বীকার করছি এতে আমার কোনো বাহাদুরি নেই। একে মঞ্চে উপস্থিত করতে পেরে আমি গর্বিত—এ ছাড়া আমার আর কোনো ক্রেডিট নেই।'

এবার তরফদার ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন, 'জ্যোতিষ্ক, দর্শকদের দিকে দেখ তো।'

ছেলেটির দৃষ্টি সামনের দিকে ঘুরল।

তরফদার বললেন, 'সামনের সারিতে প্যাসেজের ডান দিকে লাল

সোয়েটার আর কালো প্যান্ট পরা যে ভদ্রলোকটি বসে আছেন, তাঁর কাছে কি কোনো টাকা আছে ?'

যাঁর কথা বলা হচ্ছে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'আছে', মিহি, সুরেলা গলায় বলল জ্যোতিষ্ক।

'কত টাকা বলতে পার ?'

'পারি।'

'কত ?'

'কুড়ি টাকা তিরিশ পয়সা।'

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে পকেট থেকে পার্স বার করে তার থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করেছেন। প্যাসেজের ওদিকে বসলেও দিব্যি বুঝতে পারছি যে, ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া, মুখ হাঁ।

'ওনার হাতে যে দুটো দশ টাকার নোট, তার নম্বর বলতে পার ?'

'এগারো ই—এক এক এক তিন শূন্য দুই। আর চোদ্দ সি— দুই আট ছয় শূন্য দুই পাঁচ।'

ভদ্রলোকের ভুরু আরো ইঞ্চিখানেক উপরে উঠে গেল।

'মাই গড—হি ইজ অ্যাবসোলিউটলি রাইট!'

চারিদিক থেকে তুমুল হাততালি আর উল্লাসের কোরাস।

এবার তরফদার দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, 'এখন অবিশ্যি আমি জ্যোতিষ্ককে প্রশ্ন করছি, কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনাদের যে কেউ করতে পারেন। শুধু এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্ন এমন হতে হবে যার উত্তর সংখ্যায় হয়। এই ভাবে উত্তর দিতে জ্যোতিষ্কর যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম হয়, যদিও সেটা বাইরে থেকে বোঝা নাও যেতে পারে। তাই জ্যোতিষ্ক আর মাত্র দুটো প্রশ্নের জবাব দেবে, তারপর তার ছুটি।'

দুটোর একটায় একজন তরুণ দর্শক প্রশ্ন করল, 'আমি এখানে এসেছি মোটর গাড়িতে। সে গাড়ির নম্বর তুমি বলতে পার ?'

জ্যোতিষ্ক নম্বর বলে দিয়ে বলল, 'তোমাদের কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা গাড়ি আছে। সেটার নম্বর ডব্লিউ এম এফ ছয় দুই তিন দুই।'

তারপর তরফদার একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এ বছর কোনো পরীক্ষা দিয়েছ ?'

'মাধ্যমিক', বলল ছেলেটা। তরফদার জ্যোতিষ্কর দিকে ফিরে বললেন, 'এই ছেলেটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় কত নম্বর পেয়েছে বলতে পার ?'

জ্যোতিষ্ক বলল, 'একাশি। ওর চেয়ে বেশি কেউ পায়নি।'

উত্তর শুনে ছেলেটি নিজেই হাততালি দিয়ে উঠল।

শোয়ের পর ফেলুদা বলল, 'একবার ব্যাকস্টেজে যাওয়া দরকার। তরফদারকে একটা ধন্যবাদ ত দিতেই হয়।'

আমরা গেলাম। তরফদার আয়নার সামনে বসে মেক-আপ তুলছেন—আমাদের দেখেই এক গাল হেসে উঠে দাঁড়ালেন।

'কেমন লাগল ম্যাজিক বলুন, স্যার।'

'দুটো আইটেমের তারিফ করতেই হয়', বলল ফেলুদা। 'এক, আপনার হিপ্‌নটিজ্‌ম, আর দুই—জ্যোতিষ্ক। কোত্থেকে পেলেন এই আশ্চর্য ছেলেকে?'

'কালীঘাটের ছেলে। ওর আসল নাম নয়ন। জ্যোতিষ্ক নামটা আমিই দিয়েছি; বিজ্ঞাপনেও জ্যোতিষ্কই ব্যবহার করছি। কথাটা আপনাদের বললুম, আপনারা কাইন্ডলি আর কাউকে বলবেন না।'

'না না', বলল ফেলুদা। 'কিন্তু শুধু কালীঘাট বললে ত কিছুই বলা হল না।'

'বাপ অসীম সরকার থাকেন নিকুঞ্জবিহারী লেনে। ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমার কাছে নিয়ে আসেন যদি আমি ওকে কাজে লাগাতে পারি। আসলে ভদ্রলোক অভাবী, তাই ভাবলেন ছেলেকে দিয়ে যদি কিছু একস্ট্রা ইনকাম হয়।'

'সেটা যে হবে সে বিষয় আমার কোনো সন্দেহ নেই, ছেলেটি কি

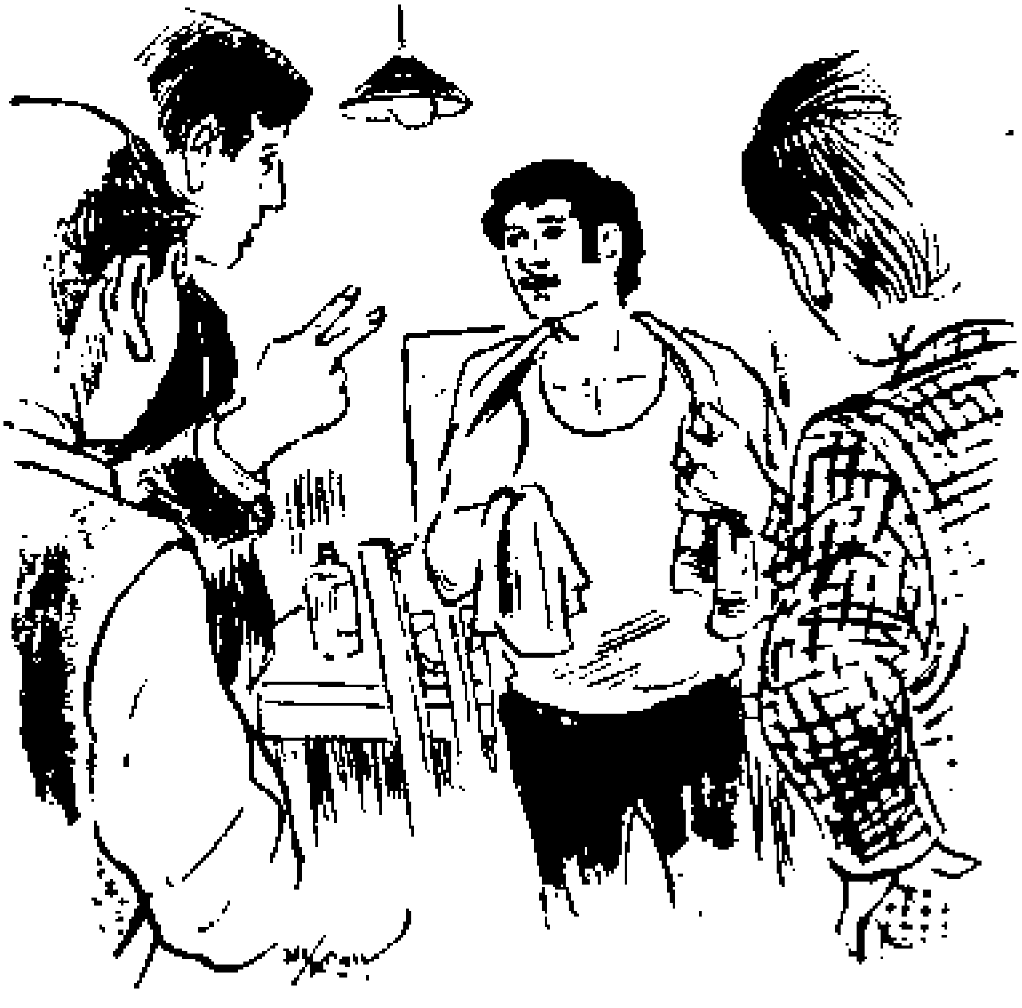

বাপের কাছেই থাকে ?'

'আজ্ঞে না। আমি ওকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছি। ওর পড়াশুনোর জন্য টিউটর ঠিক করেছি। কাল এক ডাক্তারকে ডেকেছিলাম, উনি নয়নের ডায়েট বাতলে দিয়েছেন।'

'এসব ত রীতিমতো খরচের ব্যাপার!'

'জানি স্যার। তবে এও জানি যে নয়ন ইজ এ গোল্ডমাইন। ওর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি খরদেনাও করতে হয়, সে টাকা কদিনের মধ্যেই উঠে আসবে।'

'হুঁ... তবে আইডিয়াল হত যদি আপনি একটি পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করতে পারতেন।'

'সেটা আমিও বুঝি, স্যার। দেখি আর দুটো দিন...'

'আপনার অনেকটা সময় নিয়েছি। আর মাত্র দুটো কথা বলে আপনাকে রেহাই দেব। এক—এই স্বর্ণখনিটি যাতে বেহাত না হয় সেদিকে আপনার কড়া নজর রাখতে হবে। সেকেন্ড রোতে মনে হল কয়েকজন সাংবাদিককে দেখলাম, তাই না ?'

'ঠিক দেখেছেন, স্যার। এগারজন সাংবাদিক আজকে আমার শো দেখেছেন। তারা সকলেই আগামী শুক্রবারের সিনেমার পাতায় আমার শোয়ের বিষয় লিখবেন। ইতিমধ্যে কোনো চিন্তার কারণ আছে বলে মনে হয় না।'

'যাই হোক, এটা বলে গেলাম যে, যদি নয়ন সম্বন্ধে কোনো এনকোয়ারি বা টেলিফোন আসে যা আপনার মনে খট্‌কা জাগায়, তাহলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

'মেনি থ্যাঙ্কস্‌, স্যার। এবার আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।'

'কী ?'

'এবার থেকে আমায় আপনি না বলে তুমি বলবেন কাইন্ডলি।'

॥ ৩ ॥

শুক্রবারের কাগজে নয়ন সম্বন্ধে বেরোনর কথা ; আজ মঙ্গলবার। বেশ অবাক হলাম দেখে যে, আজই তরফদারের কাছ থেকে টেলিফোন এল। শুধু ফেলুদার দিকটা শুনে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলাম না ; ফোন রাখার পর ফেলুদা খুলে বলল।

'খবরটা এর মধ্যেই ছড়িয়েছে, বুঝেছিস তোপ্‌সে। আটশো লোক সেদিন ম্যাজিক দেখেছে ; তার মধ্যে কতজন কত লোককে নয়ন সম্বন্ধে বলেছে কে জানে ? ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে—তরফদার চারজনের কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছে। হেঁজিপেঁজি নয়, বেশ মালদার লোক। তারা সকলেই নয়ন সম্বন্ধে কথা বলতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায়। তরফদার কাল সকাল ন'টা থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেখেছে। প্রত্যেককে পনের মিনিট সময় দেবে। এও বলে দিয়েছে যে, তার সঙ্গে আরো তিনজন লোক থাকবে—অর্থাৎ মিস্টার ফেলু, মিস্টার তপেশ আর মিস্টার লালু। এই খবরটা তুই এক্ষুনি ফোন করে জটায়ুকে জানিয়ে দে।'

'কিন্তু এই চারজন কারা সেটা তরফদার বললেন না ?'

'একজন আমেরিকান, একজন পশ্চিমা ব্যবসাদার, একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, একজন বাঙালি। আমেরিকানটি নাকি ইমপ্রেসারিও। অর্থাৎ নানা রকম শিল্পীদের স্টেজে উপস্থিত করেন এবং তা থেকে দু' পয়সা কামান। অন্য তিনজন কী তা গেলে জানা যাবে। আসল কথা যা বুঝলাম—তরফদার বুঝেছে সে একা সিচুয়েশনটা হ্যান্ডল করতে পারবে না ; তাই আমাদের ডাকা।'

লালমোহনবাবুকে ফোন করাতে ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে চলেই এলেন। 'শ্রীনাথ !' বলে একটা হাঁক দিয়ে তাঁর প্রিয় কাউচটাতে বসে বললেন, 'একটা চেনা-চেনা গন্ধ পাচ্ছি যে মশাই, কী ব্যাপার ?'

'এখন পর্যন্ত গন্ধ পাবার কোনো কারণ নেই, লালমোহনবাবু। এটা নিছক আপনার কল্পনা।'

'আমি মশাই কাল থেকে ওই খোকার কথা ভাবছি। কী অদ্ভুত ক্ষমতা বলুন ত !'

'কিছুই বলা যায় না', বলল ফেলুদা, 'একদিন হয়ত দেখবেন হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ক্ষমতাটা লোপ পেয়ে গেছে। তখন আর-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে নয়নের কোনো তফাত থাকবে না।'

'কাল তাহলে আমরা তরফদারের ওখানে মীট করছি?'

'ইয়েস, এবং একটা কথা আপনাকে বলে রাখি—আমি কিন্তু কাল গোয়েন্দা হিসেবে যাচ্ছি না। আমি হব নির্বাক দর্শক। যা কথা বলার তা আপনি বলবেন।'

'এটা আপনি রিয়েলি মীন করছেন?'

'সম্পূর্ণ।'

'ঠিক হ্যায়। জয় মা তারা বলে লেগে পড়ব।'

*

একডালিয়া রোডে তরফদারের বাড়ি। মাঝারি দোতলা বাড়ি—অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরোন ত বটেই। গেটে সশস্ত্র দারোয়ান; বুঝলাম ফেলুদার সতর্কবাণীতে ফল হয়েছে।

ফেলুদার নাম শুনে দারোয়ান গেট খুলে দিল, আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই ডাইনে এক ফালি বাগান, তাতে কেয়ারির কোনো বালাই নেই। সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, 'দেখবি উইদিন টু ইয়ারস্ তরফদার এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।'

'কোথায় যাবে?'

'সাম অট্টালিকা।'

সদর দরজার দারোয়ানও আমাদের সেলাম ঠুকে ভিতরে যেতে দিল।

আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেটা ল্যান্ডিং, বাঁয়ে সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় বেশ ভদ্র পোশাক পরা একজন চাকর—বেয়ারা বলাই বোধহয় ঠিক হবে—আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আসুন আপনারা'। আমরা চাকরের পিছন পিছন গিয়ে বৈঠকখানায় হাজির হলাম।

'বসুন; বাবু আসছেন।'

এই ঘরের সাইজও মাঝারি, তবে আসবাবপত্রে বেশ রুচির পরিচয় আছে। দুটো সোফায় ভাগাভাগি করে আমরা তিনজন বসলাম।

'গুড মর্নিং!'

ম্যাজিশিয়ান হাজির, তবে একা নন। তাঁর পাশে একটি বিরাট অ্যালসেশিয়ান দণ্ডায়মান। আমি জানি ফেলুদা কুকুরের ভক্ত, আর যত বড় যত ভীতিজনক হাউন্ডই হোক না কেন, পোষা জানলে তার পিঠে হাত বোলানোর লোভ সামলাতে পারে না। এখানেও তাই করল।

'এর নাম বাদশা', বললেন তরফদার। 'বয়স বারো। খুব ভালো ওয়াচ-ডগ।'

'এক্সেলেন্ট!' আবার সোফায় বসে বলল ফেলুদা। 'আমরা কিন্তু তোমার কথামতো পনের মিনিট আগেই এসেছি।'

'আপনি যে পাংচুয়াল হবেন সেটা আমি জানতাম', তৃতীয় সোফায় বসে বললেন তরফদার।

'তোমার এ বাড়ি কি ভাড়া বাড়ি?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আজ্ঞে না। এ বাড়ি আমার বাবার তৈরি। উনি নামকরা অ্যাটর্নি ছিলেন। আরেকটা বাড়ি আছে—ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে। সেটায় আমার দাদা থাকেন। দুই ভাইকে দুটো বাড়ি উইল করে দিয়ে যান। বাবা মারা যান এইট্টি-ফোরে। আমি এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছি।'

'আপনি সংসার করেননি?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'আজ্ঞে না', মৃদু হেসে বললেন তরফদার। 'তাড়া কী? আগে শো-টাকে দাঁড় করাই!'

চা এসে গেছে, সঙ্গে সিঙাড়া। ফেলুদা একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু আমি শ্রোতা। কিছু বলার থাকলে ইনি বলবেন।' ফেলুদা জটায়ুর দিকে নির্দেশ করল। 'ইনি কে জান ত?'

'তা জানি বৈকি!' চোখ কপালে তুলে বললেন তরফদার। 'বাঙলার নাম্বার ওয়ান রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক।'

লালমোহনবাবু কোনোদিন চেষ্টা করেও বিনয়ী ভাব প্রকাশ করতে পারেননি; এখন একটা সেল্যুটে বুঝিয়ে দিলেন তিনি চেষ্টাই করছেন না।

ফেলুদা হাতের কাপ টেবিলে রেখে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'তোমাকে একটা কথা অকপটে বলছি, সুনীল। তোমার শো-য়ে শোম্যানশিপের কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষ করলাম। আজকের উঠতি যাদুকরদের কিন্তু ও দিকটা নেগলেক্ট করলে চলে না। তোমার হিপ্‌নটিজ্‌ম, আর তোমার নয়ন—দুটোই আশ্চর্য আইটেম তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের দর্শক জাঁকজমকটাও চায়।

'জানি। আমার মনে হয় সে অভাব এবার পূরণ হবে। অ্যাদ্দিন যে হয়নি তার একমাত্র কারণ পুঁজির অভাব।'

'সে অভাব মিটল কী করে?' ভুরু তুলে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'সুখবরটা দেবার মওকা খুঁজছিলাম।—আমি একজন ভালো পৃষ্ঠপোষক পেয়েছি, স্যার।'

'এই সেদিনই বলছিলাম, আর এর মধ্যেই...?'

'হ্যাঁ স্যার। আপাতত আর কোনো ভাবনা নেই।'

'কিন্তু কে সেই ব্যক্তি সে কি জানতে পারি?'

'কিছু মনে করবেন না, স্যার—তিনি তাঁর নামটা উহ্য রাখতে

বলেছেন।'

'কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কী করে সেটা বলাও কি বারণ?'

'মোটেই না। এই ভদ্রলোকের এক নিকট-আত্মীয় গত রবিবার আমার শো দেখে সেই রাত্রেই ভদ্রলোককে নয়নের কথা বলেন। রাত দশটায় ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি ফোন পাই। তিনি বলেন যে, অবিলম্বে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। আমি পরদিনই সকাল দশটায় সময় দিই। উনি কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এসে হাজির হন। তারপর বৈঠকখানায় এসে বসে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন জ্যোতিষ্ককে কী ভাবে দেখা যায়। নয়ন আমার কাছেই থাকে জেনে ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ নয়নকে ডেকে পাঠাতে বলেন। নয়ন এলে পর ভদ্রলোক তাকে দু-একটা এমন প্রশ্ন করেন যার উত্তর সংখ্যায় হয়। নয়ন অবশ্যই ঠিক ঠিক জবাব দেয়। ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ নয়নের দিকে চেয়ে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রস্তাবটা দেন।'

'কী প্রস্তাব?'

'প্রস্তাবটা আমাকে হাতে চাঁদ পাইয়ে দিল। উনি বললেন আমার শো-য়ের সব খরচ উনি বহন করবেন। একটা কোম্পানি স্থাপন করবেন যার নাম হবে "মিরাকলস আনলিমিটেড"। এই কোম্পানির মালিক কে তা কেউ জানবে না। এই কোম্পানির হয়েই আমি শো করব। তা থেকে খ্যাতি যা হবে তা আমার, খরচ হয়ে লভ্য যা হবে তা ওঁর। আমাকে উনি মাসোহারা দেবেন যাতে আমার আর নয়নের স্বচ্ছন্দে চলে যায়।—আমি অবিশ্যি এ প্রস্তাবে রাজি হই, কারণ আমার মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যাচ্ছে এতে।'

'কিন্তু এমন সুযোগ উনি হঠাৎ কেন দেবেন সে কথা জিজ্ঞেস করনি?'

'স্বভাবতই করেছি, এবং উনি তাতে এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালেন। ওনার শখ ছিল পেশাদারি যাদুকর হবেন। ইস্কুল থেকে শুরু করে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত উনি সমানে ম্যাজিক অভ্যাস করেছেন, ম্যাজিকের বই আর সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন। বাদ সাধলেন ওঁর বাবা। তিনি ছেলের এই নেশা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। একদিন ঘটনাচক্রে জানতে পেরে রেগে আগুন হয়ে ছেলের ম্যাজিকের সব সরঞ্জাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জোর করে তাকে ব্যবসায় নামান। অসম্ভব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন বাবা, তাই ছেলে তাঁর শাসন মেনে নেন। শুধু তাই নয়, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ভালো রোজগার করতে শুরু করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ম্যাজিকের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন না। ভদ্রলোক বললেন, "আমি রোজগার করেছি অনেক কিন্তু তাতে আমার আত্মার তৃপ্তি হয়নি। এই ছেলেকে দেখে বুঝতে পারছি এই আমার জীবনে সার্থকতা এনে দেবে।"

'তোমার সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখন অত্যন্ত হালকা বোধ করছি। নয়নের মাস্টার, ডাক্তার, জামাকাপড়—সব কিছুর খরচ উনি দিচ্ছেন। একটা প্রশ্ন অবিশ্যি উনি আমাকে করেন, সেটা হল কলকাতার বাইরে ভারতবর্ষের অন্য বড় শহরে শো করার অ্যামবিশন আমার আছে কিনা। আমি জানাই যে সেদিনই সকালে আমি ম্যাড্রাস থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছি মিঃ রেড্ডি নামে এক থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে। রবিবার রাত্রে আমার শো দেখে ভদ্রলোকের একজন কলকাতাবাসী সাউথ ইন্ডিয়ান বন্ধু রেড্ডিকে নয়নের কথা টেলিফোনে জানান। তাই পরদিন সকালেই রেড্ডি আমাকে ফোন করেন। খবরটা শুনে পৃষ্ঠপোষক জানতে চাইলেন আমি রেড্ডিকে কী বলেছি। আমি বললাম—আমি ভাববার জন্য সময় চেয়েছি। তাতে পৃষ্ঠপোষক বললেন, "তুমি এক্ষুনি রেড্ডির আমন্ত্রণ অ্যাক্সেপ্ট করছ বলে টেলিগ্রাম কর। দক্ষিণ ভারত সফরে যাবে তুমি। শুধু ম্যাড্রাস নয়, আরো অন্য শহরে শো করবে তুমি। সব খরচ আমার।'

'তোমাকে খরচের হিসাব দিতে হবে না?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'তা ত বটেই', বললেন তরফদার। 'সে কাজের ভার নেবে আমার ম্যানেজার ও বন্ধু শঙ্কর। ও খুব এফিশিয়ান্ট লোক।'

পনের মিনিট যে চলে গেছে সেটা টের পেলাম যখন চাকর এসে বলল যে একটি সাহেব, আর তার সঙ্গে একটি বাঙালিবাবু এসেছেন।

'এখানে নিয়ে এস,' বললেন তরফদার।'

জটায়ু দেখলাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসলেন, কারণ এখন থেকে ফেলুদা নির্বাক।

সাহেবের মাথায় ধবধবে সাদা চুল হলেও বয়স যে বেশি না সেটা চামড়ার টান ভাব দেখেই বোঝা যায়।

তরফদার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আগন্তুকদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। ফেলুদা জায়গা করে দেবার জন্য আমাদের সোফাতেই লালমোহনবাবুর পাশে এসে বসল।

'আমার নাম স্যাম কেলারম্যান,' বললেন সাহেব। 'আর ইনি আমার ইন্ডিয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ মিস্টার ব্যানার্জি।'

লালমোহনবাবু কাজে লেগে গেলেন।

'ইউ আর অ্যান ইমপ্রেসোরিয়ো—থুড়ি, ইমপ্রেসারিও?'

'ইয়েস। আজকাল ভারতীয় কালচার নিয়ে আমাদের দেশে খুব মাতামাতি চলছে। মহাভারত নাটক হয়েছে, ফিল্মও হয়েছে, জানেন বোধহয়। তাতে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা নতুন দিক খুলে গেছে।'

'সো ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন ইন্ডিয়ান কালচার?'

'আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট কিড।'

'ইউ মীন—সান অফ এ গোট?'

আমি এটাই ভয় পেয়েছিলাম। আমেরিকানরা যে মানুষের বাচ্চাকেও কিড বলে সেটা লালমোহনবাবু জানেন না।

এবার মিঃ বসাক মুখ খুললেন।

'ইনি জ্যোতিষ্কর কথা বললেন; মিঃ তরফদারের শো-তে যে ছেলেটি অ্যাপিয়ার করে।'

'উনি ছেলেটি সম্বন্ধে কী জানতে চান সেটা বলবেন কি?' বললেন তরফদার। মিঃ বসাক প্রশ্নটা অনুবাদ করে দেওয়াতে কেলারম্যান বললেন, 'আমি চাই এই আশ্চর্য ছেলেটিকে আমাদের দেশের দর্শকের সামনে হাজির করতে। এর যা ক্ষমতা তা ভারতবর্ষ ছাড়া কোনো দেশে সম্ভব হত না। অবিশ্যি কিছু স্থির করার আগে আমি একবার ছেলেটিকে দেখতে চাই, এবং তার ক্ষমতারও একটু নমুনা পেতে চাই।'

বসাক বললেন, 'মিঃ কেলারম্যান পৃথিবীর তিনজন সবচেয়ে বিখ্যাত ইমপ্রেসারিওর একজন। একুশ বছর ধরে এই কাজ করছেন। ছেলেটিকে পাবার জন্য ইনি অনেক মূল্য দিতে প্রস্তুত। তাছাড়া টিকিট বিক্রী থেকেও যা আসবে তার একটা অংশও ছেলেটি পাবে। সেটা চুক্তিতে লেখা থাকবে।'

তরফদার বললেন, 'মিঃ কেলারম্যান, দ্য ওয়াণ্ডার কিড ইজ পার্ট অফ মাই ম্যাজিক শো। তার আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সামনে আমার দক্ষিণ ভারত ট্যুর আছে—ম্যাড্রাস দিয়ে শুরু। সেখানে এই ছেলের খবর পৌঁছে গেছে, এবং তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখার জন্য। ভেরি সরি, মিঃ কেলারম্যান—আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।'

কেলারম্যানের মুখ লাল হয়ে গেছে। তাও তিনি ধরা গলায় অনুরোধ করলেন, 'ছেলেটিকে একবার দেখা যায়? আর সেই সঙ্গে যদি তার ক্ষমতার...?'

'তাতে অসুবিধে নেই।' বললেন তরফদার। তারপর চাকরকে দিয়ে নয়নকে ডেকে পাঠালেন। নয়ন এসে তরফদারের সোফার হাতলে কনুই রেখে দাঁড়াল। দিনের বেলা তাকে এত কাছ থেকে দেখে অদ্ভুত লাগছিল। এমন একটা ক্ষমতা যে ওর মধ্যে আছে সেটা দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই—যদিও চাউনিতে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট।

কেলারম্যান অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নয়নের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে, নয়নের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, বললেন, 'ওকি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর বলে দিতে পারে?'

তরফদার বাংলায় নয়নকে প্রশ্নটা করাতে সে বলল, 'কোন ব্যাঙ্ক? ওর ত তিনটে ব্যাঙ্কে টাকা আছে।'

কেলারম্যানের মুখ থেকে লাল ভাবটা চলে গিয়ে একটা ফ্যাকাসে ভাব

দেখা দিল। সে ঢোক গিলে আগের মতোই ধরা গলায় মার্কিনী মার্কা উচ্চারণে বলল, 'সিটি ব্যাঙ্ক অফ নিউইয়র্ক।'

নয়ন গড়গড় করে বলে দিল, 'ওয়ান্ টু ওয়ান্ টু এইট ড্যাশ সেভ্ন ফোর।'

'জীসাস ক্রাইস্ট!'

কেলারম্যানের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

'আই অ্যাম অফারিং ইউ টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড ডলারস রাইট নাউ'। তরফদারের দিকে ফিরে বললেন কেলারম্যান 'তোমার ম্যাজিক শো থেকে ও কোনোদিন এত রোজগার করতে পারবে?'

'এ তো সবে শুরু, মিঃ কেলারম্যান', বললেন তরফদার। 'এখনো ভারতবর্ষের কত শহর পড়ে আছে; তারপর সারা পৃথিবীর বড় বড় শহর। ম্যাজিক দেখতে ছেলে বুড়ো সকলেই ভালোবাসে। আর এই ছেলেটি যে ম্যাজিক দেখায় তার নমুনা ত দেখলেন আপনি। এর কোনো তুলনা আছে কি? বিশ হাজার কেন—তারও ঢের বেশি যে এ ছেলে আমার শো থেকে আনবে না, সেটা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে?'

'ওর বাবা আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন কেলারম্যান।

'ধরে নিন এখন আমিই ওর বাবা।'

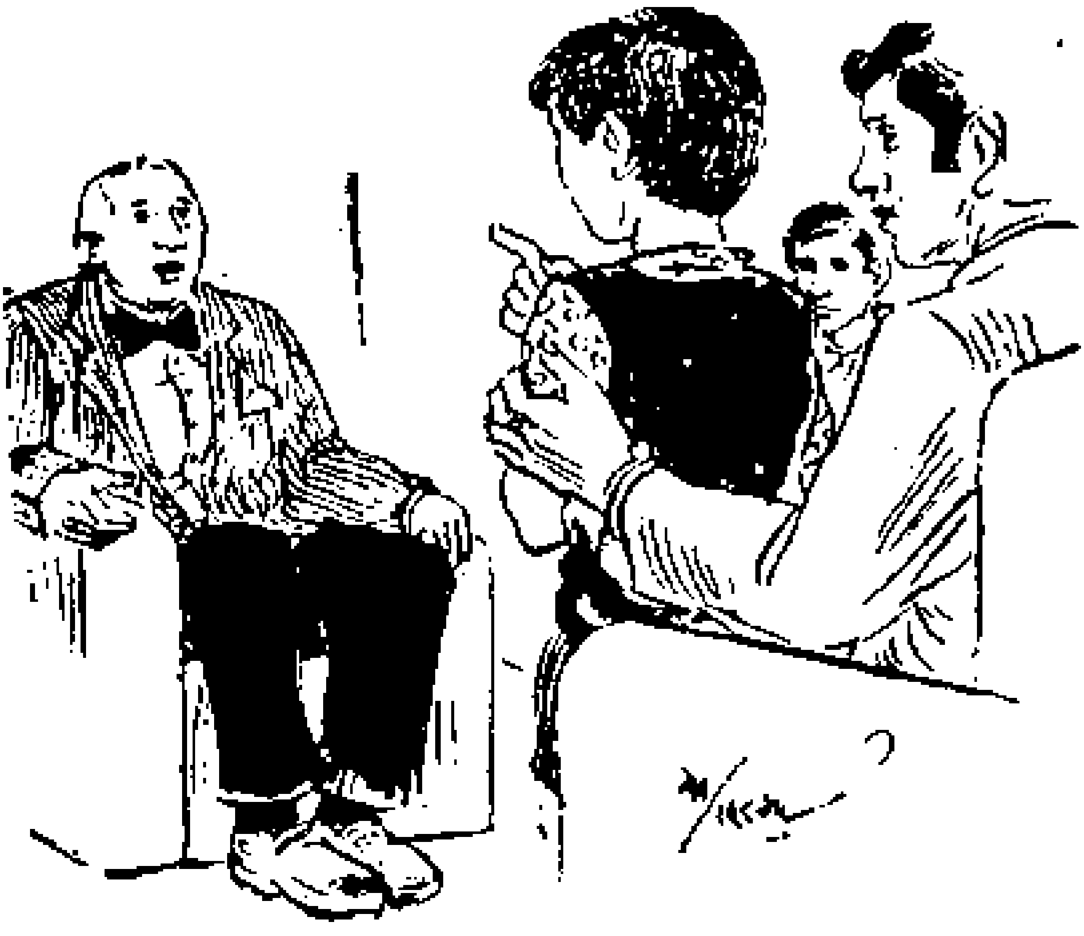

এর মধ্যে লালমোহনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'স্যার, ইন আওয়ার ফিলজফি, ত্যাগ ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান ভোগ।'

কথাটা বসাক কেলারম্যানকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'মিস্টার তরফদার, আপনি কিন্তু একটা সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন না। এমন সুযোগ আপনি আর পাবেন না। ভেবে দেখুন।'

বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক যদি নয়নকে কেলারম্যানের হাতে তুলে দিতে পারেন তাহলে তাঁর নিজেরও নির্ঘাৎ মোটারকম প্রাপ্তি আছে।

'আমার ভাবা হয়ে গেছে', সহজ ভাবে বললেন তরফদার।

অগত্যা কেলারম্যানও উঠে দাঁড়ালেন। বসাক এবার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে তরফদারকে দিয়ে বললেন, 'এতে আমার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সবই আছে। যদি মাইন্ড চেঞ্জ করেন ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

দুই ভদ্রলোককে দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন তরফদার।

'বসাক ঘুঘু লোক।' তরফদার ফেরার পরে বলল ফেলুদা, 'নইলে মার্কিন ইমপ্রেসারিওর এজেন্ট সে হতে পারে না। পয়সার দিক দিয়েও সলিড, হয়ত কেলারম্যানের দৌলতেই। দামী ফরাসী আফটার-শেভ লোশন মেখে এসেছে—যদিও থুতনির নীচে এক চিলতে শেভিং সোপ এখনো লেগে আছে। বোঝাই যাচ্ছে ঘুম ভাঙে দেরিতে, তাই নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে।'

॥ ৪ ॥

'একজনকে ত বিদায় করা গেল', বললেন তরফদার, 'এবার দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা। পাংচুয়াল হলে ত আর দু-তিন মিনিটের মধ্যেই আসা উচিত।'

দু মিনিট অপেক্ষা করতে হল না। নয়নকে ফেরত পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরকে যেতে হল সদর দরজায়। সে ফিরে এল সঙ্গে একটি কালো স্যুট পরা ভদ্রলোককে নিয়ে। তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং। আপনার নামটা টেলিফোনে ঠিক ধরতে পারিনি। আপনি যদি...'

'তেওয়ারি', সোফায় বসে বললেন ভদ্রলোক, 'দেবকীনন্দন তেওয়ারি। টি· এইচ সিন্ডিকেটের নাম শুনেছেন?'

তরফদার, জটায়ু দুজনেই চুপ দেখে ফেলুদাকেই মুখ খুলতে হল।

'আপনাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কারবার কি? পোলক স্ট্রিটে অপিস?'

'ইয়েস স্যার।'

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন বলে তরফদার আমাদের বিষয় ওঁকে বলে দিলেন।

'এঁরা আমার তিনজন বিশিষ্ট বন্ধু। আশা করি এঁদের সামনে কথা বলতে আপনার কোনো আপত্তি হবে না।'

'নো, নো; তবে কথা মানে শুধু একটি প্রশ্ন। ওই ছেলেটিকে যদি একবার আমার সামনে উপস্থিত করেন, তা হলে আমি তাকে কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন করব। জবাব পেলে আমার অশেষ উপকার হবে, আর আমার কাজও শেষ হবে।'

নয়নকে আবার আনতে হল। তরফদার নয়নের পিঠে হাত রেখে তেওয়ারির দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন। দেখ তার উত্তর দিতে পার কি না।' তারপর তেওয়ারির দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর সংখ্যায় হবে ত? অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এ দিতে পারবে না।'

'আই নো, আই নো। আমি জেনেশুনেই এসেছি।'

তারপর—লালমোহনবাবুর ভাষায়—নয়নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার সিন্দুকের কম্বিনেশনটা কী সেটা বলতে পার ?'

নয়ন ফ্যাল ফ্যাল করে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছে দেখে ফেলুদা বলল, 'শোন জ্যোতিষ্ক—কম্বিনেশন জিনিসটা কী সেটা বোধহয় তুমি জান না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। —একরকম সিন্দুক হয় যাতে তালাচাবি থাকে না। তার বদলে ডালার এক পাশে একটা চাক্‌তি থাকে যেটাকে ঘোরানো যায়। এই চাক্‌তির গায়ে একটা তীর আঁকা থাকে, আর চাকতিটাকে ঘিরে সিন্দুকের গায়ে এক থেকে শূন্য অবধি নম্বর লেখা থাকে। কম্বিনেশন হল সিন্দুক খোলার একটা বিশেষ নম্বর। চাকতিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পর পর সেই নম্বরের পাশে তীরটাকে আনলে শেষ নম্বরে পৌঁছতেই ঘড়াৎ করে সিন্দুক খুলে যায়—বুঝেছ ?'

'বুঝেছি।'

এখানে জটায়ু দুম্ করে একটা বেশ লাগসই প্রশ্ন করলেন তেওয়ারিকে।

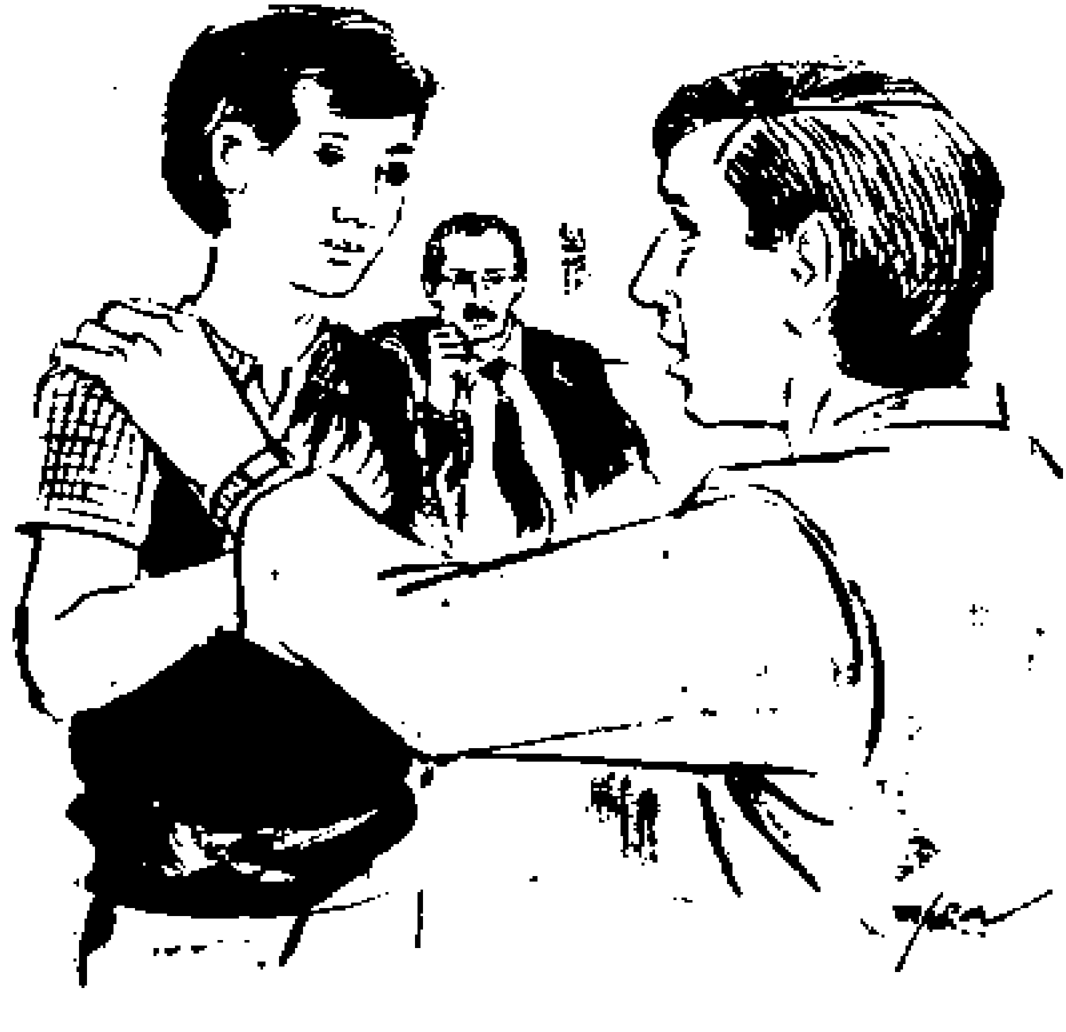

'আপনার নিজের সিন্দুকের কম্বিনেশন আপনি নিজেই জানেন না ?'

'তেইশ বছর ধরে জেনে এসেছি', আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন তেওয়ারি। 'স্বভাবতই মুখস্থ ছিল। ক' হাজার বার সে সিন্দুক খুলেছি তার কি হিসাব আছে ? কিন্তু বয়স যেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে অমনি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে শুরু করেছে। আজ চারদিন থেকে নম্বরটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। একটা ডায়রিতে লেখা ছিল, বহু পুরোনো ডায়রি—সেটা যে কোথায় গেছে জানি না। আমি হয়রান হয়ে শেষে এই ছেলের খবর পেয়ে মিস্টার তরফদারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি।'

'আপনি কি আর-কাউকে কোনোদিন নম্বরটা বলেননি ?' আবার প্রশ্ন করলেন জটায়ু। ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম সে জটায়ুকে তারিফ করছে।

তেওয়ারি বললেন, 'আমার ধারণা আমার পার্টনারকে বলেছিলাম—বহুকাল আগে অবশ্য—কিন্তু সে অস্বীকার করছে। হয়ত এও আমার স্মৃতিভ্রম। কম্বিনেশন ত আর পাঁচজনকে বলে বেড়াবার জিনিস নয়, আর এ-সিন্দুক হল আমার পার্সোনাল সিন্দুক। আমার যে-টাকা ব্যাঙ্কে নেই তা সবই এই সিন্দুকে আছে। অথচ...'

তেওয়ারির দৃষ্টি সোফার পাশে দাঁড়ানো নয়নের দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন বলল, 'সিক্স ফোর থ্রী এইট নাইন সিক্স ওয়ান।'

'রাইট ! রাইট ! রাইট !' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তেওয়ারি। আর সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে ডটপেন দিয়ে তাতে নম্বরটা লিখে নিলেন।

'আপনার সিন্দুকে কত টাকা আছে সেটা আপনি জানেন ?' প্রশ্ন করলেন তরফদার।

'এগজ্যাক্ট অ্যামাউন্টটা জানি না।' বললেন তেওয়ারি, 'তবে যতদূর মনে হয়—লাখ চারেক ত হবেই।'

'এ কিন্তু বলে দিতে পারে', নয়নের দিকে দেখিয়ে বললেন তরফদার। 'আপনি জানতে চান ?'

'তা কৌতূহল ত হয়ই।'

তেওয়ারি ঠোঁটের কোণে হাসি আর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে নয়নের দিকে চাইলেন।

'টাকা-পয়সা কিচ্ছু নেই', বলল নয়ন।

'হোয়াট ?'

তেওয়ারি সোফা থেকে প্রায় তিন ইঞ্চি লাফিয়ে উঠলেন। তারপর উত্তেজনা সামলে নিয়ে মুখে একটা বিরক্ত ভাব এনে বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে এই বালক সব ব্যাপারে রিলায়েবল নয়। এনিওয়ে, কম্বিনেশনটায় ভুল নেই। ওটা জানতে পেরে সত্যিই আমার উপকার হয়েছে।'

তেওয়ারি দাঁড়িয়ে উঠে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোলাপী কাগজে মোড়া সরু লম্বা প্যাকেট বার করে নয়নের হাতে দিয়ে বললো, 'দিস ইজ ফর ইউ, মাই বয়।'

তেওয়ারিকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে তরফদার ফিরে আসতে ফেলুদা নয়নকে বলল, 'ওটা খুলে দেখ ত ওতে কী আছে।'

প্যাকেট খুলতে বেরোল একটা ছোটদের রিস্টওয়াচ।

'বাঃ!' বললেন জটায়ু। 'এটা পরে ফেল নয়ন ভাই, পরে ফেল।'

নয়ন ঘড়িটা হাতে পরে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

'সিন্দুক খুলে তেওয়ারি সাহেবের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে', বলল ফেলুদা।

'সিন্দুকে যদি সত্যিই কিছু থেকে না থাকে', বললেন জটায়ু, 'তাহলে তেওয়ারি নিশ্চয়ই ওঁর পার্টনারকেই সন্দেহ করবেন?'

ফেলুদা যেন মন থেকে ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। তরফদারের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা যে দক্ষিণ ভারত সফরে যাচ্ছ, সেটা কিসে যাবে? ট্রেনে, না প্লেনে?'

'ট্রেনে অবশ্যই। সঙ্গে এত লটবহর, ট্রেন ছাড়া উপায় কী?'

'নয়নকে সামলাবার কী ব্যবস্থা করছ?'

'ট্রেনে ত আমিই সঙ্গে থাকব: কিছু হবে বলে মনে হয় না। ওখানে পৌঁছে আমি ছাড়াও একজন আছে যে ওকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখবে। সে হল আমার ম্যানেজার শঙ্কর।'

কথা হয়ত আরো চলত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে চাকর একটি প্যান্ট-কোট-টাই পরা ভদ্রলোককে এনে হাজির করলেন। বুঝলাম ইনি নাম্বার থ্রী।

'গুড মর্নিং। আই মেড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ—'

'মী', বললেন তরফদার। 'মাই নেম ইজ তরফদার।'

'আই সী। মাই নেম ইজ হজসন। হেনরি হজসন।'

'প্লীজ সিট ডাউন।'

তরফদারও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; এবার দুজনেই একসঙ্গে বসলেন।

হজসনের গায়ের যা রং, তাঁকে সাহেব বলা মুশকিল। তাও ইংরিজি ছাড়া গতি নেই।

'এঁরা কারা প্রশ্ন করতে পারি কি?' পর পর আমাদের তিনজনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন হজসন।

'আমার খুব কাছের লোক। আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন।'

'হুম্।'

ভদ্রলোকের মেজাজ যে তিরিক্ষি, সেটা তাঁর পার্মানেন্টলি কুঁচকে থাকা ভুরু থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

'আমার এক পরিচিত বাঙালি ভদ্রলোক লাস্ট সানডে তোমার ম্যাজিক দেখেছিল। সে একটি ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলে। আমি অবিশ্যি তার কথা বিশ্বাস করিনি। আমি ঈশ্বর মানি না; তাই অলৌকিক শক্তিতেও আমার বিশ্বাস নেই। ইফ ইউ ব্রিং দ্যাট বয় হিয়ার—আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

তরফদার যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাকরকে ডেকে পাঠালেন।

'নারায়ণ, আরেকবার যাও ত—খোকাবাবুকে ডেকে আন।'

নয়ন মিনিট খানেকের মধ্যে হাজির।

'সো দিস ইজ দ্য বয়?'

হজসন নয়নের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'আমাদের এখানে ঘোড়দৌড় হয় তুমি জান?'

তরফদার সেটা বাঙলা করে নয়নকে বললেন।

'জানি', পরিষ্কার গলায় বলল নয়ন।

'গত শনিবার রেস ছিল', বলল হজসন। 'তিন নম্বর রেসে কত নম্বর ঘোড়া জিতেছিল বলতে পার?

এটাও অনুবাদ হল নয়নের জন্য।

'ফাইভ'—এক মুহূর্ত না ভেবে বলে দিল নয়ন।

এক কথাতেই কেল্লা ফতে। সোফা থেকে উঠে প্যান্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ' বলে এপাশ ওপাশ পায়চারি করতে লাগলেন হজসন সাহেব। তারপর হঠাৎ থেমে তরফদারের দিকে সোজা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'অল আই ওয়ান্ট ইজ দিস—আমি সপ্তাহে একবার করে এখানে এসে এর কাছ থেকে জেনে যাব সামনের শনিবার কোন রেসে কত নম্বর ঘোড়া জিতবে। সোজা কথায় বলছি—রেস আমার নেশা। অনেক টাকা খুইয়েছি, তাও নেশা যায়নি। কিন্তু আর হারলে দেনার দায়ে আমাকে জেলে পুরবে। তাই এবার থেকে শিওর হয়ে বেট করতে চাই। দিস্ বয় উইল্ হেল্প মি।'

'হাউ ক্যান ইউ বি সো শিওর?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তরফদার।

'হি মাস্ট, হি মাস্ট, হি মাস্ট!' বাঁ হাতের তেলোর ওপর ডান হাত দিয়ে পর পর তিনটে ঘুঁষি মেরে বললেন হজসন সাহেব।

'নো—হি মাস্ট নট', দৃঢ়স্বরে বললেন তরফদার। 'অসাধু উদ্দেশ্যে কোনোরকমে ব্যবহার করা চলবে না এই বালকের ক্ষমতা। এ ব্যাপারে আমার কথার এক চুল নড়চড় হবে না।'

এবারে হজসনের চেহারা হয়ে গেল ভিখিরির মতো। হাত দুটো জোড় করে ভদ্রলোক কাতর সুরে বললেন, 'অন্তত আগামী রেসের উইনারের নামগুলো বলে দিক! প্লীজ!'

'নো হেল্‌প ফর গ্যাম্বলারস্‌, নো হেল্‌প ফর গ্যাম্বলারস্‌ !' আশ্চর্য শুদ্ধ ইংরিজিতে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন জটায়ু।

হজসন সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন, তাঁর মুখ বেগুনি।

'তোমাদের মতো এমন ঢ্যাঁটা আর মূর্খ লোক আমি আর দেখিনি, ড্যাম ইট !'

কথাটা বলে আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে হজসন গটগটিয়ে সদর দরজার দিকে চলে গেলেন।

'বিশ্রী লোক ! হরিব্‌ল ম্যান !' নাক কুঁচকে চাপা গলায় বললেন জটায়ু।

তরফদার নয়নকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

'বিচিত্র সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট', বলল ফেলুদা। 'হজসন অবিশ্যি শুধু জুয়াড়ি নন, তিনি নেশাও করেন। আমি কাছে বসেছিলাম তাই গন্ধটা সহজেই পাচ্ছিলাম। ওঁর যে দৈন্যদশা সেটা ওঁর কোটের আস্তিনের কনুই দেখলেই বোঝা যায়। ভাঁজ খেয়ে খেয়ে কোটের ওইখানটাই সবচেয়ে আগে জখম হয়। এঁকে তাপ্পি লাগাতে হয়েছে, কিন্তু নতুন কাপড়ের সঙ্গে পুরোনর রং বা কোয়ালিটি কোনোটাই মেলেনি। তাছাড়া ভদ্রলোককে যে বাসে বা ট্রামে আসতে হয়েছে সেটা ওঁর ডান পায়ের কালো জুতোর ডগায় অন্য কারুর জুতোর আংশিক ছাপ দেখেই বোঝা যায়। এ জিনিস ট্যাক্সি বা মেট্রোতে হয় না।'

এগুলো অবিশ্যি শুধু ফেলুদারই চোখে ধরা পড়েছে।

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে আমরা আবার টান হয়ে বসলাম।

'নাম্বার ফোর', বলল ফেলুদা।

॥ ৫ ॥

মিনিট খানেক পরেই নারায়ণ এক অদ্ভুত প্রাণীকে এনে হাজির করল। পুরোন জুতোর বুরুশের মতো দাড়ি, শুঁয়োপোকার মতো গোঁফ। ঝুলঝাড়ার মতো চুল, পরনে ঢিলে হয়ে যাওয়া গেরুয়া সুট, আর বিশ্রী ভাবে প্যাঁচ দেওয়া সবুজ টাই। ছোটখাটো মানুষ। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে, যদিও সেই তুলনায় চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক দেখে মিহি অথচ কর্কশ গলায় বললেন, 'তরফদার, তরফদার—হুইচ ওয়ান ইজ তরফদার?'

তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমিই সুনীল তরফদার।'

'অ্যান্ড দীজ থ্রী?' আমাদের তিনজনের উপর দিয়ে একটা ঝাড়ু-দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'আমার তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু', বললেন তরফদার।

'নেম্‌স? নেম্‌স?'

'ইনি প্রদোষ মিত্র, ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, আর ইনি তপেশ মিত্র।'

'অল রাইট। এবার কাজের কথা। কাজের কথা।'

'বলুন।'

'আমার নাম জানেন?'

'আপনি ত টেলিফোনে শুধু আপনার পদবীটাই বলেছিলেন—ঠাকুর। সেটাই জানি।'

'তারকনাথ। তারকনাথ ঠাকুর। টি এন টি—ট্রাইনাইট্রোটোলুইন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

ভদ্রলোকের হাসির দমকে চমকে উঠলাম। ট্রাইনাইট্রোটোলুইন বা টি এন টি যে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরকের উপাদান সেটা আমি জানতাম।

'আপনার বাড়িতে কি একজন অসম্ভব বেঁটে বামুন থাকে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কিটোমো। কোরিয়ান,' বললেন তারকনাথ। 'এইট্টি টু সেন্টিমিটারস্। বিশ্বের খর্বতম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি।'

'এ খবরটা মাস কয়েক আগে কাগজে বেরিয়েছিল।'

'এবার গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পাবে।'

'একে আপনি জোগাড় করলেন কী করে?' প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

'আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। আমার অঢেল টাকা। এক পয়সা নিজে উপার্জন করিনি, সব বাপের টাকা। উইল করেননি, তবে আমিই একমাত্র সন্তান, তাই সব টাকাই আমি পাই। কিসের টাকা জান? গন্ধদ্রব্য। পারফিউম। কুন্তলায়নের নাম শুনেছ?'

'সে তো এখনো পাওয়া যায়,' বললেন জটায়ু।

'হ্যাঁ। বাবারই আবিষ্কার, ব্যবসাও বাবারই। এখন এক ভাইপো দেখে। আমার কোনো ইনটারেস্ট নেই। আমি সংগ্রাহক।'

'কী সংগ্রহ করেন?'

'নানান মহাদেশের এমন সব জিনিস যার জুড়ি নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিত্যেমোর কথা বললাম। এছাড়া আছে দুহাতে একসঙ্গে লিখতে পারে এমন একটি সেক্রেটারি। জাতে মাওরি। নাম টোকোবাহানি। আরো আছে। একটি ব্ল্যাক প্যারট তিন ভাষায় কথা বলে। একটি দুই-মাথা বিশিষ্ট পমেরেনিয়ান কুকুর, লছমনঝুলার একটি সাধু উড্ডীনানন্দ, মাটি থেকে দেড় হাত উপরে শূন্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ধ্যান করে। তাছাড়া—'

'ওয়ান মিনিট স্যার,' বলে লালমোহনবাবু বাধা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হল। হাতের লাঠি মাথার উপর তুলে চোখ রক্তবর্ণ করে তারকনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইউ ডেয়ার ইনটারাপ্ট মী!'

'সরি সরি সরি স্যার।' জটায়ু কুঁকড়ে গেছেন— 'আমি জানতে চাইছিলুম আপনার সংগ্রহের মধ্যে যারা মানুষ, তারা কি স্বেচ্ছায় আপনার ওখানে রয়েছে?'

'তারা ভালো খায়, ভালো পরে, ভালো বেতন পায়, আরাম পায় আদর পায়—থাকবে না কেন? হোয়াই নট? আমার কথা আর আমার সংগ্রহের কথা পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোকেই জানে: তোমরা না জানতে পার। আমেরিকা থেকে একজন সাংবাদিক এসে আমার সঙ্গে কথা বলে দেশে ফিরে গিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে "দ্য হাউস অফ ট্যারক" বলে এক প্রবন্ধ লেখে।'

এবার তরফদার মুখ খুললেন।

'অনেক কথাই ত জানা গেল, কেবল আপনার এখানে আসার কারণটা ছাড়া।'

'এটা আবার বলে দিতে হবে? আমি এই খোকাকে আমার সংগ্রহের জন্য চাই। কী নাম যেন? ইয়েস—জ্যোতিষ্ক। আই ওয়ান্ট জ্যোতিষ্ক।'

'কেন? সে তো এখানে দিব্যি আছে,' বললেন তরফদার। 'খাওয়া-

পরার অভাব নেই, যত্নআত্তির অভাব নেই। সে আমার ডেরা ছেড়ে আপনার ওই উদ্ভট ভিড়ের মধ্যে যাবে কেন ?'

তারকনাথ তরফদারের দিকে প্রায় আধ মিনিট চেয়ে থেকে বললেন, 'গাওয়াঙ্গিকে একবার দেখলে তুমি এমন বেপরোয়া কথা বলতে পারতে না।'

'হোয়াট ইজ গাওয়াঙ্গি ?' প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

'নট হোয়াট, বাট হু,' গম্ভীরভাবে বললেন তারকনাথ। 'নট বস্তু, বাট ব্যক্তি! ইউগ্যাণ্ডার লোক। পৌনে আট ফুট হাইট, চুয়ান্ন ইঞ্চি ছাতি, সাড়ে তিনশো কিলো ওজন। কোনো ওলিম্পিক ওয়েট লিফটার ওর কাছে পাত্তা পাবে না! একবার টেরাইয়ের জঙ্গলে একটা বাঘকে ঘুমপাড়ানি ইনজেকশনের গুলি মারে, কারণ বাঘটার গায়ে স্পট এবং ডোরা দুইই ছিল। একমেবাদ্বিতীয়ম। সেই বাঘকে কাঁধে করে সাড়ে তিন মাইল বয়ে এনেছিল গাওয়াঙ্গি। সে এখন আমার একনিষ্ঠ সেবক।'

'আপনি কি আবার দাসপ্রথা চালু করলেন নাকি ?' জটায়ু বেশ সাহসের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

'নো স্যার!' গর্জিয়ে উঠলেন টি এন টি। 'গাওয়াঙ্গিকে যখন দেখি তখন তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইউগ্যাণ্ডার রাজধানী কাম্পালা শহরে এক শিক্ষিত পরিবারের ছেলে বাপ ডাক্তার। তাঁর কাছেই শুনি গাওয়াঙ্গির যখন চোদ্দ বছর বয়স তখনই সে প্রায় সাত ফুট লম্বা। বাড়ির বাইরে বেরোয় না। কারণ রাস্তার লোকে ঢিল মারে। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু ছাত্রদের বিদ্রূপের ঠেলায় বাধ্য হয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। আমি যখন তাকে দেখি তখন তার বয়স একুশ। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। চুপচাপ ঘরে বসে থাকে সারাদিন। দেখে মনে হল এইভাবে সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। সেই অবস্থা থেকে তাকে আমি উদ্ধার করে আনি। আমার কাছে এসে সে নতুন জীবন পায়। সে আমার দাস হতে যাবে কেন ? আমি তাকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করি। আমাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।'

'যাই হোক তারকবাবু', বললেন তরফদার, 'আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। আমি জ্যোতিষ্ককে চিড়িয়াখানার অধিবাসী হিসেবে কল্পনা করতে পারি না এবং চাইও না।'

'গাওয়াঙ্গির বিবরণ শোনার পরেও এটা বলছ ?'

'বলছি।'

ভদ্রলোক যেন একটু দমে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই যখন বলছ তখন এই ছেলেটিকে একবার দেখতে পারি কি ?'

'সেটা সহজ ব্যাপার। আপনি সেই কলকাতার উত্তর প্রান্ত থেকে এসেছেন, আপনার জন্য এতটুকু করতে পারব না ?'

নয়ন এসে দাঁড়াতে তারকবাবু তার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বাড়িতে কটা ঘর আছে বলতে পার ?'

'ছেষট্টি।'

'হুঁ...'

এবার তারকনাথ উঠে দাঁড়িয়ে তার লাঠির রুপো দিয়ে বাঁধানো মাথাটা ডান হাতের মুঠো দিয়ে শক্ত করে ধরে বললেন, 'রিমেমবার, তরফদার—টি এন টি অত সহজে হার মানে না। আমি আসি।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ কোনো কথাই বললাম না। নয়নকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন তরফদার। অবশেষে লালমোহনবাবু ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'চার দিয়ে ত অনেক কিছু হয়—না মশাই ? চতুর্দিক, চতুর্ভুজ, চতুর্মুখ, চতুর্বেদ—এই চারটিকে কী বলব তাই ভাবছি।'

'চতুর্লোভী বলতে পারেন।' বলল ফেলুদা। 'চার জনই যে লোভী তাতে ত কোনো সন্দেহ নেই। তবে লোভী হয়েও যে কোনো লাভ হল না সে ব্যাপারে সুনীলকে তারিফ করতে হয়।'

'তারিফ কেন স্যার ?' বললেন তরফদার। 'এ ত সোজা অঙ্ক। সে ছেলে আমার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে সুস্থ পরিবেশে। আমি তাকে দেখছি। সে আমাকে দেখছে। স্রেফ লেনদেনের ব্যাপার। এ অবস্থার পরিবর্তন হবে কেন ?'

আমরা তিনজন উঠে পড়লাম।

'একটা কথা বলি তোমাকে', তরফদারের কাঁধে হাত রেখে বলল ফেলুদা, 'আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট না।'

'পাগল !' বললেন তরফদার। 'এক দিনেই যা অভিজ্ঞতা হল, এর পরে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট !'

'তবে এটা বলে রাখি—নয়নকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে যদি আমার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি তৈরি আছি। ছেলেটির উপর আমার মায়া পড়ে গেছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ! প্রয়োজন হলেই খবর পাবেন।'

॥ ৬ ॥

বিষ্যুদবারের সকাল। গতকালই চতুর্বেদীর সঙ্গে সকলে কাটিয়েছি আমরা। বেশ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ক্রমে এক্সাইটিং হয়ে আসছে, তাই বোধহয় জটায়ু তাঁর অভ্যাসমতো নটায় না এসে সাড়ে আটটায় এসেছেন।

ভদ্রলোক কাউচে বসতেই ফেলুদা বলল, 'আজ কাগজে খবরটা দেখেছেন?'

'কোন কাগজ?'

'স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার...'

'মশাই, এক কাশ্মিরী শালওয়ালা এসে সকালটা একেবারে মাটি করে দিয়ে গেল। কাগজ-টাগজ কিছু দেখা হয়নি। কী খবর মশাই?'

আমি আগেই কাগজ পড়েছি, তাই খবরটা জানতাম।

'তেওয়ারি সিন্দুক খুলেছিলেন,' বলল ফেলুদা, 'আর খুলে দেখেন সত্যিই তার মধ্যে একটি কপর্দকও নেই।'

'তাহলে ত নয়ন ঠিকই বলেছিল,' চোখ বড় বড় করে বললেন জটায়ু। 'চুরিটা কখন হয়?'

'দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে। অন্তত তেওয়ারির তাই ধারণা। সেই সময়টা তিনি আপিসে ছিলেন না। ছিলেন তাঁর ডেনটিস্টের চেম্বারে। ভদ্রলোকের স্মরণশক্তি এখন ভালো কাজ করছে। দুদিন আগেই নাকি উনি সিন্দুক খুলেছিলেন, তখন সব কিছুই ছিল। টাকার অঙ্কও মনে পড়েছে— পাঁচ লাখের কিছু উপরে। তেওয়ারি অবিশ্যি তাঁর পার্টনারকেই সন্দেহ করছেন। বলছেন একমাত্র তাঁর পার্টনারই নাকি কম্বিনেশনটা জানত। এছাড়া আর কাউকে কখনো বলেননি।'

'এই পার্টনারটি কে?'

'নাম হিঙ্গোরানি। টি এইচ সিন্ডিকেটের টি হলেন তেওয়ারি আর এইচ হিঙ্গোরানি।'

'যাকগে। তেওয়ারি, হিংটিংছট, এসবে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমি খালি ভাবছি ওই পুঁচকে ছেলে এমন ক্ষমতা পেলো কি করে?'

'আমিও সে কথা অনেকবার ভেবেছি। ব্যাপারটা প্রথম কী করে

আবিষ্কার হয় সেটা জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে। তোপশে, নয়নের বাড়ির রাস্তাটার নাম তোর মনে আছে?'

'নিকুঞ্জবিহারী লেন। কালীঘাট।'

'গুড।'

'একবার যাবেন নাকি মশাই? বলা যায় না, আমার ড্রাইভার কলকাতার এমন সব রাস্তা চেনে যার নামও আমি কস্মিনকালে শুনিনি।'

সত্যিই দেখা গেল হরিপদবাবু নিকুঞ্জবিহারী লেন চেনেন। বললেন, 'ও রাস্তায় ত পণ্টু দত্ত থাকতেন। আমি তখন অজিতেশ সাহার গাড়ি চালাই। একদিন তাঁকে নিয়ে গেলুম পণ্টু দত্তর বাড়ি। দুজনেই ত ফুটবলার, তাই খুব আলাপ।'

দশ মিনিটের মধ্যে নিকুঞ্জবিহারী লেনে পৌঁছে একটা পানের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানলাম অসীম সরকার থাকেন আট নম্বরে।

আট নম্বরের দরজায় টোকা দিতে একজন রোগা, ফরসা ভদ্রলোক দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। বুঝলাম তিনি সবেমাত্র দাড়ি কামানো শেষ করেছেন, কারণ হাতের গামছা দিয়ে গাল মোছা এখনো শেষ হয়নি।

'আপনারা—?' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'আপনি কি আপিসে বেরোচ্ছেন?'

'আজ্ঞে না। এখন ত ৯টা। আমি বেরোই সাড়ে নটায়।'

ফেলুদা বলল, 'আমরা গত রবিবার তরফদারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার ছেলের—আপনিই ত অসীম সরকার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতা আপনার ছেলের। তরফদারের সঙ্গে আমাদের বেশ ভালো আলাপ হয়েছে। তাঁর কাছেই আপনার বাড়ির হদিস পেলাম।—এই দেখুন, আমরা কে তাই বলা হয়নি!—ইনি রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক জটায়ু, এ আমার ভাই তপেশ, আর আমি প্রদোষ মিত্র।'

'প্রদোষ মিত্র?' ভদ্রলোকের চোখ কপালে। 'সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র—যাঁর ডাক নাম ফেলু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ফেলুদা বিনয়ের অবতার।

'ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন—কী আশ্চর্য!'

আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন ভিতরে গিয়ে একটা সরু প্যাসেজের বাঁ দিকের দরজা দিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেটাকে শোবার ঘর বসবার ঘর দুই-ই বলা চলে। দুটো চেয়ার আর একটা তক্তপোষ ছাড়া ঘরে কোনও আসবাব নেই। তক্তপোষের এক প্রান্তে সতরঞ্চি দিয়ে গোটানো একটা বালিশ দেখে বোঝা যায় সেখানে কেউ শোয়। ফেলুদা

আর জটায়ু চেয়ারে, অসীমবাবু আর আমি খাটে বসলাম।

ফেলুদা বলল, 'আপনার বেশি সময় নেবো না। আমাদের আসার কারণটা বলি। সেদিন তরফদারের শোতে আপনার ছেলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শোয়ের পর তরফদারকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বলেন ছেলেটি তাঁর কাছেই থাকে। আমি জানতে চাই যে নয়নের বাসস্থান পরিবর্তনের প্রস্তাবটা কি তরফদার করেন, না আপনি করেন?'

'আপনি মহৎমান্য ব্যক্তি, আপনার কাছে মিথ্যা বলব না। ওঁর বাড়িতে রাখার প্রস্তাবটা তরফদার মশাই-ই করেন, তবে তার আগে নয়নকে আমিই ওঁর কাছে নিয়ে যাই।'

'সেটা কবে?'

'ওর ক্ষমতা প্রকাশ পাবার তিনদিন পরে—ষোলই ডিসেম্বর।'

'এই সিদ্ধান্তের কারণটা কী?'

'এর একটাই কারণ, মিত্তির মশাই। আমার বাড়ি দেখেই বুঝতে পারছেন আমার টানাটানির সংসার। আমার চারটি সন্তান। বড়টি ছেলে, সে বি. কম. পড়ছে। তার খরচ আমাকে জোগাতে হয়। তারপর দুটি মেয়ে; তাদেরও ইস্কুলের খরচ আছে। নয়নকে এখনো ইস্কুলে দিইনি; আমি এই কালীঘাট পোস্ট আপিসেই সামান্য চাকরি করি। পুঁজি বলতে কিছুই নেই; যা আনি তা নিমেষেই খরচ হয়ে যায়; ভবিষ্যতের কথা ভেবে গা-টা বারবার শিউরে ওঠে। তাই নয়নের মধ্যে যখন হঠাৎ এই ক্ষমতা প্রকাশ পেল তখন মনে হল—একে দিয়ে কি দু'পয়সা উপার্জন করানো যায় না? কথাটা শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে কিন্তু আমার যা অবস্থা, তাতে এমন ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়, মিত্তির মশাই।'

'সেটা আমি বুঝতে পারছি', বলল ফেলুদা। 'এর পরেই আপনি নয়নকে তরফদারের কাছে নিয়ে যান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ত টেলিফোন নেই, তাই আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারিনি, সোজা চলে যাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রলোক নয়নের ক্ষমতার দু'একটা নমুনা দেখতে চাইলেন। আমি বললুম, ওকে এমন কিছু জিজ্ঞেস করুন যার উত্তর নম্বরে হয়। ভদ্রলোক নয়নকে বললেন, "আমার বয়স কত বলতে পার?" নয়ন তক্ষুনি জবাব দিল—তেত্রিশ বছর তিন মাস দশ দিন। এর পরে আর কোনো প্রশ্ন করেননি তরফদার। আমাকে বললেন—আমি যদি একে মঞ্চে ব্যবহার করি তাতে আপনার কোনো আপত্তি আছে? আমি অবশ্যই পারিশ্রমিক দেবো।—আমি রাজি হয়ে গেলুম। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কত আশা করেন? আমি ভয়ে ভয়ে বললুম—মাসে এক হাজার। তরফদার বললেন, "ভুল হল। আমার মাথায় কী নম্বর আছে বল ত, নয়ন?" নয়ন বলল—তিন শূন্য শূন্য

শূন্য। —সে ভুল বলেনি, মিত্তির মশাই। তরফদার মশাইও তাঁর কথা রেখেছেন। আগাম তিন হাজার আমি এরই মধ্যে পেয়ে গেছি। আর ভদ্রলোক যখন আমাকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিলেন, তখন নয়নকে তাঁর বাড়িতে রাখার প্রস্তাবেই বা কি করে না বলি?'

'কিন্তু নয়ন কি স্বেচ্ছায় গেল?'

'সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এখন ত ও দিব্যি আছে।'

'এইবারে আরেকটা প্রশ্ন করছি', বলল ফেলুদা, 'তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।'

'বলুন।'

'ওর ক্ষমতার প্রথম পরিচয় আপনি কী করে পেলেন?'

'খুব সহজ ব্যাপার। একদিন সকালে উঠে নয়ন বলল—"বাবা, আমার চোখের সামনে অনেক কিছু গিজ গিজ করছে। তুমি সেরকম দেখছ না?" আমি বললাম, "কই, না ত! কী গিজ গিজ করছে?" নয়ন বলল, "এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় শূন্য। সব এদিকে ওদিকে ঘুরছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। আমার মনে হয় আমাকে যদি নম্বর নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস কর তাহলে ওদের ছুটফটানি থামবে।"—আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাও ছেলের অনুরোধ রাখতে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার একটা খুব মোটা লাল বাঁধানো বাঙলা বই আছে জান ত?" নয়ন বলল, "মহাভারত?" আমি বললাম, "হ্যাঁ। সেই বইয়ে কত পাতা আছে বল ত।" নয়নের মুখে হাসি ফুটল। বলল, "ছুটফটানি থেমে গেছে। সব নম্বর পালিয়ে গেছে। খালি তিনটে নম্বর পর পর দাঁড়িয়ে আছে।" কী নম্বর জিজ্ঞেস করাতে নয়ন বলল, "নয় তিন চার।" আমি তাক থেকে কালী সিংহের মহাভারত নামিয়ে খুলে দেখি তার পৃষ্ঠা সংখ্যা সত্যি ৯৩৪।'

আমাদের কাজ শেষ, আমরা ভদ্রলোককে বেশ ভালোরকম ধন্যবাদ দিয়ে বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

শ্রীনাথ দরজা খুলে দিতে বসবার ঘরে ঢুকেই দেখি দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তার মধ্যে সুনীল তরফদারকে চিনি। অন্যজনকে আগে দেখিনি।

ফেলুদা ব্যস্ত ভাবে বলল, 'সরি। তোমরা কি অনেকক্ষণ এসেছ?'

'পাঁচ মিনিট', বললেন তরফদার। 'এ হচ্ছে আমার ম্যানেজার ও প্রধান সহকারী—শঙ্কর হুবলিকার।'

তরফদারের মতো বয়স, বেশ চালাক চেহারা, উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের নমস্কার করলেন।

'আপনি ত মারাঠি?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'ইয়েস স্যার। তবে আমার জন্ম, স্কুলিং, সবই এখানে।'

'বসুন, বসুন।'

আমরা সবাই বসলাম।

'কী ব্যাপার বলুন', তরফদারকে উদ্দেশ করে বলল ফেলুদা।

'ব্যাপার গুরুতর।'

'মানে ?'

'কাল আমাদের বাড়িতে দৈত্যের আগমন হয়েছিল।'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। সেই গাওয়াঙ্গির কথা বলছেন নাকি ভদ্রলোক ?

'ব্যাপারটা খুলে বল', বলল ফেলুদা।

'বলছি।' বললেন ভদ্রলোক। 'আজ ঘুম থেকে উঠে বাদশাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোব—তখন সাড়ে পাঁচটা—দোতলা থেকে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।'

'কেন ?'

'সিঁড়ির সামনের মেঝেতে ছড়িয়ে আছে রক্ত, আর সেই রক্ত থেকে পায়ের ছাপ সদর দরজার দিকে চলে গেছে। সেই ছাপ পরে মেপে দেখেছি—লম্বায় ষোল ইঞ্চি।'

'ষো—!' লালমোহনবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

'তারপর ?' বলল ফেলুদা।

তরফদার বলে চললেন, 'আমাদের দরজায় কোল্যাপসিবল গেট লাগানো। রাত্তিরে সে গেট তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। সেই গেট দেখি অর্ধেক খোলা, আর তালা ভাঙা। সেই আধখোলা গেটের বাইরে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আমার দারোয়ান ভগীরথ। ভগীরথের পাশ দিয়ে আরো রক্তাক্ত পায়ের ছাপ চলে গেছে পাঁচিলের দিকে।

'জলের ঝাপটা দিয়ে ও কোনোরকমে ভগীরথের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। সে চোখ খুলেই 'দানো ! দানো !' বলে আর্তনাদ করে আবার ভির্মি যায় আর কি ! যাই হোক, তার কাছ থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে এই—মাঝরাত্তিরে সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে খৈনি ডলছিল। দরজার বাইরে একটা লো পাওয়ারের বাতি সারারাত জ্বলে। এই আবছা আলোয় ভগীরথ হঠাৎ দেখে যে একটা অতিকায় প্রাণী পাঁচিলের দিক থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণীটা যে পাঁচিল টপকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ গেটে রয়েছে সশস্ত্র প্রহরী।

'ভগীরথ বলে সে একবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল; সেখানে "গরিলা" বলে একটা জানোয়ার দেখে। এই প্রাণীর চেহারা কতকটা সেইরকম, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি লম্বা আর চওড়া। এর বেশি ভগীরথ আর কিছু বলতে পারেনি, কারণ তার পরেই সে সংজ্ঞা হারায়।'

'বুঝেছি', বলল ফেলুদা। 'দানোটা তারপর কোল্যাপসিবল গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকে, আর তখনই তোমার বিশ্বস্ত বাদশা দানোটার পায়ে কামড় দিয়ে তাকে জখম করে; এবং তার ফলেই দানব তার কাজ অসমাপ্ত রেখে পলায়ন করে।'

'কিন্তু যাবার আগে সে প্রতিশোধ নিয়ে যায়। বাদশার ঘাড় মটকানো মৃতদেহ পড়ে ছিল সদর দরজা থেকে ত্রিশ হাত দূরে—তার মুখের দুপাশে তখনো রক্ত লাগা।'

আমি মনে মনে বললাম—এই ঘটনায় যদি খুশি হবার কোনো কারণ থাকে সেটা এই যে টি-এন-টি-র উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি।

ফেলুদা চিন্তিত ভাবে চুপ করে আছে দেখে তরফদার অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কিছু বলুন, মিস্টার মিত্তির?'

'বলার সময় পেরিয়ে গেছে সুনীল', গম্ভীর স্বরে বলল ফেলুদা। 'এখন করার সময়।'

'কী করার কথা ভাবছেন?'

'ভাবছি না, স্থির করে ফেলেছি।'

'কী?'

'দক্ষিণ ভারতে যাবো। ম্যাড্রাস দিয়ে শুরু। নয়ন ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার। তার যাতে অনিষ্ট না হয় এটা দেখার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখানে প্রদোষ মিত্তিরকে প্রয়োজন।'

তরফদারের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'আপনি যে আমাকে কতটা নিশ্চিন্ত করলেন তা বলতে পারব না। আপনি অবশ্য আপনার প্রোফেশনাল ক্যাপাসিটিতে কাজ করবেন। আপনার পারিশ্রমিক আর আপনাদের তিনজনের যাতায়াত ও হোটেল খরচা আমি দেব। আমি মানে—আমার পৃষ্ঠপোষক।'

'খরচের কথা পরে। তোমাদের যাওয়ার তারিখ ত উনিশে ডিসেম্বর, কিন্তু কোন ট্রেন সেটা জানি না।'

'করোমণ্ডল এক্সপ্রেস।'

'আর হোটেল?'

'সেও করোমণ্ডল।'

'বুঝেছি। তাজ করোমণ্ডল। তাই ত?'

'হ্যাঁ, আর আপনারা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস এ-সি-তে যাচ্ছেন। এখনই আপনাদের নাম আর বয়স একটা কাগজে লিখে দিন। বাকি কাজ সব শঙ্কর করে দেবে।'

ফেলুদা বলল, 'বুকিং-এ অসুবিধা হলে আমাকে জানিও। রেলওয়েতে আমার প্রচুর জানাশোনা।'

॥ ৭ ॥

তরফদাররা গেলেন পৌনে দশটায়, তারপর ঠিক পাঁচ মিনিট বাদেই ফেলুদার একটা ফোন এল যেটা যাকে বলে একেবারে অপ্রত্যাশিত। কথা-টথা বলে সোফায় বসে শ্রীনাথের সদ্য আনা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'কাল ডিরেক্টরি খুলে দেখেছি, এই নামে শুধু দুটো ফোন আছে।'

'এইসব সামান্য ব্যাপারে আপনার সাসপেন্স তৈরি করার প্রবণতাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না, মশাই,' বললেন জটায়ু। 'কার ফোন সেটা হেঁয়ালি না করে বলবেন ?'

'হিঙ্গোরানি।'

'যার কথা কাগজে বেরিয়েছে ?'

'ইয়েস স্যার। তেওয়ারির পার্টনার।'

'এই ব্যক্তির কী দরকার আপনার সঙ্গে ?'

'সেটা ওঁর ওখানে গেলে বোঝা যাবে। ভদ্রলোক বললেন কর্নেল দালালের কাছে আমার প্রশংসা শুনেছেন।'

'ও, গতবছরের সেই জালিয়াতির মামলাটা ?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে ?'

'সেটা আমার কথা থেকেই আপনার বোঝা উচিত ছিল ; আপনি মনোযোগ দেননি।'

আমি কিন্তু বুঝেছিলাম ফেলুদার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায়। সেটা লালমোহনবাবুকে বলতে উনি বেশ রেগে গিয়ে বললেন, 'কানের কাছে অন্যে টেলিফোন করলে আমি অন প্রিন্সিপল্ তার কথা শুনি না। কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ?'

'আলিপুর পার্ক রোড।'

'বনেদি পাড়া।—আমরাও যাচ্ছি ত আপনার সঙ্গে ?'

'সেটা কবে যাননি বলতে পারেন ?'

'ঠিক কথা। ইয়ে—"আনি" দিয়ে পদবী শেষ হলে ত সিন্ধি বোঝায়,

তাই না ?'

'তা ত বটেই। দেখুন না—দু আনি ছ আনি কেরানি কাঁপানি হাঁপানি চাকরানি মেথরানি...'

'রক্ষে করুন, রক্ষে করুন!' দু হাত তুলে বললেন জটায়ু। 'বাপরে!—এ হচ্ছে আপনার মজারু-মজারু মুড। আমার খুব চেনা। কিছু জিজ্ঞেস করলেই টিটকিরির খোঁচা। যাই হোক—যেটা বলতে চাইছিলাম—ভাবছি আজ দ্বিপ্রহরের আহারটা এখানেই সারব। খিচুড়ির আইডিয়াটা কেমন লাগে? বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়েছে ত?'

'উত্তম প্রস্তাব', বলল ফেলুদা।

দুপুরে খাবার পর ফেলুদা দু'ঘণ্টা ধরে জটায়ুকে স্ক্র্যাব্‌ল খেলা শেখালো। ভদ্রলোক কোনোদিন ক্রসওয়ার্ডই করেননি। তাই ওঁকে—সিঙ্কি নামের ঢং-এই বলি—বেশ নাকানি-চোবানি খেতে হল। ফেলুদা শব্দের খেলাতে একেবারে মাস্টার, যেমন হেঁয়ালির জট ছাড়াতেও মাস্টার—যার অনেক উদাহরণ এর আগে দিয়েছি।

আলিপুর পার্ক রোড অবশ্যই হরিপদবাবুর চেনা। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমাদের গাড়ি সাঁইত্রিশ নম্বরের গেট দিয়ে ঢুকে পোর্টিকোর নীচে এসে থামল। সামনেই ডাইনে গ্যারেজ, তার বাইরে একটা লম্বা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। 'বিদেশী বলে মনে হচ্ছে?' লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন।

ফেলুদা সদর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'না। ওটার নাম কনটেসা। এখানেই তৈরি।'

সদর দরজায় দারোয়ান দাঁড়িয়ে, ফেলুদা তাকে বলল, 'আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ইতিমধ্যে বোধহয় গাড়ির শব্দ পেয়েই একটি বেয়ারা এসে হাজির হয়েছে; সে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'মিত্তর সা'ব?'

'হাম নেহী—ইনি', ফেলুদার দিকে দেখিয়ে বললেন জটায়ু।

'আইয়ে আপ লোগ।'

বেয়ারার পিছন পিছন আমরা একটা ড্রইং রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

'বৈঠিয়ে।'

আমি আর জটায়ু একটা সোফায় বসলাম। ফেলুদা তৎক্ষণাৎ না বসে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখে একটা বুক সেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেয়ালে আর টেবিলে শোভা পাচ্ছে এমন খুঁটিনাটির মধ্যে অনেক নেপালী জিনিস রয়েছে। লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, 'দার্জিলিং'।

'কেন, দার্জিলিং কেন?' ফিরে এসে আরেকটা সোফায় বসে বলল ফেলুদা। 'নেপালি জিনিস কি নেপালে পাওয়া যায় না?'

॥ ৭ ॥

তরফদাররা গেলেন পৌনে দশটায়, তারপর ঠিক পাঁচ মিনিট বাদেই ফেলুদার একটা ফোন এল যেটা যাকে বলে একেবারে অপ্রত্যাশিত। কথা-টথা বলে সোফায় বসে শ্রীনাথের সদ্য আনা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'কাল ডিরেক্টরি খুলে দেখেছি, এই নামে শুধু দুটো ফোন আছে।'

'এইসব সামান্য ব্যাপারে আপনার সাসপেন্স তৈরি করার প্রবণতাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না, মশাই,' বললেন জটায়ু। 'কার ফোন সেটা হেঁয়ালি না করে বলবেন?'

'হিঙ্গোরানি।'

'যার কথা কাগজে বেরিয়েছে?'

'ইয়েস স্যার। তেওয়ারির পার্টনার।'

'এই ব্যক্তির কী দরকার আপনার সঙ্গে?'

'সেটা ওঁর ওখানে গেলে বোঝা যাবে। ভদ্রলোক বললেন কর্নেল দালালের কাছে আমার প্রশংসা শুনেছেন।'

'ও, গতবছরের সেই জালিয়াতির মামলাটা?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে?'

'সেটা আমার কথা থেকেই আপনার বোঝা উচিত ছিল; আপনি মনোযোগ দেননি।'

আমি কিন্তু বুঝেছিলাম ফেলুদার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায়। সেটা লালমোহনবাবুকে বলতে উনি বেশ রেগে গিয়ে বললেন, 'কানের কাছে অন্যে টেলিফোন করলে আমি অন প্রিন্সিপল্ তার কথা শুনি না। কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?'

'আলিপুর পার্ক রোড।'

'বনেদি পাড়া।—আমরাও যাচ্ছি ত আপনার সঙ্গে?'

'সেটা কবে যাননি বলতে পারেন?'

'ঠিক কথা; ইয়ে—"আনি" দিয়ে পদবী শেষ হলে ত সিন্ধি বোঝায়,

তাই না ?'

'তা ত বটেই। দেখুন না—দু আনি ছ আনি কেরানি কাঁপানি হাঁপানি চাকরানি মেথরানি...'

'রক্ষে করুন, রক্ষে করুন!' দু হাত তুলে বললেন জটায়ু। 'বাপ্‌রে!—এ হচ্ছে আপনার সজারু-মজারু মুড। আমার খুব চেনা। কিছু জিজ্ঞেস করলেই টিট্‌কিরির খোঁচা। যাই হোক্—যেটা বলতে চাইছিলাম—ভাবছি আজ দ্বিপ্রহরের আহারটা এখানেই সারব। খিচুড়ির আইডিয়াটা কেমন লাগে? বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়েছে ত?'

'উত্তম প্রস্তাব', বলল ফেলুদা।

দুপুরে খাবার পর ফেলুদা দু'ঘণ্টা ধরে জটায়ুকে স্ক্র্যাব্‌ল খেলা শেখালো। ভদ্রলোক কোনোদিন ক্রসওয়ার্ডই করেননি। তাই ওঁকে—সিঙ্কি নামের ঢং-এই বলি—বেশ নাকানি-চোবানি খেতে হল। ফেলুদা শব্দের খেলাতে একেবারে মাস্টার, যেমন হেঁয়ালির জট ছাড়াতেও মাস্টার—যার অনেক উদাহরণ এর আগে দিয়েছি।

আলিপুর পার্ক রোড অবশ্যই হরিপদবাবুর চেনা। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমাদের গাড়ি সাঁইত্রিশ নম্বরের গেট দিয়ে ঢুকে পোর্টিকোর নীচে এসে থামল। সামনেই ডাইনে গ্যারেজ তার বাইরে একটা লম্বা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। 'বিদেশী বলে মনে হচ্ছে?' লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন।

ফেলুদা সদর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'না। ওটার নাম কনটেসা। এখানেই তৈরি।'

সদর দরজায় দারোয়ান দাঁড়িয়ে, ফেলুদা তাকে বলল, 'আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ইতিমধ্যে বোধহয় গাড়ির শব্দ পেয়েই একটি বেয়ারা এসে হাজির হয়েছে; সে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'মিত্তর সা'ব?'

'হাম নেহী—ইনি', ফেলুদার দিকে দেখিয়ে বললেন জটায়ু।

'আইয়ে আপ লোগ।'

বেয়ারার পিছন পিছন আমরা একটা ড্রইং রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

'বৈঠিয়ে।'

আমি আর জটায়ু একটা সোফায় বসলাম; ফেলুদা তৎক্ষণাৎ না বসে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখে একটা বুক সেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেয়ালে আর টেবিলে শোভা পাচ্ছে এমন খুঁটিনাটির মধ্যে অনেক নেপালী জিনিস রয়েছে। লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, 'দার্জিলিং'।

'কেন, দার্জিলিং কেন?' ফিরে এসে আরেকটা সোফায় বসে বলল ফেলুদা। 'নেপালি জিনিস কি নেপালে পাওয়া যায় না?'

'আরে সে তো নিউ মার্কেটেই পাওয়া যায়।'

বাইরে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো গ্র্যান্ডফাদার ক্লক দেখেছি, এবার তাতে গম্ভীর অথচ মোলায়েম শব্দে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজতে শুনলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খয়েরি রঙের সুট পরা একজন রোগা, ফরসা, প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। কেন জানি মনে হল ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যটা খুব ভালো যাচ্ছে না—বোধহয় চোখের তলায় কালির জন্য।

আমরা তিনজনেই নমস্কার করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বসুন বসুন—প্লীজ সিট ডাউন।'

ভদ্রলোকের ঘড়ির ব্যান্ডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে, কারণ নমস্কার করে হাত নামাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা সড়াৎ করে নীচে নেমে এল। ডান হাত দিয়ে ঠেলে সেটাকে যথাস্থানে এনে ভদ্রলোক ফেলুদার উল্টোদিকের সোফায় বসলেন। বাংলা ইংরিজি হিন্দি মিশিয়ে কথা বললেন হিঙ্গোরানি।

ফেলুদা নিজের এবং আমাদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দেবার পর ভদ্রলোক বললেন, 'আমার আপিসের যে খবর কাগজে বেরিয়েছে সে কি আপনি পড়েছেন?'

'পড়েছি', বলল ফেলুদা।

'আমি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করি। আমাকে যে ভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে তাকে গ্রহের ফের ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমার পার্টনারের ভীমরতি ধরেছে; কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক লোক কখনো এমন করতে পারে না।'

'আমরা কিন্তু আপনার পার্টনারকে চিনি।'

'হাউ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন হিঙ্গোরানি।

ফেলুদা সংক্ষেপে তরফদার আর জ্যোতিষের ব্যাপারটা বলে বলল, 'এই ছেলের ব্যাপারেই তেওয়ারি ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তরফদারের বাড়ি এসেছিলেন; আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভদ্রলোক বললেন তাঁর সিন্দুকের কম্বিনেশনটা ভুলে গেছেন। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলে দেয়, আর সেই সঙ্গে এটাও বলে যে সিন্দুকে আর একটি পাই-পয়সাও নেই।'

'আই সী...'

'আপনি ফোনে বললেন আপনাকে খুব বিব্রত হতে হচ্ছে?'

'তা ত বটেই। প্রথমত, বছর খানেক থেকেই আমাদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, যদিও এককালে আমরা বন্ধু ছিলাম। আমরা একসঙ্গে এক ক্লাসে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তাম। কলেজ ছাড়ার বছর খানেকের মধ্যেই আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবসা শুরু করি। তারপর ১৯৭৩-এ আমরা এক জোটে টি- এইচ- সিন্ডিকেটের পত্তন করি। বেশ ভালো চলছিল কিন্তু ওই যে বললাম—কিছুদিন থেকে দুজনের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল।'

'সেটার কারণ কী ?'

'প্রধান কারণ হচ্ছে—তেওয়ারির স্মরণশক্তি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। সামান্য জিনিসও মনে রাখতে পারে না। ওকে নিয়ে মিটিং করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত বছর একদিন আমি তেওয়ারিকে বলি—"ডাঃ শর্মা বলে একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ মস্তিষ্ক চিকিৎসক আছেন। তাঁকে আমি খুব ভালো করে চিনি। আমি চাই তুমি একবার তাঁর কাছে যাও।"—তাতে তেওয়ারি ভয়ানক অফেন্স নেয়। সেই থেকেই আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। অথচ আমি হাল না ধরলে সিন্ডিকেট ডুবে যাবে শুধু এই কথা ভেবেই আমি রয়ে গিয়েছিলাম। না হলে আইনসম্মত ভাবে পার্টনারশিপ চুকিয়ে দিয়ে চলে আসতাম। কিন্তু যে ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেলাম সেটা এই যে, তেওয়ারি যেই জানতে পারল যে ওর সিন্দুক খালি, ও সটান আমার কাছে এসে বলল, "গিভ মি ব্যাক মাই মানি—দিস মিনিট।"'

'উনি যে ক্লেম করেন যে এককালে আপনাকে কম্বিনেশনটা বলেছিলেন সেটা কি সত্যি ?'

'সর্বৈব মিথ্যা। ওটা ছিল ওর পার্সোনাল সিন্দুক। তার কম্বিনেশন ও পাঁচজনকে বলে বেড়াবে ? ননসেন্স। তাছাড়া ওর ধারণা যে ও যখন ডেন্টিস্টের কাছে যায় তখনই আমি ওর সিন্দুক খুলে টাকা চুরি করি। অথচ আমার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে সেই সময়টা আমি ছিলাম আপিস থেকে অন্তত চার মাইল দূরে। আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে খবর পেয়ে আমি এগারটার সময় বেলভিউ ক্লিনিকে চলে যাই, ফিরি সাড়ে তিনটেয়।'

'তাও মিঃ তেওয়ারি আপনার পিছনে লেগে আছেন ?'

'শুধু পিছনে লেগেছেন নয় মিস্টার মিটার, তিনি আমাকে শাসিয়েছেন যে অবিলম্বে টাকা ফেরত না দিলে তিনি আমার সর্বনাশ করবেন। তেওয়ারি যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতদূর যেতে পারে তার বেশ কিছু নমুনা আমি গত সতের বছরে পেয়েছি। গুণ্ডা লাগিয়ে কী করা সম্ভব-অসম্ভব সে আর আমি আপনাকে কী বলব ?'

'আপনি বলতে চান তেওয়ারি এতই প্রতিহিংসোপরায়ণ যে গুণ্ডা লাগিয়ে আপনাকে খুন করানোতেও সে পেছপা হবে না ?'

'সিন্দুকে কিছু নেই জানার পরমুহূর্তে সে যেভাবে আমার ঘরে এসে আমার উপর দোষারোপ করে, তাতে আমি পরিষ্কার বুঝি যে তার কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। এ অবস্থায় টাকা ফেরত না পেলে আমার উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

'এই চুরি সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনো থিওরি আছে ?'

'প্রথমত, চুরি যে গেছে সেটাই আমি বিশ্বাস করি না। তেওয়ারি হয়

সেটা সরিয়েছে, না হয় কিছুতে খরচ করেছে, না হয় কাউকে দিয়েছে। তোমরা বাঙলায় যে বল না—ব্যোম ভোলানাথ ?—তেওয়ারি হল সেই ভোলানাথ। না হলে বাইশ বছরের পুরোন ব্যক্তিগত সিন্দুকের কম্বিনেশন কেউ ভোলে ?'

'বুঝলাম', বলল ফেলুদা। 'এবার তাহলে আসল কথায় আসা যাক।'

'কেন আমি আপনাকে ডেকেছি সেটা জানতে চাইছেন ত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেখুন মিঃ মিটার—আমি চাই প্রোটেকশন। তেওয়ারি নিজে ভোলানাথ হতে পারে, কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডাদের কেউই ভোলানাথ নয়। তারা অত্যন্ত সেয়ানা, ধূর্ত, বেপরোয়া। এই জাতীয় প্রোটেকশনের কাজ ত আপনাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মধ্যে পড়ে ; তাই না ?'

'তা পড়ে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, আমি সামনে প্রায় পাঁচ সপ্তাহের জন্য থাকছি না। ফলে আমার কাজ শুরু করতে ত অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাতে আপনার চলবে কি ?'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'দক্ষিণ ভারত। প্রথমে ম্যাড্রাস। সেখানে দশদিন, তারপর অন্যত্র।'

হিঙ্গোরানির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'এক্সেলেন্ট !' হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে একটা কথা এখনও বলা হয়নি—আমি দুদিন থেকে আর আপিসে যাচ্ছি না। যা ঘটেছে তার পরে আর কোনোমতেই ওখানে থাকা যায় না। আইনত যা করার তা আমি যথাসময়ে করব—যখন মাথা ঠাণ্ডা হবে। অথচ রোজগার ত করতেই হবে। ম্যাড্রাসে একটা কাজের সম্ভাবনা আছে সে খবর আমি পেয়েছি। আমি এমনিতেই যেতাম। আপনারা গেলে এক সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব। আপনি প্লেনে যাচ্ছেন ?'

'না, ট্রেনে। এখানেও একজনকে প্রোটেক্ট করার ব্যাপার আছে। ত্তরফদারের ম্যাজিক শোয়ের ওই বালক। তারও জীবন বিপন্ন। অন্তত তিনজন ব্যক্তির লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে ওর উপর। বুঝতেই ত পারছেন, এমন আশ্চর্য ক্ষমতাকে অসদুদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর অজস্র উপায় আছে।'

'বেশ ত,' বললেন হিঙ্গোরানি, 'আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মারুন। আপনি ত এই যাদুকরের জন্য প্রোফেশনালি কাজ করছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা আমার বেলাতেও করুন, আমিও আপনাকে পারিশ্রমিক দেবো।'

ফেলুদা অফারটা নিয়ে নিল। তবে বলল, 'এটা জেনে রাখবেন যে শুধু আমার প্রোটেকশনে হবে না। আপনাকেও খুব সাবধানে চলতে হবে।

আর সন্দেহজনক কিছু হলেই আমাকে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই। আপনি কোথায় থাকবেন?'

'হোটেল করোমণ্ডল। আমরা একুশে পৌঁছচ্ছি।'

'বেশ। ম্যাড্রাসেই দেখা হবে।'

বাড়ি ফেরার পথে আমি বললাম, 'আচ্ছা ফেলুদা, ড্রইং রুমের দুদিকের দেয়ালে দুটো বেশ বড় বড় রেক্ট্যাঙ্গুলার ছাপ দেখলাম—অনেক দিনের টাঙানো ছবি তুলে ফেললে যেমন হয়।'

'গুড অবজারভেশন', বলল ফেলুদা। 'বোঝাই যাচ্ছে ও জায়গায় দুটো বাঁধানো ছবি ছিল—সম্ভবত অয়েল পেন্টিং।'

'সেগুলো যে আর নেই,' বললেন জটায়ু, 'সেটার কোনো সিগনিফিক্যান্স আছে কি?'

'বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক ছবিগুলো পাচার করে দিয়েছেন।'

'তার সিগনিফিকান্স?'

'সাতশো ছেষট্টি রকম সিগনিফিক্যান্স। সব শোনার সময় আছে কি আপনার?'

'আবার সজারু!—আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে আপনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না।'

'সেটার সময় এখনো আসেনি, লালমোহনবাবু। তথ্যটা আমার মস্তিষ্কের কম্পিউটারের মেমারিতে পুরে দিয়েছি। প্রয়োজনে বোতাম টিপলেই ফিরে পাব।'

'আপনি যে এই হিঙের কচুরির কেসটাও নিলেন—দুদিক সামলাতে পারবেন ত?'

ফেলুদা কোনো উত্তর না দিয়ে ভাসা-ভাসা চোখে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল 'খট্‌কা… খট্‌কা… খট্‌কা…'

॥ ৮ ॥

পরদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি তরফদার সম্বন্ধে খবর বেরিয়েছে যে উনি উনিশে ডিসেম্বর দলবল নিয়ে দক্ষিণ ভারত সফরে যাচ্ছেন, পঁচিশে ডিসেম্বর ম্যাড্রাসে ওঁর প্রথম শো।

ফেলুদা চুল ছাঁটাতে গিয়েছিল, দশটা নাগাত ফিরল। ওকে খবরটার কথা বলতে ও গম্ভীরভাবে বলল, 'দেখেছি।... আত্মপ্রচারের লোভ খুব কম লোকেই সামলাতে পারে রে, তোপসে! আমি একটু নরম-গরম কথা শোনাবো বলে ওকে ফোন করেছিলাম,কারণ—বুঝতেই ত পারছিস—এই খবর বেরোনর ফলে আমার কাজটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে।'

'তরফদার কী বললেন?'

ফেলুদা একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'বলে কি—আজকের দিনে শোম্যানদের পাবলিসিটি ছাড়া গতি নেই, মিস্টার মিত্তির। ও নিয়ে আপনি কাইন্ডলি আমাকে কিছু বলবেন না।... আমি বললাম— যে-তিনজন ব্যক্তি নয়নের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিচ্ছে, তারা যে তোমার প্রোগ্রামটা জেনে গেল সেটা কি ভালো হল?— তাতে ছোক্‌রা বলল— আপনি চিন্তা করবেন না! আমি যে ভাবে ওদের বলেছি, আমার বিশ্বাস তাতে ওরা নয়নকে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছে। —এর পর আর কী বলি বল? সত্যি যদি তাই হয় তাহলে ত আমার আর কোনো প্রয়োজনই থাকে না। কিন্তু আমি ত জানি যে নয়নের বিপদ—এবং সেই সঙ্গে আমার দায়িত্ব—এখনো পুরোমাত্রায় রয়েছে! অর্থাৎ আমার দিক থেকে কাজে ঢিলে দেবার কোনো প্রশ্নই আসে না।'

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ, আর তার পরে পর পর দুবার কলিং বেল টেপার শব্দে বুঝলাম জটায়ু হাজির। এখন সোয়া দশটা; ভদ্রলোক সাধারণত নটা-সাড়ে নটার মধ্যে চলে আসেন। আজ কোনো কারণে দেরি হয়েছে।

দেখে ভালো লাগল যে ফেলুদার মুখ থেকে মেজাজ খিঁচড়োনো ভাবটা চলে গেল।

'খবর আছে মশাই, খবর আছে!' ঘরে ঢুকেই চোখ বড় বড় করে

বললেন জটায়ু।

'দাঁড়ান, দেখি আমি কতদূর আন্দাজ করতে পারি,' বলল ফেলুদা। 'আপনি নিউ মার্কেটে গেসলেন। ঠিক?'

'কী করে জানলেন?'

'আপনার কোটের বুক পকেট থেকে আইডিয়াল স্টোর্সের ক্যাশমেমোর ইঞ্চি খানেক বেরিয়ে আছে। তাছাড়া আপনার কোটের বাঁ দিকের সাইড পকেট এমনভাবে ঝুলে ফুলে রয়েছে যে বোঝাই যাচ্ছে আপনার প্রিয় টুথপেস্ট ফরহ্যানসের একটি ফ্যামিলি সাইজ টিউবের প্যাকেট রয়েছে ওখানে।'

'বোঝো! —নেক্সট?'

'আপনি রেস্টোরান্টে গিয়ে স্ট্রবেরি আইসক্রিম খেয়েছিলেন—তার দু' ফোঁটা আপনার সার্টে পড়েছে।'

'সাবাশ! —নেক্সট?'

'আপনি একা কখনো রেস্টোরান্টে জান না। অর্থাৎ একটি পরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যার সঙ্গে আপনি যান।'

'জবাব নেই! —নেক্সট?'

'আপনি তাকে নিয়ে যান নি, সেই আপনাকে নিয়ে গেস্‌ল। কারণ আপনাকে এতকাল চিনে অন্তত এটুকু জানি যে আপনার এমন কোনো বন্ধু এখন নেই যাকে আপনি রেস্টোরান্টে নিয়ে গিয়ে আইসক্রিম খাওয়াবেন।'

'আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে! —নেক্সট?'

'এ ব্যক্তির সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে আপনার। পুরোনো আলাপী বলতে আমরা দুজন ছাড়া আপনারে আর কেউ নেই। তরফদার কী? না। তার এত সময় নেই; সে এখন সফরের তোড়জোড় করছে। চতুর্বেদীর কেউ কি? হজসন নন, কারণ সে ইনভাইট করলে আপনি রিফিউজ করবেন—একটানা ইংরিজি বলাটা আপনার পারদর্শিতার মধ্যে পড়ে না। তারকনাথ? উঁহু,তাঁর নিউ মার্কেটে কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না; উত্তর কলকাতায় দোকানের অভাব নেই। আর তাছাড়া আমার ধারণা তাঁর বাজার করার জন্য মাইনে করা লোক আছে। তাহলে বাকি রইল কে?'

'ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট! আপনি ধরে ফেলেছেন, ফেলুবাবু, ধরে ফেলেছেন! অনেকদিন পরে আপনার চিন্তাশক্তি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নমুনা পাওয়া গেল। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!'

'বসাক ত?'

'বসাক, বসাক— নন্দলাল বসাক! আজ প্রথম পুরো নামটা জানলুম।'

'আপনার সঙ্গে তাঁর কী কথা?'

'কথা ভালো নয়, ফেলুবাবু। ভদ্রলোক তরফদারকে আরো দশ হাজার ডলার অফার করেছিলেন। তার মানে ত্রিশ। আজকাল এক ডলারে কত টাকা?'

'সতেরোর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।'

'হিসেব করুন, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।'

'তরফদার কী বলেন?'

'তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তার ফলে বসাকের মেজাজ খিচড়ে যায়। তরফদারকে কিছু বলেননি, তবে আমাকে বললেন—আপনি ওই ভেলকিরামকে বলে দেবেন যে বসাকের সংকল্পে ব্যাগড়া দেবে এমন লোক এখনো জন্মায়নি। শেষের কথাগুলো আরো সাংঘাতিক ; বললেন—বড়দিনে মাদ্রাজে তরফদারের শো ওপ্‌ন করছে ; ইফ মাই নেম ইজ নন্দ বসাক—তাহলে সেই শো থেকে ওই খোকার আইটেম বাদ দিতে হবে। টেল দিস টু ইওর টিকটিকি ফ্রেন্ড।'

ফেলুদার চেহারার সঙ্গে অনেক বাঙালীই পরিচিত, কাজেই বসাক যে তাকে চিনে ফেলবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু কেন জানি আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'বসাকের হদিস ত তবু পাওয়া গেল', বলল ফেলুদা, 'তেওয়ারি ইজ আউট অফ দ্য পিকচার। এখন বাকি তারকনাথ আর হুকসন।'

তারকনাথ কেন—গাওয়াঙ্গি বলুন! তারকনাথ খ্যাপাটে হতে পারেন, কিন্তু তাঁর যা বয়স তাতে তিনি একা কিছু করতে পারবেন না।'

একেই ফেলুদা বলে টেলিপ্যাথি। তারকনাথের কথা ওঠার মিনিট খানেকের মধ্যেই কলিং বেল বাজায় দরজা খুলে দেখি স্বয়ং টি· এন· টি·।

'মিঃ মিত্তির আছেন?'

'আসুন, আসুন,' ভিতর থেকে বলল ফেলুদা। 'আপনিও দেখছি আমায় চিনে ফেলেছেন।'

'তা চিনব না কেন?' ঘরে ঢুকে একটা কাউচে বসে বললেন ভদ্রলোক। 'আর আপনাকে যখন চিনেছি, তখন আপনার এই স্যাংবোটটিকেও চিনেছি। আপনিই ত জটায়ু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'একবার ভেবেছিলাম আপনাকেও আমার আজব ঘরে এনে রাখব, কারণ গাঁজাখুরি গপ্পো লেখায় ত আপনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌! "হন্ডুরাসে হাহাকার"— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

ভদ্রলোকের এই ঘর-কাঁপানো হাসির সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় হল।

'তাহলে আপনার সঙ্গে মাদ্রাজে দেখা হচ্ছে?' ফেলুদার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন তারক ঠাকুর।

'আপনি যাওয়া স্থির করে ফেলেছেন ?'

'শুধু আমি কেন ? আমার ইউগ্যান্ডার অপোগণ্ডটিও যাবেন ! হাঃ হাঃ হাঃ —কেমন ? ভালো হয়েছে ? জটায়ু ?'

'আপনি ট্রেনে যাচ্ছেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তাছাড়া ত উপায় নেই। প্লেনের সীটে ত গাওয়াঙ্গি বসতেই পারবে না !'

আরেক দফা হো হো করে হেসে ভদ্রলোক উঠে পড়ে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলি মিঃ মিত্তির—এমন অনেক সিচুয়েশান আছে যেখানে শারীরিক শক্তির কাছে মানসিক শক্তি দাঁড়াতেই পারে না। গাওয়াঙ্গির চেয়ে আপনার বুদ্ধি যে অনেক গুণে বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলেও, গাওয়াঙ্গির যে শারীরিক বল, তার শতাংশের একাংশও আপনার নেই। —গুড বাই।'

ভদ্রলোক যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনিই হঠাৎ চলে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম—এই গাওয়াঙ্গি বস্তুটিকে একবার চাক্ষুষ দেখতেই হবে।

॥ ৯ ॥

স্টেশন থেকে হোটেলে আসার পথে মাদ্রাজের চেহারা দেখে জটায়ু বললেন, 'মশাই, এই শহরের নাম কলকাতা বম্বে দিল্লির সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয় কেন তার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। পশ্চিমবাংলার যে কোনো মফঃস্বল টাউন এর চেয়ে বেশি গমগমে। তাছাড়া ডিসেম্বর মাসে গরমটা কিরকম দেখেছেন? আর ইয়ে—আমরা যে-হোটেলে যাচ্ছি সেখানে দিশি বিদেশি সব রকম খাবার পাওয়া যায় ত? মাদ্রাজী মেনুতে শুনিচি শুধু তিনটে নাম থাকে। আমি খাইয়ে না হতে পারি, কিন্তু যা খাবো, সেটা মুখরোচক না হলে আমার সাধ মেটে না।'

আমার কিন্তু শহরটা খারাপ লাগছিল না, যদিও গমগমে ভাবটা একেবারেই নেই। অনেক দিন পরে একটা বড় শহরে এসে চারিদিকে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বাড়ির ভিড় নেই দেখে অদ্ভুত লাগছিল। রাস্তা দিব্যি ভালো—এখন পর্যন্ত একটা গাড্ডাও পাইনি; আর যেটা পাইনি সেটা হল ট্র্যাফিক জ্যাম। তা সত্ত্বেও লালমোহনবাবু কেন মুখ বেজার করে আছেন জানি না।

'বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কথা ত কয়েকবার বলিচি আপনাদের', হঠাৎ বললেন জটায়ু।

'আপনার সেই এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের কবি?'

'কবি অ্যান্ড পর্যটক। ভ্রমণের নেশা ছিল ভদ্রলোকের।'

'উনি কি মাদ্রাজেও এসেছিলেন?'

'সার্টেনলি।'

'মাদ্রাজ নিয়ে পদ্য আছে ওঁর?'

'সার্টেনলি। জাস্ট সিক্স লাইনস্। শুনুন—

বড়ই হতাশ হয়েছি আজ
তোমারে হেরিয়ে মাদ্রাজ!—
ভাষা হেথা দুর্বোধ্য তামিল
অন্য ভাষার সাথে নেই কোনো মিল—

ইডলি আর দোসা খেয়ে তৃপ্তিবে রসনা ?
ওরে বাবা, এ শহরে কেউ কভু এস না !

'তৃপ্তিবে ?' ভুরু কুঁচকে বলল ফেলুদা।

'হোয়াই নট ? মল্লিকের উপর মাইকেলের দস্তুরমতো প্রভাব ছিল। তৃপ্তিবে হল নামধাতু। আপনি গোয়েন্দা তাই হয়ত জানেন না ; আমরা সাহিত্যিকরা জানি। বলছি না—হাইলি ট্যালেন্টেড। পোড়া দেশ বলে কল্কে পেলেন না।'

আমি দেখেছি বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কথা বলতে গেলেই জটায়ু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, আর এতটুকু সমালোচনা করলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। আমি আর ফেলুদা তাই চুপ মেরে গেলাম।

এই ফাঁকে বলে রাখি যে ট্রেনে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। তরফদার, শঙ্করবাবু আর নয়ন এ· সি· ফার্স্ট ক্লাসে আমাদের এক বোগীতেই ছিলেন। দলের বাদবাকি সব ছিল সেকেন্ড ক্লাসে। যে তিনজনকে নিয়ে চিন্তা—হুজসন, তারকনাথ আর বসাক—তারা কেউ এ ট্রেনে এসে থাকলেও আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। মাড্রাস সেন্ট্রালে নেমেও এদের কাউকে দেখিনি হিঙ্গোরানি আজ রাত্রেই প্লেনে আসছেন, আর আমাদের হোটেলেই থাকবেন।

করোমণ্ডলের ঝলমলে লবিতে ঢুকে লালমোহনবাবুর মুখে প্রথম হাসি দেখা দিল। এদিকে ওদিকে দেখে বললেন, 'নাঃ,অনবদ্য মশাই,অনবদ্য ! ইডলি-দোসার দেশে এ জিনিস ভাবাই যায় না।'

ট্রেনেই আলোচনা করে ঠিক হয়েছে যে আমরা প্রথম তিনটে দিন একটু ঘুরে দেখব। সঙ্গে অবশ্য নয়ন আর তরফদারও থাকবে। ফেলুদা বলেছে—'আমরা এলিফ্যান্টা দেখেছি, এলোরা দেখেছি, উড়িষ্যার মন্দির দেখেছি—মাদ্রাজে এসে মহাবলীপুরম দেখলে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নমুনাটা দেখা হয়ে যাবে। তোপ্‌সে, তুই গাইডবুকটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিস। কতগুলো তথ্য জানা থাকলে দেখতে আরো ভালো লাগবে।'

রাত্রে নটার মধ্যে ডাইনিং রুমে গিয়ে মোগলাই খানা খেয়ে ঠাণ্ডা ঘরে দিব্যি আরামে ঘুম দিলাম। পরদিন সকালে উঠে ফেলুদা বলল, 'একবার তরফদারের খোঁজটা নেওয়া দরকার।'

আমরা দুজন আমাদের চার তলার ৪৩৩ নম্বর ঘর থেকে তিন তলার ৩৮২ নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে দরজার বেল টিপলাম।

দরজা খুলে দিলেন তরফদার নিজেই। ঘরে ঢুকে দেখি শঙ্করবাবুও রয়েছেন, আর আরেকটি ভদ্রলোক, যাকে দেখলেই মাদ্রাজী বলে বোঝা যায়। কিন্তু নয়নকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

'গুড মর্নিং মিঃ মিত্তির,' একগাল হেসে বললেন তরফদার। 'ইনি মিঃ রেড্ডি। এঁর রোহিণী থিয়েটারেই আমার শো। বলছেন প্রচুর এনকোয়ারি আসছে। এঁর ধারণা, দুর্দান্ত সেল হবে।'

'নয়ন কই?' তরফদারের কথাগুলো যেন অগ্রাহ্য করেই জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'এখানকার সবচেয়ে নামী কাগজ "হিন্দু"-র একজন রিপোর্টার নয়নকে ইন্টারভিউ করছে,' বললেন তরফদার। 'এর ফলে আমাদের দারুণ পাবলিসিটি হবে।'

'কিন্তু কোথায় হচ্ছে সে ইন্টারভিউ?'

'হোটেলের ম্যানেজার নিজে একতলার কনফারেন্স রুমে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এও বলা আছে বাইরের কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। তাছাড়া—'

তরফদারের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল হোটেলের করিডর দিয়ে—আমি পিছনে।

লিফ্‌ট না নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নামলাম আমরা—ফেলুদা সমানে দাঁতে দাঁত চেপে হিন্দি, ইংরিজি ও বাংলায় তরফদারের উদ্দেশে গালি দিয়ে চলেছে।

নীচে পৌঁছে একজন বেয়ারাকে সামনে পেয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'হোয়্যার ইজ দ্য কনফারেন্স রুম?'

বেয়ারা দেখিয়ে দিল, আমরা হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। তার মাঝখানে লম্বা টেবিলের দুপাশে আর দু'মাথায় সারি সারি চেয়ার। একটা চেয়ারে নয়ন বসে আছে, তার পাশের চেয়ারে একজন দাড়িওয়ালা লোক নোটবই খুলে ডট পেন হাতে নিয়ে নয়নের সঙ্গে কথা বলছে।

ফেলুদা তিন সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল। তারপর ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে এক টানে রিপোর্টারের গাল থেকে দাড়ি, আর আরেক টানে ঠোঁটের উপর থেকে গোঁফ খুলে ফেলল।

অবাক হয়ে দেখলাম ছদ্মবেশের তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন হেনরি হজসন।

'গুড মর্নিং!' উঠে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ হাসি হেসে বললেন হজসন।

ফেলুদা নয়নের দিকে ফিরল।

'উনি কী জিজ্ঞেস করছিলেন তোমাকে?'

'ঘোড়ার কথা।'

'আমার কাজ এখানে শেষ হলেও আমার আপসোস নেই,' বললেন হজসন। 'আগামী তিন দিনের সব কটা রেসের উইনিং হর্সের নম্বর আমি জেনে নিয়েছি। আমি এখন বেশ কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। গুড ডে

স্যার ?'

হজসন গটগটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা কপালে হাত দিয়ে ধপ্ করে হজসনের চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে গভীর বিরক্তির সুরে বলল, 'নয়ন, এবার থেকে কোনো বাইরের লোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তুমি বলবে—ফেলুকাকা সঙ্গে থাকলে বলব, না হলে নয়। বুঝেছ ?'

নয়ন মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সে বুঝেছে।

আমি বললাম, 'তবে একটা কথা ফেলুদা—হজসন আর জ্বালাবে না ; সে এখন কলকাতায় ফিরে গিয়ে রেস খেলবে।'

'সেটা ঠিক, কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের যাদুকরটি কত দায়িত্বজ্ঞানহীন। ম্যাজিশিয়ানদের এর চেয়ে বেশি কমনসেন্স থাকা উচিত।'

আমরা নয়নকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলাম তরফদারের ঘরে।

'চমৎকার পাবলিসিটি হবে তোমার !' শ্লেষমাখানো সুরে তরফদারকে বলল ফেলুদা। 'নয়ন কাকে ইন্টারভিউ দিচ্ছিল জানো ?'

'কাকে ?'

'মিস্টার হেনরি হজসন।'

'ওই দাড়িওয়ালা— ?'

'হ্যাঁ, ওই দাড়িওয়ালা। তার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। এই যদি তোমার আক্কেলের নমুনা হয় তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারব না। তোমার অনুমান যে ভুল সে তো দেখতেই পাচ্ছ ; হজসন যদি ম্যাড্রাস অবধি ধাওয়া করতে পারে তাহলে অন্য দুজনই বা করবে না কেন ? আমি জানি যে বিপদের আশঙ্কা এখনো পুরোমাত্রায় রয়েছে। এ অবস্থায় আমি যা বলছি, তা তোমাকে মানতেই হবে।'

'বলুন স্যার,' হেঁট মাথা চুলকে বললেন তরফদার।

'মিঃ রেড্ডির তরফ থেকে যেটুকু পাবলিসিটি না করলেই নয়, সেটুকু তিনি করবেন ; কিন্তু তোমরা—তুমি বা শঙ্কর পাবলিসিটির ধারে-কাছেও যাবে না। প্রেস পীড়াপীড়ি করলেও তাদের কাছে তোমরা মুখ খুলবে না। তোমার এই সফর যদি সাক্সেসফুল হয়, তাহলে সেটা হবে নয়নের জোরে, তোমাদের পাবলিসিটির জোরে নয়। বুঝেছ ?'

'বুঝেছি স্যার।'

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে লালমোহনবাবুকে ঘটনাটা বলতে উনি বললেন, 'ঠিক এইটেরই দরকার ছিল। ভয় হচ্ছিল যে মাদ্রাজে এসে বুঝি কেসটা থিতিয়ে যাবে। তা নয়—এখন আবার দিব্যি জমে উঠেছে।'

ঠিক হয়েছিল দশটার সময় আমরা দুটো ট্যাক্সি নিয়ে বেরোব। মহাবলীপুরম আজ নয়, কাল। আজ যাব স্নেক পার্ক দেখতে। হুইটেকার

নামে এক আমেরিকানের কীর্তি এই স্নেক পার্ক। গাছপালায় ভরা পার্কও বটে, আবার সেই সঙ্গে সাপের ডিপোও বটে।

যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, লালমোহনবাবু অলরেডি তৈরী হয়ে আমাদের ঘরে এসে হাজির, এমন সময় দরজার বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি মিঃ হিঙ্গোয়ানি।

'মে আই কাম ইন?'

টি- ভি-টা খোলা ছিল, যদিও দেখবার মতো কিছুই হচ্ছিল না, ফেলুদা সেটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—প্লীজ কাম ইন।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাউচে বসে বললেন, 'সো ফার—নো ট্রাবল।'

'এ তো সুসংবাদ,' বলল ফেলুদা।

'আমার বিশ্বাস তেওয়ারি আমার ম্যাড্রাসে আসার খবরটা জানে না। আমি কাউকে না বলে চলে এসেছি।'

'আপনি নিজে সাবধানে আছেন ত?'

'তা আছি।'

'একটা কথা আমি খুব জোর দিয়ে বলছি—আপনি যখন ঘরে থাকবেন, তখন কেউ বেল টিপলে আপনি নাম জিজ্ঞেস করে গলা চিনে তারপর দরজা খুলবেন, তার আগে নয়।'

হিঙ্গোরানি কিছু বলার আগেই আমাদের দরজার বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি নয়নকে নিয়ে তরফদার হাজির।

'এসো ভিতরে,' বলল ফেলুদা।

'এই সেই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন বালক কি?' দুজনে ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলেন হিঙ্গোয়ানি।

ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি তার ঠোঁটের কোণে হাসি।

'আপনার সঙ্গে এই দুজনের পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন আছে কি?' হিঙ্গোরানিকে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'মিঃ হিঙ্গোরানি, আপনি আমাকে আপনার নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করেছেন। এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে গোয়েন্দার কাছ থেকে মক্কেল যদি কোনো জরুরি তথ্য গোপন করেন তাহলে গোয়েন্দার কাজটা আরো অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'সেটাও আপনি খুব ভালো করেই জানেন, কিন্তু না-জানার ভাণ করছেন। অবিশ্যি সত্য গোপন করার অভিযোগ শুধু আপনার বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য নয়। এঁর বিরুদ্ধেও বটে।'

ফেলুদা শেষ কথাটা তরফদারকে উদ্দেশ করে বলল। তরফদার কিছু

বলতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'আপনারা যখন মুখ খুলছেন না, তখন আমিই বলি।'

ফেলুদার দৃষ্টি এখনো তরফদারের দিকে।

'সুনীল, তুমি একজন পৃষ্ঠপোষকের কথা বলছিলে। আমি কি অনুমান করতে পারি যে মিঃ হিঙ্গোরানিই সেই পৃষ্ঠপোষক?'

হিঙ্গোরানি চোখ কপালে তুলে চেয়ার থেকে প্রায় অর্ধেক উঠে পড়ে বললেন, 'বাট হাউ ডিড ইউ নো? এও কি ম্যাজিক?'

'না, মিঃ হিঙ্গোরানি, ম্যাজিক নয়। এ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ রাখার ফল। আমরা গোয়েন্দারা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি দেখি, বেশি শুনি।'

'কী দেখে বা শুনে আপনি এই তথ্যটা আবিষ্কার করলেন?'

'গত রবিবার তরফদারের ম্যাজিক শো-তে এক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে এই জ্যোতিষ্ক দুটো গাড়ির নম্বর বলে দেয়। তার মধ্যে একটা নম্বর—ডব্লিউ এম এফ ছয় দুই তিন দুই—দেখলাম আপনার গ্যারাজের সামনে দাঁড়ানো কনটেসার নম্বর। এই যুবক কি আপনার বাড়ির লোক নন এবং তিনি শো থেকে ফিরে এসে কি আপনাকে জ্যোতিষ্কর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলেননি?'

'ইয়েস, বলেছিল। মোহন, আমার ভাইপো...' হিঙ্গোরানির কেমন যেন হতভম্ব ভাব।

'আরেকটা ব্যাপার আছে', বলল ফেলুদা। 'সেদিন আপনার ড্রইংরুমের বুক কেসে দেখলাম পুরো একটা তাকভর্তি ম্যাজিকের বই। তার মানে—'

'ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস!' ফেলুদাকে বাধা দিয়ে বললেন হিঙ্গোরানি। 'ওগুলোর মায়া আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বাবা আমার ম্যাজিকের সব সরঞ্জাম ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বই ফেলেননি।'

তরফদারের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর শোচনীয় অবস্থা।

'তরফদারকে কোনো দোষ দেবেন না, মিঃ মিটার', বললেন হিঙ্গোরানি: 'ও আমারই অনুরোধে আমার নামটা প্রকাশ করেনি।'

'কিন্তু এই গোপনতার কারণ কী?'

'একটা বড় কারণ আছে, মিঃ মিটার।'

'কী?'

'আমার বাবা এখনো জীবিত; ফৈজাবাদে থাকেন, আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। বিরাশি বছর বয়স। কিন্তু এখনো টনটনে জ্ঞান, মজবুত শরীর। তিনি যদি জানেন যে এতদিন বাদে আমি আবার ম্যাজিকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছি, তাহলে তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।'

ফেলুদা ভ্রুকুটি করে বার তিনেক মাথা উপর-নীচ করে বলল, 'বুঝেছি।'

হিঙ্গোরানি বলে চললেন, 'মোহন শো দেখে ফিরে এসেই এই ছেলের অসামান্য ক্ষমতার কথা আমাকে বলে। তখনই আমার মাথায় আসে আমি এই যাদুকরের শো ফাইনান্স করব। যখন থেকে তেওয়ারির সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হয়েছে, তখন থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে আমাকে অবিলম্বে টি. এইচ. সিন্ডিকেটের পার্টনারশিপে ইস্তফা দিয়ে রোজগারের নতুন রাস্তা দেখতে হবে। রবিবার রাত্রে জ্যোতিষ্কর কথা শুনে সোমবার সকালেই আমি তরফদারের বাড়িতে গিয়ে আমার প্রস্তাবটা দিই। তরফদার রাজি হয়ে যায়। এর দুদিন বাদেই তেওয়ারির টাকা চুরি ধরা পড়ে এবং আমার সঙ্গে তার সংঘর্ষ সপ্তমে চড়ে। আমি আর থাকতে না পেরে তেওয়ারিকে একটা চার লাইনের চিঠিতে জানিয়ে দিই যে আমি অসুস্থ। ডাক্তারের প্রস্তাব মতো একমাসের অবসর নিচ্ছি। তার পরদিন থেকেই আমি আপিসে যাওয়া বন্ধ করি।'

'তার মানে আপনি এমনিতেই মাদ্রাজে আসছিলেন তরফদারের শো-য়ের জন্য?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার বিপদের আশঙ্কাটাও সম্পূর্ণ সত্যি। অর্থাৎ আপনার সাহায্য আমাকে নিতেই হত।'

'আর আপনি মাদ্রাজে যে একটা চাকরির সম্ভাবনার কথা বলছিলেন?'

'সেটা সত্যি নয়।'

'আই সী!' বলল ফেলুদা। 'তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে—আপনার জীবন বিপন্ন, যার কারণ হল তেওয়ারি সংক্রান্ত ঘটনা; আর জ্যোতিষ্কও ঘোর বিপদে পড়তে পারে দুজন অত্যন্ত লোভী আর বেপরোয়া ব্যক্তির চক্রান্তে। এই দুই বিপদই সামলানোর জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। নয়নের সঙ্গে সব সময় আমাদের কেউ-না-কেউ থাকবে। এখন আপনি বলুন আপনি কী ভাবে আমাদের কাজটা সহজ করতে পারেন।'

হিঙ্গোরানি বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। মাদ্রাজে আমি এর আগে অনেকবার এসেছি। কাজেই এখানে আমার দেখবার কিছু বাকি নেই। তরফদারের শো একবার শুরু হলে তার রিপোর্ট আমি ওর ম্যানেজারের কাছ থেকে পাবো এবং শো-এর দরুন পেমেন্ট যা করার তা ম্যানেজারকেই করব; অর্থাৎ আমি ঘরেই থাকব এবং চেনা লোক কি না যাচাই না করে দরজা খুলব না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমরা দুজনও।

'এসো, নয়নবাবু।'

জটায়ু নয়নের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, নয়ন বেশ আগ্রহের সঙ্গে হাতটা ধরে নিল। বুঝলাম জটায়ুকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেছে।

॥ ১০ ॥

স্নেক পার্কে বেশিক্ষণ ছিলাম না, কিন্তু এটা বুঝেছি যে জায়গাটা একেবারে নতুন ধরনের। মাত্র একজন লোকের মাথা থেকে যে এ জিনিস বেরিয়েছে সেটা বিশ্বাস করা যায় না। যতরকম সাপের নাম আমি শুনেছি তার সব, আর তার বাইরেও বেশ কিছু এই পার্কে রয়েছে। তাছাড়া, সাপ দেখা ছাড়াও, পার্কে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দও এখানে পাওয়া যায়।

প্রথম দিনের এই আউটিং-এ কোনো উল্লেখযোগ্য বা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেনি। যদিও হজসনের ছদ্মবেশের কথা জানার জন্যেই বোধহয় দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই জটায়ু বসাক বলে সন্দেহ করে নয়নকে একটু কাছে টেনে নিচ্ছিলেন।

সাপ দেখে এদিক ওদিক ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা বেশ বড় জলা জায়গায় গোটা পাঁচেক কুমীর রোদ পোয়াচ্ছে। দেখে মনে হল তারা সব কটাই ঘুমোচ্ছে। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে এ-দৃশ্য দেখছি, লালমোহনবাবু নয়নকে ফিসফিস্ করে বলছেন—তুমি আরেকটু বড় হলে তোমাকে আমার 'করাল কুম্ভীর' বইটা দেব—এমন সময় দেখি দুহাতে দুটো বালতি নিয়ে গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পড়া একটা লোক কুমীরগুলো থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কুমীরগুলো এবার একটু নড়েচড়ে উঠল। লোকটা এবার বালতিতে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে এক-একটা কোলা ব্যাঙ বার করে কুমীরগুলোর দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। আশ্চর্য এই যে, প্রত্যেকটা ব্যাঙই কোনো-না-কোনো কুমীরের হাঁ করা মুখের ভিতর গিয়ে পড়ল। কুমীরকে ব্যাঙ চিবিয়ে খেতে আর কোনোদিন দেখিওনি আর দেখব বলে ভাবিওনি।

গোলমেলে ঘটনা যা ঘটে সেটা দ্বিতীয় দিনে, আর সেটার কথা ভাবলেই মনে বিস্ময়, আতঙ্ক, অবিশ্বাস—সব একসঙ্গে জেগে ওঠে।

•••

গাইডবুক পড়ে জেনেছিলাম মহাবলীপুরম ম্যাড্রাস থেকে প্রায় আশি

কিলোমিটার দূরে। রাস্তা নাকি ভালো, যেতে দুঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়। কালকের মতোই দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা করেছিলেন শঙ্করবাবু। এবার নয়ন তরফদারের সঙ্গে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল। কারণ আর কিছুই নয়, জটায়ুর সঙ্গে ওর বেশ জমে গেছে। ভদ্রলোক নয়নকে তাঁর লেটেস্ট বই 'অতলান্তিক আতঙ্ক'-র গল্প সহজ করে বলে শোনাচ্ছেন। একবারে ত শেষ হবার নয়, তাই খেপে খেপে শোনাচ্ছেন। গাড়িতে তাই ফেলুদা আর জটায়ুর মাঝখানে বসল নয়ন। আর আমি সামনে।

যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছি আমরা ক্রমে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছি। মাদ্রাজ শহর সমুদ্রের ধারে হলেও আমরা এখন অবধি সমুদ্র দেখিনি, তবে সন্ধেবেলা সমুদ্রের দিক থেকে আসা হাওয়া উপভোগ করেছি।

সোয়া দুঘণ্টার মাথায় সামনের দৃশ্যটা হঠাৎ যেন ফাঁক হয়ে গেল। ওই যে দূরে গাঢ় নীল জল, আর সামনে বালির উপর ছড়িয়ে উঁচিয়ে আছে সব কী যেন।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম যে সেগুলো মন্দির। মূর্তি আর বিশাল বিশাল পাথরের গায়ে খোদাই করা নানারকম দৃশ্য।

আমাদের গাড়ি যেখানে এসে থামল, তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটা ভ্যান। আর তার পরেই একটা প্রকাণ্ড লাক্সারি কোচ। কোচে একে একে উঠছে এক বিরাট টুরিস্ট দল। তাদের দেখেই কেন জানি বোঝা যায় তারা আমেরিকান। কত রকম পোশাক, কত রকম টুপি, চোখে কতরকম ধোঁয়াটে চশমা, কাঁধে কতরকম ঝোলা।

'বিগ বিজনেস, টুরিজ্‌ম,' বলে জটায়ু নয়নকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

ফেলুদা আগে এখানে না এলেও, কোথায় কী আছে সব জানে। ও আগেই বলে রেখেছিল—'অনেক দূর ছড়িয়ে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে; তবে নয়নকে নিয়ে ত আর অত ঘোরা যাবে না; তুই অন্তত চারটে জিনিস অবশ্যই দেখিস—শোর টেম্পল, গঙ্গাবতরণ, মহিষ মণ্ডপ গুহা আর পঞ্চ পাণ্ডব গুহা। জটায়ু যদি দেখতে চান ত দেখবেন; না হলে নয়নকে সামলাবেন। তরফদার আর শঙ্কর কী করবে জানি না; কথাবার্তা শুনে ত মনে হয় না ওদের মধ্যে শিল্পপ্রীতি বলে কোনো বস্তু আছে।'

আমরা গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগোনর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু একটা জটায়ু-মার্কা প্রশ্ন করলেন।

'এ ত পল্লভদের কীর্তি, তাই না মশাই?'

ফেলুদা তার গলায় একটা বাড়তি টান এনে বলল, 'পল্লব, মিস্টার গাঙ্গুলী, পল্লব। নট পল্লভ।'

'কোন সেঞ্চুরি ?'

'সেটা খোকাকে জিজ্ঞেস করুন, বলে দেবে।'

লালমোহনবাবু অবিশ্যি সেটা আর করলেন না ; খালি মৃদুস্বরে একবার 'সজারু' বলে চুপ করে গেলেন। আমি জানি মহাবলীপুরম সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল।

প্রথমেই শোর টেম্পল বা সমুদ্রের ধারের মন্দিরটা দেখা হল। মন্দিরের পিছনের পাঁচিলের গায়ে ঢেউ এসে ঝাপটা মারছে।

'এরা স্পট সিলেক্ট করতে জানত মশাই,' ঢেউয়ের শব্দের উপরে গলা তুলে মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ডান পাশে দূরে একটা হাতি আর একটা ষাঁড়ের মূর্তির পাশে কয়েকটা ছোট ছোট মন্দিরের মতো জিনিস রয়েছে। ফেলুদা বলল সেগুলো পাণ্ডবদের রথ। —'যেটা দেখতে কতকটা বাংলার গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরের মতো, সেটা হল দ্রৌপদীর রথ।'

মাথা ঘুরে গেল গঙ্গাবতরণ দেখে। এটাকে অবিশ্যি অর্জুনের তপস্যাও বলা হয়। বাইরেই রয়েছে ব্যাপারটা, আর বোঝাই যায় যে একটা বিশাল পাথরের স্ল্যাব দেখে শিল্পীদের এই দৃশ্য খোদাই করার আইডিয়া মাথায় আসে। দুটো বিরাট হাতি, আর তার চতুর্দিকে অজস্র মানুষের ভিড়।

লালমোহনবাবু নয়নকে নিয়ে এখনো আমাদের পাশেই ছিলেন, দৃশ্যটার দিকে চোখ রেখে বললেন, 'এ ত ছেনি-হাতুড়ির কাজ, তাই না ?'

'হ্যাঁ', গম্ভীরভাবে বলল ফেলুদা। 'তবে ভেবে দেখুন—হাজার হাজার প্রাচীন ভাস্কর্যের নমুনা রয়েছে আমাদের সারা দেশ জুড়ে, দশ-বারো শতাব্দী ধরে সেগুলো তৈরি হয়েছে, অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেও তার সামান্যতম অংশেও একটিও হাতুড়ির বেয়াড়া আঘাত বা ছেনির বেয়াড়া অ্যাঙ্গেলের চিহ্ন পাবেন না। এ ত মাটি নয় যে আঙুলের চাপে এদিক ওদিক করে ত্রুটি সংশোধন হয়ে যাবে ; পাথরের ত্রুটি শুধরানোর কোনো উপায় নেই। এ যুগে সেই পারফেক্শনের সহস্রাংশও আর অবশিষ্ট নেই। কোথায় গেল কে জানে !'

তরফদার আর শঙ্করবাবু এগিয়ে গিয়েছিলেন ; ফেলুদা বলল, 'যা, তোরা গিয়ে পঞ্চপাণ্ডব আর মহিষমণ্ডপ গুহাগুলো দেখে আয়। আমি এটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখছি। তাই সময় লাগবে।'

ফেলুদার কাছ থেকে গাইড বুকটা চেয়ে প্ল্যান দেখে বুঝে নিলাম গুহা দুটো দেখতে কোনদিকে যেতে হবে। লালমোহনবাবুকে মুখে বলে বুঝিয়ে দিলাম। তবে তিনি এখন মহাবলীপুরম ছেড়ে অতলান্তিকে চলে গেছেন, তাই আমার কথা কানে গেল কি না জানি না। না গেলেও, আমি এগোনোর আগেই তিনি গল্প শুরু করে নয়নকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কিছুদূর গিয়ে ডাইনে ঘুরে দেখি একটা কাঁচা রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়ে

ওপরে উঠে গেছে। প্ল্যান বলেছে এটা দিয়েই যেতে হবে। ঢেউয়ের আওয়াজ এখানে কম ; তার চেয়ে বেশি জোরে শুনছি লালমোহনবাবুর গলা। মনে হচ্ছে গল্প ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছচ্ছে।

একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি পঞ্চপাণ্ডব গুহায় পৌঁছে গেছি—অন্তত বাইরের সাইনবোর্ডে তাই বলছে। আমি ঢোকার আগেই জটায়ু নয়নকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে আরো উপরে উঠে গেলেন। বুঝলাম আশ্চর্য সব শিল্পের নমুনা লালমোহনবাবুর কাছে মাঠে মারা যাচ্ছে।

ফেলুদার আদেশ, তাই পঞ্চপাণ্ডব গুহায় খানিকটা সময় দিলাম। একটা ঘাড় ফেরানো গরু আর তার পাশে দাঁড়ানো বাছুরের দৃশ্য দেখে মনে হল যে ঠিক এই দৃশ্য আজও বাংলার যে কোনো গ্রামে দেখা যায়। শুধু গরু বাছুর কেন, মহাবলীপুরমের হাতি হরিণ বাঁদর ষাঁড় ইত্যাদি দেখে বুঝতে পারি তেরশো বছরেও এদের চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়নি। অথচ পোশাক বদলের জন্য সেযুগের মানুষকে আজ আর চেনার কোনো উপায় নেই।

গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম, যেগুলো কানে আর চোখে ধরা পড়ল।

এক, সূর্য ঢেকে গেছে ছাই রঙের মেঘে। গুড়গুড়ুনি যে মেঘের ডাক তাতে কোনো সন্দেহ নেই রোদের তেজটা চলে গিয়ে এখন সমুদ্রের হাওয়াটা আরো বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি তফাত ধরা পড়ে কানে। সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া চারিদিকে কোনো শব্দ নেই। আমি গুহাতে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকিনি। সামনে মহিষমর্দিনী গুহা। তার ভিতর থেকে লালমোহনবাবুর গলা পাওয়া উচিত। কারণ গল্পের বেশ জমাটি অংশে তিনি গুহায় পৌঁছেছিলেন। অবিশ্যি তিনি গুহাতে না ঢুকেই এগিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু কেন ? ওদিকে ত আর কিছু দেখার নেই ! কোথায় গেলেন ভদ্রলোক নয়নকে নিয়ে ?

কেমন জানি একটা সংশয়ের ভাব আমাকে চেপে ধরল। আমি দেখলাম মহিষমর্দিনী গুহার দিকে আমি দৌড়তে শুরু করেছি।

গুহার পাশে পৌঁছতেই আরেকটা শব্দ আমার আতঙ্ক সপ্তমে চড়িয়ে দিল।

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—'

টি· এন· টি-র হাসি !

ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছুটে গিয়ে মোড় ঘুরে একটা সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে আমার নিশ্বাস মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

দেখলাম একটা লাল-সাদা ডুরে-কাটা জামা আর কালো প্যান্ট পরা এক অতিকায় কৃষ্ণকায় প্রাণী—যাকে দানব বললে খুব ভুল হয়

না—এক-বগলে জটায়ু আর অন্য বগলে নয়নকে নিয়ে দ্রুত পা ফেলে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

ভয়াবহ দৃশ্য, কিন্তু তখন আমার মাথায় খুন চেপে গেছে, আর তার ফলে শরীরে এনার্জি আর মনে সাহস এসে গেছে। আমি 'ফেলুদা!' বলে একটা চীৎকার দিয়ে প্রাণপণে ছুটে গেলাম দানবটার দিকে—আমার উদ্দেশ্য পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা পা জাপটে ধরে তার হাঁটা বন্ধ করব।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম সেটা করেও কোনো ফল হল না। পা জড়িয়ে ধরতেই প্রথমে দানবটা একটি বিকট চীৎকার দিল—বুঝলাম যেখানে বাদশা কামড়েছিল ঠিক সেখানেই আমি চাপ দিয়েছি। তার পরমুহূর্তে দেখলাম সেই জখম পায়ের ঝটকানিতে আমি মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেছি। তারপর চোখের পলকে দেখি আমি নয়নের সঙ্গে একই বগলের নীচে বন্দী হয়ে হাওয়া কেটে এগিয়ে চলেছি, আমার পা দুটো পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। দৈত্যটার মাংসপেশীর চাপে আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলেও আমি শুনতে পাচ্ছি অন্য বগলের তলা থেকে লালমোহনবাবুর 'মাগো! মাগো!' আর্তনাদ।

আর হাসি?

সামনে বিশ হাত দূরে তারকনাথ হাসতে হাসতে লাফাচ্ছেন আর ডান হাত মাথার উপর তুলে লাঠি ঘোরাচ্ছেন।

'কেমন? গাওয়ার্কি কাকে বলে দেখলে?' তারস্বরে প্রশ্ন করলেন টি· এন· টি।

কিন্তু এখন ত আর তিনি একা নেই! তাঁর পিছন থেকে এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে দুজন লোক। তার মধ্যে একজন অদ্ভুতভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বকের মতো এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

চমৎকার সুনীল তরফদার।

এবার তরফদার তাঁর গতি না কমিয়ে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে সাপের ফণার মতো দোলাতে লাগলেন—তাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টি সটান আমাদের যিনি বগলদাবা করেছেন তাঁর দিকে।

এই চাউনি, এই ঝুঁকে পড়া, হাতের এই ঢেউ খেলানো—এ সবই আমার চেনা। এ হল তরফদারের সম্মোহনের কায়দা।

তারকনাথ হঠাৎ উন্মাদের মতো লাঠি উঁচিয়ে তরফদারের দিকে ধাওয়া করতেই পিছন থেকে এক লাফে এগিয়ে এসে শঙ্করবাবু বুড়োর হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিলেন।

এবার বুঝলাম আমাদের গতি কমে আসছে।

আকাশে আবার মেঘের গর্জন।

তারকনাথ এবার দুহাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরে ঘড়ঘড়ে গলায় একটা অদ্ভুত অচেনা ভাষায় গাওয়াঙ্গিকে কী জানি বললেন।

গাওয়াঙ্গি আর তরফদার এখন মুখোমুখি।

আমি বগলদাবা অবস্থাতেই কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে গাওয়াঙ্গির মুখের দিকে চাইলাম। এমন মুখ আমি আর দেখিনি। চোয়াল ঝুলে পড়ে দাঁত বেরিয়ে গেছে, আর চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে।

বগলদাবা করা বিশাল হাত দুটো এবার ধীরে ধীরে নেমে এল। আমার পা এখন মাটিতে। ওদিকে লালমোহনবাবুও মাটিতে।

'আপনারা গাড়িতে গিয়ে উঠুন!' চোখের পাতা না ফেলে গাওয়াঙ্গির দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন তরফদার। 'আমরা এক্ষুনি আসছি!'

উল্টোদিকে দৌড় দেবার আগের মুহূর্তে দেখলাম তারকনাথ মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

ফেলুদা এখনো গঙ্গাবতরণের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের তিনজনকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখে যেন ও আপনা থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিল।

আমাদেরও আগে ও দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমরা চারজন হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লাম।

'টার্ন ব্যাক! টার্ন ব্যাক!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ফেলুদা। এই ড্রাইভার হিন্দি জানে না; কেবল তামিল আর ভাঙা ভাঙা ইংরিজি।

গাড়ি উল্টোমুখো হতেই ফেলুদা আবার বলল, 'নাউ ব্যাক টু ম্যাড্রাস—ফাস্ট!'

গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে রওনা দেবার পর শুধু একজনই কথা বলল। সে হল নয়ন।

'দৈত্যটার বেয়াল্লিশটা দাঁত।'

॥ ১১ ॥

বেশ জমিয়ে লাঞ্চ খাওয়া হচ্ছে কারোমণ্ডলের মোগলাই ডাইনিং রুম মাইসোরে ! অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল—আজকের খানার পুরো ভার নিয়েছেন লালমোহনবাবু। আসলে তরফদার যে সম্মোহনের জোরে ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাতে—ওঁরই ভাষায়—উনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

খেতে খেতে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'অনেক থ্রিলিং ঘটনার মধ্যে পড়েছি মশাই—থ্যাঙ্কস টু ইউ—কিন্তু আজকেরটা একেবারে ফাইভ-স্টার অভিজ্ঞতা।'

দানবের বগলবন্দী হওয়াটা কী ভাবে ঘটল সেটা ফেলুদা আগেই জিজ্ঞেস করেছিল। আর লালমোহনবাবু সেটা বলেওছিলেন তাঁর ভাষাতেই ঘটনার বর্ণনাটা এখানে দিচ্ছি।

'আর বলবেন না, মশাই—আমি ত খোকাকে গপ্পো শোনাতে মশগুল, গুহায় ঢুকছি আর বেরোচ্ছি, পল্লব-টল্লব মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। একটা গুহায় ঢুকে দেখলুম সামনেই মহিষাসুর। বেরিয়ে আসব, এমন সময় দেখলুম—আরেকটা মূর্তি রয়েছে যেটা বিশাল, বীভৎস। এটার চোখ বোজা, আর মিশকালো রঙের উপর লাল-সাদা ডোরা। মনে মনে ভাবছি—এই ব্যতিক্রমের কারণটা কী?—এও ভাবছি—একি ঘটোৎকচের মূর্তি নাকি?—কারণ মহাভারতের অনেক কিছুই ত এখানে দেখছি। এমন সময় মূর্তিটা চোখ খুলল। ভাবতে পারেন?—ধুমসোটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল!

'চোখ খুলেই অবশ্য আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। আমি নয়ন দুজনেই ঘোমকে গেছি, সেই অবস্থাতেই আমাদের দুজনকে বগলদাবা করে নিয়ে দে ছুট!'

ফেলুদা মন্তব্য করেছিল যে বোঝাই যাচ্ছে গাওয়াঙ্গির মনটা খুব সরল। এমনকি এও হতে পারে যে তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই; যা আছে সে শুধু শারীরিক বল। নাহলে সুনীল তাকে হিপনোটাইজ করতে পারত না।

তরফদার আর শঙ্করবাবু কোথায় গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করাতে

তরফদার বললেন, 'শঙ্করের হবি হচ্ছে আয়ুর্বেদ। ও শুনেছিল যে মহাবলীপুরমে সর্পগন্ধা গাছ পাওয়া যায়, তাই আমরা দুজনে খুঁজতে গিয়েছিলাম। গাছ পেয়ে ফিরতি পথে দেখি এই কাণ্ড।'

'সর্পগন্ধা ত ব্লাড প্রেশারে কাজ দেয়, তাই না?' বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ', বললেন শঙ্করবাবু। 'এই সুনীলের প্রেশার মাঝে মাঝে চড়ে যায়। ওর জন্যই এই গাছ আনা।'

এর পরেই জটায়ু প্রস্তাব করেন যে তিনি সকলকে খাওয়াবেন। মোগলাই খানার কথাও উনিই বলেন, আর তাতে সকলেই রাজি হয়।

এখন এক টুকরো চিকেন টিক্কা কাবাব মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়ে গেছে সেটা আজ প্রমাণ হল।'

ফেলুদা ঠাট্টাটাকে খুব একটা আমল না দিয়ে বলল, 'তার চেয়েও বড় কথা হল—গাওয়াঙ্গি বাতিল হয়ে গেল।'

'ইয়েস', বললেন জটায়ু। 'এখন বাকি শুধু মিস্টার ব্যাসাক।'

আমাদের সঙ্গে আজ মিঃ রেড্ডিও খাচ্ছেন—অবিশ্যি নিরামিষ। পরশু বড়দিনে তাঁর রোহিণী থিয়েটারে তরফদারের শো শুরু। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে রেড্ডি যে কোনো কার্পণ্য করেননি সেটা ফেরার পথে রাস্তার দুপাশে তামিল আর ইংরিজি পোস্টার দেখেই বুঝেছি। প্রত্যেকটাতেই যাদুকরের পোশাক পরে তরফদারের ছবি আর সেই সঙ্গে 'জ্যোতিষ্ক—দ্য ওয়ান্ডার বয়'-এর নাম। রেড্ডি জানালেন যে এর মধ্যেই প্রথম দু দিন হাউসফুল হয়ে গেছে।

'আমি বলছি আজ আর কোথাও বেরোবেন না', বললেন মিঃ রেড্ডি। 'আর কালকের দিনটাও রেস্ট করুন। আপনাদের আজকের এক্সপিরিয়েন্স ত শুনলাম; ওই ছেলেকে নিয়ে আর কোনো রিস্ক নেবেন না। ওর কিছু হলে যারা টিকিট কেটেছে তারা সবাই টাকা ফেরত চাইবে। তখন কী দশা হবে ভেবে দেখুন—আমারও, আপনারও। থিয়েটারে অবিশ্যি আমি পুলিশ রাখছি, কাজেই শোয়ের সময় কোনো গণ্ডগোল হবে না।'

গাওয়াঙ্গির ঘটনার ফলে তরফদার আর শঙ্করবাবু দুজনেই বুঝেছেন যে নয়নকে সামলানোর ব্যাপারে কোনো গাফিলতি চলবে না। ফেলুদা ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, মহাবলীপুরম দেখে ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল—'না হলে আমি কখনই মিস্টার গাঙ্গুলীর হাতে নয়নকে ছাড়তাম না। এখন শিক্ষা হয়েছে, এবার থেকে আর কোনো গণ্ডগোল হবে না।'

জটায়ুর গল্প শেষ। তাই নয়ন আজ খাবার পরে তরফদারের সঙ্গেই ঘরে চলে গেল।

এখনো যে চমকের শেষ সীমায় পৌঁছইনি, সেটা ঘরে ফেরার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই—অর্থাৎ আড়াইটে নাগাদ—প্রমাণ হল।

ফেলুদা আজ রগড়ের মুডে ছিল। জটায়ুকে বলছিল—'এবার থেকে আপনিই সামাল দিন, আমার দিন ত ফুরিয়ে এল'—ইত্যাদি। লালমোহনবাবু ব্যাপারটা রীতিমতো উপভোগ করছিলেন, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফেলুদা মিনিটখানেক ইংরিজিতে কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, 'চিনলাম না। কিছুক্ষণের জন্য আসতে চায়।'

'আসতে বললে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ', বলল ফেলুদা। 'হোটেলে এসেছে, নীচ থেকে ফোন করল। জটায়ু—প্লীজ টেক ওভার।'

'মানে?' লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ।

'আমার প্রয়োজনীয়তা ত ফুরিয়েই গেছে। দেখাই যাক না আপনাকে দিয়ে চলে কিনা।'

লালমোহনবাবু কিছু বলার আগেই দরজার বেল বেজে উঠল।

আমি দরজা খুলতে একজন মাঝারি হাইটের বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। মাথার চুল পাতলা এবং সাদা হয়ে এসেছে, তবে গোঁফটা কালো এবং ঘন। ভদ্রলোক একবার জটায়ু আর একবার ফেলুদার দিকে চেয়ে ইংরিজিতে বললেন, 'আপনার নামের সঙ্গে আমি পরিচিত, মিঃ মিটার, কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে নয়। হুইচ ওয়ান অফ ইউ ইজ—?'

ফেলুদা সরাসরি লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে বলল, 'দিস ইজ মিস্টার মিটার।'

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন লালমোহনবাবুর দিকে। জটায়ু দেখলাম নিজেকে সামলে নিয়েছেন, আর বেশ তাঁটের সঙ্গেই হ্যান্ডশেকটা করলেন। মনে পড়ল ফেলুদাই একবার জটায়ুকে বলেছিল—'হ্যান্ডশেকটা পুরোপুরি সাহেবী ব্যাপার, তাই ওটা করতে হলে সাহেবী মেজাজেই করবেন, মিনমিনে বাঙালি মেজাজে নয়। মনে রাখবেন—গরুখোরের গ্রিপ আর মাছখোরের গ্রিপ এক জিনিস নয়।'

মনে হয় সেটা মনে রেখেই জটায়ু বেশ শক্ত করে আগন্তুকের হাতটা ধরে দুবার সারা শরীর দুলিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, 'সিট ডাউন, মিস্টার—'

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন, 'আমার নাম বললে আপনারা চিনবেন না। আমি এসেছি মিঃ ত্রেওয়ার্থার কাছ থেকে। ওঁর সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। এ ছাড়া আমার আরেকটা পরিচয় আছে—আমিও আপনারই মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার কোম্পানির নাম ছিল ডিটেকনীক। সাতাশ বছর আগে কলকাতায় এই কোম্পানি স্টার্ট করে। নাইনটীন সিক্সটি এইটে, আজ থেকে বাইশ বছর আগে, আমি বম্বে চলে যাই আমার কোম্পানি নিয়ে। তাই আপনার নাম শুনলেও আপনার চেহারার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। আই অ্যাম সারপ্রাইজড—কারণ

আপনার চেহারা দেখে গোয়েন্দা বলে মনেই হয় না। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার মিটার, বাট ইউ লুক ভেরি অর্ডিনারি। বরং এঁকে—'

আগন্তুক ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ঘোরালেন। জটায়ু গলাটা রীতিমতো চড়িয়ে বললেন, 'হি ইজ মাই ফ্রেন্ড মিস্টার লালমোহন গ্যাঙ্গুলী, পাওয়ারফুলি আউটস্ট্যান্ডিং রাইটার।'

'আই সী।'

'আপনি কোথাকার লোক?'

ভদ্রলোক যা বললেন, তাতে ছাগলের গলায় খাঁড়ার কোপ পড়ার মতো শব্দ হল।

'কচ্।'

'কচ্ছ?'

'ইয়েস···যাই হোক, যে কারণে আসা···'

ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো বার করে জটায়ুর দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি খুব যে কাছে ছিলাম, তা নয়, কিন্তু তাও বুঝতে পারলাম সেটা হিঙ্গোরানির ছবি।

'এই লোকের হয়ে আপনি কাজ করছেন প্রোফেশানালি, তাই না?'

ফেলুদা নির্বিকার; জটায়ুর চোখ এক মুহূর্তের জন্য কপালে উঠে নেমে এল। আমাদের ধারণা ফেলুদা যে হিঙ্গোরানির হয়ে কাজ করছে সেটা বাইরের কেউ জানে না। ইনি জানলেন কী করে?

'তাই যদি হয়', বললেন আগন্তুক, 'তাহলে আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ আমি তেওয়ারির দিকটা দেখছি। ওর ব্যাপারটা আমি কাগজে পড়ে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বাইশ বছর পরে আমার হদিস পেয়ে সে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কলকাতায় থাকতে আমি ওকে অনেক ব্যাপারে হেল্প করি, সেটা ও ভোলেনি। বলল—আই নীড ইওর হেল্প এগেন।—আমি রাজি হই, আর তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। প্রথমেই হিঙ্গোরানির বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি ও কলকাতায় নেই। ওর এক ভাইপো ফোন ধরেছিল; বলল—আঙ্কল কোথায় যাচ্ছেন তা বলে যাননি।—আমি এয়ারলাইনসে খোঁজ করে ম্যাড্রাসের প্যাসেঞ্জার লিস্টে ওর নাম পাই। বুঝতে পারি তেওয়ারির শাসানির ফলে সে ভয়ে চম্পট দিয়েছে। এর পর আমি ওর বাড়িতে যাই। ওর বেয়ারার কাছে জানতে পারি যে কদিন আগে তিনজন বাঙালী হিঙ্গোরানির সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাদের একজনের নাম মিত্তর। আমার সন্দেহ হয়। আমি ডাইরেক্টরি থেকে আপনার নম্বর বার করে ফোন করি। একজন সার্ভেন্ট ফোন ধরে বলে যে আপনি ম্যাড্রাস গেছেন। আমি দুয়ে দুয়ে চার হিসেব করে ম্যাড্রাস যাওয়া স্থির করি। কাল এখানে এসেই ফোনে সব হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি হিঙ্গোরানি করোমণ্ডলে আছেন। আমি জিজ্ঞেস

করি—মিটার বসে আছেন কেউ ?—উত্তর পাই, হাঁ আছেন ; পি· মিটার। তখনই স্থির করি আপনার সঙ্গে দেখা করে লেটেস্ট সিচুয়েশনটা জানাবো। এটা আপনি স্বীকার করছেন ত যে হিঙ্গোরানি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে তাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ?'

'এনি অবজেকশন ?'

'মেনি !'

আমরা তিনজনেই চুপ। ফেলুদা কিন্তু মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং ছাড়ছে, দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই তার মনে কী আছে।

'তেওয়ারির সিন্দুকের ঘটনা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে জানেন ?' বললেন আগন্তুক।

'কলকাতার কাগজে বেরিয়েছে কি ?' জটায়ুর প্রশ্ন।

'ইয়েস। সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। এতে কেসটার চেহারাটাই পালটে যায়। কাগজ পড়েই আমি তেওয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করি। আপনি যাঁর প্রাণরক্ষার ভার নিয়েছেন তিনি কেমন লোক জানেন ? হি ইজ এ থীফ, স্কাউন্ড্রেল অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান লায়ার।'

ভদ্রলোক শেষের কথাগুলো বললেন ঘর কাঁপিয়ে। জটায়ু প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁর কথায় আতঙ্কের রেশ ঢাকতে পারলেন না।

'হা-হাউ ডু ইউ নো-নো ?'

'তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। হিঙ্গোরানি তেওয়ারির সিন্দুক থেকে পাঁচ লক্ষের উপর টাকা চুরি করেছে। সিন্দুকের তলা থেকে হিঙ্গোরানির আংটি পাওয়া গেছে—পলা বসানো সোনার আংটি। ওর আপিসের প্রত্যেকে ওই আংটি চিনেছে। আংটিটা গড়িয়ে একেবারে পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। তাই এতদিন বেরোয়নি। পরশু বেয়ারা মেঝে সাফ করতে গিয়ে পায়। এটাই হচ্ছে আমার রঙের তুরুপ। দিস্ উইল ফিনিশ হিঙ্গোরানি।'

'কিন্তু যখন চুরিটা হয় তখন ত হিঙ্গোরাজ—থুড়ি, হিঙ্গোরানি—আপিসে ছিলেন না।'

'ননসেন্স!' গর্জিয়ে উঠলেন ডিটেকটিভ। 'হিঙ্গোরানি চুরিটা করে মাঝরাত্তিরে, আপিস টাইমে নয়। গোয়েঙ্কা বিল্ডিং-এ টি. এইচ. সিন্ডিকেটের আপিস। সেই বিল্ডিং-এর দারোয়ানকে পাঁচশো টাকা ঘুষ দিয়ে হিঙ্গোরানি আপিসে ঢোকে রাত দুটোয়। একথা দারোয়ান পুলিশের দাবড়ানিতে স্বীকার করেছে। সিন্দুকের কম্বিনেশন তেওয়ারি হিঙ্গোরানিকে বলেছিল, সেটা তেওয়ারির এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে। প্রায় বছর পনের আগে তেওয়ারির জনডিস হয়, হাসপাতালে ছিল, খুব খারাপ অবস্থা। হিঙ্গোরানি তখন তার পার্টনার আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুকে ডেকে তেওয়ারি বলে, 'আমি মরে গেলে আমার সিন্দুক কী করে খোলা হবে?' হিঙ্গোরানি ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তেওয়ারি জোর করে তাকে নম্বরটা নোট করে নিতে বলে। হিঙ্গোরানি সে অনুরোধ রাখে।'

'কিন্তু হিঙ্গোরানি হঠাৎ টাকা চুরি করবে কেন?'

'কারণ ওর পকেট ফাঁক হয়ে আসছিল', গলা সপ্তমে তুলে বললেন আগন্তুক। 'শেষ বয়সে জুয়ার নেশা ধরেছিল! প্রতি মাসে একবার করে কাঠমাণ্ডু যেত। ওখানে জুয়ার আড্ডা ক্যাসিনো আছে জানেন ত? সেই ক্যাসিনোতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খুইয়েছে রুলেটে। তেওয়ারি ব্যাপারটা জেনে যায়। হিঙ্গোরানিকে অ্যাডভাইস দিতে যায়। হিঙ্গোরানি খেপে ওঠে। এমন দশা হয়েছিল লোকটার যে বাড়ির দামী জিনিসপত্র বেচতে শুরু করে। শেষে মরিয়া হয়ে পার্টনারের সিন্দুকের দিকে চোখ দেয়।'

'আপনি কী করবেন স্থির করেছেন?'

'তোমাদের এখান থেকে আমি তার ঘরেই যাবো। আমার বিশ্বাস চুরির টাকা তার সঙ্গেই আছে। তেওয়ারি কেমন মানুষ জানেন?—সে বলেছে তার টাকা ফেরত পেলে সে তার পুরোনো পার্টনারের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেবে না। এই খবরটা আমি হিঙ্গোরানিকে জানাব—তাতে যদি তার চেতনা হয়।'

'আর যদি না হয়?'

ভদ্রলোক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলে একটা ক্রূর হাসি হেসে বললেন, 'সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'আপনি গোয়েন্দা হয়ে আ-আইন বিরুদ্ধ কাজ— ?'

'ইয়েস, মিস্টার মিটার! গোয়েন্দা শুধু একরকমই হয় না, নানা রকম হয়। আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি। এটা কি আপনি জানেন না যে গোয়েন্দা আর ক্রিমিন্যালে প্রভেদ সামান্যই ?'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। আবার জটায়ুর সঙ্গে জবরদস্ত হ্যাণ্ডশেক করে—'গ্ল্যাড টু মীট ইউ, মিস্টার মিটার। গুড ডে' বলে গটগটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা তিনজন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ফেলুদাই প্রথম কথা বলল :

'থ্যাঙ্ক ইউ, লালমোহনবাবু। মৌন থাকার সুবিধে হচ্ছে যে চিন্তার আরো বেশি সময় পাওয়া যায়। কোনো একটা ব্যারামে—হয়ত ডায়াবেটিস—হিঙ্গোরানি রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন। তাই সেদিন বারবার কবজি থেকে ঘড়ি নেমে যাওয়া, আর চুরির সময় আঙুল থেকে আংটি খুলে যাওয়া।'

'আপনি কি তাহলে ওই গোয়েন্দার কথা বিশ্বাস করছেন ?'

'করছি, লালমোহনবাবু, করছি। অনেক ব্যাপার, যা ধোঁয়াটে লাগছিল, তা ওর কথায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে হিঙ্গোরানি টাকা চুরি করে অর্থাভাব মেটানোর জন্য নয়; সে কাঠমাণ্ডুতে জুয়া খেলে যতই টাকা খুইয়ে থাকুক, নয়নকে পেয়ে সে বোঝে তার সব সমস্যা মিটে যাবে। সে টাকা চুরি করে মিরাক্‌লস আনলিমিটেড কোম্পানিকে দাঁড় করানোর জন্য, তরফদারকে ব্যাক্ করার জন্য।'

'তাহলে এখন আপনি হিঙ্গোরানির সঙ্গে দেখা করবেন না ?'

'তার ত কোনো প্রয়োজন নেই! যিনি দেখা করবেন তিনি হলেন ডিটেক্‌টীকের এই গোয়েন্দা। হিঙ্গোরানিকে তেওয়ারির টাকা বাধ্য হয়েই এই গোয়েন্দার হাতে তুলে দিতে হবে—প্রাণের ভয়ে। কাজেই তরফদারের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

'তাহলে এখন… ?'

'এইখানেই দাঁড়ি দিন, লালমোহনবাবু। এর পরে যে কী তা আমি নিজেই জানি না।'

॥ ১২ ॥

জটায়ু আর আমার পিছনে যেহেতু কেউ লাগেনি, বিকেলে আমরা দুজনে সমুদ্রের ধারে গেলাম হাওয়া খেতে। হিঙ্গোরানির কপালে কী আছে জানি না, তবে এটা মনে হচ্ছে যে নয়নের আর কোনো বিপদ নেই। যদি তেওয়ারির টাকা ফেরত দিয়েও হিঙ্গোরানির কাছে বেশ কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তরফদারের শো হতে কোনো বাধা নেই। আর প্রথম শো থেকেই ত টিকিট বিক্রির টাকার অংশ আসতে শুরু করবে। মনে হয় হিঙ্গোরানি এখনো বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাবেন।

জটায়ুকে বলাতে তিনি চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'তপেশ, আই অ্যাম শক্‌ড্‌! লোকটা একটা ক্রিমিন্যাল, পরের সিন্দুক থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়েছে, আর সে লোক নয়নকে ভাঙিয়ে খাবে এটা ভেবে তুমি খুশি হচ্ছ?'

'খুশি নয়, লালমোহনবাবু। হিঙ্গোরানির বিরুদ্ধে যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে ত তাকে এই মুহূর্তে জেলে পোরা যায়। কিন্তু তার পার্টনার যদি পুরোন বন্ধুত্বের খাতিরে তার উপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে রেহাই দেন—তাতে আমার-আপনার কী বলার আছে?'

'লোকটা জুয়াড়ি—সেটা ভুলো না। আমার অন্তত কোনো সিমপ্যাথি নেই হিঙ্গোরানির উপর।'

তেষ্টা পাচ্ছিল দুজনেরই। লালমোহনবাবু কোল্ড কফি খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। 'এখানকার কফিটা একটা প্লাস পয়েন্ট সেটা স্বীকার করতেই হবে।'

সমুদ্রের কাছেই একটা কাফে আবিষ্কার করে আমরা একটা টেবিল দখল করে বেয়ারাকে কোল্ড কফি অর্ডার দিলাম। কাফেতে অনেক লোক, বুঝলাম এদের ব্যবসা ভালোই চলে।

মিনিটখানেকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্‌ করে দুটো গেলাস এসে পড়ল আমাদের টেবিলের উপর। আমরা দুজনেই ঘাড় নীচু করে প্লাস্টিকের স্ট্রয়ের ডগা ঠোঁটের মধ্যে পুরে দিলাম।

'হ্যাভ ইউ টোল্ড ইওর টিকটিকি ফ্রেন্ড?'

লালমোহনবাবু একটা বিশ্রী শব্দ করে বিষম খেলেন।

মুখ তুলেই দেখি টেবিলের উল্টোদিকে চক্রা-বক্রা হাওয়াইয়ান শার্ট পরে দণ্ডায়মান মিস্টার নন্দলাল বসাক।

লালমোহনবাবু সামলে নিতে ভদ্রলোক বললেন, 'শুধু এইটে বলে দেবেন মিত্তিরকে এবং তরফদারকে যে, নন্দ বসাক পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না। পঁচিশে ডিসেম্বর যদি শো হয়, তাহলে সেই শো থেকে শেষের আইটেমটি বাদ যাবে, এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।'

আমাদের পাশেই কাফের দরজা। ভদ্রলোক কথাটা বলেই সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে অন্ধকার, তাই তিনি যে কোনদিকে গেলেন সেটা বুঝতেই পারলাম না।

তেষ্টা মেটেনি, তাই কফিটা শেষ করে দাম চুকিয়ে আমরা আর দশ মিনিটের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলমুখো রওনা হলাম।

হোটেলে পৌঁছতে লাগল আধঘন্টা। ভিতরে ঢুকে দেখি লবি লোকে লোকারণ্য। শুধু লোক নয়, তার সঙ্গে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড় করানো অজস্র লাগেজ। বোঝাই যাচ্ছে একটা বিদেশী টুরিস্ট দল সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে। ফেলুদাকে বসাকের খবরটা এক্ষুনি দিতে হবে, তাই আমরা প্রায় দৌড়ে গিয়ে লিফটে ঢুকে চার নম্বর বোতামটা টিপে দিলাম।

চারশো তেত্রিশের সামনে গিয়েই বুঝলাম ঘরে ফেলুদা ছাড়াও অন্য লোক আছে, আর বেশ গলা উঁচিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে।

বেল টেপার প্রায় পনের সেকেণ্ড পরে দরজা খুলল ফেলুদা, আর আমাকে সামনে পেয়েই এক রামধমক।

'দরকারের সময় না পাওয়া গেলে তোরা আছিস কী করতে?'

কাঁচুমাচু ভাবে ঘরে ঢুকে দেখি মাথায় হাত দিয়ে কাউচে বসে আছেন সুনীল তরফদার।

'ব্যাপারটা কী মশাই?' ভয়ে ভয়ে শুধোলেন জটায়ু।

'সেটা ঐন্দ্রজালিককে জিজ্ঞেস করুন', শুকনো গম্ভীর গলায় বলল ফেলুদা।

'কী মশাই?'

'আমিই বলছি!' বলল ফেলুদা, 'এর মুখ দিয়ে কথা বেরোবে না।' খচ করে লাইটার দিয়ে ঠোঁটে ধরা চারমিনারটা জ্বালিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'নয়ন হাওয়া। কিড্ন্যাপ্‌ড। ভাবতে পারিস? এর পরেও ফেলু মিত্তিরের মান ইজ্জত থাকবে? পই পই করে বলে দিয়েছিলাম ঘর থেকে যেন না বেরোয়, নয়ন যেন ঘর থেকে না বেরোয়।—আর এই ভর সন্ধেবেলা—গিজগিজ করছে লবি, তার মধ্যে শঙ্করবাবু নয়নকে নিয়ে

গেছেন বুকশপে।

'তারপর ?'—আমার বুকের ধুকপুকুনি আমি কানে শুনতে পাচ্ছি।

'বাকিটা বলো চমকদার মশাই, বাকিটা বলো ! নাকি এই কাজটাও আমার উপর ছাড়তে হবে ?'

ফেলুদাকে এত রাগতে আমি অনেকদিন দেখিনি।

তরফদার হেঁট মাথা অনেকটা তুলে চাপা গলায় বললেন, 'নয়ন একা ঘরে বসে অস্থির হয়ে পড়ে বলে শঙ্কর ওর জন্য গল্পের বই কিনতে গিয়েছিল। বই পেয়েও ছিল। দোকানের মেয়েটি দুটো বই প্যাক করে ক্যাশ মেমো করে দিচ্ছিল—শঙ্কর তাই দেখছিল। হঠাৎ মেয়েটি বলে ওঠে—দ্যাট বয় ? হোয়্যার ইজ দ্যাট বয় ?—শঙ্কর পিছন ফিরে দেখে নয়ন নেই। ও তৎক্ষণাৎ দোকান থেকে বেরিয়ে লবিতে খোঁজে, নয়নের নাম ধরে ডাকে, একে ওকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। লবিতে এত ভিড় তার মধ্যে একজন ন'বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে...'

'এটা কখনকার ঘটনা ?'

'সেখানেই বলিহারি !' চেঁচিয়ে উঠল ফেলুদা। 'দেড় ঘণ্টা আগে ব্যাপারটা ঘটেছে, আর সুনীল এই সবে দশ মিনিট হল এসে আমাকে রিপোর্ট করছে—হুঃ !'

'বসাকে', বললেন জটায়ু। 'নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।'

'আপনি দেখি ভয়ঙ্কর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছেন কথাটা ?'

আমি কাফের ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। ফেলুদা গম্ভীর।

'আই সী...আমি এটাই আশঙ্কা করেছিলাম। অর্থাৎ কুকীর্তিটা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তোদের সঙ্গে দেখা হয়। হুঁ...'

'শঙ্করবাবু কোথায় ?' জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

তরফদার মাথা না তুলেই বলল, 'থানায়।'

'শুধু পুলিশে খবর দিলে ত চলবে না', বলল ফেলুদা, 'তোমার পৃষ্ঠপোষক আছে, তোমার থিয়েটারের মালিক আছেন। তিনি কি নয়ন ছাড়া শো করতে রাজি হবেন ? আই হ্যাভ গ্রেট ডাউটস।'

'তাহলে হিঙ্গোরানিকে...'

জটায়ু একবার ফেলুদার, একবার তরফদারের দিকে চাইলেন।

'তাঁকে খবর দেবার সাহস নেই এই সম্মোহক প্রবরের। বলছে—"আপনি কাইন্ডলি কাজটা করে দিন, মিস্টার মিত্তির ! আমি গেলে সে লোক আমাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলবে"।'

'শুনুন—' লালমোহনবাবু হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠলেন—'আপনারও যেতে হবে না, সুনীলবাবুরও যেতে হবে না। আমরা যাচ্ছি।—কী তপেশ, রাজি ত ?'

ফেলুদা ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট আর কপালে ভ্রূকুটি নিয়ে সোফায়

বসে পড়ে বলল, 'যেতে হলে এখনই যান। তোপ্‌সে, তুই ইংরিজিতে হেল্‌প করিস।'

হিঙ্গোরানির ঘরের নম্বর দুশো আটাশি। আমরা সিঁড়ি দিয়েই নেমে গিয়ে তাঁর দরজার বেল টিপলাম।

দরজা খুলল না।

'সময়-সময় এই বেলগুলো ওয়ার্ক করে না', বললেন জটায়ু। 'এবার বেশ জোরে চাপ দিও ত।'

আমি বললাম, 'ভদ্রলোকের ত বেরোবার কথা না। ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

তিনবার টেপাতেও যখন ফল হল না, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে লবিতে গিয়ে হাউস টেলিফোনে ২৮৮ ডায়াল করতে হল।

ফোন বেজেই চলল। নো রিপ্লাই।

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু রিসেপশনে গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করতে। তারা বলল—'মিঃ হিঙ্গোরানি নিশ্চয়ই ঘরেই আছেন। কারণ তাঁর চাবি এখানে নেই।'

এবার জটায়ুর মুখ দিয়ে তোড়ে ইংরিজি বেরোল, ভাষা টেলিগ্রামের।

'বাট ইম্পর্ট্যান্ট সী হিঙ্গোরানি—ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। নো ডুপ্লিকেট কী? নো ডুপ্লিকেট কী?'

কাজটা খুব খুশি মনেই করে দিল রিসেপশনের লোকেরা।

চাবি হাতে বয়কে সঙ্গে নিয়ে আমরা লিফ্‌টে দোতলায় উঠে আবার হিঙ্গোরানির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ইয়েল লক চাবি ঘোরাতেই খড়াৎ করে খুলে গেল, বয় দরজা ঠেলে দিল, আমি বললাম 'থ্যাঙ্ক ইউ', জটায়ু আমার আগেই ঘরে ঢুকে তৎক্ষণাৎ তড়াক করে পিছিয়ে আমারই সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। তারপর অদ্ভুত স্বরে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিন টুকরো কথা বেরোল।

'হিং-হিং-হিক্‌!'

ততক্ষণে আমিও ভিতরে ঢুকে গেছি, আর দৃশ্য দেখে এক নিমেষে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

খাটের উপর চিত হয়ে হাতপা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মিঃ হিঙ্গোরানি। তাঁর পা দুটো অবিশ্যি নীচে নেমে মেঝের কার্পেটে ঠেকে আছে। তাঁর গায়ে যে লাল নীল সাদা আলোর খেলা চলেছে, সেটার কারণ হচ্ছে বাঁয়ে টেবিলের উপর রাখা টিভি—যেটাতে হিন্দি ছবি চলেছে, যদিও কোনো শব্দ নেই। ভদ্রলোকের বোতাম খোলা জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা সার্টের উপর ভেজা লাল ছোপ, আর তার মাঝখানে উঁচিয়ে আছে একটা ছোরার হাতল।

॥ ১৩ ॥

হিঙ্গোরানিকে যে ভিক্টোরীকের গোয়েন্দাই খুন করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ পুলিশের ডাক্তার নানা পরীক্ষা করে বলেছেন খুনটা হয়েছে আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। গোয়েন্দা ভদ্রলোক আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন পৌনে তিনটে নাগাত—আর তিনি নিজেই বলেছিলেন সোজা যাবেন হিঙ্গোরানির ঘরে। এও বোঝা যাচ্ছে যে হিঙ্গোরানি তেওয়ারির টাকা ফেরত দিতে রাজি হননি। তাই গোয়েন্দা তার কথামতো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছেন। বেডসাইড টেবিলের উপর খুচরো পঁয়ষট্টি পয়সা ছাড়া এক কপর্দকও পাওয়া যায়নি হিঙ্গোরানির ঘরে। একটা সুটকেস ছাড়া আর কোনো মাল ঘরে ছিল না। টাকা নিশ্চয়ই একটা ব্রীফকেস জাতীয় ব্যাগে ছিল; তার কোনো চিহ্ন আর নেই।

ফেলুদা পুলিশকে জানিয়েছে যে আততায়ী যদি টাকা নিয়ে থাকে তাহলে সে-টাকা সে কলকাতায় গিয়ে টি· এইচ· সিন্ডিকেটের মিঃ দেবকীনন্দন তেওয়ারির হাতে তুলে দেবে। এই খবরটা কলকাতার পুলিশকে জানানো দরকার।

ফেলুদাকে হত্যাকারীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলতে হল যে লোকটার নাম তার জানা নেই :—'শুধু এটুকু বলতে পারি যে সে সম্ভবত কচ্ছ প্রদেশের লোক।'

মিঃ রেড্ডি খবর পেয়েই চলে এসেছিলেন, আর এখন আমাদের ঘরেই বসে ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি ব্যাপারটা জেনে মূর্ছা যাবেন। তার বদলে দেখলাম নয়ন ছাড়াও কী ভাবে শোটাকে জমানো যায় তিনি সেই কথা ভাবছেন। বোঝাই যায় ভদ্রলোকের তরফদারের উপর একটা মায়া পড়ে গেছে। বললেন, 'শো বন্ধ না করে যদি আপনার হিপ্নোটিজম-এর আইটেমটা ডবল করে দেওয়া যায়? আমি ম্যাড্রাসের লীডিং ফিল্ম স্টারস্, ডানসারস্, সিঙ্গারসকে ডাকব ওপনিং নাইটে। আপনি তাদের এক এক করে স্টেজে ডেকে বুদ্ধু বানিয়ে দিন। কেমন আইডিয়া?'

তরফদার মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুধু আপনার ওখানে

খেলা দেখিয়ে ত আমার চলবে না! আমি জানি নয়নের খবর ছড়িয়ে গেছে। সব ম্যানেজার ত আপনার মতো নয়, মিঃ রেড্ডি!—তাদের বেশির ভাগই কড়া ব্যবসাদার। নয়ন ছাড়া তারা আমাকে বুকিংই দেবে না।...একসঙ্গে দুটো দুর্ঘটনা আমাকে শেষ করে দিয়েছে।'

ফেলুদা তরফদারকে জিজ্ঞেস করল, 'হিঙ্গোরানি কি তোমাকে অলরেডি কিছু পেমেন্ট করেছেন?'

'কলকাতায় থাকতে কিছু দিয়েছিলেন; তাতে আমাদের যাতায়াতের খরচ হয়ে যায়। একটা বড় কিস্তি আগামী কাল দেবার কথা ছিল। উনি দিনক্ষণ দেখে এসব কাজ করতেন। আগামীকাল নাকি দিন ভালো ছিল।'

মিঃ রেড্ডি কাহিল। বললেন, 'তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। এই মন নিয়ে তোমার পক্ষে শো করা অসম্ভব।'

'শুধু আমি না, মিঃ রেড্ডি। আমার ম্যানেজার শঙ্কর এমন ভেঙে পড়েছে যে সে শয্যা নিয়েছে। তাকে ছাড়াও আমার চলে না।'

পুলিশ আধঘণ্টা হল চলে গেছে। তারা খুনের তদন্তই করবে; মাদ্রাজের বিভিন্ন হোটেল, লজ, ধরমশালায় খোঁজ নেবে আমাদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন চেহারার কোনো লোক গত দুদিনের মধ্যে সেখানে এসে উঠেছে কিনা। হিঙ্গোরানির ভাইপো মোহনকে টেলিফোন করা হয়েছিল। সে আগামীকাল এসে লাশ সনাক্ত করে সৎকারের ব্যবস্থা করবে। মৃতদেহ এখন মর্গে রয়েছে। পুলিশ এও জানিয়েছে যে ছোরার হাতলে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। নয়নের ব্যাপারে ফেলুদা বলল যে সে নিজেই তদন্ত করবে। তাতে তরফদার সায় দিয়েছেন।

রেড্ডি এবার চেয়ার থেকে উঠে ফেলুদাকে বললেন, 'আমি কিন্তু আপনার উপরই ভরসা করে আছি, মিঃ মিত্তির। দুদিন যদি শো পোস্টপোন করতে হয় তা আমি করব। এই দুদিনের মধ্যে আপনি জ্যোতিষ্কমকে খুঁজে বার করে দিন—প্লীজ!'

রেড্ডি যাবার মিনিটখানেকের মধ্যে তরফদারও উঠে পড়ে বললেন, 'দুদিন দেখি। তার মধ্যে যদি নয়নকে না পাওয়া যায় তাহলে কলকাতায় ফিরে যাব।—আপনি কি আরো কিছুদিন থাকবেন?'

'অনির্দিষ্টকাল থাকা অবশ্যই সম্ভব নয়,' বলল ফেলুদা। 'তবে এইভাবে চোখে ধুলো দেওয়াটাও মেনে নেওয়া মুশকিল। দেখি...'

তরফদার বেরিয়ে যাবার পর ফেলুদা হাতের সিগারেটে একটা শেষ টান দিয়ে তার খুব চেনা গলায় একটা চেনা কথা মৃদুস্বরে তিনবার বলল—'খটকা...খটকা...খটকা...'

'এটা আবার কিসের খটকা?' জটায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

'হিঙ্গোরানিকে বলা ছিল যে অচেনা লোক হলে সে যেন দরজা না খোলে; তাহলে ডিটেকটিভ ঢুকলেন কী করে? তাকে কি হিঙ্গোরানি

আগে থেকেই চিনতেন ?'

'কিছুই আশ্চর্য নয়', বললেন জটায়ু। 'হিঙ্গোরানি কতরকম ব্যাপারে আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল ভেবে দেখুন।'

আমি ফেলুদাকে একটা কথা না বলে পারলাম না।

'তুমি কি শুধু হিঙ্গোরানি মার্ডারের কথাই ভাবছ, ফেলুদা ? আমার কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে যে একটা বাজে লোক যদি খুন হয়েও থাকে তাতে যতটা ভাবনা হয়, তার চেয়ে নয়নের মতো ছেলে চুরি যাওয়াটা অনেক বেশি ভাবনার। তুমি হিঙ্গোরানি ভুলে গিয়ে এখন শুধু নয়নের কথা ভাবো।'

'দুটোই ভাবছি রে তোপ্‌শে, কিন্তু কেন জানি মনের মধ্যে দুটো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

'এ আবার কী হেঁয়ালি মশাই ?' লালমোহনবাবু বেশ বিরক্তভাবে বললেন। 'দুটো ত সেপারেট ঘটনা—জট পাকাতে দিচ্ছেন কেন ?'

ফেলুদা জটায়ুর কথায় কান না দিয়ে বার দুতিন মাথা নেড়ে বলল, 'নো সাইন অফ স্ট্রাগল…নো সাইন অফ স্ট্রাগল…'

'সে ত শুনলুম', বললেন জটায়ু। 'পুলিশ ত তাই বলল।'

'অথচ লোকটা যে ঘুমের মধ্যে খুন হয়েছে তা ত নয়!'

'তা হবে কেন ? জুতো মোজা পরে কেউ ঘুমোয় নাকি ?'

'তা অনেক মাতাল ঘুমোয় বৈকি- কারণ তাদের হুঁশ থাকে না।'

'কিন্তু এঁর ঘরে ত ড্রিঙ্কিং-এর কোনো চিহ্ন ছিল না।—অবিশ্যি যদি বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসে দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে…'

'উঁহু।'

'হোয়াই নট ?'

'টিভি খোলা ছিল, যদিও ভল্যুম একেবারে নামানো ছিল। তাছাড়া অ্যাশট্রের খাঁজেতে একটা আধখানা সিগারেট পুরোটা ছাই হয়ে পড়ে ছিল। অর্থাৎ ভদ্রলোক টিভি দেখতে দেখতে সিগারেট খাচ্ছিলেন, সেই সময় দরজার বেলটা বাজে। হিঙ্গোরানি টিভির ভল্যুম পুরো নামিয়ে দিয়ে সিগারেটটা ছাইদানের কানার খাঁজে রেখে উঠে গিয়ে দরজা খোলেন।'

'খোলার আগে কি জিজ্ঞেস করবেন না কে বেল টিপল ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু চেনা গলা হলে ত আর দ্বিধার কোনো কারণ থাকে না।'

'তাহলে ধরে নিন যে হিঙ্গোরানির সঙ্গে এই গোয়েন্দার আলাপ ছিল, এবং হিঙ্গোরানি তাকে অসৎ লোক বলে জানতেন না।'

'কিন্তু সেই লোক যখন ছুরি বার করবে তখন হিঙ্গোরানি বাধা দেবেন না ? স্ট্রাগ্‌ল হবে না ?'

'আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কী ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব সেটা আপনি ভেবে বের করবেন। যদি না পারেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার

পাঠকদের অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। কোথায় গেল আপনার আগের সেই জৌলুস। সেই ক্ষুরধার—'

'চুপ!'

লালমোহনবাবুকে ব্রেক কষতে হল।

ফেলুদা আমাদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে এখন দেয়ালের দিকে চেয়ে—চোখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কপালে গভীর খাঁজ।

আমি আর জটায়ু প্রায় এক মিনিট কথা বন্ধ করে ফেলুদার এই নতুন চেহারাটা দেখলাম। তারপর আমাদের কানে এল কতকগুলো কথা—ফিসফিসিয়ে বলা—

'বু-ঝে-ছি।—কিন্তু কেন, কেন, কেন?'

দশ-বারো সেকেণ্ড নৈঃশব্দ্যের পর লালমোহনবাবুর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আপনি একটু একা থাকতে চাইছেন কি?'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার গাঙ্গুলী। আধঘণ্টা, আধঘণ্টা, থাকতে চাই একা।'

আমরা দুজন উঠে পড়লাম।

॥ ১৪ ॥

আমার মনে যে ইচ্ছেটা ছিল, সেটা দেখলাম লালমোহনবাবুর ইচ্ছের সঙ্গে মিলে গেছে। সেটা হল নীচে কফি শপে গিয়ে চা খাওয়া।

আমরা কফি শপে গিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। 'সঙ্গে স্যান্ডউইচ হলে মন্দ হত না,' বললেন জটায়ু। 'শুধু চা বড় চট করে ফুরিয়ে যাবে। আধ ঘণ্টা কাটাতে হবে ত!' বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল ; চায়ের সঙ্গে দু প্লেট চিকেন স্যান্ডউইচ যোগ করে দিলাম।

আমার আগে আঁচ পেয়েছি যে ফেলুদা আলোর সন্ধান পেয়েছে। সেটা কম কি বেশি জানি না, কিন্তু বুঝতে পারছি যে শিরদাঁড়া দিয়ে ঘন ঘন শিহরন বয়ে যাচ্ছে।

হাতে সময় আছে তাই লালমোহনবাবু তাঁর সবে মাথায় আসা উপন্যাসের আইডিয়াটা শোনালেন। যথারীতি গল্পের নাম আগেই ঠিক হয়ে গেছে। মাঞ্চুরিয়ায় রোমাঞ্চ। বললেন, 'চায়না সম্বন্ধে একটু পড়ে নিতে হবে। অবিশ্যি আমার এ গল্পে আজকের চীনের চেহারা পাওয়া যাবে না ; এ হবে ম্যান্ডারিনদের আমলের চায়না।'

খাওয়া শেষ, লালমোহনবাবুর গল্প শেষ, তাও দেখি দশ মিনিট সময় রয়েছে।

কফি শপ থেকে লবিতে বেরিয়ে এসে জটায়ু বললেন, 'কী করা যায় বল ত?'

আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছে করছে একবার বুক শপটাতে ঢুঁ মারি। ওটা ত এখন আমাদের কাছে একটা হিস্টোরিক জায়গা— নয়ন ত ওখান থেকেই অদৃশ্য হয়েছে।'

'গুড আইডিয়া। আর বলা যায় না— হয়ত গিয়ে দেখব আমার বই ডিসপ্লে করা হয়েছে।'

'ইডলি দোসার দেশে আপনার বই থাকবে না, লালমোহনবাবু।'

'দেখি না খোঁজ করে!'

দোকানের ভদ্রমহিলার বয়স বেশি না, আর দেখতেও সুশ্রী। জটায়ু 'এক্সকিউজ মি' বলে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ইয়েস স্যার ?'

'ডু ইউ হ্যাভ ক্রাইম নভেলস্ ফর— ইয়ে, কী বলে— কিশোরস্ ?'

'কিশোরস্ ?' ভদ্রমহিলার ভুরু কুঁচকে গেছে।

'ফর ইয়াং পীপ্‌ল,' বললাম আমি।

'ইন হোয়াট ল্যাংগুয়েজ ?'

'বাংলি— আই মীন, বেঙ্গলী।'

'নো, স্যার। নো বেঙ্গলী বুক্‌স। সরি। বাট উই হ্যাভ লট্‌স অফ চিলড্রেনস্ বুক্‌স ইন ইংলিশ।'

'জানি। আই নো।'

তারপর একটু হেসে ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে আরম্ভ করলেন, 'টুডে— মানে, দিস আফটারনুন, এ ফ্রেন্ড.. ইয়ে...নু'

বুঝলাম সেকেন্ড গিয়ারে গাড়ি আটকে গেছে। আমাকেই বলে দিতে হল যে আজই বিকেলে আমাদের এক বন্ধু এই দোকান থেকে দুটো ইংরিজি চিলড্রেনস বুক্স কিনে নিয়ে গেছে।

'দিস আফটারনুন ?'

'ইয়েস।' বললেন জটায়ু। 'নো ?'

'নো, স্যার।'

'নো ?'

ভদ্রমহিলা বললেন গত চারদিনের মধ্যে কোনো ছোটদের বই তিনি বিক্রি করেননি। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমার বুকে ধুকপুকুনি। ধরা গলায় বললাম, 'দশ মিনিট হয়ে গেছে, লালমোহনবাবু।'

ভদ্রমহিলাকে একটা থ্যাঙ্ক ইউ জানিয়ে আমরা প্রায় দৌড়ে গিয়ে লিফটে উঠলাম। বোতাম টিপে খসখসে গলায় জটায়ু বললেন, 'এ যে বিচিত্র সংবাদ !'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, কারণ আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

চাবি ঘুরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে দুজনেই একসঙ্গে কথা বলে ফেললাম।

'ও মশাই— !'

'ফেলুদা !'

'ওয়ান অ্যাট এ টাইম'— ফেলুদার গলায় ধমকের সুর।

আমি বললাম, 'আমি বলছি।— শঙ্করবাবু বইয়ের দোকানে যাননি।'

'টাটকা কিছু থাকে ত বল। এটা বাসী খবর।'

'আপনি জানেন !'

'আমি সময়ের অপব্যবহার করি না, লালমোহনবাবু। বইয়ের দোকানে প্রায় বিশ মিনিট আগেই হয়ে এসেছি। মিস্ স্বামীনাথনের সঙ্গে কথা বলেছি। খবরটা আপনাদের দিতে গিয়ে দেখলাম আপনারা গোগ্রাসে স্যান্ডউইচ গিলছেন ; তাই চলে এলাম।'

'কিন্তু তাহলে— ?' আমার অসমাপ্ত প্রশ্ন।

'তরফদার আসছে। এক্ষুনি ফোন করেছিল। বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। দেখি কী বলে।'

দরজায় ঘণ্টা।

তরফদার, মুখ চুন।

'আমায় বাঁচান, ফেলুবাবু !' হাহাকার করে উঠলেন ভদ্রলোক।

'কী হল ?'

'শঙ্কর। ওর ঘরে গেসলাম। বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আমার বিপদের কি আর শেষ নেই?'

ফেলুদার কাছ থেকে এই প্রশ্নের এক অদ্ভুত উত্তর এল।

'না, সুনীল তরফদার; এই সবে শুরু।'

'মানে? চেরা গলায় বলে উঠলেন তরফদার।

'মানে অত্যন্ত সহজ, সুনীল। তুমি এখনো নিরপরাধের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ; এ পোশাক তোমাকে মানায় না, সুনীল। তুমি যে ঘোর অপরাধী!'

'মিস্টার মিত্তির, আমাকে এই ধরনের কথা বলার কোনো অধিকার নেই আপনার।'

'কী বলছ সুনীল? গোয়েন্দা অপরাধীকে ধরে ফেললে তার উপর দোষারোপ করবে না? তুমি এই যে এলে আমার ঘরে, এখান থেকে সোজা চলে যাবে পুলিশের হাতে। তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।'

'আমার অপরাধটা কী সেটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। এক, তুমি হত্যাকারী; দুই, তুমি চোর। সেকথাই আমি পুলিশকে বোঝাব।'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন। আপনি প্রলাপ বকছেন।'

'মোটেই না। হিঙ্গোরানি চেনা লোক ছাড়া আর কারুর জন্য দরজা খুলবেন না এটা তিনি নিজেই বলেছিলেন। যাকে আমরা এতক্ষণ খুনী বলে ভাবছিলাম— অর্থাৎ ছদ্মবেশী সেই গোয়েন্দা— তাকে হিঙ্গোরানি চিনতেন না। সেই কারণেই গোয়েন্দা হিঙ্গোরানির ছবি সঙ্গে এনেছিলেন, যাতে তিনি শিওর হতে পারেন যে ঠিক লোকের সঙ্গেই তিনি দেখা করছেন। অতএব তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হিঙ্গোরানির পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমায় তিনি চিনতেন ভালো করেই, তাই তুমি নিজের পরিচয় দিলে তাঁর পক্ষে দরজা খুলে দেওয়া স্বাভাবিক।'

'আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, ফেলুবাবু। পুলিশ পরিষ্কার বলেইছে হিঙ্গোরানি তার আততায়ীকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করেননি। দেয়ার ওয়জ নো সাইন অফ স্ট্রাগল। আমি যদি ছুরি বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতাম, তিনি কি বাধা দেবার চেষ্টা করতেন না?'

'একটা বিশেষ ক্ষেত্রে কখনই করতেন না।'

'কী সেই বিশেষ ক্ষেত্র?'

'সেটা তোমারই ক্ষেত্র, তরফদার। সম্মোহন। হিঙ্গোরানিকে হিপ্‌নোটাইজ করে খুন করলে তিনি বাধা দেবেন কী করে?'

'আপনার পাগলামি এখনো যায়নি, ফেলুবাবু। হিঙ্গোরানি আমার অন্নদাতা। তাঁর ব্যাকিং-এর উপর আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল।

আমি কি এমনই মূর্খ যে এঁকেই আমি খুন করব ? যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া ? আপনি হাসালেন মিঃ মিত্তির— আপনি হাসালেন ।'

'এই বেলা হেসে নাও, চমৎকার তরফদার ; এর পরে আর সে অবস্থা থাকবে না ।'

'আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে আমার প্রধান অবলম্বন নয়ন চলে গিয়ে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খুন করেছি ?'

'না, কারণ তোমার জবানীতেই জানা যায় যে নয়ন সন্ধ্যাবেলা নিখোঁজ হয়, আর হিঙ্গোরানির মৃত্যুর সময় দুপুর আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে ।'

'আপনি এখনো উল্টোপাল্টা বলছেন, মিঃ মিত্তির । মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন ।'

'আমার মাথায় জল ঢালো, তরফদার— দেখবে তা বরফ হয়ে গেছে ।... এবারে একটা খবর তোমাকে দিই । আমি কিছুক্ষণ আগে নীচে বইয়ের দোকানটায় গিয়েছিলাম । যিনি দোকানে বসেন সেই মহিলার সঙ্গে আমার কথা হয় । তিনি বলেন গত চারদিনের মধ্যে তাঁর বইয়ের দোকান থেকে কোনো ছোটদের বই বিক্রি হয়নি, এবং কোনো খদ্দেরের সঙ্গে কোনো ছোট ছেলে আসেনি ।'

'শি-শি মাস্ট বি লাইং ।'

'নো, সুনীল তরফদার— নট শি । মিথ্যাবাদী হচ্ছ তুমি এবং তোমার ম্যানেজার শঙ্কর হুবলিকার । শঙ্করের মাথায় পোর্সিলেনের ছাইদান দিয়ে বাড়ি মেরেছি বলে হয়ত তার মধ্যে কিছুটা চেতনার সঞ্চার হবে— কিন্তু তোমার ঢ্যাটামো দেখছি কিছুতেই যাচ্ছে না ।'

'শঙ্করকে আপনিই বেহুঁশ করেছেন ?'

'ইয়েস, সুনীল তরফদার ।'

'কেন ?'

'কারণ সে খুনের কারণ গোপন রাখতে সাহায্য করছিল ।'

দরজার বেল বেজে উঠল ।

'তোপশে, মিঃ রামচন্দ্রনকে ভেতরে নিয়ে আয় ।'

দরজা খুলতে রামচন্দ্রন ঢুকে এসে ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন ।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই তরফদার রামচন্দ্রনের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ব্যক্তি বলছেন আমি খুন করেছি, কিন্তু কোনো কারণ বা মোটিভ দেখাতে পারছেন না ।'

ফেলুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'শুধু খুন নয়, তরফদার । ভুলো না— ডাকাতিও বটে । হিঙ্গোরানির প্রতিটি কপর্দক এখন তোমার হাতে । পাঁচ

লাখের উপর— যেটা দিয়ে তুমি নিজের পৃষ্ঠপোষকতা নিজেই করার মতলব করেছিলে।'

ফেলুদা এবার আমার দিকে ফিরল।

'তোপ্‌শে— বাথরুমের ভিতরে যে রয়েছে তাকে বার করে আনত।'

আমি বাথরুমের দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখি নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে বেরিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেল।

'শঙ্কর একে তার বাথরুমের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল। আসল ঘটনাটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে আমি শঙ্করের ঘরে যাই, এবং তাকে অজ্ঞান করে নয়নকে নিয়ে আসি। নয়নের মুখ থেকেই শোন তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রাস এবং তোমার খুন ও চুরির রাস্তা নেবার কারণ।'

তরফদারের দিকে চেয়ে দেখলাম তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছে।

'নয়ন', বলল ফেলুদা, 'তরফদার মশাইকে ক'বছর জেল খাটতে হবে বল ত।'

'তা ত জানি না।'

'জান না?'

'না।'

'কেন, নয়ন? কেন জান না?'

'আমি ত চোখের সামনে আর নম্বর দেখছি না।'

'দেখছ না?'

'না। তোমাকে ত বললাম— সব নম্বর পালিয়ে গেছে।'

—

ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়

রবার্টসনের রুবি

রবার্টসনের রুবি

॥ ১ ॥

'মামা-ভাগ্নে বলতে আপনার বিশেষ কিছু মনে পড়ে?' প্রশ্নটা জটায়ুকে করল ফেলুদা।

আমি অবিশ্যি উত্তরটা জানতাম, কিন্তু লালমোহনবাবু কী বলেন সেটা জানার জন্য তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিলাম।

'আঙ্কল অ্যান্ড নেফিউ?' চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'নো স্যার। ইংরিজি করলে চলবে না। মামা-ভাগ্নে। বলুন তো দেখি কীসের কথা মনে পড়ে।'

'দাঁড়ান মশাই, আপনার এই দুম্ করে করা প্রশ্নগুলো বড় গোলমেলে। মামা-ভাগ্নে...মামা ভাগ্নে...। উঁহু। আমি হাল ছাড়লুম, এবার আপনি আলোকপাত করুন।'

'অভিযান ছবিটা দেখেছেন?'

'সে তো বহুকাল আগে। ও ইয়েস!'—লালমোহনবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। 'সেই পাথর! একটা বিরাট চ্যাপটা ঢাইয়ের উপর আরেকটা বিরাট পাথর ব্যালান্স করা রয়েছে নাকের ডগায়। মনে হয় হাত দিয়ে ঠেলা মারলেই উপরের পাথরটা দুলবে। মামার পিঠে ভাগ্নে—তাই তো?'

'রাইট। ব্যাপারটা কোথায় সেটা মনে পড়ছে?'

'কোন জেলা বলুন তো!'

'বীরভূম।'

'ঠিক ঠিক।'

'অথচ ও অঞ্চলটায় একবারও ঢুঁ মারা হয়নি। আপনি গেছেন?'

'টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ—নো স্যার।'

'ভাবুন তো দেখি!—আপনি লেখক, তা যেরকম লেখাই লিখুন না কেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছেন, সেইখানেই যাননি! কী লজ্জার কথা বলুন তো দেখি!'

'যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি মশাই। আর সত্যি বলতে কী, আমরা তো

ট্যাগোরের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরিচি, কিনা, তাই শান্তিনিকেতন—টেকেতন তেমন আর পাত্তা দিইনি। 'হনলুলুতে হুলুস্থুল' যে লিখেছে সে আর কবিগুরু থেকে কী প্রেরণা পেতে পারে বলুন!'

'আপনি বীরভূম বলতে আশা করি শুধু শান্তিনিকেতন ভাবছেন না। বক্রেশ্বরের হট স্প্রিংস আছে, কেন্দুলিতে কবি জয়দেবের জন্মস্থান আছে, বামাক্ষ্যাপা যেখানে সাধনা করতেন সেই তারাপীঠ আছে, মামা-ভাগ্নের দুবরাজ আছে, অজস্র পোড়া ইঁটের মন্দির আছে—'

'সেটা আবার কী দেখবার জিনিস মশাই?'

'টেরা কোটা জানেন না? বাংলার এক বড় সম্পদ!'

'ট্যাড়া কোট? মানে, ব্যাঁকা বাড়ি?'

কেউ কোনও বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে ফেলুদার স্কুলমাস্টার মূর্তিটা বেরিয়ে পড়ে। ও বলল—

'টেরা—টি ই আর আর এ—ল্যাটিন ও ইটালিয়ান কথা, মানে মাটি; আর কোটা—সি ও ডবল টি এ—এও ইটালিয়ান কথা, মানে পোড়া। মাটি আর বালি মিশিয়ে তা দিয়ে নানারকম মূর্তি ইত্যাদি গড়ে উনুনের আঁচে রেখে দিলে যে লাল চেহারাটা নেয় তাকে বলে টেরা কোটা। যেমন সাধারণ ইঁট। যেটা বানানো হয় সেটা যে শুধু দেখতে সুন্দর তা নয়, টেকসইও বটে। এই টেরা কোটার মন্দির ছড়িয়ে আছে সারা পশ্চিম বাঙলায় আর বাংলাদেশে। তার মধ্যে সেরা মন্দির কিছু পাওয়া যাবে বীরভূমে। তার কোনও কোনওটা আড়াইশো-তিনশো

বছরের পুরনো। কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়। বাংলার এ সম্পদ সম্বন্ধে যে ওয়াকিবহাল নয় সে বাংলার কিছুই জানে না।'

'বুঝলাম। জানলাম। আমার ঘাট হয়েছে। কাইন্ডলি এক্সকিউজ মাই ইগ্নোরান্স।'

'আপনি জানেন না, অথচ একজন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক এই নিয়ে যা কাজ করে গেছেন তার তুলনা নেই।'

'কার কথা বলছেন?'

'ডেভিড ম্যাককাচন। অকাল মৃত্যু তাঁর কাজ শেষ করতে দেয়নি, কিন্তু তাও যা করেছেন তার জবাব নেই। আপনি খবরের কাগজের হেডলাইন ছাড়া আর কিছু পড়েন না জানি—তাই আজ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা অনুমান করতে পারি। না হলে ডেভিড ম্যাককাচনের উল্লেখ সেখানে পেতেন।'

'কী লেখা বলুন তো!'

'রবার্টসনস রুবি।'

'রাইট, রাইট। লেখার নামটা দেখে আর রুবির রঙিন ছবিটা দেখে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু ধোপা এসে সব মাটি করে দিল।'

'প্রবন্ধের লেখক পিটার রবার্টসন এখন এখানে। ভারতপ্রেমিক বলে মনে হল। ম্যাককাচনের লেখা পড়ে বীরভূমের মন্দির দেখতে চায়, তা ছাড়া ট্যাগোরের শান্তিনিকেতন দেখতে চায়।'

'কিন্তু রুবির ব্যাপারটা কীভাবে আসছে?'

'এই পিটারের এক পূর্বপুরুষ প্যাট্রিক রবার্টসন সিপাইদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয় এবং ব্রিটিশদের জয় হয়, প্যাট্রিক তখন লখ্নৌতে। মোটে ছাব্বিশ বছর বয়স। ইংরেজ সেনা ছলেবলে নবাবের প্রাসাদে লুটতরাজ করে এবং মহামূল্য মণিমুক্তা নিয়ে পালায়। প্যাট্রিক রবার্টসন একটি রুবি পান যার আয়তন একটা পায়রার ডিমের সমান। সেই রুবি প্যাট্রিকের সঙ্গে ইংল্যান্ডে আসে এবং প্যাট্রিকের মৃত্যুর পর রবার্টসন পরিবারেই থেকে যায়। লোকে উল্লেখ করত রবার্টসনস রুবি বলে। সম্প্রতি প্যাট্রিকের একটি শেষ বয়সের ডায়রি পাওয়া গেছে যার অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না। তাতে প্যাট্রিক লখ্নৌয়ের লুটতরাজের উল্লেখ করে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। প্যাট্রিক বলেছেন তাঁর আত্মা শান্তি পাবে শুধুমাত্র যদি তাঁর কোনও বংশধর ভারতবর্ষ থেকে লুট করে আনা এই রুবি আবার ভারতবর্ষে ফেরত দিয়ে দেয়। পিটার সেই পাথর সঙ্গে করে এনেছে, এবং যাবার আগে এখানে কোনও মিউজিয়ামে দিয়ে যাবে।'

লালমোহনবাবু পুরো ব্যাপারটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন্দুলিতে শীতকালে দারুণ মেলা হয় বলে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন। দলে দলে বাউল আসে সেই মেলাতে।'

'সেটা ঠিক কখন হয় মশাই?'

'এই এখন। মকর সংক্রান্তিতে শুরু হয়েছে।'

'হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো?'

লালমোহনবাবুর মাঝে মাঝে একটা সাহেবি মেজাজ প্রকাশ পায়। উনি বলেন সেটা ওঁর গল্প লেখার জন্য অনেক ইংরিজি বই কনসাল্ট করতে হয় বলে।

ফেলুদা বলল, 'সত্যিই যেতে চাইছেন বীরভূম?'

'ভেরি মাচ সো।'

'তা হলে আমি বলি কী, আপনি হরিপদবাবুকে বলুন সোজা আপনার গাড়ি নিয়ে বোলপুর চলে যেতে। আমরা সেদিনই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চলে যাব। যাবার আগে অবশ্য ট্যুরিস্ট লজে বুকিং করে নিতে হবে। ফাস্ট ট্রেন; শুধু বর্ধমানে থামে; আড়াই ঘণ্টায় শান্তিনিকেতন পৌঁছে যাব।'

'ট্রেনেই যাব বলছেন?'

'তার কারণ আছে। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে লাউঞ্জ কার বলে একটা ফার্স্ট ক্লাস এয়ারকন্ডিশনড বগি থাকে। এতে করিডর নেই, সেই আদ্যিকালের কামরার মতো চওড়া। পঁচিশ ত্রিশজন যায়, বৈঠকখানার মতো সোফা কাউচ টেবিল পাতা রয়েছে। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।'

'জিহ্বা দিয়ে লালাক্ষরণ হচ্ছে মশাই। তা হলে একটা কাজ করি—শতদলকে একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দিই।'

'শতদলটা কে?'

'শতদল সেন। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি, এখন বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল মশাই, আমি ওকে কোনওদিন টেক্কা দিতে পারিনি।'

'তার মানে আপনিও ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন বলছেন?'

'তা বাংলার জনপ্রিয়তম থ্রিলার রাইটার সম্বন্ধে সেটা কি বিশ্বাস করা খুব কঠিন ব্যাপার?'

—'তা আপনার বর্তমান আই. কিউ—' পর্যন্ত বলে ফেলুদা আর কথাটা শেষ করল না। বলল, 'লিখে দিন আপনার বন্ধুকে।'

দু'দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বোলপুর ট্যুরিস্ট লজে একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুম বুক করা হয়েছে। গরম কাপড় বেশ ভালরকম নিতে হবে, কারণ এটা জানুয়ারি মাস, শান্তিনিকেতনে কলকাতার চেয়ে বেশি শীত। ইতিমধ্যে আমি ডেভিড ম্যাককাচনের বইটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। দেখে অবাক লাগছিল যে একজন লোক কী করে এত জায়গায় ঘুরে এত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছে। বাংলার এই আশ্চর্য সম্পদ সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না।

শনিবার সকালে লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডর নিয়ে হরিপদবাবু বেরিয়ে পড়লেন। পানাগড় অবধি গিয়ে ডাইনে ঘুরতে হবে, তারপর অজয় নদী পেরিয়ে ইলামবাজার দিয়ে বোলপুর।

আমরা সাড়ে নটায় হাওড়া স্টেশনে জড়ো হলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'আমার দু'দিন থেকে ডান চোখটা নাচছে; সেটা গুড সাইন না ব্যাড সাইন, মশাই?'

ফেলুদা বলল, 'আপনি খুব ভাল করেই জানেন আমি ও ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, তাও কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো!'

লালমোহনবাবু কেমন যেন মুষড়ে পড়ে বললেন, 'একবার ভাবলুম এটা হয়তো কোনও আসন্ন তদন্তের লক্ষণ; তারপর মনে হল ট্যাগোরের সঙ্গে ক্রাইমের কোনও রকম সম্পর্ক থাকা একেবারে অসম্ভব। কাজেই এটা আপনি মন থেকে দূর করে দিতে পারেন, ফেলুবাবু।'

॥ ২ ॥

লালমোহনবাবু অবশ্য পরে বললেন, ওটাই হচ্ছে ওঁর ডান চোখ নাচার কারণ, আমার কিন্তু মনে হল ব্যাপার যাকে ইংরিজিতে বলে কোইন্সিডেন্স আর বাংলায় কাকতালীয়।

লাউঞ্জ কারে নবসুদ্ধ চব্বিশ জন বসতে পারে, কিন্তু উঠে দেখি আমাদের নিয়ে রয়েছে মাত্র দশজন; তার মধ্যে আবার দুজন সাহেব। একজনের সোনালি চুল, দাড়িগোঁফ নেই, আরেকজনের কালো চাপ দাড়ি আর কাঁধ অবধি লম্বা চুল। বয়স ফেলুদার চেয়ে কিছু কমই হবে—মানে ত্রিশের সামান্য বেশি। আমার মন কিন্তু বলল এর মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পিটার রবার্টসন।

সেটা যে সত্যি সেটা জানা গেল গাড়ি ছাড়ার দশ মিনিটের মধ্যেই।

একটা সোফায় আমরা তিনজন পাশাপাশি বসেছি, সত্যিই বুঝতে পারছি এরকম আরামের কামরা এর আগে কখনও দেখিনি। ফেলুদা একটা চারমিনার বার করে মুখে পুরে লাইটারটা দিয়ে সেটা ধরিয়েছে এমন সময় সোনালি চুল-ওয়ালা সাহেব মুখে একটা সিগারেট পুরে ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'মে আই—?'

ফেলুদা লাইটারটা সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, 'আর ইউ গোইং টু বোলপুর টু?'

সাহেব সিগারেটটা ধরিয়ে লাইটারটা ফেরত দিয়ে হাসিমুখে ফেলুদার দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'ইয়েস। মাই নেম ইজ পিটার রবার্টসন, অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড টম ম্যাক্সওয়েল।'

ফেলুদা এবার আমাদের তিনজনেরই পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার লেখাই তো সেদিন স্টেটসম্যানে পড়ছিলাম না?'

'ইয়েস। ডিড ইউ লাইক ইট?'

'অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেখা। সেই রুবি কি তুমি কাউকে দিয়ে দিয়েছ?'

'না। ওটা আমাদের সঙ্গেই আছে। আমরা কলকাতার মিউজিয়মকে ওটা অফার করেছি। ঘটনাটা কিউরেটরকে জানিয়েছি। উনি বলেছেন উনি অত্যন্ত খুশি হবেন পাথরটা মিউজিয়মের জন্য পেলে। উনি অবশ্য ব্যাপারটা দিল্লিতে জানিয়েছেন। ওখান থেকে অনুমতি পেলেই আমরা পাথরটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিউজিয়মের হাতে তুলে দেব। কিউরেটর বললেন ভারতবর্ষের অনেক সম্পদই নাকি বিদেশে চলে গেছে, তার সামান্য অংশও যদি এইভাবে ফেরত পাওয়া যেত তা হলে কত ভাল হত।'

'তোমার তো ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটা যোগসূত্র রয়েছে; তোমার বন্ধুরও আছে নাকি?'

উত্তরটা বন্ধু নিজেই দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন পিটার রবার্টসন।

'টমের ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন বীরভূমে এক নীলকুঠির মালিক। জার্মানরা কৃত্রিম উপায়ে নীল বার করে শস্তায় বাজারে ছাড়ার পর ভারতবর্ষ থেকে নীলের চাষ উঠে যায়। তখন টমের পূর্বপুরুষ রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল দেশে ফিরে যান। আমাদের দুজনেরই একই ভ্রমণের নেশা আর তার থেকে বন্ধুত্ব। টম একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফার। আমি ইস্কুল মাস্টারি করি।'

টমের পাশেই কামরার মেঝেতে রাখা একটা ব্যাগ দেখে আন্দাজ করেছি তাতে ক্যামেরার সরঞ্জাম রয়েছে।

'তোমরা ক'দিন বীরভূমে থাকবে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'দিন সাতেক', বলল পিটার রবার্টসন। 'আসল কাজ কলকাতাতেই, কিন্তু বাংলা কিছু টেরা কোটা মন্দির দেখার শখ আছে।'

'বীরভূমে অবিশ্যি মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু দেখবার জিনিস আছে। একবার গিয়ে পড়লে একসঙ্গে ঘুরে দেখা যাবে। ভাল কথা—তোমার স্টেটসম্যানের লেখার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি?'

'কী বলছ!—লেখা বার হবার তিনদিনের মধ্যে স্টেটসম্যানে চিঠি আসতে শুরু করে। লেখকদের মধ্যে রাজারাজড়ার ম্যানেজার আছে, ধনী ব্যবসাদার আছে, রত্ন সংগ্রাহক আছে—এরা সকলেই রুবিটা কিনতে চায়। আমি আমার লেখার মধ্যে স্পষ্টই বলে দিয়েছি যে ওটা আমি বিক্রি করব না। রবার্টসনের রুবি নিয়ে আমাদের দেশেও রত্ন সংগ্রাহকদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে অনেকদিন থেকে। তারা ওটার জন্য কত টাকা দিতে প্রস্তুত তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। আমি লন্ডনে যাচাই করিয়ে দেখেছি, এটার মূল্য হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড পাউন্ডস।'

'পাথরটা বোধহয় তোমার কাছেই রয়েছে?'

'ওটা টমের জিম্মায়। এ ব্যাপারে ও আমার চেয়ে অনেক বেশি সাবধান। তা ছাড়া ওর রিভলভার আছে, প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করতে পারে।'

'পাথরটা কি একবার দেখা যায়?'

'নিশ্চয়ই।'

পিটার টমের দিকে দৃষ্টি দিল। টম তার ক্যামেরার ব্যাগ খুলে তার মধ্যেথেকে একটা নীল মখমলের বাক্স বার করল। ফেলুদা তার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে খুলতেই আমাদের তিনজনের মুখ দিয়ে একসঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। শুধু যে এমন পাথর এর আগে দেখিনি তা নয়—এমন লাল রঙও আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

ফেলুদা পাথরটা কিছুক্ষণ হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে 'ইট্‌স্‌ অ্যামেজিং!' বলে সেটা ফেরত দিয়ে দিল। তারপর টম ম্যাক্সওয়েলকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনার রিভলভারটা একবার দেখতে পারি? ও বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে।'

কথাটা বলে ফেলুদা তার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে পিটারের হাতে দিল। পিটারের হাতে দিল।

পিটারের চোখ কপালে উঠে গেল।

'সে কী—তুমি যে দেখছি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! তা হলে তো আমাদের কোনও গণ্ডগোল হলে তোমার শরণাপন্ন হতে হবে।'

'গণ্ডগোল আশা করি হবে না, যদিও সেটা নির্ভর করছে ম্যাক্সওয়েল সাহেবের উপর, কারণ পাথরটা ওঁর জিম্মায় রয়েছে।'

ইতিমধ্যে ম্যাক্সওয়েল তার রিভলভারটা বার করেছে, এবার সেটা ফেলুদাকে দেখতে দিল। দেখেই বুঝলাম সেটা ফেলুদার কোল্ট না, অন্য কোম্পানির তৈরি।

'ওয়েবলি স্কট', বলল ফেলুদা। তারপর রিভলভারটা ফেরত দিয়ে বলল, 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস কতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার এটার দরকার হয় কেন?'

'ফোটোগ্রাফির নেশা আমাকে নানান জায়গায় নিয়ে যায়।

অনেক দুর্গম জায়গায় আমি গিয়েছি, জংলি উপজাতিদের ছবি তুলেছি। বুঝতেই পারছ সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই রিভলভার দিয়ে আমি অ্যাফ্রিকায় ব্ল্যাক মাম্বা সাপ পর্যন্ত মেরেছি।'

'ভারতবর্ষে এর আগে কখনও এসেছ?'

'না, এই প্রথম।'

'ছবি তোলা শুরু করে দিয়েছ?'

'কলকাতার কিছু জনবহুল অঞ্চলের ছবি তুলেছি।'

'তার মানে বস্তি?'

'হ্যাঁ। আমি যেই পরিবেশে মানুষ সেরকম পরিবেশের ছবি তোলার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। তার থেকে যত অন্যরকম হয় ততই ভাল। আমার মনে হয় পভার্টি ইজ মোর ফোটোজেনিক দ্যান প্রসপেরিটি।'

'ফোটো—হোয়াট?' প্রশ্নটা করলেন জটায়ু।

'ফোটোজেনিক', বলল ফেলুদা। 'অর্থাৎ চিত্রগুণসম্পন্ন।'

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে বাংলায় মন্তব্য করলেন, 'এ কি বলতে চায় হাড়হাভাতেরা আর মোর ফোটোজেনিক দ্যান যারা খেয়ে-পরে আছে?'

ম্যাক্সওয়েল বলল, 'কাজেই এখানেও আমাদের ওই কথাটা মনে রাখতে হবে। ওই কথা মনে রেখেই আমি এখানেও ছবি তুলব।'

ভদ্রলোকের কথাগুলো আমার কেন জানি অদ্ভুত লাগছিল। পিটার ভারতবর্ষকে ভালবাসে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বন্ধুর মনোভাব এত অন্যরকম হয় কী করে? এই বন্ধুত্ব টিকবে তো?

বর্ধমানে চা-ওয়ালা ডেকে ভাঁড়ে চা খাওয়া হল, সেই চা ওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে তার ছবি তুললেন ম্যাক্সওয়েল।

বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে সাইকেল রিকশার ভিড় দেখে ম্যাক্সওয়েল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পিটার তাকে জানিয়ে দিল যে স্টেশনে এত সময় নষ্ট করা চলবে না।

চারটে রিকশা নিয়ে মালপত্রসমেত আমরা যখন বোলপুর টুরিস্ট লজে পৌঁছলাম তখন একটা বেজে দশ মিনিট।

॥ ৩ ॥

স্টেশনে লালমোহনবাবুর বন্ধু শতদল সেন এসেছিলেন। লালমোহনবাবুরই বয়সী, ফরসা রঙ, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল। অনেকদিন পরে একজনকে দেখলাম যিনি লালমোহনবাবুকে লালু বলে সম্বোধন করলেন। ভদ্রলোক নিজেও অবিশ্যি হয়ে গেলেন সতু।

যে যার ঘরে যাবার আগে টুরিস্ট লজের লাউঞ্জে বসে কথা হচ্ছিল। শতদলবাবু বললেন, 'তোদের গাড়ি বলছিস তিনটে নাগাত আসবে। তারপর তোরা চলে আসিস আমার ওখানে। পিয়ার্সন পল্লীতে খোঁজ করলেই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। নাম শান্তিনিলয়। তোদের একবার উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সটা দেখিয়ে আনব।'

ফেলুদা বলল, 'আমাদের সঙ্গে কি দুজন সাহেব যেতে পারেন?'

'বেশ তো তারাও ওয়েলকাম।'

শতদলবাবু চলে গেলেন।

সকালে স্নান করে বেরিয়েছিলাম, তাই ঘরে মালপত্তর রেখে প্রথমেই লাঞ্চটা সেরে নিলাম। শান্তিনিকেতনে সত্যিই শান্ত পরিবেশ, তাই ফেলুদার রেস্ট হবে ভাল। ও সম্প্রতি দুটো মামলা করে এসেছে। প্রথমটা মনে হয়েছিল আত্মহত্যা, কিন্তু শেষটায় দাঁড়াল খুন আর দ্বিতীয়টা জালিয়াতি। দুটোই বেশ ঝামেলার কেস ছিল, তাই ওর এখন সত্যিই বিশ্রামের দরকার।

ডাইনিং রুমেই পিটার আর টমকে আমাদের বিকেলের প্ল্যানটা বলে দিলাম। পিটার তৎক্ষণাৎ রাজি, যদিও টম কিছুই বলল না। পিটার এও বলল যে এর মধ্যেই ও দুবরাজপুরের এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছে। ফোনটা করেছিল তাঁর ছেলে, কারণ ভদ্রলোকের ইংরাজিটা নাকি তেমন সড়গড় নয়। পিটার বলল, 'ভদ্রলোক আমার রুবির খবরটা পেয়েছেন এবং সেটা কেনার

ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি অবিশ্যি বলতে বাধ্য হলাম যে আমি ওটা বেচব না। তাতে ভদ্রলোক ছেলেকে দিয়ে বলালেন যে পাথরটা তাঁর একবার দেখার ইচ্ছে। আশা করি সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করব না।'

'ভদ্রলোকের নাম কী?'

'জি. এল. ঝানঝানিয়া।'

'ঝানঝানিয়া। বুঝলাম। কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'কাল সকাল দশটা।'

'আমরা আসতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। আপনারা এলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব। ইন ফ্যাক্ট, আপনারা ভাল দোভাষীর কাজ করতে পারবেন। দুবরাজপুর আর তার পাশেই হেতমপুরে তো ভাল টেরা কোটার মন্দির আছে বলে ম্যাককাচন লিখেছে। কথা সেরে না হয় সেগুলো দেখে আসব।'

'শুধু মন্দির না', ফেলুদা বলল, 'দুবরাজপুরে আরও দেখার জিনিস আছে। হাতে সময় থাকলে সেও দেখা যেতে পারে।'

হরিপদবাবু অ্যাম্বাসাডর নিয়ে পৌনে চারটেয় এসে পৌঁছালেন। পথে বর্ধমানে খেয়ে নিয়েছিলেন, বললেন আমরা বেরোতে চাইলে বেরোতে পারি।—'আমার বিশ্রামের কোনও দরকার নেই, স্যার।'

আমরা আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম। পিয়ার্সন পল্লী থেকে শতদল সেনকে তুলে নিয়ে ছ'জনে গিয়ে হাজির হলাম উত্তরায়ণে। পিটার এরকম বাড়ি এর আগে দেখেনি, বলল, 'ইট লুকস্ লাইক এ ফেয়ারি টেল প্যালেস!'

উদীচী, শ্যামলীও দেখা হল। কোনওখানেই পতার্টির ছাপ নেই বলেই বোধহয় ম্যাক্সওয়েল তার ক্যামেরা রুদ্রর প্লট বেরোবে না; তার জন্য চাই ক্যালকাটার পরিবেশ।'

ফেরবার পথে পিটার আর টম একটা সাইকেল রিকশা ধরল। পিটার বলল, 'কাছেই একটা ট্রাইব্যাল ভিলেজ আছে, টম তার কিছু ছবি তুলতে চায়।'

বুঝলাম সাঁওতাল গ্রামের কথা বলা হচ্ছে।

সাহেবদের বিদায় দিয়ে আমরা আমাদের ঘরে এসে 'অন্ত্যাক্ষরী' খেলে বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম। খাবার সময় শতদলবাবু তাঁর থলি থেকে একটা বই বার করে জটায়ুকে দিয়ে বললেন, 'এই নিন—"লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন বীরভূম", লেখক এক পাদ্রি, নাম রেভারেন্ড প্রিচার্ড। একশো বছর আগের লেখা বই। ইন্টারেস্টিং তথ্যে বোঝাই। পড়ে দেখবেন।'

'উনি না পড়লেও আমি নিশ্চয়ই পড়ব।' বলল ফেলুদা।

পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সারা হল। দুবরাজপুর এখান থেকে ২৫ কিলোমিটার, যেতে আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না। ঝানঝানিয়ার ছেলে ওদের

বাড়িটা কোথায় সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল, আর তা ছাড়া এও বলেছিল যে দুবরাজপুরে ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাড়ি।

আমরা দশটার পাঁচ মিনিট আগেই একটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাড়ির লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম, গেটের গায়ে ফলকে লেখা জি. এস. ঢানঢানিয়া।

সশস্ত্র দারোয়ান একবার আমাদের মুখটা দেখে নিয়েই গেট খুলে দিতে বুঝলাম যে তাকে বলা হয়েছে সাহেবরা আসছে।

গেট খুলে দিতে গাড়ি ঢুকে খানিকটা মোরামফেলা পথ দিয়ে গিয়েই সদর দরজার সামনে পৌঁছে গেলাম। দরজার সামনে একটা স্কুটার ধরে একজন বছর পঁচিশের ছেলে, সে আমাদের দেখেই স্কুটারটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে এল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। পিটার এগিয়ে গেল যুবকের দিকে। হাত বাড়িয়ে বলল, 'মাই নেম ইজ পিটার রবার্টসন। ইউ মাস্ট বি কিশোরীলাল?'

'হ্যাঁ। আমি কিশোরীলাল ঢানঢানিয়া। আমার বাবা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমার এই তিনজন ভারতীয় বন্ধুও যেতে পারেন তো?'

'নিশ্চয়ই।'

আমরা কিশোরীলালকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতর ঢুকে একটা উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দুটো ঘর আর একটা বারান্দা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

'জুতো খুলতে হবে কি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না না, কোনও দরকার নেই।' কিশোরীলালের বাংলায় বেশ একটা টান আছে।

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। দরজা জানালায় রঙিন কাচ, তাই দিয়ে আলো এসে ঘরটাকে বেশ রংদার করে তুলেছে। ঘরের অর্ধেকটা ফরাস পাতা, বাকি অংশটায় সোফা চেয়ার ইত্যাদি রয়েছে। মালিক বসে আছেন ফরাসের এক প্রান্তে, শীর্ণকায় চেহারায় একটা প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোঁফ একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য এনেছে। চারপাশে তাকিয়া ছড়ানো। মালিক ছাড়াও ঘরে রয়েছেন বছর পঞ্চাশেকের একটি ভদ্রলোক, পরনে ছাই রঙের প্যান্টের সঙ্গে খয়েরি রঙের জ্যাকেট। ইনি আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

পিটার ঢানঢানিয়াকে উদ্দেশ করে ভারতীয় ভঙ্গিতে একটা নমস্কার করে বলল, 'মিঃ ড্যানড্যানিয়া, আই প্রিজিউম।'

'ইয়েস', বললেন ঢানঢানিয়া, 'অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ইনস্পেক্টর চৌবে।'

'ইনি আমার বন্ধু টম ম্যাক্সওয়েল, আর এঁরা তিনজনও আমার বন্ধুস্থানীয়।'

ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র, ইনি মিঃ গাঙ্গুলী, আর এ আমার ভাই তপেশ।'

'সিট ডাউন, বৈঠিয়ে।—কিশোরী রামভজনকো বোলো মিঠাই আর সরবতকে লিয়ে।'

কিশোরীলাল আজ্ঞা পালন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা চেয়ার আর সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম। এবারে লক্ষ করলাম দেয়ালে চতুর্দিকে টাঙানো দেবদেবীর ছবি। মগনলাল মেঘরাজের বেনারসের বৈঠকখানার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

আমরা বসতে ফেলুদা গলা খাকরিয়ে বলল, 'আমাদের তো কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না, আমরা এসেছি মিঃ রবার্টসনের সঙ্গে। আপনার কোনও আপত্তি থাকলে কিন্তু আমরা এখুনি চলে যেতে পারি।'

'নো, নো। স্রেফ একটা পাথর দেখার ব্যাপার, আপনারা থাকলে ক্ষেতি কী?'

ম্যাক্সওয়েল হঠাৎ বলে উঠল, 'মে আই টেক সাম পিকচার্স, মিঃ ঝাওয়ানিয়া?'

'হোয়াট পিকচার্স?'

'অফ দিস রুম।'

'ঠিক হ্যায়।'

'হি সেজ ইউ মে', বলে দিল ফেলুদা।

'লেকিন পহলে তো উয়ো রুবি দেখলাইয়ে।'

'হি ওয়ন্টস্ টু সি দ্য রুবি ফার্স্ট', বলল ফেলুদা।

'আই সি।'

ম্যাক্সওয়েল ক্যামেরাটা পাশে সরিয়ে রেখে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রুবির কৌটোটা বার করল। তারপর সেটাকে খুলে ঢানঢানিয়ার দিকে এগিয়ে দিতে আমার বুকটা কেন জানি ধুকপুক করে উঠল।

ঢানঢানিয়া পাথরটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কোনও মন্তব্য না করে সেটা তাঁর বন্ধু ইন্সপেক্টর চৌবের হাতে চালান দিলেন। চৌবে সেটা খুব তারিফের দৃষ্টিতে দেখে আবার ঢানঢানিয়াকে ফেরত দিল।

'হোয়াট প্রাইস ইন ইংল্যান্ড?' ঢানঢানিয়া প্রশ্ন করলেন।

'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড পাউন্ডস', বলল পিটার রবার্টসন।

'হুম—দশ লাখ রুপেয়া...'

এবার পাথরটা বাক্সে রেখে সেটা ম্যাক্সওয়েলকে ফেরত দিয়ে ঢানঢানিয়া বললেন, 'আই উইল পে টেন ল্যাখস।'

লাখ ব্যাপারটা সাহেবরা বোঝে না বলে আবার ফেলুদাকে বলে দিতে হল, 'হি মিনস ওয়ান মিলিয়ান রুপিজ।'

'কিন্তু তার প্রশ্ন আসছে কী করে', বলল রবার্টসন, 'আমি তো পাথরটা বিক্রি করব না।'

এই প্রথম বুঝলাম ঢানঢানিয়া ইংরিজিটা দিব্যি বোঝেন, কেবল বলার সময় হোঁচট খান।

'হোয়াই নট?' শুধোলেন ঢানঢানিয়া।

'আমার পূর্বপুরুষের সাধ ছিল এটা ভারতবর্ষে ফেরত যাক', বলল রবার্টসন, 'আমি তাঁর সে সাধ পূরণ করতে এসেছি। আমি এ পাথর নিয়ে ব্যবসা করব না। এটা আমি কলকাতার মিউজিয়মে দিয়ে দেব।'

'দ্যাট ইজ ফুলিশ', বললেন ঢানঢানিয়া। 'যাদুঘরে এই পাথর আলমারির এক কোণে পড়ে থাকবে। লোকে ভুলেই যাবে ওটার কথা।'

'সে তো আপনাকে বিক্রি করলে আপনি ওটা বাক্স-বন্দি করে রেখে দেবেন।'

'ননসেন্স!' বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন ঢানঢানিয়া। 'আমি আমার নিজের মিউজিয়ম করব—যেমন সালার জং মিউজিয়ম আছে হায়দ্রাবাদে। সেই রকম মিউজিয়ম আমি করব, দুবরাজপুরে নয়, কলকাতায়। গণেশ ঢানঢানিয়া মিউজিয়ম। লোকে এসে আমার কালেকশন দেখে যাবে। ইওর রুবি উইল বি ইন এ স্পেশাল শো কেস। লোকে এসে দেখে তারিফ করবে। রুবির তলায় লেখা থাকবে সেটা কোত্থেকে কীভাবে পাওয়া গেছে। তোমার নাম ভি থাকবে।'

এবার দুজন ভৃত্যের প্রবেশ ঘটল। তাদের একজনের হাতে ট্রেতে লাড্ডু, আরেকজনের ট্রেতে সরবত।

'লাড্ডু খান, খেয়ে ডিসাইড করুন মিঃ রবার্টসন।'

আমরা ডান হাতের কাজটা সেরে ফেলার জন্য তৈরি হলাম। লাঞ্চ টাইম হতে এখনও দেরি, কিন্তু পেট বলছে খেতে আপত্তি নেই। বীরভূমের জলের কথা আগেই শুনেছিলাম।

আমাদের সঙ্গে সাহেবরাও লাড্ডু খেল। তারপর সরবত খাবার সময় দেখি টম ম্যাক্সওয়েল পকেট থেকে একটি বড়ি বের করে তাতে ফেলে দিল।

'মিঃ মিটার', বললেন গণেশ ঢানঢানিয়া, 'আপনার বন্ধুদের বলে দিন কি বীরভূমের জল পিউরিফাই করার কোনও দরকার হয় না।'

ফেলুদা অবিশ্যি সেটা আর বলল না।

'ওয়েল?' মিষ্টি খাবার পর গুরুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন গণেশ

ঢানঢানিয়া। ওর শীর্ণ শরীর থেকে এই হেঁড়ে গলা বার হওয়াটাও বেশ একটা অবাক করা ব্যাপার।

'ভেরি সরি মিঃ ঢ্যানঢ্যানিয়া', বলল রবার্টসন, 'আমি তো বলেইছিলাম এ পাথর বিক্রির জন্য নয়। তুমি দেখতে চেয়েছিলে তাই দেখলাম।'

এবার ইন্সপেক্টর চৌবে মুখ খুললেন।

'আমি খালি প্রশ্ন করতে চাই। পাথর বিক্রি করা না-করা আপনার মর্জি। কিন্তু এমন একটা জিনিস আপনার বন্ধু ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে আমার মোটেই ভাল লাগছে না! আপনি বললে আমি ওটার প্রোটেকশনের জন্য লোক দিতে পারি। সে হবে প্লেন ক্লোদস্ ম্যান। আপনি তাকে পুলিশ বলে বুঝতেও পারবেন না, কিন্তু সে আপনাদের নিরাপত্তা এনশিওর করবে।'

'পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই', বলল টম ম্যাক্সওয়েল। 'আমার কাছে এ পাথর সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় আছে। চোর চ্যাচড় এর ওপর দৃষ্টি দিলে তাকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। আমি নিজেই অস্ত্রধারণ করি পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই।'

চৌবে হাল ছেড়ে দিলেন।

'ঠিক আছে। আপনার যদি এতই কনফিডেন্স থাকে তা হলে আমার বলার কিছু নেই।'

'আপনারা ক'দিন আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ঢানঢানিয়া।

'চার পাঁচ দিন তো বটেই', বলল পিটার রবার্টসন। 'আমি নিজে টেরা কোটা মন্দির সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড, এবং সেই নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি।'

'থিংক, মিঃ রবার্টসন, থিংক,' বললেন ঢানঢানিয়া 'থিংক অব টু ডেস—দেন কাম টু মি অ্যাগেন।'

'বেশ তো। ভাবতে তো আর পয়সা লাগে না। ভেবে নিয়ে তারপর তোমাকে আবার জানাব।'

'গুড', বললেন ঢানঢানিয়া, 'অ্যান্ড গুড বাই।'

॥ ৪ ॥

'বাঃ—এ দৃশ্যই ভাবা যায় না।'

গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথাটা বললেন জটায়ু। উনি না বললে হয়তো আমি বলতাম, কারণ এরকম দৃশ্য আমি এর আগে কখনও দেখিনি। প্রায় এক বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে ছোট বড় মাঝারি সাইজের পাথর কাত হয়ে পড়ে আছে না হয় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে যেগুলোর হাইট সত্যিই উঁচু সেগুলো প্রায় তিন তলা বাড়ির সমান। এক-একটা বিশাল দাঁড়ানো পাথর আবার মাঝখান থেকে চিরে দু'ভাগ হয়ে গেছে—হয়তো সুদূর অতীতের কোনও

ভূমিকম্পের চিহ্ন। দৃশ্যটার মধ্যে এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক ছাপ রয়েছে যে একটা পাথরের পাশ দিয়ে যদি একটা ডাইনোসর বেরিয়ে আসে তা হলেও অবাক হব না।

এইখানেই একটা বিশেষ জোড়া পাথরকে বলা হয় মামা-ভাগ্নে, আর তার থেকে পুরো জায়গাটারই নাম হয়ে গেছে মামা-ভাগ্নে, আর তার থেকে পুরো জায়গাটারই নাম হয়ে গেছে মামা-ভাগ্নে।

গণেশ চানচানিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই ফেলুদা প্রস্তাব করল দুবরাজপুরেই যখন আসা হয়েছে তখন মামা-ভাগ্নে না দেখে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তৌবেও প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সাহেবরা এটার কথা আগে শোনেনি, এসে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। পিটার খালি খালি বলছে 'ফ্যানট্যাস্টিক...ফ্যানটাস্টিক', আর টমের মুখে এই প্রথম হাসি দেখা দিয়েছে। সে একটা ছবি তোলার বিষয়ও পেয়ে গেছে—একটা উঁচু পাথরের মাথায় বসে একটা সাধু চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াচ্ছে। তিনি কী করে ওই টঙে চড়েছেন তা মা গঙ্গাই জানেন।

পিটার বলল, 'আচ্ছা, চারিদিকে ত্রিসীমানায় কোনও পাথর দেখছি না, অথচ এইখানে এত পাথর—এ নিয়ে কোনও কিংবদন্তি নেই?'

'ডু ইউ নো গড হনুমান?'

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিতভাবে করলেন জটায়ু। উত্তরে পিটার মৃদু হেসে বলল, 'আই হ্যাভ হার্ড অফ হিম।'

এর পরে লালমোহনবাবু যা বললেন, একসঙ্গে এতটা নির্ভুল ইংরিজি বলতে তাঁকে এর আগে কখনও শুনিনি।

'ওয়েল, হোয়েন গড হনুমান ওয়জ ফ্লাইং থ্রু দ্য এয়ার উইথ ম্যাউন্ট গন্ধমাদন অন হিজ হেড, সাম রকস্ ফ্রম দি মাউনটেন ফেল হিয়ার ইন সুবরাজপুর।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং', বলল পিটার রবার্টসন।

সাহেব থাকা সত্ত্বেও ফেলুদা জটায়ুকে উদ্দেশ করে বাংলায় বলল, 'হনুমানের কিংবদন্তিটা বোধহয় আপনার কল্পনাপ্রসূত?'

'নো স্যার!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু। 'লজের ম্যানেজার নিজে আমায় এটা বলেছেন। এখানে সবাই এটাই বিশ্বাস করে।'

'"বাংলায় ভ্রমণ" তা বলেনি।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধনের জন্য পাথর আনাইলেন, তখন কিছু পাথর পুষ্পক রথ থেকে এখানে পড়ে যায়।'

'ভালই, তবে নট অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই হনুমান।'

ম্যাক্সওয়েলের মনে হল পাথরের ছবি তুলতে বিশেষ ভাল লাগছে না, যদিও আমার মনে হচ্ছিল পাথরগুলো দারুণ ফোটোজেনিক। ওর সুযোগ এল মামা-ভাগ্নের এক প্রান্তে পাহাড়েশ্বর শিব আর শ্মশানকালীর মন্দিরে এসে।

মন্দিরে পুজো দেওয়া ও বোধহয় এই প্রথম দেখল, কারণ দেখলাম ওর ক্যামেরার খচ খচ শব্দ আর থামছে না। এই শ্মশানকালীকেই নাকি রঘু ডাকাত পুজো দিত।

চৌবে দেখলাম ম্যাক্সওয়েলের কাণ্ড দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, 'এখানে অনেকেই কিন্তু বিদেশীরা যে সব কিছুর ছবি তুলে নিয়ে যায় সেটা পছন্দ করে না। এই ব্যাপারে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে।'

'কেন?' ফোঁস করে বলে উঠল ম্যাক্সওয়েল। 'এখানে চোখের সামনে যা ঘটছে তারই তো ছবি তুলছি আমি, জোচ্চুরি তো করছি না।'

'তাও বলছি—কখন, কী নিয়ে কে আপত্তি করে বসে তা বলা যায় না। ভারতীয়রা এ ব্যাপারে একটু সেনসিটিভ। আমাদের কিছু আচার ব্যবহার বিদেশীদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেগুলোর ছবি তুলে বাইরে প্রচার করাটা অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হতে পারে।'

ম্যাক্সওয়েল তেড়েমেড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পিটার তাকে একটা মৃদু ধমকে নিরস্ত করল।

আমরা মামা-ভাগ্নে দেখে তেষ্টা মেটানোর জন্য কিছুদূরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে রাস্তার উপরেই রাখা বেঞ্চিগুলোতে বসে চা আর

মালখাটাই অর্ডার দিলাম। হরিপদবাবু বললেন উনি এই ফাঁকে একবার চা খেয়ে নিয়েছেন তাই আর খাবেন না।

ইন্সপেক্টর চৌবে ফেলুদার পাশে বসেছিলেন, তাঁর পাশে আমি। তাই চৌবে যে কথাটা বললেন সেটা আমার কানে এল।

'আপনার নাম শুনেই আমি আপনাকে চিনেছি, কিন্তু সেটা আর প্রকাশ করিনি, কারণ মনে হল সর্বত্র আপনার আসল পরিচয়টা প্রকাশ পেয়ে যায় সেটা হয়তো আপনি চাইবেন না।'

'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন', বলল ফেলুদা।

'এখানে কি বেড়াতে?'

'পুরোপুরি।'

'আই সি।'

'আপনি তো বিহারের লোক বোধহয়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু পাঁচপুরুষ ধরে আমরা বীরভূমেই রয়েছি। ভাল কথা, ম্যাক্সওয়েল ছেলেটির সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও যোগসূত্র আছে কি?'

'ম্যাক্সওয়েলের ঠাকুরদার ঠাকুরদাদা এই বীরভূমেই একটা নীলকুঠির মালিক ছিলেন। নাম বোধহয় রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল।'

'তাই হবে। আমি ছেলেবেলায় বাপ-ঠাকুরদাদার মুখে এক ম্যাক্সওয়েল সাহেবের নাম শুনেছি, তিনিও নীলকুঠির মালিক ছিলেন। দাতপুরের কাছে ছিল তাঁর কুঠি। গাঁয়ের লোকে বলত ম্যাকশেয়াল সাহেব। তারপর ক্রমে সেটা খ্যাঁকশেয়ালে পরিণত হয়।'

'কেন?'

'কারণ লোকটা ছিল ঘোর অত্যাচারী এবং অহংকারী। এর মধ্যেও দেখছি সেই পূর্বপুরুষের রক্ত কিছুটা বইছে। অথচ রবার্টসন সাহেব কিন্তু একবারেই সেরকম নন, সত্যি করেই ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের ভালবাসেন।'

চা পর্ব সেরে দুবরাজপুরের দু'মাইলের মধ্যে হেতমপুরে কয়েকটা সুন্দর টেরা কোটা মন্দির দেখে আমরা লাঞ্চের আগেই টুরিস্ট লজে ফিরে এলাম। হেতমপুরের মন্দিরের গায়ে দুশো বছরের পুরনো থামে মেমসাহেবের মূর্তি দেখে রবার্টসন মুগ্ধ। ম্যাক্সওয়েলের দেখলাম মন্দির সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই। সে রাস্তার ধারে টিউবওয়েলে এক মা তার বাচ্চাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল, তারই কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল।

হেতমপুর থেকে চৌবে বিদায় নেবার আগে ফেলুদা তাকে একটা প্রশ্ন করল।

'আপনার সঙ্গে তো চানচানিয়ার যথেষ্ট পরিচয় আছে দেখলাম। লোকটা কেমন?'

চৌবে বলল, 'পরিচয় মানে ও আমাকে হাতে রাখতে চায়। ওর নানারকম

সব ধোঁয়াটে কারবার আছে, তাই পুলিশের সঙ্গে ওর দোস্তি রাখাটা দরকার। আমি অবশ্য ওর খাতিরের মানে বুঝি এবং সব সময়ই চোখ কান খোলা রাখি। গোলমাল দেখলে আমি ওকে রেহাই দেব না। তবে লোকটা ধনী। ওই রুবির জন্য দশ লাখ দিতে ওর গায়ে লাগবে না।'

'ওঁর ছেলে কি ওর বাপের ব্যবসা দেখে?'

'কিশোরীলালের নিজের ইচ্ছা নেই বাপের ব্যবসায় থাকার। সে নিজে একটা কিছু করতে চায় এবং সেই নিয়ে তার বাপের সঙ্গে কথাও হয়েছে। গণেশ তার ছেলেকে খুব ভালবাসে, তাই শেষ পর্যন্ত সে রাজিও হয়ে যেতে পারে।'

'আই সি।'

'ভাল কথা—আপনাদের কালকের প্ল্যান কী?'

'কাল ভাবছি সকালে একবার কেন্দুলির মেলাটা দেখে আসব।'

'আপনারা সবাই যাবেন? ইনক্লুডিং এই দুই সাহেব?'

'সেরকমই তো মনে হয়।'

'তা হলে আপনাকে বলে দিই—আপনি এই ম্যাক্সওয়েল ছোকরাটির উপর একটু দৃষ্টি রাখবেন। ওর ব্যবহার আমার মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'নিশ্চয়ই রাখব।'

লজে ফিরে এসে আরও দুজনের সঙ্গে আলাপ হল—তাদের কথা এই বেলা লিখে রাখি।

এক—মিস্টার নস্কর। ইনি কলকাতার একজন নাম-করা ধনী ব্যবসায়ী। ইনি আগেই দুটোর সময় নিজের গাড়িতে এসে পৌঁছেছেন।

দুই—জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি বোলপুরেই থাকেন। স্টেটসম্যানে পিটারের লেখাটা পড়ে সোজা আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করে বললেন উনি বীরভূম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। এখানকার প্রত্যেকটি টেরা কোটা মন্দির ওর দেখা এবং সে ব্যাপারে উনি সাহেবদের খুব সাহায্য করতে পারেন। পিটার তাঁকে বলে দিল ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে।

মিঃ নস্কর—পরে জেনেছিলাম পুরো নাম অর্ধেন্দু নস্কর—ট্যুরিস্ট লজে এসে লাউঞ্জে আমাদের দেখা পেলেন। আমরা সবাই তখন লাঞ্চের ডাক কখন পড়বে তার অপেক্ষায় বসে আছি। ভদ্রলোক এসে ঢুকতে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, কারণ চেহারাটা বেশ চোখে রিমলেস চশমা, পরনে গাঢ় নীল সুটের সঙ্গে জামার উপর কালো নকশা করা স্কার্ফ।

ভদ্রলোক দুজন সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে 'মিঃ রবার্টসন?' বলতেই পিটার উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। ভদ্রলোক করমর্দন করে বললেন, 'মাই নেম ইজ ন্যাস্কার। আমি স্টেটসম্যানে তোমার লেখাটা পড়ে খোঁজখবর করে তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে সোজা এখানে চলে আসছি আমার গাড়িতে।'

'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

নন্দর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পিটারের মুখোমুখি বসে বলল, 'আগে তোমার মুখ থেকে আমি একটা কথা শুনতে চাই...'

'কী?'

'দেড়শো বছর আগে তোমার পূর্বপুরুষ তাঁর ডায়রিতে যে বাসনার কথা লিখেছেন, তুমি কি সত্যিই সেটা পূরণ করতে এদেশে এসেছ?'

'অ্যাবসোলিউটলি', বলল পিটার।

'তুমি কি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস কর? তোমার কি সত্যিই ধারণা যে রুবিটা ভারতবর্ষে ফেরত দিলে তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে?'

পিটার শুকনো গলায় উত্তরটা দিল।

'আমি কী বিশ্বাস করি বা না করি সেটা জানার কী দরকার? যতদূর বুঝছি আপনি রুবিটা কেনার প্রস্তাব করছেন। আমার উত্তর হল আমি ওটা বেচব না।'

'তুমি তোমার দেশের জহুরিকে এটা দেখিয়েছ?'

'দেখিয়েছি।'

'রুবির দাম তার মতে কত হতে পারে?'

'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড পাউন্ডস।'

'পাথরটা কি হাতের কাছে আছে? সেটা একবার দেখতে পারি?'

পাথরটা টমের কাছেই ছিল; সে ব্যাগ থেকে কৌটোটা বার করে নন্দরকে দিল। মিঃ নন্দর কৌটোটা খুলে পাথরটা বার করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তারপর পিটারের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের দুজনের কাউকেই তো তেমন ধনী বলে মনে হচ্ছে না।'

'তার কারণ', বলল পিটার, 'আমরা ধনী নই। কিন্তু এও বলতে পারি যে আমরা লোভীও নই।'

'আমরা দুজনে কিন্তু এক ছাঁচে ঢালা নই', টম ম্যাক্সওয়েল হঠাৎ বলে উঠল।

'তার মানে?' নন্দর শুধোলেন।

পিটার বলল, 'আমার বন্ধু বলতে চাইছে যে এ ব্যাপারে আমাদের দুজনের মধ্যে মতের সম্পূর্ণ মিল নেই। অর্থাৎ রুবিটা বিক্রি করে দু' পয়সা রোজগারের ব্যাপারে তার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু রুবিটা তো ওর প্রপার্টি নয়, আমার প্রপার্টি; কাজেই ওর কথায় তেমন আমল না দিলেও চলবে।'

টম দেখি গম্ভীর হয়ে গেছে, তার কপালে গভীর খাঁজ।

'এনিওয়ে', বললেন নন্দর, 'আমি এখানে আরও তিনদিন আছি। শান্তিনিকেতনে আমার বাড়ি রয়েছে। আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। অত সহজে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না মিস্টার রবার্টসন। আমি আপনাকে বারো লাখ টাকা দিতে রাজি আছি। আমার মূল্যবান পাথরের সংগ্রহ

সারা ভারতবর্ষে পরিচিত। এত বড় একটা রোজগারের সুযোগকে আপনারা কেন হেলাফেলা করছেন জানি না। আশা করি ক্রমে আপনাদের মত পরিবর্তন হবে।'

পিটার বলল, 'এখানে একটা কথা কিন্তু বলা দরকার। আপনার আগে আরেকজন আমাদের অফার দিয়েছেন।'

'কে?'

'দুবরাজপুরের একজন ব্যবসায়ী।'

'ঢানঢানিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'ও কত দেবে বলেছে?'

'দশ লাখ। সেটা আরও বাড়বে না এমন কোনও কথা নেই।'

'ঠিক আছে। ঢানঢানিয়াকে আমি খুব চিনি। ওকে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

মিঃ নস্কর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আর ওদিকে ডাইনিং রুম থেকে খবর এল যে পাত পড়েছে।

॥ ৫ ॥

বোলপুর থেকে ২৫ মাইল দূরে আড়াইশো বছর আগে বর্ধমানের এক মহারানির তৈরি রাধাবিনোদের টেরা কোটা মন্দির ঘিরে চলেছে কেন্দুলির বিরাট মেলা। মেলা বলতে যা বোঝায় তার সবই এখানে আছে। দক্ষিণ দিয়ে বয়ে চলেছে অজয় নদী।

আমরা আমাদের গাড়িতেই এসেছি সকলে; সেটা সম্ভব হয়েছে ফেলুদা গাড়ি চালানোর ফলে। আমরা তিনজন সামনে আর পিছনে পিটার, টম ও জগন্নাথ চাটুজ্যে। মেলার এক পাশে একটা বিরাট বটগাছের তলায় বাউলরা জমায়েত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন আবার একতারা আর ডুগডুগি নিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে—

আমি অচল পয়সা হলাম রে ভবের বাজারে

তাই ঘৃণা করে ছোঁয় না আমায় রসিক দোকানদার...

জগন্নাথবাবু এদিকে পিটারকে মন্দিরের গায়ের কারুকার্য বোঝাচ্ছে। আমিও কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক দৃশ্য মন্দিরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে।

টম একটু আগেও আমাদের পাশেই ছিল, এখন জানি না কোথায় চলে গেছে।

একটা সুযোগ পেয়ে ফেলুদা পিটারকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে একটা প্রশ্ন করল, যেটা আমার মাথায়ও ঘুরছিল।

'তোমাদের দু'জনের বন্ধুত্বে কি একটু চিড় ধরেছে? টমের কথাবার্তা হবেভাব কাল থেকেই আমার ভাল লাগছে না। তুমি ওর উপর কতখানি বিশ্বাস রাখ?'

পিটার বলল, 'আমরা একই স্কুলে একই কলেজে পড়েছি। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বাইশ বছরের। কিন্তু ভারতবর্ষে আসার পর থেকে ওকে যেমন দেখছি তেমন আর আগে কখনও দেখিনি। ওর মধ্যে কতকগুলো পরিবর্তন দেখছি। এক এক সময় মনে হয় ওর ধারণা ব্রিটিশরা এখনও বুঝি ভারতীয়দের শাসন করে। তা ছাড়া ওদেশে থাকতে রুবিটা ভারতবর্ষে ফেরত দেবার ব্যাপারে ও কোনও আপত্তি করেনি। এখন মনে হচ্ছে ওটা বিক্রি করতে পারলে ও আরও খুশি হয়।'

'ওর কি খুব টাকার দরকার?'

'ও সারা পৃথিবী ঘুরে ছবি তুলতে চায়—বিশেষ করে যেসব দেশে দারিদ্র্যের চেহারাটা খুব প্রকট। এতে যা খরচ হবে সে টাকা ওর কাছে নেই। তবে রুবিটা বিক্রি করলে যা টাকা পাওয়া যাবে তাতে আমাদের দুজনের খরচ কুলিয়ে যাবে।'

'ও যদি তোমাকে না জানিয়ে পাথরটা পাচার করে?'

'সেরকম বিশ্বাসঘাতকতা ও করবে বলে মনে হয় না। আমি ওকে মাঝে মাঝে শাসন করতে শুরু করেছি। মনে হয় তাতে কাজ দেবে।'

ফেলুদা এদিক ওদিক দেখে বলল, 'ও কোথায় গেছে বলতে পারো?'

'তা তো জানি না। আমাকে বলে যায়নি।'

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী?'

'দক্ষিণ দিকে নদীর পাড় থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখে বুঝতে পারছি ওখানে শ্মশান আছে। ও আবার তার ছবি তুলতে যায়নি তো? একবার গিয়ে দেখা দরকার।'

লালমোহনবাবু কাছেই একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা তাঁকে ডেকে নিয়ে ধোঁয়ার দিকে রওনা দিলাম।

বাউলের দল পেরিয়ে নদীর পাড়। সেখান থেকে জমিটা ঢালু হয়ে গিয়ে জলে মিশেছে।

ওই যে শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে, আরেকটা চিতায় শুইয়ে তার উপর কাঠ চাপানো হচ্ছে।

'ওই তো টম!' পিটার চেঁচিয়ে উঠল।

আমিও দেখলাম টমকে। সে ক্যামেরা হাতে যে মড়াটায় কাঠ চাপানো হচ্ছিল তার ছবি তোলার তোড়জোড় করছে।

'হি ইজ ডুইং সামথিং ভেরি ফুলিশ', বলল ফেলুদা।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা যে সত্যি সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। মড়ার কাছেই গোটা চারেক মস্তান টাইপের ছেলে বসেছিল। টম সবে ক্যামেরাটা

চোখের সামনে ধরেছে আর সেই সময় একটা মাস্তান টমের দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরাটায় মারল একটা চাপড়, আর যন্ত্রটা টমের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে বালির একটা চাপড়, আর যন্ত্রটা টমের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে বালির ওপর পড়ল।

আর টম? সে বিদ্যুদ্বেগে তার ডান হাত দিয়ে মস্তানের নাকে মারল এক ঘুঁষি। মাস্তানটা হাত দিয়ে মুখ চেপে মাটিতে বসে পড়ল। হাত সরাতে দেখি ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে মাস্তানদের সামনে হাত তুলে দাঁড়াল, তার পিছনেই টম।

ফেলুদা এবার মুখ খুলল। যতটা সম্ভব নরম করে সে কথাগুলো বলল।

'আপনারা এইবারের মতো এই সাহেবকে মাপ করে দিন। উনি নতুন এসেছেন, কোথায় কী করতে হয় না-হয় সে বিষয়ে এখনও ধারণা নেই। মৃতদেহের ছবি তুলে উনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। সেটা আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। আপনারা এইবারের মতো ওকে মাপ করে দিন।'

অবাক হয়ে দেখলাম একজন মাস্তান এগিয়ে এসে ঢিপ করে ফেলুদাকে একটা প্রণাম করে বলল, 'আপনি স্যার ফেলুদা নন? একেবারে সেই মুখ, সেই ফিগার!'

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি আমি ফেলু মিত্তির। এই সাহেব আমাদের বন্ধু। আপনারা দয়া করে এঁকে রেহাই দিন।'

'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে', কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল মাস্তানের দল। আমি বুঝলাম ফেলুদাকে চিনে ফেললে ফল যে সব সময় খারাপ হয় তা মোটেই না।

কিন্তু যে মাস্তান ঘুঁষি খেয়েছিল সে এ পর্যন্ত কথা বলেনি, এবার বলল—'আমি এর বদলা নেব, মনে রেখো সাহেব—চাঁদু মল্লিকের কথা নড়চড় হয় না।'

আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। বালির উপর পড়াতে টমের ক্যামেরার কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে ও দেখলাম বেশ হকচকিয়ে গেছে। আশা করি এবার থেকে ও একটু সাবধান হবে।

আমাদের মেলা দেখার শখ মিটে গিয়েছিল, তাই আমরা বোলপুরমুখো রওনা দিলাম।

বোলপুরে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে লাউঞ্জে এসে বসতেই দেখি চৌবে হাজির।

'আপনাদের খবর নিতে এলাম', বললেন চৌবে। পুলিশের চোখ, তাই বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা গোলমাল হয়েছে?'

'বিস্তর গোলমাল', বলল ফেলুদা। তারপর শ্মশানের ঘটনাটা বর্ণনা করে বলল, 'চাঁদু মল্লিক নামটা কি চেনা চেনা মনে হচ্ছে?'

'বিলক্ষণ চেনা', বললেন চৌবে। 'হেতমপুরে থাকে, নাম-করা গুণ্ডা। বার তিনেক জেলেও গেছে। ও যদি বদলা নেবার কথা বলে থাকে তো সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।'

ইতিমধ্যে টম ঘরে চলে গিয়েছিল। পিটার বসেছিল আমাদের সঙ্গে। চৌবে ইংরিজিতে বললেন, 'শুধু একটিমাত্র লোক এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তিনি হলেন পিটার রবার্টসন। মিঃ রবার্টসন—প্লিজ কনট্রোল ইওর ফ্রেন্ড'স টেমপার। ভারতবর্ষ পঁয়তাল্লিশ বছর হল স্বাধীন হয়েছে। তাদের প্রাক্তন মনিবদের কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার আজ আর কোনও ভারতীয় বরদাস্ত করতে পারবে না।'

'সেটা তুমিই ওকে বলো', বলল পিটার। 'আমার মাথায় সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি এই টমকে আর চিনি না। তার সঙ্গে কথা বলতে হয় তুমি বলো। বলে যদি কিছু ফল হয় তা হলে আমাদের এখানে আসাটা সার্থক হবে।'

'ঠিক আছে। আমিই বলছি। কিন্তু পাথরটা কি আপনার বন্ধুর কাছেই থাকবে? সেটা কি আপনার নিজের জিম্মায় রাখা চলে না?'

'আমার অসম্ভব ভুলো মন, জানেন মিঃ চৌবে। পাথরটা মনে হয় ওর কাছেই নিরাপদে আছে। আর ও যদি পাথরটাকে পাচার করতে চায় তা হলে সেটা ও আমাকে না জানিয়ে করবে বলে মনে হয় না।'

আমরা উঠে পড়লাম। সবাই মিলে গিয়ে ঢুকলাম দশ নম্বর ঘরে।

একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে টম ম্যাক্সওয়েল, তার ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা আধ-খাওয়া সিগারেট। ঘরের দরজা খোলাই ছিল, আমরা ঢুকতে

সে মুখ তুলে চাইল, কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। মিঃ চৌবে গিয়ে তার পাশের চেয়ারটায় বসলেন. আমরা বাকি ক'জন দু' খাটে ভাগাভাগি করে বসলাম।

'আর ইউ ট্রাইং টু পুট প্রেশার অন মি?' জিজ্ঞেস করল টম ম্যাক্সওয়েল।

'নো', বললেন চৌবে, 'উই হ্যাভ নট কাম টু প্লিড উইথ ইউ। তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে এসেছি।'

'কী অনুরোধ?'

'ভারতীয়দের প্রতি তোমার যতই বিদ্বেষ থাক না কেন, সেটা বাইরে প্রকাশ কোরো না।'

'আমি তো তোমার কথা মতো চলব না। আমার নিজের বিচারবুদ্ধি যা বলে আমি তাই করব। আমি এই দুই দিনেই দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দেশ কোথায় পিছিয়ে পড়ে আছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছরে তোমরা এক চুলও অগ্রসর হওনি। এখনও তোমরা হাল বলদ দিয়ে চাষ করো, কলকাতার মতো শহরে মানুষ দিয়ে রিমা টানাও, ফুটপাথে লোকে শুয়ে থাকে সপরিবারে—এ সব কি সভ্যতার লক্ষণ? তোমরা এ সব গোপন রাখতে চাও বিশ্বের লোকেদের কাছ থেকে। আমি তা মানব না। আমি ছবি তুলে দেখিয়ে দেব স্বাধীন ভারতবর্ষের আসল চেহারা।'

'শুধু এই ক'টা দিক দেখলে চলবে না, টম ম্যাক্সওয়েল। অন্য কত দিকে আমাদের দেশ এগিয়েছে সেটা তুমি দেখবে না? আমরা মহাকাশে যান পাঠিয়েছি। আমাদের দেশে দৈনিক ব্যবহারের কতরকম জিনিস তৈরি হয়েছে সেটা তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ? জামা-কাপড়, ওষুধপত্র, প্রসাধনের জিনিস, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি—কোনটা না তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষে! শুধু অভাবটাই তুমি দেখবে? তোমাদের দেশে কি নিন্দনীয় কিছু নেই?'

'দুটোর তুলনা কোরো না। ইন্ডিয়ান স্বাধীনতা একটা ভাঁওতা। সেটা আমি আমার ক্যামেরা দিয়ে প্রমাণ করতে চাই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদের উপর যেমন কর্তৃত্ব করে এসেছে, এখনও সেটার দরকার। না হলে এ দেশের কোনও উন্নতি হবে না। মাই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ওয়জ রাইট।'

'মানে?'

'তিনি ছিলেন নীল কুঠির মালিক। হি কিল্‌ড ওয়ন অফ হিজ সার্ভেন্টস টু ডেথ।'

'সে কী!'

'ইয়েস স্যার! হিজ পাংখা-পুলার। এখন তো তবু শীতকাল, গরমে তোমাদের দেশের আবহাওয়া কী বীভৎস হয় তা আমি শুনেছি। সেই গরমকালে রাত্রে আমার পূর্বপুরুষ রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ঘুমোচ্ছিলেন তাঁর বাংলোয়। পাংখাওয়ালা পাংখা টানছিল। টানতে টানতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘাম এবং অজস্র মশার কামড়ের চোটে রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আন্দাজ

করেন ব্যাপারটা কী। বাইরে এসে দেখেন পাংখাপুলার মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। রেজিন্যাল্ড প্রচণ্ড রাগে তার চাকরের পেটে কষে লাথি মারতে থাকেন। তাতে চাকরের ঘুম চিরনিদ্রায় পরিণত হয়। এই হচ্ছে রাইট ট্রিটমেন্ট। তোমরা কী বিশ্রীভাবে মড়া পোড়াও আজ তার ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। এ দৃশ্য আমাদের দেশে কেউ দেখেনি—আমি তাদের দেখাতে চেয়েছিলাম। এ দৃশ্য আমাদের দেশে কেউ দেখেনি—আমি তাদের দেখাতে চেয়েছিলাম। তবে স্থানীয় কয়েকজন হুডলামস্ আমাকে শাসাতে আসে। আমি ঘুঁষি মেরে তাদের একজনের নাক ফাটিয়ে দিই। হি ডিজার্ভড্ ইট। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আপশোস নেই।'

চৌবে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মিস্টার ম্যাক্সওয়েল, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে দ্য সুনার ইউ লিভ আওয়ার কান্ট্রি দ্য বেটার। তুমি থাকলে শুধু দেশের অমঙ্গল নয়, তোমার নিজেরও যে অমঙ্গল হতে পারে সেটা আশা করি বুঝতে পেরেছ।'

'আমি এ দেশে এসেছি ছবি তুলতে। সে কাজ শেষ করে তবে আমি ফিরব।'

'তোমাদের আসার আসল উদ্দেশ্য তো হল রবার্টসনের রুবিটা ফেরত দেওয়া।'

'সেটা পিটারের উদ্দেশ্য—অ্যান্ড আই থিঙ্ক হি ইজ বিইং ভেরি স্টুপিড। ও যদি পাথরটা বেচে দেয় তা হলে আমি আরও অনেক বেশি খুশি হব।'

॥ ৬ ॥

রাত্রে ডিনার সেরে ঘরে বসে আড্ডা মারছি, ফেলুদা সবে একটা চারমিনার ধরিয়েছে, এমন সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

'এত তাড়া কীসের?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আরে মশাই, শতদল একটা বই পড়তে দিয়েছে না—সেটা ছাড়তে পারছি না। টম ম্যাক্সওয়েল যে পাংখা-পুলারকে জুতিয়ে মারার গল্প বলল, সেই ঘটনা এই বইতে রয়েছে।'

'বটে?'

'বইটার নাম লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন বীরভূম; লিখেছেন এক পাদ্রি, নাম রেভারেন্ড প্রিচার্ড. গত সেঞ্চুরির শেষের দিকের ঘটনা। রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল তার চাকরকে খুন করে কিন্তু সেই খুনের জন্য কোনও শাস্তি তাকে কোনওদিন ভোগ করতে হয়নি। এই চাকরের নাম ছিল হীরালাল।

'মারা যাওয়াতে তার ছেলে অনাথ হয়ে পড়ে। এই পাদ্রি তখন ছিলেন সিউড়িতে। তিনি খুনের খবরটা পেয়ে ম্যাক্সওয়েলের নীলকুঠিতে যান। সেখানে এগারো বছরের অনাথ অনন্ত নারায়ণকে দেখে ভারি দুঃখ পান তখনই

ছেলেটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। তারপর ছেলেটিকে ক্রিশ্চান করে একটি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করেন। এই পর্যন্ত পড়েছি মশাই। সেই ছেলেটির কী হল জানার জন্য প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে, সো প্লিজ এক্সকিউজ—'

দরজায় টোকা। খুলে দেখি পিটার রবার্টসন।

'মে আই কাম ইন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। লালমোহনবাবু আবার বসে পড়লেন। পিটারকে গম্ভীর দেখাচ্ছে; কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

'কী ব্যাপার পিটার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু সেল দ্য রুবি।'

'সে কী! বসো, বসো—বসে কথা বলো।'

পিটার বসল। তারপর বলল, 'এই দূর দেশে এসে বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা ভেবে মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। টম বদ্ধপরিকর যে পাথরটা বেচে যা টাকা আসবে তাই দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবে। এই ধারণাটা ওকে একেবারে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। আর আমিও ভেবে দেখলাম—মিউজিয়ামে দিলে ক'জনে আর পাথরটার কথা জানতে পারবে? তাই অনেক ভেবে-চিন্তে...অবশেষে...'

ফেলুদা গম্ভীর। বলল, 'তোমাদের সিদ্ধান্ত আমি নাকচ করার কে? তবে অনেক আশা করেছিলাম যে তোমার সিদ্ধান্তই কায়েমি থাকবে। এখন দেখছি তা নয়।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'কবে বিক্রি করার কথা ভাবছ তুমি?'

'প্রথম অফার যখন চানচানিয়ার তখন ওকেই দেব ভাবছি। ওর সঙ্গে টেলিফোনেও কথা হয়ে গেছে। পরশু সকাল দশটায় টাইম দিয়েছে।'

'একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে বলেছিলে, এখন সেটা একটা মামুলি ঘটনায় পর্যবসিত হল', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ফেলুদা।

'আই অ্যাম ভেরি সরি।'

পিটার চলে গেল। রবার্টসনের রুবির সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপারটা জড়িয়ে জিনিসটা কেমন জানি ঘোলাটে হয়ে গেল।

'গুড মর্নিং।'

আমরা লাউঞ্জে দাঁড়িয়েছিলাম, সকলেই গুড মর্নিং বললাম।

'আজ ফুলবেড়ে গ্রামে চাঁদনি রাতে জবর সাঁওতাল নাচের বন্দোবস্ত হয়েছে।'

'হঠাৎ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'একদল জাপানি ট্যুরিস্ট এসেছে। তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি এসেছি আপনাদের আমার ওখানে ইনভাইট করতে। রাত্রে ডিনার। তারপর দশটা নাগাদ দু' মাইল দূরে সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে নাচ দেখা। কেমন?'

ফেলুদা বলল, 'ইনভাইট করছেন মানে সবাইকে?'

'এভরিওয়ান। আপনারা তিনজন এবং সাহেব দুজন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ', বলল ফেলুদা। 'ক'টায় আসব?'

'এই আটটা আগাদ। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব কি?'

'না না', বলল ফেলুদা। 'আমরা তো ড্রাইভার নিয়ে সবসুদ্ধ ছ'জন—কোনও অসুবিধা হবে না।'

'ভেরি ওয়েল। গুড ডে।'

বক্রেশ্বর গিয়ে মনে হল সেই কোন আদ্যিকালে এসে পড়েছি। সামনে সারি সারি মন্দির, পিছনে জঙ্গল। তার মধ্যে বটগাছই বেশি। কোনও কোনও বটগাছ থেকে ঝুরি নেমে এসে মন্দিরকে আঁকড়ে ধরেছে। এতগুলো মন্দির আর এতগুলো কুণ্ড, জগন্নাথবাবু দেখলাম সবগুলোর নাম জানেন। লালমোহনবাবু পুজো দিলেন। কারণ বললেন, 'না দিলে নিজেকে বড় বে-ধার্মিক মনে হচ্ছে।' দুজন সাহেবের একজন—পিটার রবার্টসন—সুইমিং ট্রাংকস্ পরে সৌভাগ্য কুণ্ডে সাঁতার কাটল। কুণ্ডের নামের মানেটা আগেই জেনে নিয়েছিল। তাই বলল, 'দিস উইল ব্রিং মি গুড লাক্।'

মন্দিরের আগেই ভিখিরির দল। তাই টম ম্যাক্সওয়েলের ফোটোজেনিক বিষয়ের অভাব ঘটেনি।

লজে ফিরে আসার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফেলুদার একটা ফোন এল ইন্সপেক্টর চৌবে; জিজ্ঞেস করল আমরা সাঁওতাল নাচের খবরটা পেয়েছি কি না। ফেলুদা অবিশ্যি নস্করের বাড়িতে ডিনারের খবরটাও পেয়েছি কি না। ফেলুদা অবিশ্যি নস্করের বাড়িতে ডিনারের খবরটাও দিয়ে দিল। বলল, সেখান থেকে আমরা নাচ দেখতে যাব। চৌবে বললেন তিনিও সাড়ে দশটা নাগাদ যাবেন, কাজেই ওখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

মিঃ নস্কর ভালরকম ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ওঁর বাড়ি পেতে দেরি হল না। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান, গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকে পোর্টিকোর নীচে থামল।

নস্কর আমাদের জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন, আমরা গাড়ি থেকে নামতে আমাদের আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটা সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা ক'জন বসলাম। সাহেবদের জন্য ইংরিজিতেই কথাবার্তা হল।

'একা মানুষের পক্ষে তো আপনার বিরাট বাড়ি দেখছি', বলল ফেলুদা।

'একা বটেই, তবে আমার বন্ধু-বান্ধব অনেক। তাদের চার-পাঁচজনকে ধরে নিয়ে প্রায়ই এখানে ছুটি কাটিয়ে যাই।'

নস্কর আর দুই সাহেবের জন্য হুইস্কি এল, আর আমরা ও রসে বঞ্চিত জেনে আমাদের জন্য লিমকা।

লালমোহনবাবুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে হঠাৎ নস্কর বললেন, আপনার বন্ধু যে গোয়েন্দা যে আমি নাম শুনেই বুঝেছি। কিন্তু আপনার সঠিক পরিচয়টা পাওয়া যায়নি। এখন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

উত্তর দিল ফেলুদা।

'ওঁর আসল নামটা অনেকেই জানে না। উনি ছদ্মনামে থ্রিলার লেখেন। সেই নামটা হল জটায়ু। জনপ্রিয়তায় উনি নাম্বার ওয়ান বললে বেশি বলা হবে না।'

'ঠিক, ঠিক—আমি পড়েছি আপনার লেখা। "সাংঘাইয়ে সংঘাত"—কেমন, ঠিক বলিনি?'

লালমোহনবাবু একটা বিনয়ী হাসি হাসলেন।

'আমি সিরিয়াস বই একদম পড়তে পারি না', বললেন নস্কর। 'বিলিতি ক্রাইম ফিকশন পড়ি আর মাঝে মাঝে দু-একটা দিশিও চেয়ে দেখি। এখন কী লিখছেন?'

'আপাতত রেস্ট। গত পুজোয় একটা বেরিয়েছে। নাম শুনে থাকতে পারেন—লন্ডনে লণ্ডভণ্ড।'

'এটাও কি হিট?'

'সাড়ে চার হাজার কপি নিঃশেষ—হেঃ হেঃ!'

মিঃ নস্কর আসল প্রসঙ্গে যেতে বেশি সময় নিলেন না। পিটারের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার প্রস্তাবটা নিয়ে কি আপনি কিছু ভেবেছেন?'

'আমি পাথরটা বিক্রি করে দিচ্ছি।' বলল পিটার।

'দ্যাটস্ এক্সেলেন্ট।'

'কিন্তু আপনাকে না।'

'চানচানিয়া?'

'হ্যাঁ। উনিই প্রথম অফার দিয়েছিলেন তাই...'

'নো, মিঃ রবার্টসন, আপনি ওটা আমাকেই বিক্রি করবেন।'

'সে কী করে হয়? আই হ্যাভ সেট-আপ মাই মাইন্ড।'

'কী করে হয় আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কারণটা আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মুখ দিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।—মিঃ গাঙ্গুলী!'

'আগ্ গেঁ?'

ডাকটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর গলা চিরে দু-ভাগ হয়ে গেল।

'আপনি কাইন্ডলি যদি এই কার্পেটের সামনেটায় এসে দাঁড়ান।'

'আ-আমি?'

'আপনিই সবচেয়ে নিরপেক্ষ এবং সবচেয়ে অমায়িক। আপনি ভয় পাবেন না। আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। আমার একটা বিশেষ ক্ষমতার কথা আপনাদের বলা হয়নি। আমি সকলকে হিপনোটাইজ করতে পারি। সেই অবস্থায় তাদের নানারকম প্রশ্ন করে সঠিক জবাব পেতে পারি। হিপনোটাইজড ব্যক্তি

কখনও মিথ্যা বলে না। কারণ সেই ক্ষমতাটা তাদের সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে যায়। সেই জায়গায় নতুন ক্ষমতা আসে। সেটার পরিচয় আপনারা এখনই পাবেন।'

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে লালমোহনবাবু আপত্তি করার কোনও সুযোগই পেলেন না। ফেলুদাও দেখলাম নির্বিকার। আসলে লালমোহনবাবুকে নিয়ে কেউ রগড় করলে ও সেটা বেশ উপভোগ করে।

নকুড় উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধ ধরে তাঁকে একরকম টেনে এনেই ঘরের মাঝখানে দাঁড় করালেন। তারপর নিজেই গিয়ে ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট লাল টর্চ বার করে সেটা জ্বালিয়ে জটায়ুর চোখের উপর ফেলে আলোটাকে ঘোরাতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর কথাও শুরু হল।

'আপনি সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করুন, আমার উপর নির্ভর করুন। আপনার নিজের সত্তা লোপ পেতে বসেছে, সেই জায়গায় আসছে একটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞ মানুষ।...ইয়েস...ইয়েস...ইয়েস...ইয়েস...'

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি লালমোহনবাবুর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে, তাঁর মুখ হাঁ হয়ে আসছে। তিনি সটান চেয়ে আছেন শঙ্করের দিকে।

এবার টর্চ ঘোরানো থামল, কিন্তু শঙ্কর সেটা লালমোহনবাবুর মুখের উপর ফেলে রাখলেন। তারপর এল প্রথম প্রশ্ন।

'আপনার নাম কী?'

'শ্রী সর্বজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায়, ওরফে লালমোহন, ওরফে জটায়ু।'

লালমোহনবাবুর এ নাম আমি কখনও শুনিনি।

'এ ঘরে ক'জন উপস্থিত আছে?'

'ছ'জন।'

'তাদের সবাই কি বাঙালি?'

'দুজন সাহেব।'

'তাদের নাম কী?'

'পিটার রবার্টসন আর টম ম্যাক্সওয়েল।'

'তাঁরা কোত্থেকে আসছেন?'

'ল্যাঙ্কেশিয়র, ইংল্যান্ড।'

'এঁদের বয়স কত?'

'পিটার চৌত্রিশ বছর তিন মাস, টম তেত্রিশ বছর নয় মাস।'

'এদের ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্য কী?'

'পিটারের উদ্দেশ্য রবার্টসনের রুবি ফেরত দেওয়া।'

'সে রুবি কার কাছে আছে?'

'টম ম্যাক্সওয়েল।'

'এই রুবির ভবিষ্যৎ কী?'

'ওটা বিক্রি হবে।'

'সেটা কি গণেশ ঝুনঝুনওয়ালা কিনবে?'

'না।'

'কিন্তু উনি তো দর দিয়েছেন?'

'এবার দশ লাখ নেমে হবে সাড়ে সাত।'

'তার মানে পিটার বিক্রি করবে না?'

'না।'

'তা হলে?'

'ওটা অন্য একজন কিনবেন?'

'কে?'

'অর্ধেন্দু নস্কর।'

'কত দাম?'

'বারো লাখ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

এবার নস্কর লালমোহনবাবুর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতেই তিনি ধড়মড়িয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

ওয়েল মিস্টার রবার্টসন?'

নস্কর পিটারের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

'দ্যাট ওয়জ মোস্ট ইমপ্রেসিভ।'

'এখন বিশ্বাস হল?'

'আই ডোন্ট নো হোয়াট টু থিঙ্ক।'

'তোমাকে ভাবতে হবে না। তাড়া নেই। তুমি চানচানিয়ার সঙ্গে কাল দেখা করো। সাড়ে সাত লাখে তোমার রুবি বিক্রি করতে চাও তো পারো; তা না হলে আমার বারো লাখের অফার তো রয়েইছে।

চাকর এসে খবর দিল ডিনার রেডি।

আমরা সকলে উঠে ডাইনিং রুমের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

॥ ৭ ॥

ষোড়শোপচার ডিনার সেরে আমরা সোয়া দশটা নাগাদ ফুলবেড়িয়া গ্রামে হাজির হলাম। পূর্ণিমা রাত, তা ছাড়া এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে, তাই দেখার কোনও অসুবিধা নেই। গ্রামের একপাশে একটা মাঠ, সেখানেই লোকের ভিড়। এরা সাঁওতাল নয়—বেশির ভাগই শহরের লোক, নাচ দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ দুইই রয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে দেখি ইন্সপেক্টর চৌবে বেরিয়ে এলেন।

'শুধু আমি নয়', বললেন চৌবে, 'আপনাদের অনেক পরিচিত ব্যক্তিই এখানে উপস্থিত।'

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'কিশোরীলাল আর চাঁদু মল্লিককেও দেখলাম। সেই বীরভূম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও রয়েছেন।'

' সে তো ভাল কথা। নাচটা আরম্ভ হবে কখন?'

'সব লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়েছে তো। যে কোনও মুহূর্তেই শুরু হবে।'

পিটারকে দেখে ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাছাকাছির মধ্যে থেকো, না হলে ফেরার সময় খুঁজে বার করা মুশকিল হবে।'

টম ম্যাক্সওয়েল ক্যামেরা বার করে তাতে ফ্ল্যাশ ক্যামেরা নিয়ে রেডি। তিনি

টমের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। আমি কাছেই ছিলাম, তাই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম। শঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি স্টুডিও আছে?'

'না', বলল টম ম্যাক্সওয়েল। 'আমি স্টুডিও ফোটোগ্রাফার নই। আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলি ফ্রি লান্স। আমার ছবি বহু পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। ভারতবর্ষে যা ছবি তুলব তা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন নেবে বলেছে। তারাই আমার খরচ বহন করছেন।'

মাদলে চাঁটি পড়ল। টমের সঙ্গে আমরাও নাচের দলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

নাচ শুরু হয়ে গেছে। জনা তিরিশেক সাজগোজ করা মেয়ে পরস্পরের হাত ধরে দুলতে শুরু করেছে। তিনটে মাদলের সঙ্গে তিনজন বংশীবাদক রয়েছে। মাদল যারা বাজাচ্ছে তাদের পায়ে ঘুঙুর।

লালমোহনবাবু আমার পাশে এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখন আবার বাঁ চোখটা নাচছে। কপালে কী আছে কে জানে।'

'হিপ্‌নোটাইজ্‌ড হয়ে শরীর খারাপ হয়নি তো?'

'নাঃ। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, জানো ভাই তপেশ। কী যে করেছি আর কী যে বলেছি তার কিছু মনে নেই।'

এবার মশালের আলোয় হঠাৎ চাঁদু মল্লিককে দেখতে পেলাম বিড়ি ফুঁকছে। এক পা এক পা করে সে নাচের দলের দিকে এগোচ্ছে।

না, নাচের দিকে নয়, টমের দিকে।

আমি লালমোহনবাবুকে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'কে চোখে চোখে রাখা দরকার।'

'যা বলেছ।'

টম কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সে এবার পিছন দিকে চলে গেল, বোধহয় নতুন দৃষ্টিকোণ খোঁজবার জন্য। সব ফোটোগ্রাফারই কি এই রকম ছটফটে হয়?

চাঁদু মল্লিক একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার দু' হাত সরু প্যান্টের পকেটে গোঁজা।

ক্রমে আমাদের দলের লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। লালমোহনবাবু অবশ্য আমার পাশ ছাড়েননি। আমি সকি সকলের উপর দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করছিলাম, কারণ ফেরার সময় সকলকে এক জায়গায় জড়ো হতে হবে। ওই যে ফেলুদা, টৌবেকে একটু আগে ওর পাশে দেখেছিলাম, এখন আর নেই। ওই যে নন্দর— ওর ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। অলস ছন্দে নাচ হয়ে চলেছে।

ওই কিশোরীলাল। সে পিটারের দিকে এগোচ্ছে। ওদের মধ্যে কিছু কথা হয় কিনা জানবার জন্য আমি জটায়ুকে ছেড়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিশোরীলাল পিটারকে সামনে পেয়ে বলল, 'গুড ইভনিং।'

পিটার বলল, 'কালকে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ঠিক আছে তো?'

'ইয়েস স্যার।'

'আশা করি তোমার বাবা মত বদলাবেন না।'

'নো স্যার। হি হ্যাজ মেড আপ হিজ মাইন্ড।'

'ভেরি গুড।'

কিশোরীলাল চলে গেল।

এবার জগন্নাথবাবুকে দেখলাম তাঁর জায়গা নিতে। পিটার 'হ্যালো' বলে বলল, 'আমাকে এই নাচের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে?'

'সার্টেনলি।'

জগন্নাথবাবু পিটারের পাশে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে নাচের ব্যাপারটা বোঝাতে আরম্ভ করল। আমি আর শুনতে না পেয়ে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

এবার ফেলুদাকে দেখলাম একটা মশালের আলোয়। সে একটা চারমিনার ধরাল।

প্রথম নাচ শেষ হয়ে দ্বিতীয় নাচ শুরু হল। এর তাল একেবারে অন্য, আগেরটার চেয়ে অনেক দ্রুত। মেয়েরা একবার নিচু হচ্ছে পরস্পরের হাত ধরে, তার পরেই সোজা হয়ে উঠছে, তালে তালে, মাদল আর বাঁশির সঙ্গে। সেই সঙ্গে একটানা সুরে গান। 'ভেরি এক্সাইটিং' মন্তব্য করলেন জটায়ু।

আমাদের সামনে দিয়ে মিঃ নন্দর ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আমাদের দিকে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে—'কেমন লাগছে?'

'কী ব্যাপার? এমন জোর নাচ চলেছে আর আপনার কপালে খাঁজ?'

প্রশ্নটা জটায়ু করলেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসা ফেলুদাকে।

'ভ্রূকুটির কারণ আছে। পরিবেশটা ভাল নয়, ভাল নয়।---ম্যাক্সওয়েলকে দেখেছিস, তোপ্‌সে?'

'কিছুক্ষণ আগেও দেখেছি, কিন্তু এখন আর দেখছি না।'

'ছোকরা গেল কোথায়?' বলে আমাদের ছেড়ে ফেলুদা বাঁ দিকে এগিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'তোমার দাদাকে হেল্‌প করবে? চলো আমরাও গিয়ে দেখি ম্যাক্সওয়েল গেল কোথায়।'

'চলুন।'

লালমোহনবাবুর হাত ধরে এগিয়ে গেলাম নাচের দলের পিছন দিকটায়। চাঁদু মল্লিক। কিশোরীলাল। এক ঝলক এক ঝলক দেখছি একেকটা চেনা মুখ। কিন্তু টম কই?

ওই যে পিটার। সেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে এদিক ওদিক দেখছে।

'হ্যাভ ইউ সিন টম?'

'আমরাও ওকেই খুঁজছি।'

'আই ডোন্ট লাইক দিস অ্যাট অল।'

পিটার টমকে খুঁজতে ডাইনে চলে গেল। আমরা বাঁয়ে এগিয়ে গেলাম। নাচ এখন আরও দ্রুত, মাদল বেজে চলেছে। নাচের দল গাইছে, দুলছে আর ঘুরছে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে ফেলুদা বেরিয়ে এল।

'টোবেকে দেখেছিস?'

সে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে এগিয়ে গেল। দু'বার তাকে গলা তুলতে শুনলাম।

'ইন্সপেক্টর চৌবে! ইন্সপেক্টর চৌবে!'

এক মিনিটের মধ্যে ফেলুদাকে আবার দেখলাম, সঙ্গে চৌবে। তারা দ্রুত এগিয়ে গেল ডান দিকে।

'কী ব্যাপার?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

সংক্ষেপে 'ম্যাক্সওয়েল' বলে ফেলুদা আর চৌবে এগিয়ে গেল।

এবার আমরা ফেলুদা আর চৌবেকে অনুসরণ করে দৌড় শুরু করলাম।

একটা গাছের ধারে গিয়ে ফেলুদা থামল। হাত দশেক দূরে একটা মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখলাম ম্যাক্সওয়েল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে ঘাসের উপর লুটোচ্ছে তার ব্যাগ আর ফ্ল্যাশসমেত ক্যামেরা।

'ইজ হি ডেড?' চৌবের প্রশ্ন।

'না। অজ্ঞান। পাল্‌স আছে।'

চৌবের কাছে দেখলাম একটা ছোট্ট টর্চ রয়েছে। সেটা জ্বালিয়ে টমের মুখের উপর ফেলতে টমের চোখের পাতাটা যেন নড়ে উঠল। ফেলুদা এবার টমের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল।

'ম্যাক্সওয়েল! টম!'

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে মশালের আলোয় ছুটে বেরিয়ে এল পিটার।

'হোয়াট্‌স দ্য ম্যাটার উইথ হিম? ইজ হি ডেড?'

'না। অজ্ঞান', বললেন চৌবে। 'তবে জ্ঞান ফিরছে।'

ইতিমধ্যে টম চোখ খুলেছে। তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত।

'কোথায় লেগেছে তোমার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

টম কোনও রকমে হাত দিয়ে মাথার পিছনটা দেখিয়ে দিল।

এবার পিটার মাটি থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা খুলে ভিতরে হাত ঢোকাতে তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'দ্য রুবি ইজ গন', ভারী গলায় বলল পিটার।

টমকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা আবার নস্করের বাড়িতে ফিরে এলাম। রুবি উধাও শুনে নস্করের অবস্থা দেখবার মতো হয়েছিল। সে শ্লেষ মেশানো গলায় বলল, 'তোমার যা চেয়েছিলে তাই হল। ভারতবর্ষের রুবি ভারতবর্ষেই ফিরে এল, তবে তোমাদের পৃথিবী ভ্রমণ আর হল না।'

পূর্বপল্লীর ডাক্তার সিংহ টমকে পরীক্ষা করে বললেন, 'মাথার পিছনের একটা অংশ ফুলেছে। কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করার ফলে টম সংজ্ঞা হারায়।'

'এই আঘাত থেকে মৃত্যু হতে পারত কি?' পিটার জিজ্ঞেস করল।

'আরেকটু জোরে হলে হতে পারত বইকী?' বললেন ডাঃ সিংহ। 'আপাতত ওখানটায় বরফ ঘষে দেওয়া ছাড়া আর কোনও চিকিৎসা নেই। ব্যথা বেশি হলে একটা পেন কিলার খেয়ে নিয়ে কাজ দেবে।'

ডাঃ সিংহ চলে যাবার পর চৌবে মুখ খুললেন।

'মিঃ ম্যাক্সওয়েল, আপনাকে যে আঘাত করেছে তাকে তো আপনি দেখতে পাননি বলে বললেন।'

'না। সে লোক আমার পিছন দিক দিয়ে আসে।'

'যতদূর বুঝতে পারছি', বললেন চৌবে, 'মাথার পিছনে বাড়ি মারার কারণ ওই পাথর চুরি করা। টম ম্যাক্সওয়েলের ব্যাগে এরকম একটা পাথর ছিল সেটা অনেকেই জানত না, যদিও রবার্টসন্‌স রুবির কথা অনেকেই এর মধ্যে জেনে গেছে। যাঁরা টমের ব্যাগে পাথর আছে জানতেন তাঁরা হলেন আমি, মিস্টার মিত্তির, তাঁর ভাই, তাঁর বন্ধু লালমোহনবাবু, জগন্নাথ চাটুজ্যে, কিশোরীলাল এবং মিঃ নস্কর।'

মিঃ নস্কর হা হা করে উঠলেন।—'পাথরটা তো আমার হাতে চলেই আসত; সেখানে আমি এ রাস্তা নেব কেন—যেখানে আমার বাড়ি খেয়ে টম খুনও হয়ে যেতে পারত?'

'ও সব বলে লাভ নেই, মিঃ নস্কর। আপনি প্রাইম সাসপেক্ট! হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থায় মিঃ গাঙ্গুলী যা বলেছেন সেগুলো যে ফলবেই এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। এ রুবি যেমন তেমন রুবি নয়, আর আপনিও যেমন তেমন কালেক্টর নন। সে রুবি বেহাত হয়ে যেতে পারে জেনে আপনি সেটা বিনা পয়সায় হাত করার চেষ্টা করবেন না? কী বলছেন আপনি?'

'ননসেন্স! ননসেন্স!' বলে নস্কর চুপ করে গেলেন।

চৌবে বলে চললেন, 'এ ছাড়া আছে কিশোরীলাল। তার বাপ পয়সা দিয়ে জিনিসটা কিনতে চেয়েছিলেন। তাতে ছেলের কোনও লাভ হত না; অথচ ছেলে রুবির মূল্য জানে, সেটা কোথায় থাকে তা জানে। এই অবস্থায় সেটাকে হাতাবার চেষ্টা করাটা কি খুব অস্বাভাবিক?...টমের উপর আক্রোশ ছিল এমন এক ব্যক্তি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। সে হল চাঁদু মল্লিক। মাথায় বাড়ি মারাটা চাঁদুর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ সে বদলা নেবে বলে শাসিয়েই রেখেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে কি রুবির ব্যাপারটা জানত? মনে তো হয় না। এখানে টমকে মাথায় আঘাত মেরে অজ্ঞান করে স্রেফ টাকাকড়ির লোভে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে যদি ঘটনাচক্রে রুবির কৌটোটা পেয়ে যায়—এই সম্ভাবনাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না, পারি কি?...আরেকজন সাসপেক্ট হচ্ছে জগন্নাথ চাটুজ্যে। ইনি রুবি সম্বন্ধে জানতেন, কোথায় সেটা থাকে তাও জানতেন। ওর এ হেন আচরণের কারণ একমাত্র লোভ।'

ফেলুদা বলল, 'একজন সাসপেক্টকে আপনি বাদ দিয়ে যাচ্ছেন, মিঃ চৌবে।'

'কে?'

'পিটার রবার্টসন।'

'হোয়াট!' বলে লাফিয়ে উঠল পিটার।

'ইয়েস মিঃ রবার্টসন!' বলল ফেলুদা। 'তুমি চেয়েছিলে রুবিটাকে কলকাতার মিউজিয়ামের হাতে তুলে দিতে। তোমার বন্ধু তাতে বাদ সাধছিল। পাছে বিদেশে এসে বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় তাই তুমি পাথরটা বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলে। কিন্তু শেষে তোমার মত পালটানো আশ্চর্য নয়। এমনিও টমের সঙ্গে তোমার আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল না। আমি যদি বলি যে তুমি তোমার মূল সিদ্ধান্তে ফিরে গিয়েছিলে, এবং তাই পাথরটা নিজের কাছে নিয়ে আসো।'

কথাগুলো শুনে রবার্টসন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সটান উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো মাথায় তুলে বলল, 'আমি নিয়েছি কি না জানায় খুব সহজ রাস্তা আছে। সার্চ মি ইন্সপেক্টর চৌবে। রুবি নিয়ে থাকলে এর মধ্যে সেটা সরাবার কোনও সুযোগ আমি পাইনি। কাম অন, ইন্সপেক্টর—সার্চ মি।'

'ভেরি ওয়েল', বলে ইন্সপেক্টর চৌবে উঠে গিয়ে পিটারকে সার্চ করলেন। কিছুই পাওয়া গেল না।

ফেলুদা বলল, 'ওকে যখন সার্চ করা হল তখন আমরা তিনজন বাদ যাই কেন? আসুন মিঃ চৌবে।'

চৌবে ইতস্তত ভাব করছেন দেখে ফেলুদা আবার বলল, 'আসুন আসুন, মনের মধ্যে সন্দেহ রাখা ভাল না।'

চৌবে আমাদের তিন জনকেই সার্চ করলেন। তারপর বললেন, 'মিঃ রবার্টসন, এ ব্যাপারে আমি তদন্ত করি এটা আপনি চান কি?'

'নিশ্চয়ই', জোরের সঙ্গে বলল রবার্টসন। 'আই ওয়ান্ট দ্যাট রুবি ব্যাক অ্যাট এনি কস্ট।'

॥ ৮ ॥

পরদিন সকালে টমকে দেখলাম সে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বলল ব্যথাটা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। কিন্তু আর দু'দিনের মধ্যেই চলে যাবে।

পাথর চুরির ব্যাপারটায় দুই বন্ধুই দেখলাম সমান কাতর। এই ভাবে পাথরটাকে ভারতবর্ষে রেখে যাবার কথাটা পিটার মোটেই ভাবেনি, আর টম আপসোস করছে প্রথম দিনই কেন সেটাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়নি, যখন ঢানঢানিয়াও এত ভাল অফার দিল।

মিস্টার চৌবে সকালে আমাদের ঘরে এলেন এগারোটা নাগাদ। বললেন এসে প্রথমে একবার টমকে দেখেছেন, তারপর আমাদের কাছে এসেছেন রিপোর্ট দিতে।

'কিছু এগোল?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'একজন সাসপেক্টকে বাদ দিতে হয়েছে।'

'কে?'

'কিশোরীলাল।'

' কেন? বাদ কেন?'

'প্রথমত, আমি যতদূর জানি কিশোরীলালকে, সে অত বেপরোয়া নয়। তা ছাড়া—এটা আমি জানতাম না—মাস খানেক হল ঢানঢানিয়া বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে তার ছেলেকে একটা প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরি বানিয়ে দিয়েছে। কিশোরী রেগুলার কাজে যাতায়াত করছে। তার বাবা কড়া নজর রেখেছেন তার

উপর এই সময় একটা পাথর চুরি করে বিক্রি করে হাতে কাঁচা টাকা পেলে সেটা বাবার দৃষ্টি এড়াত না। সো-কিশোরীলাল ইজ আউট।'

'চাঁদু মল্লিক?'

'আমাদের যা হিসেব, তাতে টম মাথায় আঘাত প্রায় পৌনে এগারোটা নাগাত। তখন চাঁদু বোলপুরে নবীন ঘোষের মদের দোকানে। একাধিক সাক্ষী আছে। তাদের সবাইকে জেরা করে দেখেছি চাঁদ ইজ আউট টু।

'বাকি দু'জন?'

'আজ সকালে নন্দরের বাড়ি সার্চ করেছিলাম। পাথরটা পাওয়া যায়নি। অবিশ্যি তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। এতটুকু পাথর লুকিয়ে রাখা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ পড়ছে কিন্তু বীরভূম এক্সপার্ট জগন্নাথ চ্যাটার্জির ওপর।'

'এটা কেন বলছেন?'

'ও বীরভূম এসেছে মাত্র তিন বছর হল। ওর বাড়িতে একটা টুরিস্ট গাইড আছে, সেটার নাম হল ভ্রমণসঙ্গী। তা থেকেই ও তথ্য সংগ্রহ করে। বোলপুরের আগে বর্ধমানে ছিল। সেখানে তার পুলিশ রেকর্ড রয়েছে—জালিয়াতির কেস।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস স্যার। আমার মতে হি ইজ আওয়াজ ম্যান। সাহেবদের কাছ থেকেও ও পারিশ্রমিক আদায় করছিল। ওয়াল হান্ড্রেড অ্যান্ড পার ডে। সমস্ত ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক।'

'ওর বাড়ি সার্চ করেছেন?'

'করব আজ দুপুরে। শুধু সার্চ না—কারণ সার্চ করে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না—কড়া কথা বলে ওর মনে চরম ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভাল কথা—আপনি নিজে কোনও তদন্ত করবেন না?'

'বর্তমান ক্ষেত্রে আপনি অনেক বেশি কার্যকরী হবেন বলে মনে হয়। তবে মাথা খেলবে ঠিকই, আর কিছু মনে এলে আপনাকে জানাব। ইয়ে—আমি যে সাসপেক্টটার কথা বলেছিলাম তার কী হল?'

'পিটার রবার্টসন?'

'হ্যাঁ, কারণ আমার ধারণা ওর এখন যে মনের অবস্থা তাতে ও বন্ধুবিচ্ছেদটা মেনে নিতে প্রস্তুত প্যাট্রিক রবার্টসনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাটাও ওর এখন প্রধান লক্ষ্য।'

'আপনার কথা মনে রেখেই আমি একটু আগেই ওর ঘরটা ভাল করে সার্চ করেছি। কিছু পাইনি।'

চৌবে চা আর বিস্কুট খেয়ে উঠে পড়লেন; বললেন ওবেলা আবার আসবেন।

ফেলুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বড় গোলমেলে ব্যাপার। পাঁচটা

সাসপেক্ট পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এখানে শখের গোয়েন্দাকে পুলিশ টেক্কা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কী?'

'আপনার কি কারুর উপর সন্দেহ পড়ল?' জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'এই পাঁচজনের মধ্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কিশোরীলালের ব্যবসার ব্যাপারটা যদিও জানতাম না, কিন্তু তাও আমার মন ওকে বাতিল করে দিচ্ছিল। তার কারণ ছেলেটার মধ্যে হিম্মতের অভাব কাউকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করার সামর্থ্য ওর আছে বলে মনে হয় না, আর তার উপর ওই ভিড়ের মধ্যে ব্যাগ খুলে তার থেকে পাথর বার করে নিয়ে পালানো...'

'চাঁদু মল্লিক?'

'ওর সামর্থ্য আছে সন্দেহ নেই, তবে রুবি সম্বন্ধে—বিশেষ করে টমের ব্যাগে রুবি আছে সেটা ওর পক্ষে জানা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। মধুর লোকটাকেও সন্দেহ করতে আমার মন চায় না। বিশেষ করে মাথায় বাড়িটাড়ি মারার ব্যাপারে ও মোটেই নিজেকে জড়াবে না। তা ছাড়া এটা মনে রাখতে হবে লোকটার টাকার অভাব একেবারেই নেই।'

'একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'হিপনোটাইজ্ড হয়ে মানুষ সত্যি কথা বলে?'

'কোন সত্যিটা বলছেন আপনি?'

'বাঃ, তপেশ যে বললে ওদের বয়স বলে দিলুম। ওরা ল্যাঙ্কেশিয়ার থেকে এসেছে বলে দিলুম।'

'দুটো তথ্যই স্টেটসম্যানের লেখার গোড়ার দিকেই ছিল।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস স্যার। আর বাকি যা বলেছেন সেটা যে মিথ্যে সে তো প্রমাণই হয়ে গেল।'

'তা বটে।...তা হলে জগন্নাথ চ্যাটার্জিই কালপ্রিট?'

'চোবে যা বলল, তাতে তো সেরকমই মনে হচ্ছে। মামলাটার পরিসমাপ্তি খুব জমাটি হল না সেটা—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। কারণ দরজায় টোকা পড়েছে। দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল টমের দিকে। টম মাথা নাড়ল।

'আমি বসতে আসিনি।'

'আই সি।'

'আমি এসেছি তুমি এবং তোমার দুই বন্ধুর ঘর সার্চ করতে।'

'সার্চ তো কাল একবার হয়ে গেছে। তাতে তোমার বিশ্বাস হল না!'

'নো। সে সার্চ করেছে ইন্ডিয়ান পুলিশ। আমার তাদের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই।'

'সার্চ করতে ওয়ারেন্ট লাগে তা জানো? যে কেউ সার্চ করতে চাইলেই সার্চ করতে পারে না।'

'তা হলে তুমি আমাকে সার্চ করতে দেবে না?'

'নো, মিঃ ম্যাক্সওয়েল। ও ব্যাপারটা কালই হয়ে গেছে। আজ আর হবে না।'

ম্যাক্সওয়েল আর দ্বিরুক্তি না করে অ্যাবাউট টার্ন করে চলে গেল।

'বোঝো', বললেন লালমোহনবাবু। 'আপনার সঙ্গে অনেক তদন্তেই অংশগ্রহণ করলুম, কিন্তু ক্রিমিন্যাল বলে সাসপিশন এই প্রথম পড়ল আমাদের উপর।'

'সব রকম অভিজ্ঞতাই হয়ে থাকা ভাল, তাই নয় কি?'

'তা বটে। তা আপনি কি স্রেফ ঘরে বসে তদন্ত করবেন! বেরোবেন না কোথাও?'

'দরকার হলে নিশ্চয়ই বেরোব। তবে এখনকার স্টেজটা হল চিন্তা করার স্টেজ, আর সেটা ঘরে বসেই সবচেয়ে ভাল হয়। অবিশ্যি তাই বলে আপনাদের ধরে রাখতে চাই না। আপনারা স্বচ্ছন্দে বেরোতে পারেন। শান্তিনিকেতন এবং তার আশপাশে এখনও অনেক কিছুই দেখতে বাকি আছে।'

'ভেরি ওয়েল। আমরা তা হলে একবার শতদলকে গিয়ে ধরি। ও বলছিল ওর আজ কোনও ক্লাস নেই। দেখি ও কী সাজেস্ট করে। আপনাকে বরং একটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি—শতদলের দেওয়া সেই বই। সেই পাদ্রি প্রিচার্ডের লেখা। দারুণ বই মশাই। কাল রাত্তিরে শেষ করেছি। এই ম্যাক্সওয়েলের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাবেন। তার নীল চাষ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে।'

ফেলুদাকে বইটা দিয়ে আমি আর লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লাম।

শতদলবাবু বললেন, 'চলো তোমাদের একটা খাঁটি গ্রাম দেখিয়ে নিয়ে আসি। গোয়ালপাড়া। আর তার পিছনেই আছে গুরুদেবের প্রিয় নদী কোপাই। এ দুটো না দেখলে শান্তিনিকেতন দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

গ্রাম এর আগে যে দেখিনি তা নয়, তবে গোয়ালপাড়ার মতো খাঁটি গ্রামের চেহারা এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লালমোহনবাবুকে কবিতায় পেয়েছে। তাঁর প্রিয় কবি বৈকুণ্ঠ মল্লিকের একটা কবিতার খানিকটা অংশ আবৃত্তি করে ফেললেন—

> 'বাংলার গ্রামে স্পন্দিছে মোর প্রাণ
> সেই কবে দেখা—আজও স্মৃতি অম্লান
> যেদিকে ফেরাও দৃষ্টি
> মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলে দেখ কী অপরূপ সৃষ্টি!'

কোপাই দেখেও সেই একই ব্যাপার। এটাতে বোঝা যায় যে বৈকুণ্ঠ মল্লিক

শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন—

'জীর্ণ কোপাই সর্পিল গতি
মন বলে দেখে—মনোরম অতি
দুই পাশে ধান
প্রকৃতির দান
দুলে ওঠে সমীকরণে,
বসে দেখে কবি
আঁকা রবে ছবি
চিরতরে মোর মনে।

॥ ৯ ॥

বিকালে এক আশ্চর্য ঘটনা। ইনস্পেক্টর চৌবে পাঁচটা নাগাত এসে বললেন, 'কেস খতম্। যা ভেবেছিলাম তাই। জগন্নাথ চাটুজ্যে নিয়েছিল পাথরটা। সার্চ করে কিছু পাওয়া যায়নি অবশ্য, কিন্তু তারপর একটু পুলিশি চাপ দেওয়াতে সত্যিটা বেরিয়ে পড়ে—আর সেই সঙ্গে পাথরটাও। একটা ফুলের টবে পুঁতে রেখেছিল।'

'আপনি নিয়ে এসেছেন পাথরটা?'

'ন্যাচারেলি।'

চৌবে পকেট থেকে পাথরটা বার করলেন। আবার নতুন করে সেটার ঝলমলে রং দেখে মনটা কেমন স্নান হয়ে গেল।

'আশ্চর্য!' বলল ফেলুদা।

'কেন?'

'লোকটাকে দেখে চোর বলে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু জখমকারী বলে যায় না। একেবারে ভেতো বাঙালি।'

'মানুষের চেহারা দেখে সব সময় তার ভেতরটা জাজ করা যায় না মিঃ মিত্তির।'

'সেটা অবশ্য আমার অভিজ্ঞতাই বলে।'

'তা হলে পাথরটাকে এবার স্বস্থানে চালান দিই?'

'চলুন।'

আমরা চারজনে দশ নম্বর ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

পিটার দরজা খুলল।

'ওয়েল, মিঃ রবার্টসন', বললেন চৌবে, 'আই হ্যাভ এ লিট্‌ল গিফ্‌ট ফর ইউ।'

'হোয়াট?'

চৌবে পকেট থেকে কৌটোটা বার করে পিটারের হাতে দিলেন।

পিটার ও টমের মুখ হাঁ।

'বাট, হোয়্যার—হোয়্যার...?'

'সেটা না হয় আর নাই বললাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে সেটাই হল আসল কথা। মিঃ ম্যাক্সওয়েল নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভারতীয় পুলিশ বেশ করিৎকর্মা। এবার অবিশ্যি তোমরা এটা নিয়ে কী করবে দ্যাট ইট আপ টু ইউ। বিক্রি করতে পারো, ক্যালকাটা মিউজিয়ামেও দিয়ে দিতে পারো।'

পিটার ও টম দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, দুজনেই এবার ধপ্ করে খাটে বসে পড়ল। পিটার মৃদুস্বরে বলল, 'গুড গড! কনগ্র্যাচুলেশনস।'

'এবার তা হলে চলি?' বললেন চৌবে।

'আই ডোন্ট নো হাউ টু থ্যাঙ্ক ইউ।' বলল টম ম্যাক্সওয়েল।

'ডোন্ট। তোমার মনে যে ধন্যবাদ দেবার প্রশ্নটা জেগেছে সেটাই বড় কথা। আমরা তাতেই খুশি।'

'কী মনে হচ্ছে মশাই?' পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'কোথায় যেন গণ্ডগোল', বিড়বিড় করে বলল ফেলুদা।

'আমি বলব কোথায় গণ্ডগোল? এই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দারোগার কাছে হেরে গেলেন ফেলু মিত্তির। সেইখানেই গণ্ডগোল।'

'উঁহু। তা নয়। মুশকিল হচ্ছে কী আমি বিশ্বাস করছি না আমি হেরে গেছি।'

ফেলুদা চুপ করে গেল। তারপর বলল, 'তোপসে—তুই এখন কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর ঘরে যা। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

লালমোহনবাবুর ঘরে গিয়ে বসতে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ভাল লাগছে না ভাই তপেশ। একটা সুযোগ এসেও কেমন যেন ফসকে গেল। তাই বোধহয় কাল রাত্রে ঘুম আসছিল না।'

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার দাদার শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো? দেখে কেন জানি মনে হচ্ছিল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।'

'ঘুম হয়েছে, তবে অনেক রাত অবধি আপনার দেওয়া বইটা পড়েছে এটা আমি জানি। অবিশ্যি তাও সেই সকালে সাড়ে পাঁচটায় উঠে যোগব্যায়াম করেছে।'

'তোপ্সে!'

ফেলুদার গলা, সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। দরজা খুললাম।

ফেলুদা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বলল, 'চলুন—বেরোতে হবে। চৌবের ওখানে। দেরি নয়—ইমিডিয়েটলি।'

আমরা তৈরিই ছিলাম, তিনজন বেরিয়ে পড়লাম।

দুবরাজপুর থানায় গিয়ে গাড়িটা থামল। আমরা তিনজন নামলাম। একজন কনস্টেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এল।

'একটু ইনস্পেক্টর চৌবের সঙ্গে দেখা করব।'

'আসুন।'

আমরা চৌবের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। ভদ্রলোক কাগজপত্র দেখছিলেন, আমাদের দেখে অবাক আর খুশি মেশানো দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

'কী ব্যাপার?'

'একটু কথা ছিল।'

'বসুন, বসুন।'

আমরা তিনজন চৌবের টেবিলের উল্টোদিকে তিনটে চেয়ারে বসলাম।

'চা খাবেন তো?'

'নো থ্যাঙ্কস্। একটু আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়েছি।'

'তা বলুন কী ব্যাপার।'

'মাত্র একটা প্রশ্ন।'

'বলুন, বলুন।'

'আপনি কি ক্রিশ্চান?'

চৌবের চোখ কপালে উঠে গেল। তারপর একটা সরল হাসি হেসে বললেন, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'আমি জানতে চাই। প্লিজ, বলুন।'

'ইয়েস, আই অ্যাম এ ক্রিশ্চান—কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনাকে আমি চারবার খেতে দেখেছি। প্রথমবার মহীতোষবাবুর বাড়িতে লাড্ডু আর শরবত। লাড্ডু আপনি বাঁ হাতে খান। ব্যাপারটা দেখেছিলাম বটে, কিন্তু যাকে লক্ষ করা বলে তা করিনি। অর্থাৎ ওটার তাৎপর্য বুঝিনি। দ্বিতীয়বার, চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে নোনখাটাই খেলেন, তাও বাঁ হাতে। এটা আমার মনের কোণে নোট করে রেখেছিলাম। কাল চা বিস্কুট খেলেন আমাদের ঘরে, বিস্কুট বাঁ হাতে। তখনই বুঝতে পারি আপনি ক্রিশ্চান। কিন্তু এবারও তাৎপর্য বুঝিনি। এখন বুঝেছি।'

'বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু তাৎপর্যটা কী সেটা জানতে পারি? এই কথাটা বলতে আপনি একেবারে দুবরাজপুর চলে এলেন?'

'তা হলে আরেকটা প্রশ্ন করি?'

'করুন।'

'আপনার ফ্যামিলিতে প্রথম কে ক্রিশ্চান হয়?'

'আমার ঠাকুরদা।'

'তাঁর নাম?'

'অনন্ত নারায়ণ।'

'তাঁর ছেলের নাম?'

'চার্লস প্রেমচাঁদ।'

'অ্যান্ড হিজ সন?'

'রিচার্ড শঙ্কর প্রসাদ।'

'তিনি কি আপনি?'

'ইয়েস স্যার।'

'আপনার ঠাকুরদাদার বাবার নাম কি হীরালাল?'

'হ্যাঁ—বাট হাউ ডিড ইউ—?'

চৌবের মুখ থেকে খুশি ভাবটা চলে গিয়ে এখন খালি অবাক অবিশ্বাস।

'এই হীরালালই কি রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের পাংখা টানত?'

'এ খবর আপনি পেলেন কী করে?'

'একটা বই থেকে। পাদ্রি প্রিচার্ডের লেখা। যিনি আপনার ঠাকুরদাদাকে অনাথ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে ক্রিশ্চান করে তার ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।'

'এ রকম একটা বই আছে বুঝি?'

'আছে। দুষ্প্রাপ্য বই, কিন্তু আছে।'

'তা হলে তো আপনি—'

'কী?'

'আপনি তো জানেন...'

'কী জানি?'

'সেটা আপনিই বলুন মিঃ মিত্তির। আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে।'

'বলছি', বলল ফেলুদা। 'আপনার প্রপিতামহর সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে প্রাণত্যাগ করার ঘটনা আপনি এখনও ভুলতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই হয়তো শুনে এসেছেন রেজিন্যাল্ড খ্যাকশেয়াল কী জাতীয় লোক ছিলেন। যখন আপনি জানলেন যে সেই রেজিন্যাল্ডের নাতি এখানে এসেছে এবং যখন দেখলেন সেই নাতির মধ্যে রেজিন্যাল্ডের ঔদ্ধত্য আর ভারতবিদ্বেষ পুরোপুরি বর্তমান, তখন—'

'ঠিক আছে, মিঃ মিত্তির, আর বলতে হবে না।'

'তা হলে আমি যা ভাবছি সেটাই ঠিক তো?'

'কী?'

'আপনি প্রতিহিংসাবশত টমকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেন। পাথরটা নেন, যাতে সন্দেহটা এই চারজনের উপর গিয়ে পড়ে।'

'ঠিক। এখন এর জন্য আমার কী শাস্তি হওয়া উচিত বলুন।'

'সেটাই আমি আপনাকে বলতে এসেছি।'

'কী?'

'আপনার কোনও শাস্তি হবে না। আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও ঠিক এই জিনিসই করতাম। আপনি গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিয়েছেন। আপনি নির্দোষ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ মিত্তির—থ্যাঙ্ক ইউ।'

'এখন আপনার কোন চোখ নাচছে, মিঃ সর্বজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায়?'

'দু'চোখই। একসঙ্গে। আনন্দের নাচনি। আমি কেবল ভাবছি একটা কথা।'

'আমি জানি।'

'কী বলুন তো?'

'আপনার বন্ধু শতদল সেনকে ধন্যবাদ দিতে হবে, এই তো?'

'মোক্ষম ধরেছেন। তিনি বইটা না দিলে—'

'—এই মামলার নিষ্পত্তি হত না—'

'আর জগন্নাথ চাটুজ্যে রয়ে যেতেন ক্রিমিন্যাল।'

'অন্তত আমাদের মনে।'

'ঠিক বলেছেন।'

'হরিপদবাবু—চলুন তো দেখি পিয়ার্সন পল্লী ; শতদল সেনের বাড়ি।'

*

রবার্টসনের কবিতা শেষ পর্যন্ত মিউজিয়মেই গেল। কৃতিত্বটা যে ফেলুদার, সেটা বলাই বাহুল্য। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা যখন ম্যাক্সওয়েলের ভারতবর্ষে আসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় ও যথেষ্ট নাম-করা ফোটোগ্রাফার, এবং এই জাতীয় লোকের টাকার অভাব থাকার কথা নয়। আরও টাকার লোভে ও কবিতা বিক্রি করতে চাইছিল। পিটার ম্যাক্সওয়েলের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলেও ছোটবেলাকার বন্ধুত্বের কথা ভেবে ওর কথায় সরল বিশ্বাসে কবিতা বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন। ফেলুদার কথায় তিনি পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য যা করতে এসেছিলেন তাই করলেন। ম্যাক্সওয়েলের রাগ ও আস্ফালন কোনও কিছুই তাঁকে টলাতে পারল না।

গল্প সমগ্র

লন্ডনে ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়

ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি

রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল্-এ আসতে দেখি। মাথার চুল সব পাকা, গায়ের রং ফরসা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরনো নেপালি আর তিব্বতি জিনিস-টিনিসের যে দোকানটা আছে, সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে এসে বেঞ্চিতে আধঘন্টার মতো বসে সন্ধ্যে হব-হব হলে জলাপাহাড়ে বাড়ি ফিরে যান। আমি আবার একদিন ওঁর পেছন পেছন গিয়ে ওঁর বাড়িটাও দেখে এসেছি। গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে হে তুমি, পেছু নিয়েছ?' আমি বললাম, 'আমার নাম তপেশরঞ্জন বোস।' 'তবে এই নাও লজেঞ্চুস' বলে পকেট থেকে সত্যিই একটা লেমন-ড্রপ বার করে আমায় দিলেন, আর দিয়ে বললেন, 'একদিন সকাল সকাল এসো আমার বাড়িতে — অনেক মুখোশ আছে; দেখাব।'

সেই রাজেনবাবুর যে এমন বিপদ ঘটতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করবে?

ফেলুদাকে কথাটা বলতেই সে খ্যাক করে উঠল।

'পাকামো করিসনে। কার কীভাবে বিপদ ঘটবে না-ঘটবে সেটা কি মানুষকে দেখলে বোঝা যায়?'

আমি দস্তুরমতো রেগে গেলাম।

'বা রে, রাজেনবাবু যে ভাল লোক, সেটা বুঝি দেখলে বোঝা যায় না? তুমি তো তাকে দেখোইনি। দার্জিলিং-এ এসে অবধি তো তুমি বাড়ি থেকে বেরোওইনি। রাজেনবাবু নেপালি বস্তিতে গিয়ে গরিবদের কত সেবা করেছেন

জান?’

‘আচ্ছা বেশ বেশ, এখন বিপদটা কী তাই শুনি। আর তুই কচি খোকা, সে বিপদের কথা তুই জানলি কী করে?’

কচি খোকা অবিশ্যি আমি মোটেই না, কারণ আমার বয়স সাড়ে তেরো বছর। ফেলুদার বয়স আমার ঠিক ডবল।

সত্যি বলতে কী ব্যাপারটা আমার জানার কথা নয়। ম্যাল-এ বেঞ্চিতে বসেছিলাম — আজ রবিবার, ব্যান্ড বাজাবে, তাই শুনব বলে। আমার পাশে বসেছিলেন তিনকড়িবাবু, যিনি রাজেনবাবুর ঘর ভাড়া নিয়ে দার্জিলিং-এ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তিনকড়িবাবু ‘আনন্দবাজার’ পড়ছিলেন, আর আমি কোনওরকমে উঁকিঝুঁকি মেরে ফুটবলের খবরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতেফ্যাকাশে মুখ করে রাজেনবাবু এসে ধপ্ করে তিনকড়িবাবুর পাশে বসে গায়ের চাদরটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

তিনকড়িবাবু কাগজ বন্ধ করে বললেন, ‘কী হল, চড়াই উঠে এলেন নাকি?’

রাজেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, ‘আরে না মশাই। এক ইন্‌ক্রেডিব্‌ল্ ব্যাপার!’

ইন্‌ক্রেডিব্‌ল কথাটা আমার জানা ছিল। ফেলুদা ওটা প্রায়ই ব্যবহার করে। ওর মানে ‘অবিশ্বাস্য’।

তিনকড়িবাবু বললেন, ‘কী ব্যাপার?’

‘এই দেখুন না।’

রাজেনবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বার করে

তিনকড়িবাবুর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলাম সেটা একটা চিঠি।

আমি অবিশ্যি চিঠিটা পড়িনি, বা পড়ার চেষ্টাও করিনি; বরঞ্চ আমি উলটো দিকেমুখ ঘুরিয়ে গুনগুন করে গান গেয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বুড়োদের ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্টই নেই। কিন্তু চিঠিটা না পড়লেও, তিনকড়িবাবুর কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

'সত্যিই ইন্‌ক্রেডিব্‌ল। আপনার ওপর কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে যে আপনাকে এ ভাবে শাসিয়ে চিঠি লিখবে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'তাই তো ভাবছি। সত্যি বলতে কী, কোনও দিন কারও অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

তিনকড়িবাবু এবার রাজেনবাবুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'হাটের মাঝখানে এ সব ডিসকাস না করাই ভাল। বাড়ি চলুন।'

দুই বুড়ো উঠে পড়লেন।

* * *

ফেলুদা ঘটনাটা শুনে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে গুম্ হয়ে বসে রইল। তার পর বলল, 'তুই তা হলে বলছিস যে একবার তলিয়ে দেখা চলতে পারে?'

'বা রে — তুমিই তো রহস্যজনক ঘটনা খুঁজছিলে। বললে, অনেক ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে তোমারও ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধিটা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে।'

'তা তো বটেই। এই ধর — আমি তো আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোন্ দিকের বেঞ্চে বসেছিলি।'

'কোন দিক?'

'রাধা রেস্টুরেন্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে?'

'আরেব্বাস! কী করে বুঝলে?'

'আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝল্‌সেছে, ডান ধারেরটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চিগুলোর একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।'

'ইন্‌ক্রেডিব্‌ল।'

'যাক গে। এখন কথা হচ্ছে — রাজেন মজুমদারের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।'

* * *

'আর সাতাত্তর পা।'

'আর যদি না হয়?'

'হবেই, ফেলুদা। আমি সেবার গুনেছিলাম।'

'না হলে গাঁট্টা তো?'

'হ্যাঁ — কিন্তু বেশি জোরে না। জোরে মারলে মাথার ঘিলু এদিক-ওদিক হয়ে যায়।'

কী আশ্চর্য — সাতাত্তরে রাজেনবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম না। আরও তেইশ পা গিয়ে তবে ওর বাড়ির গেটের সামনে পড়লাম।

ফেলুদা ছোট্ট করে একটা গাঁট্টা মেরে বলল, 'আগের বার ফেরার সময় গুনেছিলি, না আসার সময়?'

'ফেরার সময়।'

'ইডিয়ট! ফেরার সময় তো ঢালে নামতে হয়। তুই নিশ্চয়ই ধাঁই ধাঁই করে ইয়া বড়া বড়া স্টেপ্‌স ফেলেছিলি!'

'তা হবে।'

'নিশ্চয়ই তাই। আর তাই স্টেপস্‌ কম হয়েছিল, এবার বেশি হয়েছে। জোয়ান বয়সে ঢালে নামতে মানুষ বড় বড় পা ফেলে দৌড়ানোর মতো। আর বুড়ো হলে ঢালুর বেলা ব্রেক ক'ষে ক'ষে ছোট ছোট পা ফেলতে হয় — তা না হলে মুখ থুবড়ে পড়ে।'

কাছাকাছি কোনও বাড়ি থেকে রেডিওতে গান শোনা যাচ্ছে। ফেলুদা এগিয়ে কলিং বেল টিপল।

'কী বলবে সেটা ঠিক করেছ ফেলুদা?'

'যা খুশি তাই বলব। তুই কিন্তু স্পিকটি-নট। যতক্ষণ থাকবি এ বাড়িতে, একটি কথা বলবিনে।'

'কিছু জিজ্ঞেস করলেও না।'

'শাটাপ!'

একটা নেপালি চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আইয়ে।'

বৈঠকখানায় ঢুকলাম। বেশ সুন্দর পুরনো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। শুনেছি রাজেনবাবু দশ বছর হল রিটায়ার করে দার্জিলিং-এ আছেন। কলকাতায় বেশ নাম-করা উকিল ছিলেন।

চেয়ার টেবিল যা আছে ঘরে, সব বেতের। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে, চারিদিকে দেওয়ালে টাঙানো সব অদ্ভুত দাঁত-খিঁচোনো চোখ-রাঙানো মুখোশের সারি। আর আছে পুরনো ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি, থালা, ফুলদানি এই সব। কাপড়ের উপর রং করা বুদ্ধের ছবিও আছে — কত পুরনো কে জানে? কিন্তু তাতে যে সোনালি রংটা আছে সেটা এখনও ঝলমল করছে।

আমরা দুজনে দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা দেওয়ালের এদিক-ওদিক দেখে বলল, 'পেরেকগুলো সব নতুন, মর্চে ধরেনি। ভদ্রলোকের প্রাচীন জিনিসের শখটা বোধহয় বেশি প্রাচীন নয়।'

রাজেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা উঠে গিয়ে টিপ্ করে এক পেন্নাম ঠুকে বলল, 'চিনতে পারছেন? আমি জয়কৃষ্ণ মিত্তিরের ছেলে ফেলু।'

রাজেনবাবু প্রথমে চোখ কপালে তুললেন, তার পর চোখের দু পাশ কুঁচকিয়ে একগাল হেসে বললেন, 'বা-বা! কত বড় হয়েছ তুমি, অ্যাঁ? কবে এলে এখানে? বাড়ির সব ভাল? বাবা এসেছেন?'

ফেলুদা জবাব দিচ্ছে, আর আমি মনে মনে বলছি — কী অন্যায়, এত কথা হল, আর ফেলুদা একবারও বলল না সে রাজেনবাবুকে চেনে?

এবার ফেলুদা আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিল। রাজেনবাবুর মুখ দেখে মনেই হল না যে, এই সাত দিন আগে আমাকে লজেঞ্চুস দেবার কথাটা ওঁর মনে আছে।

ফেলুদা এবার বলল, 'আপনার খুব প্রাচীন জিনিসের শখ দেখছি।'

রাজেনবাবু বললেন, হ্যাঁ। এখন তো প্রায় নেশায় দাঁড়িয়েছে।'

'কদ্দিনের ব্যাপার?'

'এই তো মাস ছয়েক হবে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছি।'

ফেলুদা এবার একটা গলা-খাঁকরানি দিয়ে, আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটাই শুনিয়ে বলল, 'আপনি আমার বাবার মামলার ব্যাপারে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রতিদানে আপনার এই বিপদে যদি কিছু করতে পারি ...'

রাজেনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি সাহায্য পেলে খুশিই হবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই তিনকড়িবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাঁপানোর বহর দেখে মনে হল বোধহয় বেড়িয়ে ফিরলেন। রাজেনবাবু আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বিশেষ বন্ধু অ্যাডভোকেট্ জ্ঞানেশ সেন হচ্ছেন তিনকড়িবাবুর প্রতিবেশী। আমি ঘরভাড়া দেব শুনে জ্ঞানেশই ওঁকে সাজেস্ট করে আমার এখানে আসতে। গোড়ায় উনি হোটেলের কথা ভেবেছিলেন।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'আমার ভয় ছিল আমার এই চুরুটের বাতিকটা নিয়ে। এমনও হতে পারত যে রাজেনবাবু হয়তো চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই সেটা আমি আমার প্রথম চিঠিতেই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি বায়ু পরিবর্তনের জন্য এসেছেন?'

'তা বটে। তবে বায়ুর অভাবটাই যেন লক্ষ করছি বেশি। পাহাড়ে ঠান্ডাটা আর একটু বেশি এক্সপেক্ট করে লোকে।'

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আপনার বোধহয় গান-বাজনার শখ?'

তিনকড়িবাবু অবাক হাসি হেসে বললেন, 'সেটা জানলে কী করে হে?'

'আপনি যখন কথা বলছেন তখন লক্ষ করছি যে, লাঠির উপর রাখা আপনার ডান হাতের তর্জনীটা রেডিওর সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।'

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মোক্ষম ধরেছ। উনি ভাল শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পারেন।'

ফেলুদা এবার বলল, 'চিঠিটা হাতের কাছে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হাতের কাছে কেন, একেবারে বুকের কাছে।'

রাজেনবাবু কোটের বুক-পকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। এইবার সেটা দেখার সুযোগ পেলাম।

হাতে-লেখা চিঠি নয়। নানান জায়গা থেকে ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছে, তা হল এই — 'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।'

ফেলুদা বলল, 'এ চিঠি কি ডাকে এসেছে?'

রাজেনবাবু বললেন, হ্যাঁ। লোক্যাল ডাক — বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় খামটা ফেলে দিয়েছি। দার্জিলিং-এরই পোস্টমার্ক ছিল। ঠিকানাটাও ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে লেখা।'

'আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কী আর বলব বলো! কোনও দিন কারও প্রতি কোনও অন্যায় বা অবিচার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আপনার বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কয়েকজনের নাম করতে পারেন?'

'খুব সহজ। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশি কমই। ডাক্তার ফণী মিত্তির আসেন

অসুখ-বিসুখ হলে ...'

'কেমন লোক বলে মনে হয়?'

'ডাক্তার হিসেবে বোধহয় সাধারণ স্তরের। তবে তাতে আমার এসে যায় না, কারণ আমার ব্যারামও সাধারণ — সর্দি-জ্বর ছাড়া আর কিছুই হয়নি দার্জিলিং এসে অবধি। তাই ভাল ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না।'

'চিকিৎসা করে পয়সা নেন?'

'তা নেন বইকী। আর আমারও তো পয়সার অভাব নেই। মিথ্যে অব্লিগেশনে যাই কেন?'

'আর কে আসেন?'

'সম্প্রতি মিস্টার ঘোষাল বলে এক ভদ্রলোক যাতায়াত ... এই দ্যাখো!'

দরজার দিকে ফিরে দেখি একটি ফরসা, মাঝারি হাইটের, স্যুট-পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকছেন।

'আমার নাম শুনলাম বলে মনে হল যেন!'

রাজেনবাবু বললেন, 'এইমাত্র আপনার নাম করা হয়েছে। আপনারও আমার মতো পুরনো জিনিসের শখ — সেটাই এই ছেলেটিকে বলতে যাচ্ছিলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই —'

নমস্কার-টমস্কারের পর মিস্টার ঘোষাল — পুরো নাম অবনীমোহন ঘোষাল — রাজেনবাবুকে বললেন, 'আপনাকে আজ দোকানে দেখলুম না, তাই একবার ভাবলুম খোঁজ নিয়ে যাই।'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ — আজ শরীরটা ভাল ছিল না।'

বুঝলাম রাজেনবাবু চিঠিটার কথা মিস্টার ঘোষালকে বলতে চান না। ফেলুদা মিস্টার ঘোষাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘোষাল বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকলে আজ বরং ... আসলে আপনার ওই তিব্বতি ঘন্টাটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল।'

রাজেনবাবু বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। হাতের কাছেই আছে।'

রাজেনবাবু ঘন্টা আনতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক দেওয়াল থেকে একটা ভোজালি নামিয়ে সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি কোনও এক জায়গায় বেশি দিন থাকি না। আমার ব্যবসার জন্য প্রচুর ঘুরতে হয়। আমি কিউরিও সংগ্রহ করি।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, 'কিউরিও' মানে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস।

রাজেনবাবু ঘন্টাটা নিয়ে এলেন। দারুণ দেখতে জিনিসটা। নীচের অংশটা রুপোর তৈরী, হাতলটা তামা আর পেতল মেশানো, আর তার উপরে লাল নীল সব পাথর বসানো।

অবনীবাবু চোখ-টোখ কুঁচকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘন্টাটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'কী মনে হয়?'

'সত্যিই দাঁও মেরেছেন। একেবারে খাঁটি পুরনো জিনিস।'

'আপনি বললে আমার আর কোনও সন্দেহই থাকে না। দোকানদার বলে, এটা

নাকি একেবারে খোদ লামার প্রাসাদের জিনিস।'

'কিছুই আশ্চর্য না।... আপনি বোধহয় এটা হাতছাড়া করতে রাজি নন? মানে, ভাল দাম পেলেও?'

রাজেনবাবু মিষ্টি করে হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন? শখের জিনিস — ভালবেসে কিনেছি। সেটাকে বেচে লাভ করব, এমন কী কেনা দরেও বেচব — এ ইচ্ছে আমার নেই!'

অবনীবাবু ঘন্টাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। কাল আশা করি বেরোতে পারবেন একবার।'

রাজেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে তো আছে।'

অবনীবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'ক'টা দিন একটু না বেরিয়ে-টেরিয়ে সাবধানে থাকা উচিত নয় কি?'

'সেটাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু মুশকিল কী জান? সেই চিঠির ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে, এটাকে ঠিক যেন সিরিয়াসলি নিতেই পারছি না। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা ঠাট্টা — যাকে বলে প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক।'

'যদ্দিন না সেটা সম্বন্ধে ডেফিনিট হওয়া যাচ্ছে, তদ্দিন বাড়িতেই থাকুন না। আপনার নেপালি চাকরটা কদ্দিনের?'

'একেবারে গোড়া থেকেই আছে। কমপ্লিটলি রিলায়েব্‌ল।'

ফেলুদা এবার তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন?'

'সকাল বিকেল ঘন্টাখানেক একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি আর কী। কিন্তু

বিপদ যদি ঘটেই, আমি বুড়ো মানুষ খুব বেশি কিছু করতে পারি কি? আমার বয়স হল চৌষট্টি, রাজেনবাবুর চেয়ে এক বছর কম।'

রাজেনবাবু বললেন, 'উনি চেঞ্জে এসেছেন, ওঁকে আর বাড়িতে বন্দি করে রাখার ফন্দি করছ কেন তোমরা? আমি থাকব, আমার চাকর থাকবে, এই যথেষ্ট। তোমরা চাও তো দু বেলা খোঁজ-খবর নিয়ে যেয়ো এখন।'

'বেশ তাই হবে।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমিও উঠে পড়লাম।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উলটোদিকেই একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটা তাক, আর সেই তাকের উপর তিনটে ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি। ফেলুদা ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ছবিটা দেখিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী। বিয়ের চার বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় ছবি, একজন আমার বয়সী ছেলের, গায়ে ভেলভেটের কোট।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'

রাজেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'সময়ের প্রভাবে মানুষের চেহারার কী বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে, সেইটে বোঝানোর জন্য এই ছবি। উনি হচ্ছেন আমারই বাল্য সংস্করণ। বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলে পড়তাম তখন। আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট।'

সত্যি, ভারী ফুটফুটে চেহারা ছিল রাজেনবাবুর ছেলেবয়সে।

'অবিশ্যি, ছবি দেখে ভুলো না। দুরন্ত বলে ভারী বদনাম ছিল আমার। শুধু যে

মাস্টারদের জ্বালিয়েছি তা নয়, ছাত্রদেরও। একবার স্পোর্টসের দিন হান্ড্রেড ইয়ার্ডস-এ আমাদের বেস্ট্ রানারকে কাত করে দিয়েছিলাম, ল্যাং মেরে।'

তৃতীয় ছবিটা ফেলুদার বয়সী একজন ছেলের। রাজেনবাবু বললেন, সেটা তাঁর একমাত্র ছেলে প্রবীরের।

'উনি এখন কোথায়?'

রাজেনবাবু গলা খাঁক্‌রিয়ে বললেন, 'জানি না ঠিক। বহুকাল দেশ ছাড়া! প্রায় সিক্সটিন ইয়ার্স।'

'আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি নেই?'

'নাঃ।'

ফেলুদা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ভারী ইন্টারেস্টিং কেস।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা একেবারে বইয়ের ডিটেকটিভের মতো কথা বলছে।

বাইরেটা ছম্‌ছমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জলাপাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম রঙ্গিত উপত্যকা থেকে কুয়াশা ওপর দিকে উঠছে।

রাজেনবাবু আর তিনকড়িবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। রাজেনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তাও তোমাকে বলছি — একটু যে নারভাস বোধ করছি না তা নয়। এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ-চিঠি যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।'

ফেলুদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এর

সমাধান করবই। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

রাজেনবাবু 'গুডনাইট অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেলেন।

এবার তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'তোমার — তোমাকে "তুমি" করেই বলছি — তোমার অবজারভেশনের ক্ষমতা দেখে আমি সত্যিই ইম্‌প্রেসড হইচি। ডিটেক্‌টিভ গল্প আমিও অনেক পড়িচি। এই চিঠিটার ব্যাপারে আমি হয়তো তোমাকে কিছুটা সাহায্যও করতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'এই যে টুকরো টুকরো ছাপা কথা কেটে চিঠিটা লেখা হয়েছে, এর থেকে কী বুঝলে বলো তো?'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, 'এক নম্বর — কথাগুলো কাটা হয়েচে খুব সম্ভব ব্লেড দিয়ে — কাঁচি দিয়ে নয়।'

'ভেরি গুড।'

'দুই নম্বর — কথাগুলো নানারকম বই থেকে নেওয়া হয়েছে — কারণ হরফ ও কাগজে তফাত রয়েছে।'

'ভেরি গুড। সেই সব বই সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া করেচ?'

'চিঠির দুটো শব্দ "শাস্তি" আর "প্রস্তুত" — মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।'

'আনন্দবাজার।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস। ওই টাইপটা আনন্দবাজারেই ব্যবহার হয় —অন্য বাংলা কাগজে

নয়। আর অন্য কথাগুলোও কোনওটাই পুরনো বই থেকে নেওয়া হয়নি, কারণ যে হরফে ওগুলো ছাপা, সেটা হয়েছে, মাত্র পনেরো-বিশ বছর।... আর যে আঠা দিয়ে আটকানো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোনও ধারণা করেছ?'

'গন্ধটা গ্রিপেক্স আঠার মতো।'

'চমৎকার ধরেছ।'

'কিন্তু আপনিও তো ধরার ব্যাপারে কম যান না দেখছি।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু তোমার বয়সে আমি ডিটেক্টিভ কথাটার মানে জানতুম কি না সন্দেহ!'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদা বলল, 'রাজেনবাবুর মিস্ট্রি সল্ভ করতে পারব কি না জানি না—কিন্তু সেই সূত্রে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ ফাউ পাওয়া গেল।'

আমি বললাম, 'তা হলে উনিই ব্যাপারটা তদন্ত করুন না। তুমি আর মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'আহা—বাংলা হরফের ব্যাপারটা জানা আছে বলে কি সবই জানবেন নাকি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভালই লাগল। ওর মতো বুদ্ধি আশা করি তিনকড়িবাবুর নেই। মাঝে মাঝে ফোড়ন দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু আসল কাজটা যেন ফেলুদাই করে।

'কাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা?'

'অপরা—'

কথাটার মাঝখানেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেখলাম একজন লোককে ফলো করে পিছন দিকে ঘুরছে।

'লোকটাকে দেখলি?'

'কই, না তো। মুখ দেখিনি তো।'

'ল্যাম্পের আলোটা পড়ল, আর ঠিক মনে হল'— ফেলুদা আবার থেমে গেল।

'কী মনে হল ফেলুদা?'

'নাঃ, বোধহয় চোখের ভুল। চ' পা চালিয়ে চ', ক্ষিদে পেয়েছে।'

ফেলুদা হল আমার মাসতুতো দাদা। ও আর আমি আমার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসে শহরের নীচের দিকে স্যানাটোরিয়ামে উঠেছি। স্যানাটোরিয়াম ভর্তি বাঙালি; বাবা তাদেরই মধ্য থেকে সমবয়সী বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে তাসটাস খেলে গল্পটল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। আমি আর ফেলুদা কোথায় যাই, কী করি, তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না।

আজ সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে। উঠে দেখি বাবা রয়েছেন, কিন্তু ফেলুদার বিছানা খালি। কী ব্যাপার?

বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'ও এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেনি। আজ দিনটা পরিষ্কার দেখে বোধহয় আগেভাগে বেরিয়েছে।'

আমি কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করছিলুম যে ফেলুদা তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে, আর সেই কাজেই বেরিয়েছে। কথাটা ভেবে ভারী রাগ হল। আমাকে বাদ

দিয়ে কিছু করার কথা তো ফেলুদার নয়।

যাই হোক্, আমিও মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লেডেন লা রোডে ট্যাক্‌সি স্ট্যান্ডটার কাছাকাছি এসে ফেলুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বা রে, তুমি আমায় ফেলে বেরিয়েছ কেন?'

'শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল—তাই ডাক্তার দেখাতে গেস্‌লাম।'

'ফণী ডাক্তার?'

'তোরও একটু একটু বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।'

'দেখালে?'

'চার টাকা ভিজিট নিল, আর একটা ওষুধ লিখে দিল।'

'ভাল ডাক্তার?'

'অসুখ নেই তাও পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে—কেমন ডাক্তার বুঝে দ্যাখ; তার পর বাড়ির যা চেহারা দেখলাম, তাতে পসার সে খুব বেশি তাও মনে হয় না'

'তা হলে উনি কখনওই চিঠিটা লেখেননি।'

'কেন?'

'গরিব লোকের অত সাহস হয়?'

'তা টাকার দরকার হলে হয় বইকী।'

'কিন্তু চিঠিতে তো টাকা চায়নি।'

'ওই ভাবে খোলাখুলি বুঝি কেউ টাকা চায়?'

'তবে?'

'রাজেনবাবুর অবস্থা কাল কী রকম দেখলি বল তো?'

'কেমন যেন ভিতু ভিতু।'

'ভয় পেয়ে মনের অসুখ হতে পারে, সেটা জানিস?'

'তা তো পারেই।'

'আর মনের অসুখ থেকে শরীরের অসুখ?'

'তাও হয় বুঝি?'

'ইয়েস। আর শরীরের অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে হবে, সেটা আশা করি তোর মতো ক্যাবলারও জানা আছে।'

ফেলুদার বুদ্ধি দেখে আমার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অবিশ্যি ফণী ডাক্তার যদি সত্যিই এত সব ভেবে-টেবে চিঠিটা লিখে থাকে, তা হলে ওরও বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে।

ম্যালের মুখে ফোয়ারার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ফেলুদা বলল, 'কিউরিও সম্বন্ধে একটা কিউরিয়সিটি বোধ করছি।'

'কিউরিও'র মানে আগেই শিখেছিলাম, আর কিউরিয়সিটি মানে যে কৌতূহল, সেটা ইস্কুলেই শিখেছি।

আমাদের ঠিক পাশেই 'নেপাল কিউরিও শপ'। রাজেনবাবু আর অবনীবাবু এখানেই আসেন।

ফেলুদা সটান দোকানের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

দোকানদারের গায়ে ছাই রঙের কোট, গলায় মাফলার আর মাথায় সোনালি কাজ করা কালো টুপি। ফেলুদাকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এল। দোকানের ভেতরটা পুরনো জিনিসপত্রে গিজগিজ করছে, আলোও বেশি নেই, আর গন্ধটাও

যেন সেকেলে।

ফেলুদা এদিক-ওদিক দেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভাল পুরনো থাঙ্কা আছে?'

'এই পাশের ঘরে আসুন। ভাল জিনিস তো বিক্রি হয়ে গেছে সব। তবে নতুন মাল আবার কিছু আসছে।'

পাশের ঘরে যাবার সময় আমি ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'থাঙ্কা কী জিনিস?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দেখতেই তো পাবি।'

পাশের ঘরটা আরও ছোট — যাকে বলে একেবারে ঘুপ্‌চি।

দোকানদার দেওয়ালে ঝোলানো সিল্কের উপর আঁকা একটা বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই একটাই ভাল জিনিস আছে — তবে একটু ড্যামেজড্।'

একেই বলে থাঙ্কা? এ জিনিস তো রাজেনবাবুর বাড়িতে অনেক আছে।

ফেলুদা ভীষণ বিজ্ঞের মতো থাঙ্কাটার গায়ের উপর চোখ ঠেকিয়ে উপর থেকে নীচে অবধি প্রায় তিন মিনিট ধরে দেখে বলল, 'এটার বয়স তো সত্তর বছরের বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত তিনশো বছরের পুরনো জিনিস চাইছি।'

দোকানদার বলল, 'আমরা আজ বিকেলে কিন্তু এক লট মাল পাচ্ছি। তার মধ্যে ভাল থাংকা পাবেন।'

'আজই পাচ্ছেন?'

'আজই।'

'এ খবরটা তাহলে রাজেনবাবুকে জানাতে হয়।'

'মিস্টার মজুমদার? ওনার তো জানা আছে। রেগুলার খদ্দের যে দু-তিন জন

আছেন, তাঁরা সকলেই নতুন মাল দেখতে বিকেলে আসছেন।'

'অবনীবাবুও খবরটা পেয়ে গেছেন? মিস্টার ঘোষাল?'

'জরুর!'

'আর বড় খদ্দের কে আছে আপনাদের?'

'আর আছেন মিস্টার গিলমোর—চা বাগানের ম্যানেজার। সপ্তাহে দু দিন বাগান থেকে আসেন। আর মিস্টার নাওলাখা। উনি এখন সিকিমে।'

'বাঙালি আর কেউ নেই?'

'না স্যার।'

'আচ্ছা দেখি, বিকেলে যদি একবার টুঁ মারতে পারি।'

তার পর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্‌সে, তুই একটা মুখোশ চাস?'

তোপ্‌সে যদিও আমার আসল ডাকনাম নয়, তবু ফেলুদা তপেশ থেকে ওই নামটাই করে নিয়েছে।

মুখোশের লোভ কি সামলানো যায়? ফেলুদা নিজেই একটা বাছাই করে আমাকে কিনে দিয়ে বলল, 'এইটেই সবচেয়ে হরেনডাস্‌-কী বলিস?'

ফেলুদা বলে 'হরেনডাস্‌' বলে আসলে কোনও কথা নেই। 'ট্রিমেনডাস্‌' মানে সাংঘাতিক, আর 'হরিবল্‌' মানে বীভৎস। এই দুটো একসঙ্গ বোঝাতে নাকি কেউ কেউ 'হরেনডাস্‌' ব্যবহার করে। মুখোশটা সম্বন্ধে যে ওই কথাটা দারুণ খাটে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

দোকান থেকে বেরিয়ে ফেলুদা আমার হাত ধরে কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। এবারও দেখি ফেলুদা একজন লোকের দিকে দেখছে। বোধ হয় কাল

রাতে যাকে দেখেছিল, সেই লোকটাই। বয়স আমার বাবার মতো, মানে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, গায়ের রং ফরসা, চোখে কালো চশমা। যে স্যুটটা পরে আছে সেটা দেখে মনে হয় খুব দামি। ভদ্রলোক ম্যালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাচ্ছেন। আমার দেখেই কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ফেলুদা সোজা লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ সাহেবি কায়দার উচ্চারণে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনি মিস্ঠা ছ্যাঠাঝি?'

ভদ্রলোকও একটু গম্ভীর গলায় পাইপ কামড়ে বলল, 'নো, আই অ্যাম নঠ্।'

ফেলুদা খুবই অবাক হবার ভান করে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ—আপনি সেন্ট্রাল হোটেলে উঠেছেন না?'

ভদ্রলোক একটু হেসে অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'না। মাউন্ট এভারেস্ট্। অ্যান্ড আই ডোন্ট হ্যাভ এ টুইন ব্রাদার।'

এই বলে ভদ্রলোক গটগটিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকে চলে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ কললাম যে তার কাছে একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট, আর কাগজটার গায়ে লেকা 'নপালি কিউরিও শপ'।

আমি চাপা গলায় বললাম, 'ফেলুদা, উনিও কি মুখোশ কিনেছেন নাকি?'

'তা কিনতে পারে। মুখোশটা তো আর তোর-আমার একচেটিয়া নয়।...চ', কেভেনটার্সে গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।'

কেভেনটার্সের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'লোকটাকে চিনলি?'

আমি বললাম, 'তুমিই চিনলে না, আমি আর কী করে চিনি বলো। তবে চেনা

চেনা লাগছিল।'

'আমি চিনলাম না?'

'বা রে। কোথায় চিনলে? ভুল নাম বললে যে?'

'তোর যদি এতটুকু সেন্স থাকে। ভুল নাম বলেছি হোটেলের নামটা বের করার জন্য, সেটাও বুঝলি না? লোকটার আসল নাম কী জানিস?'

'কী?'

'প্রবীর মজুমদার।'

'ও হো! হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। রাজেনবাবুর ছেলে, তাই না? যার ছবি রয়েছে তাকের উপর? অবিশ্যি বয়সটা এখন অনেক বেড়ে গেছে তো।'

'শুধু যে চেহারায় মিল তা নয়—গালের আঁচিলটা নিশ্চয় তুও লক্ষ করেছিস—আসল কথাটা হচ্ছে, ভদ্রলোকের জামা-কাপড় সব বিলিতি। স্যুট লন্ডনের, টাই প্যারিসের, জুতো ইটালিয়ান, এম কী রুমালটা পর্যন্ত বিলিতি। সদ্য বিলেত-ফেরত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু ওঁর ছেলে এখানে রয়েছে সে খবর রাজেনবাবু জানেন না?'

'বাপ যে এখানে রয়েছে, সেটা ছেলে জানে কি না সেটাও খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।'

রহস্য ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, এই কথাটা ভাবতে ভাবতে কেভেন্টারের দোকানে পৌঁছলাম।

দোকানের ছাতে যে বসার জায়গাটা আছে, সেটা আমার ভীষণ ভাল লাগে। চারদিকে দার্জিলিং শহরটা, আর ওই নীচে বাজারটা দারুণ ভাল দেখায়।

ছাতে উঠে দেখি, কোণের টেবিলটায় চুরুট হাতে তিনকড়িবাবু বসে কফি খাচ্ছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে তাঁর টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন আমাদের।

আমরা তিনকড়িবাবুর দু দিকে দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম।

তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'ডিটেক্‌শনে তোমার পারদর্শিতা দেখে খুশি হয়ে আমি তোমাদের দুজনকে দুটো হট্‌ চকোলেট খাওয়াব—আপত্তি আছে?'

হট্‌ চকোলেটের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে গেল।

তিনকড়িবাবু তুড়ি মেরে একটা বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেলে পর তিনকড়িবাবু কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। একটা এক্সট্রা কপি ছিল—আমার লেটেস্ট্‌ বই। তোমায় দিলুম।'

বইয়ের মলাটটা দেখে ফেলুদার মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

'আপনার বই মানে? আপনার লেখা? আপনিই 'গুপ্তচর' নাম নিয়ে লেখেন?'

তিনকড়িবাবু আধ-বোজা চোখে অল্প হাসি হেসে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

ফেলুদার অবাক ভাব আরও যেন বেড়ে গেল।

'সে কী! আপনার সব ক'টা উপন্যাস যে আমার পড়া। বাংলায় আপনার ছাড়া আর কারুর রহস্য উপন্যাস আমার ভাল লাগে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! ব্যাপারটা কী জানো? এখানে একটা প্লট মাথায় নিয়ে লেখার জন্যই এসেছিলাম। এখন দেখছি, বাস্তব জীবনের রহস্য নিয়েই মাথা ঘামিয়ে

ছুটিটা ফুরিয়ে গেল।'

'আমার সত্যিই দারুণ লাক্- আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ হয়ে গেল।'

'দুঃখের বিষয় আমার ছুটির মেয়াদ সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে। কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি। আশা করছি, যাবার আগে তোমাদের আরও কিছুটা হেলপ্ করে দিয়ে যেতে পারব।'

ফেলুদা এবার তার এক্সাইটিং খবরটা তিনকড়িবাবুকে দিয়ে দিল।

'রাজেনবাবুর ছেলেকে আজ দেখলাম।'

'বল কী হে?'

'এই দশ মিনিট আগে।'

'তুমি ঠিক বলছ? চিনতে পেরেছ তো ঠিক?'

'চোদ্দ আনা শিওর। মাউন্ট এভারেস্ট্ হোটেলে গিয়ে খোঁজ করলে বাকি দু আনাও পুরে যাবে বোধ হয়।'

তিনকড়িবাবু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'রাজেনবাবুর মুখে তার ছেলের কথা শুনেছ?'

'কাল যা বললেন, তার বেশি শুনিনি।'

'আমি শুনেছি অনেক কথা। ছেলেটি অল্পবয়সে বখে গিয়েছিল। বাপের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়েছিল। রাজেনবাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ছেলেটি গিয়েওছিল তাই। ২৪ বছর বয়স তখন তার। একেবারে নিখোঁজ। রাজেনবাবু অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন, কারণ পরে তাঁর অনুতাপ হয়। কিন্তু ছেলে কোনও খোঁজখবর নেয়নি বা দেয়নি। বিলেতে তাকে

দেখেছিলেন রাজেনবাবুরই এক বন্ধু। তাও সে দশ-বারো বছর আগে।'

'রাজেনবাবু তাহলে জানেন না যে তাঁর ছেলে এখানে আছে?'

'নিশ্চয়ই না। আমার মনে হয় ওঁকে না জানানোই ভাল। একে এই চিঠির শক্, তার উপর...'

তিনকড়িবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তার পর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। রহস্য উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

ফেলুদা হাসতে হাসতে বলল, 'প্রবীর মজুমদার যে চিঠি লিখে থাকতে পারেন, সেটা আপনার খেয়াল হয়নি তো?'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু...'

তিনকড়িবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বেয়ারা হট্ চকোলেট এনে টেবিলে রাখতে তিনকড়িবাবু যেন একটু চাগিয়ে উঠলেন। ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ফণী মিত্তিরকে কেমন দেখলে?'

ফেলুদা যেন একটু হকচকিয়ে গেল।

'সে কি, আপনি কী করে জানলেন আমি ওখানে গেস্‌লাম?'

'তুমি যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আমিও গেস্‌লাম।'

'আমাকে রাস্তায় দেখেছিলেন বুঝি?'

'না।'

'তবে?'

ডাক্তারের ঘরের মেঝেতে একটি মরা সিগারেট দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কে খেয়েছে। ডাক্তার ধূমপান করেন না। ফণীবাবু তখন বর্ণনা দিলেন। তাতে তোমার

কথা মনে হল, যদিও তোমাকে আমি সিগারেট খেতে দেখিনি। কিন্তু এখন তোমার আঙুলের গায়ে হলদে রং দেখে বুঝেছি, তুমি খাও।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বলল, 'আপনারও কি ফণী মিত্তিরকে সন্দেহ হয়েছিল না কি?'

'তা হবে না? লোকটাকে দেখলে অভক্তি হয় কি না?'

'তা হয়। রাজেনবাবু যে কেন ওকে আমল দেন জানি না।'

'তাও জানো না বুঝি? দার্জিলিং-এ আসার কিছু দিনের মধ্যে রাজেনবাবুর ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মন যায়। তখন ফণীবাবুই তাকে এক গুরুর সন্ধান দিয়েছিলেন। একই গুরুর শিষ্য হিসেবে ওদের যে প্রায় ভাই-ভাই সম্পর্ক হে।'

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ফণী মিত্তিরের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন?'

'কথা তো ছুতো। আসলে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম।'

'বাংলা উপন্যাস আছে কিনা দেখার জন্য?'

'ঠিক বলেছ।'

'আমিও দেখেছি, প্রায় নেই বললেই চলে। আর যা আছে, তাও আদ্যিকালের।'

'ঠিক।'

'তবে ফণী ডাক্তার অন্যের বাড়ির বই থেকেও কথা কেটে চিঠি তৈরি করতে পারে।'

'তা পারে। তবে লোকটাকে দেখে ভারী কুঁড়ে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে

অতটা কাঠখড় পোড়াবে, সেটা কেন যেন বিশ্বাস হয় না।'

ফেলুদা এবার বলল, 'অবনী ঘোষাল লোকটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

'বিশেষ সুবিধের লোক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ভারী ওপর-চালাক। আর ও সব প্রাচীন শিল্প-টিল্প কিছু না। ওর আসল লোভ হচ্ছে টাকার। এখন খরচ করে জিনিস কিনছে, পরে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে পাঁচগুণ প্রফিট করবে।'

'ওর পক্ষে এই হুমকি-চিঠি দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি?'

'সেটা এখনও তলিয়ে দেখিনি।'

'আমি একটা কারণ আবিষ্কার করেছি।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী কারণ?'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'যে দোকান থেকে ওঁরা জিনিস কেনেন, সেখানে কিছু ভাল নতুন মাল আজ বিকেলে আসছে।'

এবার তিনকড়িবাবুর চোখও জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বুঝেছি। হুমকি চিঠি পেয়ে রাজেন মজুমদার ঘরে বন্দি হয়ে রইলেন, আর সেই ফাঁকতালে অবনী ঘোষাল দোকানে গিয়ে সব লুটেপুটে নিলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!'

তিনকড়িবাবু চকোলেটের পয়সা দিয়ে উঠে পড়লেন। আমরা দুজনেও উঠলাম। উৎসাহে আর উত্তেজনায় আমার বুকটা টিপ্ টিপ্ করছিল।

অবনী ঘোষাল, প্রবীর মজুমদার আর ফণী মিত্তির—তিনজনকেই তাহলে

সন্দেহ করার কারণ আছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে ফেলুদা সেই খবরটা জেনে নিল। প্রবীর মজুমদার বলে একজন ভদ্রলোক সেই হোটেলের ষোল নম্বর ঘরে পাঁচ দিন হল এসে রয়েছেন।

বিকেলের দিকে রাজেনবাবুর বাড়িতে যাবার কথা ফেলুদা বলেছিল, কিন্তু দুপুর থেকে মেঘলা করে চারটে নাগাত তেড়ে বৃষ্টি নামল। আকাশের চেহারা দেখে মনে হল বৃষ্টি সহজে থামবে না।

ফেলুদা সারাটা সন্ধে খাতা-পেনসিল নিয়ে কী সব যেন হিসেব করল। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কী লিখছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। শেষটায় আমি তিনকড়িবাবুর বইটা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। দারুণ থ্রিলিং গল্প। পড়তে পড়তে রাজেনবাবুর চিঠির ব্যাপারটা মন থেকে প্রায় মুছেই গেল।

আটটা নাগাত বৃষ্টি থামল। কিন্তু তখন এত শীত যে, বাবা আমাদের বেরোতে দিলেন না।

পরদিন ভোরবেলা ফেলুদার ধাক্কার চোটে ঘুম ভাঙল। 'ওঠ্, ওঠ্ — এই তোপ্‌সে—ওঠ!'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ফেলুদা কানের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'রাজেনবাবুর নেপালি চাকরটা এসেছিল। বলল, বাবু এখুনি যেতে বলেছেন—বিশেষ দরকার। তুই যদি যেতে চাস তো—'

'সে আর বলতে!'

পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে রাজেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি, তিনি

ফ্যাকাশে মুখ করে খাটে শুয়ে আছেন। ফণী ডাক্তার তাঁর নাড়ি টিপে খাটের পাশটায় বসে, আর তিনকড়িবাবু এই শীতের মধ্যেও একটা হাতপাখা নিয়ে মাথার পিছনটায় দাঁড়িয়ে হাওয়া করছেন।

ফণীবাবুর নাড়ি দেখা হলে পর রাজেনবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'কাল রাত্রে—বারোটায় কিছু পরে ঘুমটা ভাঙতে বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের ঠিক সামনে আই স এ মাস্ক্‌ড্‌ ফেস্‌!'

মাস্ক্‌ড্‌ ফেস্‌! মুখোশ পরা মুখ!

রাজেনবাবু দম নিলেন। ফণী মিত্তির দেখলাম একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখছেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'দেখে এমন হল যে চিৎকারও বেরোল না গলা দিয়ে। রাতটা যে কীভাবে কেটেছে—তা বলতে পারি না।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জিনিসপত্তর কিছু চুরি যায়নি তো?'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ, তবে আমার বিশ্বাস, আমার বালিশের তলা থেকে আমার চাবির গোছাটা নিতেই সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে ... ওঃ—হরিবল্, হরিবল্!'

ফণী ডাক্তার বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার কম্‌প্লিট রেস্টের দরকার।'

ফণীবাবু উঠে পড়লেন।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'ফণীবাবু কাল রাত্রে রুগি দেখতে গেস্‌লেন বুঝি? কোটের পিছনে কাদার ছিটে লাগল কী করে?'

ফণীবাবু তেমন কিছু না ঘাবড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তারের লাইফ তো জানেনই—আর্তের সেবায় যখন জীবনটাই উৎসর্গ করিচি, তখন ডাক যখনই আসুক না কেন, বেরোতেই হবে। সে ঝড়ই হোক, আর বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক।'

ফণীবাবু তাঁর পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। রাজেনবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'তোমরা আসাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেস্‌লুম, জানো। এখন বোধহয় বৈঠকখানায় গিয়ে একটু বসা চলতে পারে।'

ফেলুদা আর তিনকড়িবাবু হাত ধরাধরি করে রাজেনবাবুকে বৈঠকখানায় এনে বসালেন।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'স্টেশনে ফোন করেছিলুম যদি যাওয়াটা দু দিন পেছোনো যায়। রহস্যের সমাধান না করে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু ওরা বললে এ-টিকিট ক্যানসেল করলে দশ দিনের আগে বুকিং পাওয়া যাবে না।'

এটা শুনে আমার ভালই লাগল। আমি চাইছিলাম ফেলুদা একাই ডিটেক্‌টিভের কাজটা করুক। তিনকড়িবাবু যেন ফেলুদার অনেকটা কাজ আগে-আগেই করে দিচ্ছিলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'আমার চাকরটার পাহারা দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি নিজেই কাল দশটার সময় তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। ওর বাড়িতে খুব অসুখ। বুড়ো বাপ আছে, তার এখন-তখন অবস্থা।'

ফেলুদা বলল, 'মাস্কটা কেমন ছিল মনে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'খুবই সাধারণ নেপালি মুখোশ, দার্জিলিং শহরেই অন্তত আরও তিন-চার শ' খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। আমার এই ঘরেই তো আরও পাঁচখানা রয়েছে—ওই যে, দ্যাখো-না।

রাজেনবাবু যে মুখোশটার দিকে আঙুল দেখালেন, ঠিক সেই জিনিসটা কাল ফেলুদা আমার জন্য কিনে দিয়েছে।

তিনকড়িবাবু এতক্ষণ বেশি কথা বলেননি, এবার বললেন, 'আমার মতে এবার বোধহয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা প্রোটেক্‌শনেরও তো দরকার। কাল যা ঘটেছে, তার পরে তো আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে নেওয়া চলে না। ফেলুবাবু, তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মতো তদন্ত চালিয়ে যেতে পারো, তাতে তোমায় কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আমি সব দিক বিবেচনা করে বলছি, এবার

পুলিশের সাহায্য নেওয়া দরকার। আমি বরং যাই, গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসি। প্রাণের ভয় আছে বলে মনে হয় না, তবে রাজেনবাবু, আপনার ঘন্টাটা একটু সাবধানে রাখবেন।'

আমরা যখন উঠছি, তখন ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'তিনকড়িবাবু তো চলে যাচ্ছেন। তার মানে আপনার একটি ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি আজ রাতটা ও ঘরে এসে থাকি, তা হলে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?'

রাজেনবাবু বললেন, 'মোটেই না। আপত্তি কী? তুমি তো হলে আমার প্রায় আত্মীয়ের মতো। আর সত্যি বলতে কী, যত বুড়ো হচ্ছি তত যেন সাহসটা কমে আসছে। ছেলেবয়সে দুরন্ত হলে নাকি বুড়ো বয়সে মানুষ ম্যাদা মেরে যায়।'

তিনকড়িবাবুকে ফেলুদা বলল স্টেশনে ওঁকে 'সি-অফ' করতে যাবে।

ফেরার পথে যখন নেপাল কিউরিও শপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তখন আমাদের দুজনেরই চোখ গেল দোকানের ভিতর।

দেখলাম দুজন ভদ্রলোক দোকানের ভিতর জিনিসপত্র দেখছে আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। দেখে মনে হয় দুজনের অনেক দিনের আলাপ।

একজন অবনী ঘোষাল, আর একজন প্রবীর মজুমদার।

আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম।

তার মুখের ভাব দেখে মনে হল না সে কোনও আশ্চর্য জিনিস দেখেছে।

সাড়ে দশটার সময় স্টেশনে গেলাম তিনকড়িবাবুকে গুড বাই করতে। উনি এলেন আমাদেরও পাঁচ মিনিট পরে।

'চড়াই উঠে উঠে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে তাই আস্তে হাঁটতে হল।' সত্যিই

ভদ্রলোক একটু খোঁড়াচ্ছিলেন।

নীল রঙের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠে তিনকড়িবাবু তাঁর অ্যাটাচিকেস খুলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট ফেলুদাকে দিলেন।

'এটা কিনতেও একটু সময় লাগল। রাজেনবাবু তো আর কিউরিওর দোকানে যেতে পারলেন না, অথচ কাল সত্যিই অনেক ভাল জিনিস এসেছে। তার থেকে একটি সামান্য জিনিস বাছাই করে ওঁর জন্যে এনেছি। তোমরা আমার নাম করে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওঁকে দিয়ে দিও।'

ফেলুদা প্যাকেটটা নিয়ে বলল, 'আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন না? মিস্ট্রিটা সল্‌ভ করে আপনাকে জানিয়ে দেব ভাবছিলাম যে!'

তিনকড়িবাবু বললেন, 'আমার প্রকাশকের ঠিকানাটা আমার বইতেই পাবে—তার কেয়ারে লিখলেই চিঠি আমার কাছে পৌঁছে যাবে। গুড লাক!'

ট্রেন ছেড়ে দিল। ফেলুদা আমাকে বলল, 'লোকটা বিদেশে জন্মালে দারুণ নাম আর পয়সা করত। পর পর এতগুলো ভাল রহস্য উপন্যাস খুব কম লোকেই লিখেছে।'

সারা দিন ধরে ফেলুদা রাজেনবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করল। আমি অনেক করে বলতেও আমাকে সঙ্গে নিল না। সন্ধেবেলা যখন রাজেনবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, তখন ফেলুদাকে বললাম, 'কোথায় কোথায় গেলে সেইটে অন্তত বলবে তো!'

ফেলুদা বলল, 'দুবার মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল, একবার ফণী মিত্তিরের বাড়ি, একবার নেপাল কিউরিও শপ, একবার লাইব্রেরি, আর এ ছাড়াও আরও কয়েকটা

জায়গা।'

'ও।'

'আর কিছু জানতে চাস?'

'অপরাধী কে বুঝতে পেরেছ?'

'এখনও বলার সময় আসেনি।'

'কাউকে সন্দেহ করেছে?'

'ভাল ডিকেক্টিভ্ হলে প্রত্যেককেই সন্দেহ করতে হয়।'

'প্রত্যেককে মানে?'

'এই ধর—তুই।'

'আমি?'

'যার কাছে এই মুখোশ আছে, সে-ই সন্দেহের পাত্র, সে যে-লোকই হোক।'

'তা হলে তুমিই বা বাদ যাবে কেন?'

'বেশি বাজে বকিস্নি।'

'বা রে—তুমি যে রাজেনবাবুকে আগে চিনতে, সে কথা তো গোড়ায় বলোনি। তার মানে সত্য গোপন করেছ। আর আমার মুখোশ তো ইচ্ছে করলে তুমিও ব্যবহার করতে পারো— হাতের কাছেই থাকে।'

'শটাপ্, শাটাপ্।'

রাজেনবাবুকে এ বেলা দেখে তবু অনেকটা ভাল লাগল। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'দুপুরের দিকটা বেশ ভাল বোধ করছিলাম। যত সন্ধে হয়ে

আসছে ততই যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগছে।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর দেওয়া প্যাকেটটা রাজেনবাবুকে দিল। সেটা খুলে তার থেকে একটা চমৎকার বুদ্ধের মাথা বের হল। সেটা দেখে রাজেনবাবুর চোখ ছলছলকরে এল। ধরা গলায় বললেন, 'খাশা জিনিস, খাশা জিনিস!'

ফেলুদা বলল, 'পুলিশ থেকে লোক এসেছিল?'

'আর বলো না। এসে বত্রিশ রকম জেরা করলে। কদ্দুর কী হদিস পাবে জানি না, তবে আজ থেকে বাড়িটা ওয়াচ করার জন্য লোক থাকবে, সেই যা নিশ্চিন্তি। সত্যি বলতে কী, তোমরা হয়তো না এলেও চলত।'

ফেলুদা বলল, 'স্যানাটোরিয়ামে বড্ড গোলমাল। এখানে হয়তো চুপচাপ আপনার কেসটা নিয়ে একটু ভাবতে পারব।'

রাজেনবাবু হেসে বললেন, 'আর তা ছাড়া আমার চাকরটা খুব ভাল রান্না করে। আজ মুরগির মাংস রাঁধতে বলেছি। স্যানাটোরিয়ামে অমনটি খেতে পাবে না।'

রাজেনবাবু আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা সটান খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাগ করে পর পর পাঁচটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।

তার পর আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ফণী মিত্তির কাল সত্যিই রুগি দেখতে গিয়েছিলেন। কার্ট রোডে একজন ধনী পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীর বাড়ি। আমি খোঁজ নিয়েছি। সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি ওখানে ছিলেন।'

'তা হলে ফণী মিত্তির অপরাধী নন?'

ফেলুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'প্রবীর মজুমদার ষোলো বছর ইংলন্ডে থেকে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছেন।'

'তা হলে ওই চিঠি ওর পক্ষে লেখা সম্ভব নয়?'

'আর ওর টাকার কোনও অভাবই নেই। তা ছাড়া দার্জিলিং-এ এসেও লেবং-এ ঘোড়দৌড়ের বাজিতে উনি অনেক টাকা করেছেন।'

আমি দম আটকে বসে রইলাম। ফেলুদার আরও কিছু বলার আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম।

আধখাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মতো করে প্রায় দশ হাত দূরের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ চা বাগানের গিলমোর সাহেব দার্জিলিং-এ এসেছে। প্লান্টারস ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। লামার প্রাসাদের আসল ঘন্টা একটাই আছে, আর সেটা গিলমোরের কাছে। রাজেনবাবুরটা নকল। অবনী ঘোষাল সেটা জানে।'

'তা হলে রাজেনবাবুর ঘন্টা তেমন মূল্যবান নয়?'

'না।..আর অবনী ঘোষাল কাল রাত্রে একটা পার্টিতে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে রাত ন'টা থেকে ভোর তিনটে অবধি মাতলামি করেছে।'

'ও। আর মুখোশ পরা লোকটা এসেছিল বারোটার কিছু পরেই।'

'হ্যাঁ।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বললাম, 'তা হলে?'

ফেলুদা কিছু না বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খাট থেকে উঠে পড়ল। ওর ভুরু দুটো যে এতটা কুঁচকোতে পারে, তা আমার জানাই ছিল না।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে ফেলুদা বৈঠকখানার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'একটু একা থাকতে চাই। ডিস্টার্ব করিস না।'

কী আর করি। এবার ওর জায়গায় আমি বিছানায় শুলাম।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের বাতিটা আর জ্বালতে ইচ্ছে করল না। খোলা জানলা দিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকটায় অন্যান্য বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বিকেলে ম্যাল থেকে একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যায়। এখন সেটা মিলিয়ে আসছে। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। দূর থেকে কাছে এসে আবার মিলিয়ে গেল।

সময় চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে শহরের আলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বোধহয় কুয়াশা হচ্ছে। ঘরের ভিতরটা এখন আরও অন্ধকার। একটা ঘুম-ঘুম ভাব আসছে মনে হল।

চোখের পাতা দুটো কাছাকাছি এসে গেছে, এমন সময় মনে হল, কে যেন ঘরে ঢুকছে। মনে হতেই এমন ভয় হল যে, যে দিক থেকে লোকটা আসছে, সে দিকে না তাকিয়ে আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা যে আমার দিকেই আসছে আর আমার সামনেই এসে দাঁড়াল যে!

জানালার বাইরে শহরের দৃশ্যটা ঢেকে দিয়ে একটা অন্ধকার কী যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তার পর সেই অন্ধকার জিনিসটা নিচু হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

এইবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে, আর সেই মুখে একটা — মুখোশ!

আমি যেই চিৎকার করতে যাব অমনি অন্ধকার শরীরটার একটা হাত উঠে গিয়ে মুখোশটা খুলতেই দেখি—ফেলুদা!

'কী রে — ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

'ওঃ — ফেলুদা — তুমি?'

'তা আমি না তো কে? তুই কি ভেবেছিলি...?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে একটা অট্টহাস্য করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেল। তার পর খাটের পাশটায় বসে বলল, 'রাজেনবাবুর মুখোশগুলো সব কটা পরে দেখছিলাম। তুই এইটে একবার পর তো।'

ফেলুদা আমাকে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

'অস্বাভাবিক কিছু লাগছে কি?'

'কই না তো। আমার পক্ষে একটু বড়, এই যা।'

'আর কিচ্ছু না? ভাল করে ভেবে তো।'

'একটু... একটু যেন ... গন্ধ।'

'কীসের গন্ধ?'

'চুরুট।'

ফেলুদা মুখোশটা খুলে নিয়ে বলল, 'এগজ্যাক্টলি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার টিপ টিপ করছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তি-তিনকড়িবাবু?'

ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল এঁরই। বাংলা উপন্যাস, খবরের কাগজ, ব্লেড, আঠা কোনওটারই অভাব নেই। আর

তুই লক্ষ করেছিলি নিশ্চয়ই—স্টেশনে আজ যেন একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় কাল জানালার বাইরে লাফিয়ে পড়ার দরুন। কিন্তু আসল যেটা রহস্য, সেটা হল— কারণটা কী? রাজেনবাবুকে তো মনে হয় রীতিমতো সমীহ করতেন ভদ্রলোক। তা হলে কী কারণে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন? এটার উত্তর বোধ হয় আর জানা যাবে না...কোনও দিনও না।'

রাত্রে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সকালে খাবার ঘরে বসে রাজেনবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছি, এমন সময় নেপালি চাকরটা একটা চিঠি নিয়ে এল। আবার সেই নীল কাগজ—আর খামের উপর দার্জিলিং পোস্ট মার্ক।

রাজেনবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'তুমিই পড়ো। আমার সাহস হচ্ছে না।'

ফেলুদা চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল। তাতে লেখা আছে—

'প্রিয় রাজু, কলকাতায় জ্ঞানেশের কাছ থেকে তোমার ঘরের খবর পেয়ে যখন তোমায় চিঠি লিখি, তখনও জানতাম না আসলে তুমি কে। তোমার বাড়িতে এসে তোমার ছেলেবয়সের ছবিখানা দেখেই চিনেছি, তুমি সেই পঞ্চাশ বছর আগের বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলের আমারই সহপাঠী রাজু!

'এতকাল পরেও যে পুরনো আক্রোশ চাগিয়ে উঠতে পারে, সেটা আমার জানা ছিল না। অন্যায়ভাবে ল্যাং মেরে তুমি যে শুধু আমায় হান্ড্রেড ইয়ার্ডস-এর নিশ্চিত পুরস্কার ও রেকর্ড থেকে বঞ্চিত করেছিলে, তাই নয়—আমাকে রীতিমতো

জখমও করেছিলে। বাবা বদলি হলেন তখনই, তাই তোমার সঙ্গে বোঝাপড়াও হয়নি, আর তুমিও আমার মন আর শরীরের কষ্টের কথা জানতে পারোনি। তিন মাস পায়ে প্লাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম।

'এখানে এসে তোমার জীবনের শান্তিময় পরিপূর্ণতার ছবি আমাকে অশান্ত করেছিল। তাই তোমার মনে খানিকটা সাময়িক উদ্বেগের সঞ্চার করে তোমার সেই প্রাচীন অপরাধের শাস্তি দিলাম। শুভেচ্ছা নিও। ইতি-তিনু (শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়)।

* * *

কৈলাস চৌধুরীর পাথর

Pradosh C. Mitter
Private Investigator

কৈলাস চৌধুরীর পাথর

'কার্ডটা কীরকম হয়েছে দ্যাখ তো।'

ফেলুদা ওর মানিব্যাগের ভিতর থেকে সড়াৎ করে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে আমায় দেখতে দিল। দেখি তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator। বুঝতে পারলাম ফেলুদা এবার তার গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা বেশ ফলাও করে জাহির করছে। আর তা করবে নাই বা কেন। বাদশাহি আংটির শয়তানকে ফেলুদা যে-ভাবে শায়েস্তা করেছিল, সে কথা ও ইচ্ছে করলে সকলকে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে পারত। তার বদলে ও শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়েছে এই তো!

ফেলুদার নাম আপনা থেকেই বেশ রটে গিয়েছিল। আমি জানি ও এর মধ্যে দু তিনটে রহস্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির অফার পেয়েছে, কিন্তু কোনওটাই ওর মনের মতো হয়নি বলে না করে দিয়েছে।

কার্ডটা ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'বড়দিনের ছুটিতে কিছুটা মাথা খাটানোর প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নতুন কোনও রহস্য বুঝি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভীষণ এক্সাইটেড লাগছিল—কিন্তু বাইরে সেটা একদম দেখালাম না।

ফেলুদা তার প্যান্টের পাশের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা মাদ্রাজি সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'তোর খুব উত্তেজিত লাগছে বলে মনে হচ্ছে?

সে কী, ফেলুদা বুঝল কী করে?

ফেলুদা নিজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। 'কী করে বুঝলাম

ভাবছিস? মানুষ তার মনের ভাব যতই গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, তার বাইরের ছোটখাটো হাবভাব থেকেই সেটা ধরা পড়ে যায়। কথাটা যখন তোকে বললাম, ঠিক সেই সময়টা তোর একটা হাই আসছিল। কিন্তু কথাটা শুনে মুখটা খানিকটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। তুই যদি আমার কথায় উত্তেজিত না হতিস, তা হলে কিন্তু যথারীতি হাইটা তুলতিস—মাঝপথে থেমে যেতিস না।'

ফেলুদার এই ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে অবাক করে দিত। ও বলত, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে ডিটেক্‌টিভ হবার কোনও মানে হয় না। এ ব্যাপারে যা খাঁটি কথা বলার সবই শার্লক হোম্‌স বলে গেছেন। আমাদের কাজ শুধু তাঁকে ফলো করা।'

আমি বললাম, 'কী কাজে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে বললে না?'

ফেলুদা বলল, 'কৈলাস চৌধুরীর নাম শুনেছিস? শ্যামপুকুরের কৈলাস চৌধুরী?'

আমি বললাম, 'না, শুনিনি। কত বিখ্যাত লোক আছে কলকাতা শহরে—তার ক'জনের নামই বা আমি শুনেছি। আর আমার তো সবেমাত্র পনেরো বছর বয়স।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরা রাজসাহিতে বড় জমিদার ছিল। কলকাতায় বাড়ি ছিল; পাকিস্তান হবার পর এখানে চলে আসে। কৈলাসবাবুর পেশা হচ্ছে ওকালতি। তা ছাড়া শিকারি হিসেবে নামডাক আছে। দুখানা শিকারের বই লিখেছেন। এই কিছুদিন আগে জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টে একটা হাতি পাগল হয়ে গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করেছিল—উনি গিয়ে সেটাকে মেরে এলেন। কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার মাথা খাটাতে হচ্ছে কেন? ভদ্রলোকের জীবনে কোনও রহস্য আছে নাকি?'

ফেলুদা জবাব না দিয়ে, তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমাকে দিল।

'পড়ে দ্যাখ।'

আমি চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ে দেখলাম। তাতে এই লেখা ছিল—

'শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপনাকে এই পত্র দেওয়া স্থির করিলাম। আপনি উপরোক্ত ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। কারণ সাক্ষাতে বলিব। আমি এক্সপ্রেস ডেলিভারি যোগে এই পত্র পাঠাইতেছি, সুতরাং আগামীকল্য ইহা আপনার হস্তগত হইবে। আমি পরশু অর্থাৎ শনিবার, সকাল ১০টায় আপনার আগমন প্রত্যাশা করিব। ইতি ভবদীয় শ্রীকৈলাসচন্দ্র চৌধুরী।'

চিঠিটা পড়ামাত্র আমি বললাম, 'শনিবার সকাল দশটা মানে তো আজই, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই।'

ফেলুদা বলল, 'তোর দেখছি বেশ ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তারিখ-টারিখগুলো বেশ খেয়াল রাখছিস।'

আমার মনে এর মধ্যেই একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। বললাম, 'তোমাকেই যখন ডেকেছে, তখন কি আর সঙ্গে অন্য কেউ...'

ফেলুদা চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'তোর বয়সটা কম বলেই হয়তো তোকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। কারণ তোকে হয়তো মানুষ বলেই ধরবেন না ভদ্রলোক। কাজেই তোর সামনে কথাবার্তা বলতে আপত্তি করবেন না। যদি করেন, তা হলে তুই না হয় পাশের ঘরে-টরে কোথাও অপেক্ষা করিস, সেই ফাঁকে আমরা কথা সেরে নেব।'

আমার বুকের মধ্যে টিপ টিপ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছুটিটা কী করব কী করব ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হয়তো দারুণ ইন্টারেস্টিং ভাবেই কেটে যাবে।

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা ট্রামে করে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট আর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছলাম। পথে একবার ট্রাম থেকে নেমে ফেলুদা দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি থেকে কৈলাস চৌধুরীর লেখা একটা শিকারের বই কিনেছিল, সেটার নাম "শিকারের নেশা"। বাকি পথটা বইটা উলটেপালটে দেখল। ট্রাম থেকে নামার সময় সেটা কাঁধে ঝোলানো থলির মধ্যে রেখে বলল, 'এমন সাহসী লোকের কেন ডিটেকটিভের দরকার পড়েছে কে জানে।'

একান্ন নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিট, একটা মস্ত পুরনো আমলের ফটকওয়ালা বাড়ি—যাকে বলে অট্টালিকা। সামনের দিকে বাগান, ফোয়ারা, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি পেরিয়ে বাড়ির দরজায় কলিং বেল টেপার আধ মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলতে দেখি একজন ভদ্রলোক, যাকে দেখে কেন জানি মনে হল, তিনি কখনই কৈলাসবাবু নন, কারণ বাঘ মারা মানুষের এমন গোবেচারা চেহারা হতেই পারে না। মাঝারি সাইজের মোটা-সোটা ফরসা ভদ্রলোক বয়স ত্রিশের বেশি বলে মনে হয় না। চোখের চাহনিতে কেমন জানি একটা সরল, ছেলেমানুষি ভাব। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস রয়েছে।

'কাকে চান আপনারা?' গলার আওয়াজ দেখলাম মানানসই রকমের মিহি ও নরম।

ফেলুদা একটা কার্ড বার করে ভদ্রলোককে দিয়ে বলল, 'কৈলাসবাবুর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি চিঠি দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে একটা সিঁড়ি পেরিয়ে ভদ্রলোক একটা আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন।

'আপনারা একটু বসুন—আমি মামাবাবুকে খবর দিচ্ছি।'

বহুদিনের পুরনো একটা কালো টেবিলের সামনে দুটো পুরনো হাতলওয়ালা চেয়ারে আমরা বসলাম। ঘরের তিনদিকে আলমারি বোঝাই পুরনো বই। সামনে টেবিলের উপর নজর যেতে একটা মজার জিনিস দেখলাম। তিনখানা মোটা স্ট্যাম্প অ্যালবাম একটার উপর আরেকটা স্তূপ করে রাখা রয়েছে, আরেকটা অ্যালবাম খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, যাতে সারি সারি স্ট্যাম্প যত্ন করে আটকানো রয়েছে। কয়েকটা সেলোফেনের মধ্যে কিছু আলগা স্ট্যাম্পও রয়েছে, আর তা ছাড়া রয়েছে স্ট্যাম্প-কালেকটারদের অত্যন্ত দরকারি ও আমার খুব চেনা কয়েকটা জিনিস, যেমন হিঞ্জ, চিমটে, স্ট্যাম্পের ক্যাটালগ ইত্যাদি। এখন বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের হাতের ম্যাগনিফাইং গ্লাসটাও এই কাজেই ব্যবহার হয়, আর তিনিই এই সব স্ট্যাম্পের

কালেকটর।

ফেলুদাও ওই সবের দিকেই দেখছিল, কিন্তু ও নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কথা হবার আগেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা বৈঠকখানায় এসে বসুন, মামা এক্ষুনি আসছেন।'

মাথার উপর বিরাট ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা দু জনে সাদা খোলস দিয়ে ঢাকা একটা প্রকাণ্ড সোফার উপর বসলাম। ঘরের চারিদিকে পুরনো বড়লোকি ছাপ। একবার বাবার সঙ্গে বেলেঘাটার মল্লিকদের বাড়িতে ঠিক এইরকম সব আসবাব, পেন্টিং, মূর্তি আর ফুলদানির ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। এছাড়া রয়েছে মেঝের উপর একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল, আর দেয়ালে চারটে হরিণ, দুটো চিতাবাঘ আর একটা মহিষের মাথা।

প্রায় দশ মিনিট বসে থাকার পর একজন মাঝবয়সী কিন্তু বেশ জোয়ান গোছের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর রং ফরসা, নাকের তলায় সরু গোঁফ আর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন।

আমরা দু জনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে যেন ভুরুটা একটু কপালে তুললেন। ফেলুদা বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই।'

ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফাতে বসে বললেন, 'আপনারা কি দু জনে একসঙ্গে ডিটেক্‌টিভগিরি করেন?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আজ্ঞে না। তবে ঘটনাচক্রে আমার সব কটা কেসের সঙ্গেই তপেশ জড়িত ছিল। ও কোনও অসুবিধা করেনি কখনও।'

'বেশ।...অবনীশ, তুমি যেতে পারো। এদের জন্যে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা দেখো।'

স্ট্যাম্প-জমানো ভদ্রলোকটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি তাঁর মামার আদেশ শুনে চলে গেলেন। কৈলাস চৌধুরী ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না আমার চিঠিটা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমিই যে প্রদোষ মিত্তির সেটারই প্রমাণ

চাইছেন তো? এই যে আপনার চিঠি।'

ফেলুদা পকেট থেকে কৈলাসবাবুর চিঠিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। উনি সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'এ সব প্রিকশন নিতেই হয়, বুঝতেই পারছেন। যাই হোক— শিকারি বলে আমার একটা নামডাক আছে জানেন বোধ হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঘরের দেয়ালে জানোয়ারের মাথাগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এগুলো সব আমারই শিকার। সতেরো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখি। তার আগে অবিশ্যি এয়ার গান দিয়ে পাখি-টাখি মেরেছি। সম্মুখ সমরে জানোয়ার কোনওদিন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। কিন্তু...যে শত্রু অদৃশ্য ও অজ্ঞাত—সে আমাকে বড় ভাবিয়ে তোলে।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমার বুকের ভিতরটায় আবার টিপটিপ শুরু হয়েছে। জানি এক্ষুনি ভদ্রলোক রহস্যের কথাটা বলবেন, কিন্তু এত কায়দা করে আস্তে আস্তে আসল কথাটায় যাচ্ছেন যে তাতে যেন সাসপেন্স আরও বেড়ে যায়।

কৈলাসবাবু আবার শুরু করলেন:

'আপনার বয়স যে এত কম তা জানা ছিল না। কত হবে বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'টুয়েন্টি এইট।'

'কাজেই, যে কাজের ভার আপনাকে দিতে যাচ্ছি সেটা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব তা জানি না। পুলিশকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না, কারণ এর আগে আরেকটা ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিয়ে ঠকেছি। ওরা অনেক সময় কাজের চেয়ে অকাজটা করে বেশি, আর এটাও ঠিক যে আমি তরুণদের অশ্রদ্ধা করি না মোটেই। কাঁচা বয়সের সঙ্গে পাকা বুদ্ধির সমাবেশটা খুব জোরালো হয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

এবারে কৈলাসবাবুর থামার সুযোগ নিয়ে ফেলুদা গলা খাঁকরিয়ে বলল, 'ঘটনাটা কী সেটা যদি বলেন...।'

কৈলাসবাবু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা

ভাঁজ করা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো এটা পড়ে কী বোঝেন।'

ফেলুদা কাগজটা খুলে ধরতে আমি পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার মানে হয় এই 'পাপের বোঝা বাড়িয়ো না। যে জিনিসে তোমার অধিকার নেই, সে-জিনিস তুমি আগামী সোমবার বিকেল চারটের মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের বিশ হাত ভিতর দিকে, রাস্তার বাঁ ধারে লিলি ফুলের প্রথম সারির প্রথম গাছটার নীচে রেখে আসবে। আদেশ অমান্য করার, বা পুলিশ-গোয়েন্দার সাহায্য নেওয়ার ফল ভাল হবে না—তোমার অনেক শিকারের মতোই তুমিও শিকারে পরিণত হবে একথা জেনে রেখো।'

'কী মনে হয়?' গম্ভীর গলায় কৈলাসবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখে বলল, 'হাতের লেখা ভাঁড়ানো হয়েছে, কারণ একই অক্ষর দু তিন জায়গায় দু তিন রকম ভাবে লেখা হয়েছে। আর, নতুন প্যাডের প্রথম কাগজে লেখা।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

'প্যাডের কাগজে লেখা হলে তার পরের কাগজে সে লেখার কিছুটা ছাপ থেকে যায়। এ কাগজ একেবারে মসৃণ।'

'ভেরি গুড। আর কিছু?'

'আর কিছু এ থেকে বলা অসম্ভব। এ চিঠি ডাকে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। পোস্টমার্ক পার্ক স্ট্রিট। তিনদিন আগে এ চিঠি পেয়েছি। আজ শনিবার ২০শে।'

ফেলুদা চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এবার আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আপনার শিকারের কাহিনী ছাড়া আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার।'

'বেশ তো। করুন না। মিষ্টি মুখে পুরে খেতে খেতে করুন।'

চাকর রুপোর প্লেটে রসগোল্লা আর অমৃতি রেখে গেছে। ফেলুদাকে খাবার কথা বলতে হয় না। সে টপ করে একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'চিঠিতে যে জিনিসটার কথা লেখা হয়েছে সেটা কী জানতে পারি?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন—যাতে আমার অধিকার নেই, এমন কোনও জিনিস আমার কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। এ বাড়িতে যা কিছু আছে তা সবই হয় আমার নিজের কেনা, না হয় পৈতৃক সম্পত্তি। আর তার মধ্যে এমন কোনও জিনিস নেই যেটা আদায় করার জন্য কেউ আমাকে এমন চিঠি দিতে পারে। তবে একটিমাত্র জিনিস আছে যেটা বলতে পারেন মূল্যবান ও লোভনীয়।'

'সেটা কী?'

'একটা পাথর।'

'পাথর?'

'প্রেশাস স্টোন।'

'আপনার কেনা?'

'না, কেনা নয়।'

'পৈতৃক সম্পত্তি?'

'তাও না। পাথরটা পাই আমি মধ্যপ্রদেশে চাঁদার কাছে একটা জঙ্গলে। একটা বাঘকে ধাওয়া করে আমরা তিন-চার জন একটা জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটাকে মারা হয়। কাছেই একটা বহু পুরনো ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরে একটা দেবমূর্তির কপালে পাথরটা লাগানো ছিল। ওটার অস্তিত্ব বোধহয় আমাদের আগে কেউই জানত না।'

'ওটা কি আপনার চোখেই প্রথম পড়ে?'

'মন্দিরটা সকলেই দেখেছিল, তবে পাথরটা প্রথম আমিই দেখি।'

'সঙ্গে আর কে ছিল সেবার?'

'রাইট বলে এক মার্কিন ছোকরা, কিশোরীলাল বলে এক পাঞ্জাবি, আর আমার ভাই কেদার।'

'আপনার ভাইও শিকার করেন?'

'করত। এখন করে কি না জানি না। বছর চারেক হল ও বিদেশে।'

'বিদেশ মানে?'

'সুইজারল্যান্ড। ঘড়ির ব্যবসার ধান্দায়।'

'যখন পাথরটা পেলেন তখন ওটা নিয়ে আপনাদের মধ্যে

কাড়াকাড়ি হয়নি?'

'না। তার কারণ ওটার যে কত দাম সেটা কলকাতায় এসে জহুরিকে দেখাবার পর জানতে পারি।'

'তারপর সে খবর আর কে জেনেছে?'

'খুব বেশি লোককে বলিনি। এমনিতে আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই। দু একজন উকিল বন্ধুকে বলেছি, কেদার জানত, আর বোধহয় আমার ভাগনে অবনীশ জানে।'

'পাথরটা বাড়িতেই আছে?'

'হ্যাঁ। আমার ঘরেই থাকে।'

'এত দামি জিনিস ব্যাঙ্কে রাখেন না যে?'

'একবার রেখেছিলাম। যেদিন রেখেছিলাম তার পরের দিনই একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়—প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই। তারপর থেকে ধারণা হয় ওটা কাছে না রাখলে ব্যাড লাক্ আসবে, তাই ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিই।'

'হুঁ...।'

ফেলুদার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওর ভ্রূকুটি দেখে বুঝলাম ও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমি, আমার ভাগনে অবনীশ, আর তিনটে পুরনো চাকর। আর আমার বাবাও আছেন, তবে তিনি একেবারে অথর্ব, জরাগ্রস্ত। একটি চাকর তাঁর পিছনেই লেগে থাকে সারাক্ষণ।'

'অবনীশবাবু কী করেন?'

'বিশেষ কিছুই না। ওর নেশা ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। বলছে একটা টিকিটের দোকান করবে।'

ফেলুদা একটু ভেবে মনে মনে কী জানি হিসাব করে বলল, 'আপনি কি চাইছেন আমি এই পত্রলেখকের অনুসন্ধান করি?'

কৈলাসবাবু যেন একটু জোর করেই হেসে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন, এই বয়সে এ ধরনের অশান্তি কি ভাল লাগে? আর শুধু যে চিঠি লিখছে তা নয়—কাল রাত্রে একটা টেলিফোনও করেছিল। ইংরেজিতে ওই একই কথা বলল। গলা শুনে চিনতে পারলাম না। কী

কলল জানেন? বলল, নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা রেখে না এলে আমার বাড়িতে এসে আমাকে ঘায়েল করে দিয়ে যাবে। অথচ এ পাথর হাতছাড়া করতে আমি মোটেই রাজি নই। তা ছাড়া লোকটার যখন ন্যায্য দাবি নেই, অথচ হুমকি দিচ্ছে—তখন বুঝতে হবে সে বদমাইশ, সুতরাং তার শাস্তি হওয়া দরকার। সেটা কী করে সম্ভব সেটাই আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

'উপায় তো একটাই। বাইশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকা। তাকে তো আসতেই হবে।'

'সে নিজে নাও আসতে পারে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। যে-ই এসে লিলি গাছের পাশে ঘুরঘুর করুক না কেন, সে যদি আসল লোক নাও হয়, তাকে ধরতে পারলে আসল লোকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না। লোকটা ডেনজারাস হতে পারে। সে যখন দেখবে লিলি গাছের তলায় পাথরটা নেই, তখন যে কী করতে পারে তা বলা যায় না। তার চেয়ে বাইশ তারিখের আগে—অর্থাৎ আজ আর কালের মধ্যে এই লোকটি কে তা যদি জানা সম্ভব হত তা হলে খুবই ভাল হত। এই চিঠি, আর ওই একটা টেলিফোন কল এই দুটো থেকে কিছু বার করা যায় না?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। ও বলল, 'দেখুন কৈলাসবাবু, চিঠিতে সে লিখেছে যে, গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল ভাল হবে না—সুতরাং আমি কিছু করি বা না করি, আপনি যে আমাকে ডেকেছেন, এতেই আপনার বিপদের একটা আশঙ্কা আছে। সুতরাং আপনি বরঞ্চ ভেবে দেখুন যে আমাদের সাহায্য চান কি না।'

কৈলাসবাবু ঠাণ্ডার মধ্যেও রুমাল দিয়ে তাঁর কপাল মুছে বললেন, 'আপনি, এবং আপনার সঙ্গে আপনার ভাইটি—এ দু জনকে দেখলে কেউ মনে করবে না যে আপনাদের সঙ্গে গোয়েন্দার কোনও সম্পর্ক আছে। এটা একটা অ্যাডভানটেজ। আপনার নাম লোকে জেনে থাকলেও, আপনার চেহারা জানে কী? মনে তো হয় না। সুতরাং সেদিকে আমার বিশেষ ভয় নেই। আপনি রাজি হলে কাজটা নিন।

উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তবে যাবার আগে একবার পাথরটা দেখে যেতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

কৈলাসবাবুর পাথর ওঁর শোবার ঘরে আলমারির ভিতর থাকে। আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা শানবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলাম। সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা লম্বা, অন্ধকার বারান্দায়। তার দু দিকে সারি সারি প্রায় দশ-বারোটা ঘর, তার অনেকগুলো আবার তালা-বন্ধ। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, আর লোকজন নেই বলেই বোধ হয় সামান্য একটু আওয়াজ হলেই তার প্রতিধ্বনি হয়।

বারান্দার শেষ মাথায় ডানদিকের ঘর হল কৈলাসবাবুর শোবার ঘর। আমরা যখন বারান্দায় মাঝামাঝি এসেছি, তখন দেখি পাশের একটা ঘরের দরজা অর্ধেক খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে একজন ভীষণ বুড়ো লোক গলা বাড়িয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে দেখছে। আমার তো দেখেই কীরকম ভয় ভয় করতে লাগল। কৈলাসবাবু বললেন, 'উনিই আমার বাবা। মাথার ঠিক নেই। সব সময়েই এখান দিয়ে ওখান দিয়ে উঁকি মারেন।'

কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন বুড়োর চাহনি দেখে সত্যিই আমার রক্ত জল হয়ে গেল। আর সেই ভয়াবহ চাহনি দিয়ে উনি তাকিয়ে রয়েছেন কৈলাসবাবুর দিকে।

বাবার ঘর পেরিয়ে কিছুদূর গেলে পর কৈলাসবাবু বললেন, 'বাবার সকলের উপরেই আক্রোশ। ওঁর ধারণা সকলেই ওঁকে নেগলেক্ট করে। আসলে কিন্তু ওঁর দেখাশোনার ত্রুটি হয় না।'

কৈলাসবাবুর ঘরে দেখলাম প্রকাণ্ড উঁচু খাট, আর তার মাথার দিকে ঘরের কোনায় আলমারি। সেটা খুলে তার দেরাজ থেকে একটা নীল ভেলভেটের বাক্স বার করে বললেন, 'সাতরামদাসের দোকান থেকে এই বাক্সটা কিনে নিয়েছিলুম এই পাথরটা রাখার জন্য।'

বাক্সটা খুলে নীল আর সবুজ রং মেশানো লিচুর সাইজের একটা ঝলমলে পাথর বার করে কৈলাসবাবু ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন—

'একে বলে ব্লু বেরিল। ব্রেজিল দেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে

খুব বেশি আছে তা নয়। অন্তত এত বড় সাইজের বেশি নেই সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

ফেলুদা পাথরটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়িয়ে দেখে ফেরত দিয়ে দিল। এবার কৈলাসবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বার করলেন। তারপর তার থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটে আগাম। কাজটা ভালয় ভালয় উতরে গেলে বাকিটা দেব, কেমন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদা নোটগুলো পকেটে পুরে নিল। চোখের সামনে ওকে রোজগার করতে এই প্রথম দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে, আর অবনীশবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

নীচে যখন পৌঁছলাম, ঠিক সেই সময় বৈঠকখানা থেকে টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করেছে। কৈলাসবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো।'

তারপর আর কোনও কথা নেই। আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতেই কৈলাসবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ধপ করে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, 'আবার সেই লোক, সেই হুমকি।'

'কী বলল?'

'এবার আর কোনও সন্দেহ রাখেনি।'

'তার মানে?'

'বলল—কোন জিনিসটা চাইছি বুঝতে পারছ বোধহয়। চাঁদর জঙ্গলের মন্দিরে যেটা ছিল সেইটে।'

'আর কী বলল?'

'আর কিছু না।'

'গলা চিনলেন?'

'না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গলাটা শুনতে ভাল লাগে না। আপনি বরং আরেকবার ভেবে দেখুন।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে।'

কৈলাসবাবুর কাছ থেকে অবনীশবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে টেবিলের উপর রাখা কী একটা জিনিস খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমরা ঢুকতেই টেবিলের উপর হাতটা চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আসুন, আসুন।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ডাকটিকিটের খুব শখ দেখছি।'

অবনীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই আমার একমাত্র নেশা। বলতে গেলে আমার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।'

'আপনি কি কোনও দেশ নিয়ে স্পেশালাইজ করেন, না সারা পৃথিবীর টিকিট জমান?'

'আগে সারা পৃথিবীরই জমাতুম, কিন্তু কিছুদিন হল ইন্ডিয়াতে স্পেশালাইজ করছি। আমাদের এই বাড়ির দপ্তরে যে কী আশ্চর্য সব পুরনো টিকিট রয়েছে তা বলতে পারি না। অবিশ্যি বেশির ভাগই ইন্ডিয়ান। গত দু মাস ধরে হাজার হাজার পুরনো চিঠির গাদা ঘেঁটে টিকিট সংগ্রহ করেছি।'

'ভাল কিছু পেয়েছেন?'

'ভাল? ভাল?' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে বললে বুঝবেন? আপনার এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'একটা বয়সে তো সকলেই ওদিকটায় ঝোঁকে—তাই নয় কী? কেপ-অফ-গুড-হোপের এক পেনি, মরিশাসের দু পেনি আর ব্রিটিশ গায়নার ১৮৫৬ সনের সেই বিখ্যাত স্ট্যাম্পগুলো পাবার স্বপ্ন আমিও দেখেছি। বছর দশেক আগে লাখ খানেক টাকা দাম ছিল ওগুলোর। এখন আরও বেড়েছে।'

অবনীশবাবু উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'তাহলে মশাই আপনি বুঝবেন। আপনাকে দেখাই। এই দেখুন!'

ভদ্রলোক তার চাপা হাতের তলা থেকে একটা ছোট্ট রঙিন কাগজ ফেলুদাকে দিলেন। দেখি খাম থেকে খোলা রং প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটা টিকিট।

'কী দেখলেন?' অবনীশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'শ-খানেক বছরের পুরনো ভারতবর্ষের টিকিট।

ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ টিকিট আগে দেখেছি।'

'দেখেছেন তো? এবার এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখুন।'

ফেলুদা ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে লাগাল।

'এবার কী দেখছেন?' ভদ্রলোকের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'এতে তো ছাপার ভুল রয়েছে।'

'এগজ্যাক্টলি।'

'POSTAGE কথাটার G-এর জায়গায় C ছাপা হয়েছে।'

অবনীশবাবু টিকিট ফেরত নিয়ে বললেন, 'তার ফলে এটার দাম কত হচ্ছে জানেন?'

'কত?'

'বিশ হাজার টাকা।'

'বলেন কী?'

'আমি বিলেত থেকে চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছি। এই ভুলটার উল্লেখ স্ট্যাম্প ক্যাটালগে নেই। আমিই প্রথম এটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম।'

ফেলুদা বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশন্‌স। কিন্তু আপনার সঙ্গে টিকিট ছাড়াও অন্য ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার মামা—কৈলাসবাবু—তাঁর যে একটা দামি পাথর আছে সেটা আপনি জানেন?'

অবনীশবাবুকে যেন কয়েক সেকেন্ড ভাবতে হল। তারপর বললেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছিলাম বটে। দামি কি না জানি না—তবে 'লাকি' পাথর সেটা একবার বলেছিলেন বটে। কিছু মনে করবেন না। আমার মাথায় এখন ডাকটিকিট ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

'আপনি এ বাড়িতে কদ্দিন আছেন?'

'বাবা মারা যাবার পর থেকেই। প্রায় পাঁচ বছর।'

'মামার সঙ্গে আপনার গোলমাল নেই তো?'

'কোন মামা? এক মামা তো বিদেশে।'

'আমি কৈলাসবাবুর কথা বলছি।'

'ও। উনি অত্যন্ত ভাল লোক, তবে...'

'তবে কী?'

অবনীশ ভুরু কুঁচকালেন।

'ক-দিন থেকে—কোনও একটা কারণে—ওঁকে যেন একটু অন্যরকম দেখছি।'

'কবে থেকে?'

'এই দু-তিন দিন হল। কাল ওঁকে আমার এই স্ট্যাম্পটার কথা বললাম—উনি যেন শুনেও শুনলেন না। অথচ এমনিতে রীতিমত ইন্টারেস্ট নেন। আর তা ছাড়া, ওঁর কতগুলো অভ্যেস কীরকম যেন বদলে যাচ্ছে।'

'উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই যেমন, এমনিতে রোজ সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করেন, গত দু দিন করেননি। ঘুম থেকে উঠেছেন দেরিতে। বোধহয় রাত জাগছেন বেশি।'

'সেটার কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তো একতলায় শুই। আমার ঠিক উপরের ঘরটাই মামার। পায়চারি করার শব্দ পেয়েছি মাঝ রাত্রে। গলার স্বরও পেয়েছি। বেশ জোরে। মনে হল ঝগড়া করছেন।'

'কার সঙ্গে?'

'বোধহয় দাদু। দাদু ছাড়া আর কে হবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করারও শব্দ পেয়েছি। একদিন তো সন্দেহ করে সিঁড়ির নীচটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম মামা ছাত থেকে দোতলায় নামছেন, হাতে বন্দুক।'

'তখন কটা?'

'রাত দুটো হবে।'

'ছাতে কী আছে?'

'কিছুই নেই। কেবল একটা ঘর আছে—চিলেকোঠা যাকে বলে। পুরনো চিঠিপত্র কিছু ছিল ওটায়, সে সব আমি মাস খানেক হল বের করে এনেছি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। বুঝলাম তার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। অবনীশবাবু বললেন, 'এ সব কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আপনার মামা কোনও কারণে একটু উদ্বিগ্ন আছেন। তবে সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি স্ট্যাম্প নিয়েই থাকুন। এদিকের ঝামেলা মিটলে একদিন এসে আপনার কালেকশান দেখব'খন।'

কৈলাসবাবুর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে ফেলুদা বলল, 'আপনাকে ষোলো আনা ভরসা দিতে পারছি না, তবু এটুকু বলছি যে আপনার ভাবনাটা আমায় ভাবতে দিন। রাত্রে ঘুমোতে চেষ্টা করুন, দরকার হলে ওষুধ খেয়ে। আর ছাতে যাবেন না দয়া করে। এ পাড়ার বাড়িগুলো যে রকম ঘেঁষাঘেঁষি আপনার শত্রু পাশের কোনও বাড়িতে এসে আস্তানা গেড়ে থাকলে বিপদ হতে পারে।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ছাতে গিয়েছিলাম বটে, তবে সঙ্গে বন্দুক ছিল। একটা আওয়াজ পেয়েই গিয়েছিলাম, যদিও গিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।'

'বন্দুকটা সব সময়ই কাছে রাখেন তো?'

'তা রাখি। তবে মানুষের মনের উদ্বেগ অনেক সময় তার হাতের আঙুলে সঞ্চারিত হয় সেটা জানেন তো? বেশি দিন এইভাবে চললে আমার টিপের কী হবে জানি না।'

* * *

পরের দিন ছিল রবিবার। সারা দিনের মধ্যে বেশির ভাগটা সময় ফেলুদা ওর ঘরে পায়চারি করেছে। বিকেলে চারটে নাগাত ওকে পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বেরোচ্ছ?'

ফেলুদা বলল, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লিলি গাছগুলো একবার দেখে আসব ভাবছি। যাবি তো চ।'

ট্রামে করে গিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচটা নাগাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটটায় পৌঁছলাম। এদিকটায় লোকজন একটু কম আসে। বিশেষ করে সন্ধের দিকটায় যা লোক আসে সবই সামনের দিকে—মানে, উত্তরে—গড়ের মাঠের দিকে।

গেট দিয়ে ঢুকে বিশ হাত আন্দাজ করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে

সত্যিই লিলি গাছের কেয়ারি। তার প্রথম সারির প্রথম গাছটার নীচেই পাথরটা রাখার কথা।

লিলি গাছের মতো এত সুন্দর জিনিস দেখেও গা-টা কেমন জানি ছমছম্ করে উঠল। ফেলুদা বলল, 'কাকার একটা বাইনোকুলার ছিল না—যেটা সেবার দার্জিলিং নিয়ে গেছিলেন?'

আমি বললাম, 'আছে।'

মিনিট পনেরো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেলাম লাইটহাউসের সামনে। ফেলুদার কি সিনেমা দেখার শখ হল নাকি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমায় না ঢুকে ও গেল উল্টোদিকের একটা বইয়ের দোকানে। এ বই সে বই ঘেঁটে ফেলুদা দেখি একটা বিরাট মোটা স্ট্যাম্প ক্যাটালগ নিয়ে তার পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল। আমি পাশ থেকে ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি কি অবনীশবাবুকে সন্দেহ করছ নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'এত যার স্ট্যাম্পের শখ, তার কিছুটা কাঁচা টাকা হাতে পেলে সুবিধে হয় বইকী?'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা যখন দোতলা থেকে একতলায় এলাম, তখন যে টেলিফোনটা এল, সেটা তো আর অবনীশবাবু করেননি।'

'না। সেটা করেছিল মসলন্দপুরের আদিত্যনারায়ণ সিংহ।'

বুঝলাম ফেলুদা এখন ঠাট্টার মেজাজে রয়েছে, ওর সঙ্গে আপাতত আর এ বিষয়ে কথা বলা চলবে না।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন আটটা বেজে গেছে। ফেলুদা কোটটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি যতক্ষণ হাতমুখ ধুচ্ছি, তুই ডিরেক্টরি থেকে কৈলাসবাবুর টেলিফোন নাম্বারটা বার কর তো।'

ডিরেক্টরি হাতে নিয়ে টেলিফোনের সামনে বসা মাত্র ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠে আমায় বেশ চমকে দিল। আমাকেই ধরতে হয়। তুলে নিলাম রিসিভারটা।

'হ্যালো।'

'কে কথা বলছেন?'

এ কী অদ্ভুত গলা! এ গলা তো চিনি না! বললাম, 'কাকে চাই?'

কর্কশ গম্ভীর গলায় উত্তর এল, 'ছেলেমানুষ বয়সে গোয়েন্দাদের

সঙ্গে ঘোরাফেরা করা হয় কেন? প্রাণের ভয় নেই?'

আমি ফেলুদার নাম ধরে ডাকতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার আগে শুনতে পেলাম লোকটা বলল, 'সাবধান করে দিচ্ছি—তোমাকেও, তোমার দাদাকেও। ফল ভাল হবে না।'

আমি কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে রইলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'ও কী—ও রকম থুম মেরে বসে আছিস কেন? কার ফোন এসেছিল?'

কোনও মতে ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। দেখলাম ও-ও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'ঘাবড়াস না। লোক থাকবে—পুলিশের লোক। বিপদের কোনও ভয় নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একবার যেতেই হবে কালকে।'

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। শুধু যে টেলিফোনের জন্য তা নয়; কৈলাসবাবুর বাড়ির ভিতরের অনেক কিছুই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই লোহার রেলিং দেওয়া ছাদ পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়ি, দোতলায় মার্বেল-বাঁধানো অন্ধকার লম্বা বারান্দা, আর তার দরজার ফাঁক দিয়ে বার করা কৈলাসবাবুর মুখ। কৈলাসবাবুর দিকে ও রকম ভাবে চেয়েছিলেন কেন তিনি? আর কৈলাসবাবু বন্দুক হাতে ছাতে গিয়েছিলেন কেন? কীসের শব্দ পেয়েছিলেন উনি?

ঘুমোতে যাবার আগে ফেলুদা একটা কথা বলেছিল—'জানিস, তোপসে—যারা চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে হুমকি দেয়—তারা বেশির ভাগ সময়েই আসলে কাওয়ার্ড হয়।' এই কথাটার জন্যই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঘুমটা এসে গেল।

* * *

পরদিন সকালে ফেলুদা কৈলাসবাবুকে ফোন করে বলল তিনি যেন নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে থাকেন; যা করবার ফেলুদাই করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে?'

ফেলুদা বলল, 'কাল যে সময় গিয়েছিলাম, সেই সময়। ভাল কথা, তোর স্কুলের ড্রইং-এর খাতা, পেনসিল-টেনসিল আছে তো?'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'কেন, তা দিয়ে কী হবে?'

'আছে কি না বল না!'

'তা তো থাকতে হবেই।'

'সঙ্গে নিয়ে নিবি। লিলি গাছের উলটো দিকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তুই ছবি আঁকবি—গাছপালা, মেমোরিয়াল বিল্ডিং—যা হয় একটা কিছু। আমি হব তোর মাস্টার।'

ফেলুদার আঁকার হাত রীতিমত ভাল। বিশেষ করে, মাত্র একবার যে মানুষকে দেখেছে, পেনসিল দিয়ে খসখস করে মোটামুটি তার একটা পোর্ট্রেট আঁকার আশ্চর্য ক্ষমতা ফেলুদার আছে। কাজেই ড্রইং মাস্টারের কাজটা তার পক্ষে বেমানান হবে না।

শীতকালের দিন ছোট হয়, তাই আমরা চারটের কিছু আগেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পৌঁছে গেলাম। সোমবার ভিড়টা আরও কম। তিনটে পেরামবুলেটার সাহেবের বাচ্চাদের নিয়ে নেপালি আয়ারা ঘোরাফেরা করছে; একটা পরিবারকে দেখে মাড়োয়ারি বলে মনে হল; আর তা ছাড়া দু-এক জন বুড়ো ভদ্রলোক। এদিকটায় আর বিশেষ কেউ নেই। কম্পাউন্ডের মধ্যেই, কিন্তু গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে চৌরঙ্গির দিকটায় একটা বড় গাছের তলায় দু জন প্যান্টপরা লোককে দেখলাম, যাদের দিকে দেখিয়ে ফেলুদা আস্তে করে আমায় কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিল। বুঝলাম ওরাই হচ্ছে পুলিশের লোক। ওদের কাছে নিশ্চয়ই লুকনো রিভলবার আছে। ফেলুদার সঙ্গে পুলিশের কিছু লোকের বেশ খাতির আছে এটা জানতাম।

লিলি ফুলের সারির উলটো দিকে কিছুটা দূরে খাতা-পেনসিল বার করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। এ অবস্থায় কি আঁকায় মন বসে? চোখ আর মন দুটোই অন্য দিকে চলে যায়, আর ফেলুদা মাঝে মাঝে এসে ধমক দেয়, আর পেনসিল দিয়ে খসখস করে হিজিবিজি এঁকে দেয়—যেন কতই না কারেক্ট করছে। আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখে।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কাছেই গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। লোকজন কমে আসছে, কারণ একটু পরেই বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। মাড়োয়ারিরা একটা বিরাট গাড়িতে উঠে চলে গেল। আয়াগুলোও

পেরামবুলেটার ঠেলতে ঠেলতে রওনা দিল। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে আপিস ফেরতা গাড়ির ভিড় আরম্ভ হয়েছে, ঘন ঘন হর্নের শব্দ কানে আসছে। ফেলুদা আমার পাশে এসে ঘাসের উপর বসতে গিয়ে বসল না। দেখলাম তার চোখ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের দিকে। আমি সেইদিকে চেয়ে গেটের বেশ কিছুটা বাইরে রাস্তার ধারে এক জন ব্রাউন চাদর জড়ানো লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ফেলুদা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কিছুক্ষণ ওই দিকে দেখে বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ।'

'ওই চাদর গায়ে দেওয়া লোকটা কে?'

'হুঁ।'

বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই লোকটা যেন দশ হাতের মধ্যে চলে এল, আর আমিও চমকে উঠে বললাম, 'এ কী—এ যে কৈলাসবাবু নিজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

'হ্যাঁ। চল—নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছেন।'

কিন্তু আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ভদ্রলোক হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গেটের বাইরে এসে কৈলাসবাবুকে আর দেখা গেল না।

ফেলুদা বলল, 'চল শ্যামপুকুর। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দেখতে পাননি, আর না দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নিতাম, কিন্তু আপিস টাইমে সেটা সম্ভব নয়, তাই ট্রাম ধরার মতলবে চৌরঙ্গির দিকে রওনা দিলাম। রাস্তা দিয়ে পর পর লাইন করে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে এসে একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেটা ভাবলে এখনও আমার ঘাম ছুটে যায়। কথা নেই বার্তা নেই, ফেলুদা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান মেরে প্রায় আমাকে ছুঁড়ে রাস্তার একেবারে কিনারে ফেলে দিল। আর সেই সঙ্গে নিজেও একটা লাফ দিল। পরমুহূর্তে, দারুণ স্পিডে আর দারুণ শব্দ করে একটা গাড়ি আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল।

'হোয়াট দ্য ডেভিল!' ফেলুদা বলে উঠল। 'গাড়ির নাম্বারটা...'

কিন্তু সেটার আর কোনও উপায় নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্য গাড়ির ভিড়ের মধ্যে সে গাড়ি মিলিয়ে গেছে। আমার হাতের

খাতা-পেনসিল কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই, তাই সেটা খুঁজে আর সময় নষ্ট করলাম না। এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা ঠিক সময় বুঝতে না পারলে আমরা দু জনেই নির্ঘাত গাড়ির চাকার তলায় চলে যেতাম।

ট্রামে ফেলুদা সারা রাস্তা ভীষণ গম্ভীর মুখ করে রইল। কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় বসা কৈলাসবাবুকে ফেলুদা প্রথম কথা বলল, 'আপনি দেখতে পেলেন না আমাদের?'

ভদ্রলোক কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'কোথায় দেখতে পেলাম না? কী বলছেন আপনি?'

'কেন, আপনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাননি?'

'আমি? সে কী কথা! আমি তো এতক্ষণ শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে ভাবনায় ছটফট করছিলুম—এই সবে মাত্র নীচে এসেছি।'

'তা হলে কি আপনার কোন যমজ ভাই আছে নাকি?'

কৈলাসবাবু কীরকম যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'সে কী, আপনাকে সে দিন বলিনি?'

'কী বলেননি?'

'কেদারের কথা? কেদার যে আমার যমজ ভাই।'

ফেলুদা সোফার উপর বসে পড়ল। কৈলাসবাবুরও মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কেদারকে দেখেছেন? সে ওখানে ছিল?'

'উনি ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না।'

'সর্বনাশ!'

'কেন বলুন তো? কেদারবাবুর কি ওই পাথরটার উপর কোনও অধিকার ছিল?'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কেমন যেন নেতিয়ে পড়লেন। সোফার হাতলে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা ছিল...তা ছিল। কেদারই প্রথম পাথরটা দেখে। আমি মন্দিরটা দেখি, কিন্তু দেবমূর্তির কপালে পাথর কেদারই প্রথম দেখে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। এক রকম আবদার করেই পাথরটা আমি নিই। অবিশ্যি মনে জানতুম ওটা আমার কাছে থাকলে থাকবে, কেদার নিলে ওটা বেচে দেবে, দিয়ে টাকাটা নষ্ট করবে। আর ওটার যে কত দাম সেটা আমি জেনেও কেদারকে জানাইনি। সত্যি বলতে কী, কেদার যখন বিদেশে চলে গেল, তখন আমার মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব এল। কিন্তু ওখানে হয়তো ও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, তাই ফিরে এসেছে। হয়তো পাথরটাকে নিয়ে বিক্রি করে সেই টাকায় নতুন কিছু ব্যবসা ফাঁদবে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফেলুদা বলল, 'এখন উনি কী করতে পারেন সেটা বলতে পারেন?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'জানি না। তবে আমার মুখোমুখি তো একবার তাকে আসতেই হবে। বাড়ি থেকে যখন বেরোই না, আর লিলি গাছের নীচে পাথর যখন রাখিনি, তখন সে আসবেই।'

'আপনি কি চান আমি এখানে থেকে একটা কোনও ব্যবস্থা করি?'

'না। তার কোনও প্রয়োজন হবে না। সে আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিছু করবে বলে মনে হয় না। আর কথা যদি বলতে আসে, তা হলে ভাবছি পাথরটা দিয়েই দেব। আপনার কর্তব্য এখানেই শেষ। আপনি যে লাইফ রিস্ক করে আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়েছিলেন, তার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আপনি বিলটা পাঠিয়ে দেবেন, একটা চেক আমি দিয়ে দেব।'

ফেলুদা বলল, 'লাইফ রিসকই বটে। একটা গাড়ি তো পিছন থেকে এসে প্রায় আমাদের শেষ করে দিয়েছিল।'

আমার কনুইটা খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল, আমি সেটা এতক্ষণ হাত দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় ফেলুদা সেটা দেখে ফেলল।

'ও কী রে, তোর হাতে যে রক্ত!' তারপর কৈলাসবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন—আপনার এখানে একটু ডেটল বা আয়োডিন হবে কি? এই সব ঘাগুলো আবার বড্ড চট করে সেপটিক হয়ে যায়।'

কৈলাসবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ইস—যা হয়েছে কলকাতার

রাস্তাঘাট। দেখি, অবনীশকে জিজ্ঞেস করি।'

অবনীশবাবু ঘরের সামনে গিয়ে ডেটলের কথা জিজ্ঞেস করাতেই উনি কেমন যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি যে এই দিন সাতেক আগেই আনলে। সে কি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?'

কৈলাসবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'ওহো, তাই তো। এই দ্যাখ, খেয়ালই নেই। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে?'

ডেটল লাগিয়ে কৈলাসবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ফেলুদা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ট্রামের দিকে না গিয়ে যাচ্ছে উলটো দিকে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, 'গণপতিদা'র কাছে একবার টেস্টম্যাচের টিকিটের কথাটা বলে যাই। এত কাছেই যখন এসেছি...'

কৈলাসবাবুর দুটো বাড়ি পরেই গণপতি চ্যাটার্জির বাড়ি। আমি ওর নাম শুনেছি ফেলুদার কাছে, কিন্তু দেখিনি কখনও। রাস্তার উপরেই সামনের ঘর, টোকা মারতেই গেঞ্জির উপর পুলোভার পরা একজন নাদুসনুদুস ভদ্রলোক দরজা খুলল।

'আরে, ফেলু মাস্টার যে—কী খবর?'

'একটা খবর তো বুঝতেই পারছেন।'

'তা তো বুঝছি, তবে সশরীরে তাগাদা না দিতে এলেও চলত। তোমার রিকোয়েস্ট কি ভুলি? যখন বলিচি দেব তখন দেবই।'

'আসার কারণ অবিশ্যি আরেকটা আছে। আমার বাড়ির ছাত থেকে শুনিচি উত্তর কলকাতার একটা খুব ভাল ভিউ পাওয়া যায়। একটা ফিল্ম কোম্পানির জন্য সেইটে একবার দেখতে চাইছিলাম।'

'স্বচ্ছন্দে। সটান সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি এদিকে চায়ের আয়োজন করছি।'

চারতলার ছাতে উঠে পুব দিকে চাইতেই দেখি—কৈলাসবাবুদের বাড়ি। একতলার বাগান থেকে ছাত অবধি দেখা যাচ্ছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে—আর তার ভিতরে একজন লোক খুটখুট করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। খালি চোখেই বুঝতে পারলাম সেটা কৈলাসবাবুর বাবা। ছাতের ওপর ওই যে চিলেকোঠা—তার জানলার দিকে দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। দরজাটা বোধহয় উলটো

দিকে।

দোতলায় একটা বাতি জ্বলে উঠল। বুঝলাম সেটা সিঁড়ির বাতি। ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগাল। একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কে? কৈলাসবাবু। এতদূর থেকেও তার লাল সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা দেখেই বোঝা যায়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কৈলাসবাবুকে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ দেখি উনি ছাতে উঠে এসেছেন। আমরা দু জনেই চট করে একসঙ্গে নিচু হয়ে শুধু চোখদুটো পাঁচিলের ওপর দিয়ে বার করে রাখলাম।

কৈলাসবাবু এদিক ওদিক দেখে চিলেকোঠার উলটোদিকে চলে গেলেন। তারপর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। কৈলাসবাবুকে জানালায় দেখা গেল। উনি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভিতরে ভীষণ জোরে ঢিপ ঢিপ আরম্ভ হয়ে গেছে। কৈলাসবাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কৈলাসবাবু আবার ঘরের বাতি নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে গেলেন।

ফেলুদা শুধু বলল, 'গোলমাল, গোলমাল।'

ফেলুদার এরকম অবস্থায় আমি ওকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। অন্য সময় মাথায় চিন্তা থাকলেও পায়চারি করে, কিন্তু আজ দেখলাম ও সটান বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। রাত সাড়ে ন-টায় দেখলাম ও নোট বইয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। ও আবার এ সব লেখা ইংরিজি ভাষায় কিন্তু গ্রিক অক্ষরে লেখে, আর সে অক্ষর আমার জানা নেই। এইটুকুই শুধু বুঝতে পারছিলাম যে, কৈলাসবাবুর বারণ সত্ত্বেও ও এই পাথরের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমোতে রাত হয়েছিল বলেই বোধহয় সকালে নিজে থেকে ঘুমটা ভাঙেনি—ভাঙল ফেলুদার ঠেলাতে।

'এই তোপ্‌সে ওঠ ওঠ, শ্যামপুকুর যেতে হবে।'

'কীসের জন্য?'

'ফোন করেছিলাম। কেউ ধরছে না। গণ্ডগোল মনে হচ্ছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিতে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম শ্যামপুকুরের দিকে। গাড়িতে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা! আরেকটু আগে বুঝতে পারলে বোধহয় গণ্ডগোলটা হত না।'

কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে ফেলুদা বেল-টেল না টিপেই ভেতরে চলে গেল। অবিশ্যি দরজাটা যে খোলাই ছিল সেটাও আমাদের ভাগ্য। সিঁড়ি পেরিয়ে অবনীশবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছতেই চক্ষুস্থির। টেবিলের সামনে একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে, আর তার ঠিক পাশেই মেঝেতে হাত দুটো পিছনে জড়ো করে বাঁধা আর মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন অবনীশবাবু। ফেলুদা হুমড়ি দিয়ে পড়ে আধ মিনিটের মধ্যে দড়ি রুমাল খুলে দিতেই ভদ্রলোক বললেন,—'উঃ—থ্যাঙ্ক গড!'

ফেলুদা বলল, 'কে করেছে এই দশা আপনার?'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে বললেন, 'মামা! কৈলাসমামা! মামার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—সেদিন বলছিলাম না আপনাকে? ভোরে এসে বসেছি ঘরে—বাতি জ্বালিয়ে কাজ করছিলাম। মামা ঘরে ঢুকেই আগে বাতি নিভিয়েছেন। তারপর মাথায় একটা বাড়ি। তারপর আর কিছু জানি না। কিছুক্ষণ হল জ্ঞান ফিরেছে—কিন্তু নড়তে পারি না, মুখে শব্দ করতে পারি না—উঃ!'

'আর কৈলাসবাবু?' ফেলুদা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'জানি না!'

ফেলুদা এক লাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটলাম তার পিছনে।

একবার বৈঠকখানায় ঢুকে কাউকে না দেখে, তিন ধাপ সিঁড়ি এক এক লাফে উঠে দোতলায় পৌঁছে ফেলুদা সটান কৈলাসবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। খাটের চেহারা দেখে মনে হল সেখানে লোক শুয়েছিল, কিন্তু ঘর এখন খালি। আলমারির দরজা দেখি হাঁ করে খোলা। ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে দেরাজ খুলে জিনিসটা বার করল সেটা মখমলের সেই নীল বাক্স। খুলে দেখা গেল ভিতরে সেই পাথর যেমন ছিল তেমনিই আছে।

এতক্ষণে দেখি অবনীশবাবু এসে হাজির হয়েছেন, তার মুখের অবস্থা শোচনীয়। তাকে দেখেই ফেলুদা বলল, 'ছাতের ঘরের চাবি কার কাছে?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'সে-সে-সেতো আমার কাছে।'

'তবে চলুন ছাতে'—বলে ফেলুদা তাকে হিড় হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে ছাতে উঠে দেখি—চিলেকোঠার দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ। এইবার দেখলাম ফেলুদার গায়ের জোর। দরজা থেকে তিন হাত পিছিয়ে কাঁধটা আগিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে চার বার ধাক্কা দিতেই কড়াগুলো পেরেক সুদ্ধ উপড়ে বেরিয়ে এসে দরজাটা খটাং করে খুলে গেল।

ভিতরে অন্ধকার। তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ক্রমে চোখটা সয়ে আসতে দেখলাম—এক কোণে অবনীশবাবুরই মতো দড়ি বাঁধা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন—ইনি কে? কৈলাস চৌধুরী, না কেদার চৌধুরী?

দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে কোলপাঁজা করে নিয়ে ফেলুদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে কৈলাসবাবুর ঘরে নিয়ে বিছানার উপর শোয়াল। ভদ্রলোক তখন ফেলুদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনিই কি...?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই নাম প্রদোষ মিত্তির। চিঠিটা বোধ হয় আপনিই আমাকে লিখেছিলেন— কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।...অবনীশবাবু, এঁর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দেখুন তো।'

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। ইনিই তাহলে কৈলাস চৌধুরী! ভদ্রলোক বালিশের উপর ভর দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শরীরে জোর ছিল, তাই টিকে আছি। অন্য কেউ হলে...এই চার দিনে...!'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বেশি স্ট্রেন করবেন না।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'কিছু কথা তো বলতেই হবে—নইলে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে না। আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ

হবে কী করে—যেদিন চিঠি দিলুম আপনাকে, সেইদিনই ও আমাকে বন্দি করে ফেলল। তাও চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে—নইলে গায়ের জোরে পারত না।'

'আর সেদিন থেকেই উনি কৈলাস চৌধুরী সেজে বসেছিলেন?'

কৈলাসবাবু দুঃখের ভাব করে মাথা নেড়ে বললেন, 'দোষটা আমারই, জানেন। বানিয়ে বানিয়ে বড়াই করাটা বোধহয় আমাদের রক্তে একেবারে মিশে আছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনেছিলুম জব্বলপুরের বাজার থেকে। কী দুর্মতি হল, ফিরে এসে চাঁপার জঙ্গলের এক দেবমন্দিরের গল্প ফেঁদে কেদারকে তাক লাগিয়ে দিলুম। সেই থেকেই ওর ওইটের উপর লোভ। আমার ভাগ্যটা ও সহ্য করতে পারেনি। অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেনি। বোধহয় ভাবত—দু জনে যমজ ভাই—চোখে দেখে কোনও তফাত করা যায় না, অথচ আমার গুণ, আমার রোজগার, আমার ভাগ্য—এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে এত তফাত হবে কেন? ও নিজে ছিল বেপরোয়া রেকলেস। একবার তো নোট জাল করার কেসে পড়েছিল। আমিই কোনও রকমে ওকে বাঁচাই। বিলেত গেল আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে। ভাবলুম আপদ গেল। এই সাতদিন আগে—গত মঙ্গলবার—বাড়ি ফিরে দেখি পাথরটা নেই। তার কথা মনেই হয়নি। চাকরদের উপর চোটপাট করলুম—কোনও ফল হল না। বিষ্যুদবার সকালে আপনাকে চিঠি দিলাম। সেদিনই রাত্রে ও এল। বাজারে যাচাই করে জেনেছে ও পাথরের কোনও দাম নেই, অথচ ও দেখেছিল লাখ টাকার স্বপ্ন। ক্ষেপে একেবারে লাল। টাকার দরকার—অন্তত বিশ হাজার। চাইল—রিফিউজ করলুম। তাতে ও আমাকে অজ্ঞান করে বন্দি করল। বলল যতদিন না টাকা দিই ততদিন ছাড়বে না, আর সে কদিন ও কৈলাস চৌধুরী সেজে বসে থাকবে—কেবল আদালতে যাবে না—অসুখ বলে ছুটি নেবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন আপনার চিঠি পেয়ে এসে পড়লাম, তখন ভদ্রলোক একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, তাই আমাদের দশ মিনিট বসিয়ে রেখে একটা হুমকি চিঠি, আর একজন কাল্পনিক শত্রু খাড়া করলেন। এইটে না করলে আমাদের সন্দেহ হত। অথচ আমি

থাকলেও বিপদ—তাই আবার টেলিফোনে হুমকি দিয়ে আর গাড়ি চাপা দিয়ে আমাদের হটাতেও চেষ্টা করলেন!'

কৈলাস ভ্রূকুটি করে বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি, কেদার এ ভাবে হঠাৎ আমাকে রেহাই দিয়ে চলে গেল কেন। আমি তো কাল রাত অবধি ওকে টাকা দিতে রাজি হইনি। ও কি শুধু হাতেই চলে গেল?'

অবনীশবাবু যে কখন মুখ নিয়ে হাজির হয়েছেন তা লক্ষই করিনি। হঠাৎ ভদ্রলোকের চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম।

'খালি হাতে যাবেন কেন তিনি? আমার টিকিট—আমার মহামূল্য ভিক্টোরিয়ার টিকিট নিয়ে গেছেন তিনি।'

ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'সেকি—সেটা গেছে নাকি?'

'গেছে বইকী! আমাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন কেদার মামা।'

'কত দাম যেন বলেছিলেন টিকিটটার?'

'বিশ হাজার।'

'কিন্তু'—ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটা নামিয়ে বলল, 'ক্যাটালগে যে বলছে ওটার দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়।'

অবনীশবাবুর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার মধ্যেও তো চৌধুরী বংশের রক্ত রয়েছে—তাই না? আপনিও বোধহয় একটু রং চড়িয়ে কথা বলতে ভালবাসেন?'

ভদ্রলোক এবার একেবারে ছেলেমানুষের মতো কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন, 'কী করি বলুন! তিন বছর ধরে চার হাজার ধুলোমাখা চিঠি ঘেঁটেও যে একটা ভাল টিকিট পেলাম না! তাও তো মিথ্যে বলে লোককে অবাক করে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়।'

ফেলুদা হো হো করে হেসে উঠে অবনীশবাবুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। আপনার কেদার মামাকে আপনি যে টিকিটটি দিলেন, সেটার কথা ভাবলেই দেখবেন প্রচুর আনন্দ পাবেন।...যাক গে, এবার দমদম এয়ারপোর্টে একটা টেলিফোন করে দেখি। কেদারবাবু পালাবেন আন্দাজ করে আজ সকালে এয়ার ইন্ডিয়াতে ফোন করে জেনেছি আজই একটা বোম্বাই-এর প্লেনে ওঁর

বুকিং আছে। পুলিশ থাকবে ওখানে, তাই পালাবার কোনও রাস্তা নেই। ভাগ্যে তপেশের কনুই ছড়েছিল। ডেটসের ব্যাপারটাতেই আমার ওর উপর প্রথম সন্দেহ হয়।'

কেদারবাবুকে গ্রেপ্তার করতে কোনও বেগ পেতে হয়নি, আর অবনীশবাবুও তাঁর পঞ্চাশ টাকার টিকিটটা ফেরত পেয়েছিলেন। ফেলুদা যা টাকা পেল, তাই দিয়ে আমাদের তিনদিন রেস্টুর্যান্টে খাওয়া আর দুটো সিনেমা দেখার পরেও ওর পকেটে বেশ কিছু বাকি রইল।

আজ বিকেলে বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ফেলুদা, একটা জিনিস আমি ভেবে বার করেছি, সেটা ঠিক কি না বলবে?'

'কী ভেবেছিস শুনি।'

'আমার মনে হয় কৈলাসবাবুর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেদারবাবু কৈলাসবাবু সেজে বসে আছেন, আর সেই জন্যেই সে দিন ওর দিকে কটমট করে চাইছিলেন। বাবারা নিশ্চয়ই নিজেদের যমজ ছেলেদের মধ্যে তফাত ধরতে পারে—তাই না?'

'এক্ষেত্রে তা যদি নাও হয়, তাহলেও, তোর ভাবনাটা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে বলে আমি তোকে সম্মানিত করছি'—এই বলে ফেলুদা আমার প্লেট থেকে একটা জিলিপি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

শেয়াল-দেবতা রহস্য

সত্যজিৎ রায়

টেলিফোনটা কে করেছিল ফেলুদা?

প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম যে বোকামি করেছি, কারণ যোগব্যায়াম করার সময় ফেলুদা কথা বলে না। [illegible] থেকে ফেলুদা এ-জিনিসটা মাস ছয়েক হল ধরেছে। সকালে আধঘণ্টা ধরে নানারকম 'আসন' করে সে। এমনকি, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে শূন্যে তুলে শীর্ষাসন পর্যন্ত। একথা স্বীকার করতেই হবে যে এক মাসে ফেলুদার শরীর আরো 'ফিট' হয়েছে বলে মনে হয়; কাজেই বলতে হয় যে যোগাসনে রীতিমত উপকার হচ্ছে।

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই পিছন ফিরে টেবিলের উপরে রাখা ঘড়ির টাইমটা দেখে নিলাম। ঠিক সাড়ে সাত মিনিট পরে আসন শেষ করে ফেলুদা জবাব দিল -

'তুই চিনবি না।'

এতক্ষণ পরে এরকম একটা উত্তর পেয়ে ভারী রাগ হল। চিনি না ত অনেককেই, কিন্তু নামটা বলতে দোষ কী? আর না চিনলেও, চিনিয়ে দেওয়া যায় না কি? একটু গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি চেন?'

ফেলুদা জলে-ভেজানো ছোলা খেতে খেতে বলল, 'আগে চিনতাম না এখন চিনি।'

কয়েকদিন হল আমার পুজোর ছুটি হয়ে গেছে; বাবা তিনদিন হল জামসেদপুরে গেছেন কাজে। বাড়িতে এখন আমি, ফেলুদা আর মা। এবার আমরা পুজোয় বাইরে যাব না। তাতে আমার বিশেষ আপশোস নেই, কারণ পুজোয় কলকাতাটা ভালোই লাগে, বিশেষ করে যদি ফেলুদা সঙ্গে থাকে। ওর আজকাল শখের গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নামডাক হয়েছে, কাজেই মাঝে মাঝে যে রহস্য সমাধানের জন্য ওর ডাক পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী? এর আগে প্রত্যেকটা রহস্যের ব্যাপারেই আমি ফেলুদার সঙ্গে ছিলাম। ভয় হয় ওর নাম বেশি হওয়াতে হঠাৎ যদি ও একদিন বলে বসে 'নাহ্, তোকে আর এবার সঙ্গে নেব না।' কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা ঘটেনি। আমার বিশ্বাস ওর আমাকে সঙ্গে রাখার একটা কারণ আছে। হয়ত সঙ্গে একটা অল্পবয়স্ক ছেলেকে দেখে অনেকেই ওকে গোয়েন্দা বলে ভাবতে পারে না। সেটা ত একটা মস্ত সুবিধে। গোয়েন্দারা যতই আত্মগোপন করে থাকতে পারে ততই তাদের লাভ।

'ফোনটা কে করল জানতে খুব ইচ্ছে করছে বোধহয়?'

এটা ফেলুদার একটা কায়দা। ও যখনই বুঝতে পারে আমার কোন একটা জিনিস জানবার খুব আগ্রহ, তখনই সেটা চট্ করে না বলে আগে একটা সাসপেন্স তৈরি করে। সেটা আমি জানি বলেই বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললাম, 'টেলিফোনটার সঙ্গে যদি কোন রহস্যের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে তাহলে জানতে ইচ্ছে করে বৈকি।'

ফেলুদা গেঞ্জির উপর তার সবুজ ডোরাকাটা শার্টটা চাপিয়ে নিয়ে বলল, লোকটার নাম নীলমণি সান্যাল। রোনাল্ডশে রোডে থাকে। বিশেষ জরুরী দরকারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

'কী দরকার বলেনি?'

'না। সেটা ফোনে বলতে চায় না। তবে গলা শুনে মনে হল ঘাবড়েছে।'

'কখন যেতে হবে ?'

'ট্যাক্সিতে করে যেতে মিনিট দশেক লাগবে। নটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সুতরাং আর দু মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ট্যাক্সি করে নীলমণি সান্যালের বাড়ি যেতে যেতে ফেলুদাকে বললাম, 'অনেক রকম ত দুষ্টু লোক থাকে, ধর নীলমণিবাবুর যদি কোনরকম বিপদ না হয়ে থাকে – তিনি যদি শুধু তোমাকে প্যাঁচে ফেলার জন্যই ডেকে থাকেন।'

ফেলুদা রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, 'সে রিস্ক ত থাকেই। তবে সেরকম লোক বাড়িতে ডেকে নিয়ে প্যাঁচে ফেলবে না, কারণ সেটা তাদের পক্ষেও রিস্কি হয়ে যাবে। সে সব কাজের জন্য অল্প টাকায় ভাড়াটে গুণ্ডার কোন অভাব নেই।'

একটা কথা বলা হয়নি – ফেলুদা গত বছর অল ইন্ডিয়া রাইফল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। মাত্র তিনমাস বন্দুক শিখেই ওর যা টিপ হয়েছিল সে একেবারে থ মেরে যাবার মত। ফেলুদার এখন বন্দুক রিভলভার দুই-ই আছে, তবে বইয়ের ডিটেকটিভের মত ও সবসময় রিভলভার নিয়ে ঘোরে না। সত্যি বলতে কি, এখন পর্যন্ত ফেলুদাকে ও দুটোর একটাও ব্যবহার করতে হয়নি; তবে কোনদিন যে হবে না সে কথা কী করে বলব ?

ট্যাক্সি যখন ম্যাডক্স স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেছে, তখন জিগ্যেস করলাম, 'ভদ্রলোক কী করেন সেটা জান ?'

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক পান খান, বোধহয় কানে একটু কম শোনেন, ''ইয়ে'' শব্দটা একটু বেশি ব্যবহার করেন, আর অল্প সর্দিতে ভুগছেন – এ ছাড়া আর কিছুই জানি না।'

এর পরে আর আমি কিছু জিগ্যেস করিনি।

নীলমণি সান্যালের বাড়িতে পৌঁছতে ট্যাক্সিভাড়া উঠল এক টাকা সত্তর পয়সা। একটা দুটাকার নোট বার করে ট্যাক্সিওয়ালার হাতে দিয়ে ফেলুদা হাতের একটা কায়দার ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিল যে তার চেঞ্জ ফেরত চাই না। গাড়ি থেকে নেমে পোর্টিকোর তলা দিয়ে গিয়ে সামনের দরজায় পৌঁছে কলিং বেল টেপা হল।

দোতলা বাড়ি, তবে খুব যে বড় তাও নয়, আর খুব পুরোনও নয়। সামনের দিকে একটা বাগানও আছে, তবে সেটা খুব বাহারের কিছু নয়।

একজন দারোয়ান গোছের লোক এসে ফেলুদার কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় বসতে বলল। ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বেশ তাক লেগে গেল। সোফা, টেবিল, ফুলদানি, ছবি, কাঁচের আলমারিতে সাজান নানারকম সুন্দর সুন্দর পুরোন জিনিস–জিনিস মিলিয়ে বেশ একটা জমকালো ভাব। মনে হয় অনেক খরচ করে মাথা খাটিয়ে এসব জিনিস কিনে সাজানো হয়েছে।

ফেলুদা নিজেই উঠে পাখার রেগুলেটারটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। পরনে স্ট্রাইপ স্লিপিং সুটের পায়জামার উপর একপাশে বোতামওয়ালা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, আর দুহাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি। হাইট মাঝারি, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় চুল বেশি নেই, মোটামুটি ফরসা, আর চোখ দুটো ঢুলুঢুলু – দেখলে মনে হয় এই বুঝি ঘুম থেকে উঠে এলেন। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয়।

'আপনারই নাম প্রদোষ মিত্তির ?' জিগ্যেস করলেন। 'আপনি যে এত ইয়ং সেটা জানা ছিল না।'

ফেলুদা একটু হেঁ হেঁ করে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। আপনি চাইলে আমাদের কথাবার্তার সময় আমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। কিন্তু ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললেন, 'কেন, থাকুক না – কোনো ক্ষতি নেই।' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ইয়ে – আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন? চা বা কফি?'

'নাঃ। এই সবে চা খেয়ে বেরিয়েছি।'

'বেশ, তাহলে আর সময় নষ্ট না করে কেন ডেকেছি সেইটে বলি। তবে তার আগে আমার নিজের পরিচয়টা একটু দিই। বুঝতেই পারছেন আমি একজন শৌখীন লোক। পয়সা কড়িও কিছু আছে সেটাও নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন। তবে বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি চাকরিও করি না, ব্যবসাও করি না, বা বাপের সম্পত্তিও এক পয়সাও পাইনি।'

নীলমণিবাবু রহস্য করার ভাব করে চুপ করলেন।

ফেলুদা বলল, 'তাহলে কি লটারি ?'

'আজ্ঞে ?'

'বলছিলাম – তাহলে কি কখনো লটারি-টটারি জিতেছিলেন ?'

'এগজ্যাক্টলি!' ভদ্রলোক প্রায় ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এগারো বছর আগে রেঞ্জার্স লটারি জিতে এক ধাক্কায় পেয়ে যাই প্রায় আড়াই লাখ টাকা। তারপর সেই টাকা দিয়ে, খানিকটা বুদ্ধি আর খানিকটা ভাগ্যের জোরে, বেশ ভালভাবেই চালিয়ে এসেছি। বাড়িটা

তৈরী করি বছর আষ্টেক আগে। আপনি হয়ত ভাবছেন, এরকম অলসভাবে একটা মানুষ বেঁচে থাকে কী করে, কিন্তু আসলে একটা কাজ আমার আছে – একটাই কাজ – সেটা হল অকশন থেকে এইসব জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজানো।'

ভদ্রলোক তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে চারিদিকের সাজানো জিনিসপত্রগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন -

'যে ঘটনাটা ঘটছে তার সঙ্গে আমার এইসব আর্টিস্টিক জিনিসপত্রের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয় যে হয়ত থাকতেও পারে। এই যে -'

নীলমণিবাবু তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাগজগুলো দেখে নিলাম। তিনটে কাগজ, তার প্রত্যেকটাতেই লেখার বদলে লাইন করে ছোট ছোট ছবি আঁকা। সেই ছবির মধ্যে কিছু কিছু বেশ বোঝা যায় – যেমন, প্যাঁচা, চোখ, সাপ, সূর্য - এইসব। আমার কেমন যেন ব্যাপারটাকে লেখা লেখা বলে মনে হচ্ছিল, এমন সময় ফেলুদা বলল, 'এইসব ত হিয়েরোগ্লিফিক লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে ?'

ফেলুদা বলল, 'প্রাচীনকালে ইজিপ্সিয়ানরা যে লেখা বার করেছিল, এটা সেই জিনিস বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই বুঝি ?'

'হুঁ। তবে এ লেখা পড়তে পারে এমন লোক কলকাতায় আছে কিনা সন্দেহ।'

ভদ্রলোক যেন একটু মুষড়ে পড়ে বললেন, 'তাহলে? যে জিনিস দুদিন অন্তর অন্তর ডাকে আমার নামে আসছে, তার মানে না করতে পারলে ত ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে। ধরুন যদি এগুলো সাংকেতিক হুমকি হয় - কেউ হয়ত আমাকে খুন করতে চাইছে, আর তার আগে আমাকে শাসাচ্ছে।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার যে সমস্ত জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে – তার মধ্যে ইজিপ্সিয়ান কিছু আছে ?'

নীলমণিবাবু হেসে বললেন, 'দেখুন, আমার কোন জিনিস যে কোথাকার, সেটা আমি নিজেই ঠিক ভালোভাবে জানি না। আমি কিনি, কারণ আমার পয়সা আছে এবং আর পাঁচজন শৌখিন লোককে এসব জিনিস কিনতে দেখেছি, তাই।'

'কিন্তু আপনার এত জিনিসের মধ্যে একটিকেও ত মেকি বলে মনে হচ্ছে না। যারা শুধু এগুলো দেখবে, তারা তো আপনাকে রীতিমত সমঝদার লোক বলে মনে করবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'এটা কী জানেন ? এসব ব্যাপারে সচরাচর জিনিস ভালো হলেই তার দাম বেশি হয়। টাকা যখন আছে, তখন আমি সেরা জিনিসটা কিনব না কেন ? অনেক ভারী ভারী খদ্দেরের উপরে টেক্কা দিয়ে নীলাম থেকে এসব কিনেছি মশাই, কাজেই ভালো জিনিস আমার কাছে থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়।'

'কিন্তু মিশরের জিনিস কিছু আছে কিনা জানেন না ?'

নীলমণিবাবু সোফা ছেড়ে উঠে একটা কাচের আলমারির দিকে গিয়ে তার উপরের তাক থেকে একটা বিঘতখানেক লম্বা মূর্তি নামিয়ে এনে সেটা ফেলুদার হাতে দিলেন। সবুজ পাথরের মূর্তি, তার গায়ে আবার নানা রঙের ঝলমলে পাথর বসানো। দু-এক জায়গায় যেন সোনাও রয়েছে। তবে আশ্চর্য এই যে, মূর্তিটার শরীর মানুষের মত হলেও, তার মুখটা শেয়ালের মত। 'এটা দিন দশেক আগে কিনেছি অ্যারাটুন ব্রাদার্সের একটা নীলাম থেকে। এটা বোধহয় -'

ফেলুদা মূর্তিটায় একবার চোখ বুলিয়েই বলল, 'আনুবিস।'

'আনুবিস ? সে আবার কী ?'

ফেলুদা মূর্তিটা সাবধানে নেড়েচেড়ে নীলমণিবাবুর হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, 'আনুবিস ছিল প্রাচীন মিশরের গড অফ দ্য ডেড। মৃত আত্মাদের দেবতা। ..... চমৎকার জিনিস পেয়েছেন এটা।'

'কিন্তু - 'ভদ্রলোকের গলায় ভয়ের সুর' - এই মূর্তি আর এইসব চিঠির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ? আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম ? কেউ কি এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা বলা মুশকিল। চিঠিগুলো কবে থেকে পেতে শুরু করেছেন ?'

'গত সোমবার থেকে।'

'অর্থাৎ, মূর্তিটা কেনার ঠিক পর থেকেই ?'

'হ্যাঁ।'

'খামগুলো আছে ?'

'না, ফেলে দিয়েছি। রেখে দেওয়া হয়ত উচিত ছিল – তবে খুবই সাধারণ খাম, সাধারন টাইপরাইটারে ঠিকানা লেখা। পোস্টঅফিস এলগিন রোড।'

'ঠিক আছে।' ফেলুদা উঠে পড়ল। 'আপাতত কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। শুধু সেফ সাইডে থাকার জন্য মূর্তিটাকে ওই আলমারিতে না রেখে আপনার হাতের কাছে রাখবেন। সম্প্রতি একজনদের বাড়ি থেকে এ ধরনের কিছু জিনিস চুরি হয়েছিল।'

তাই বুঝি ?

'হ্যাঁ। একজন সিন্ধি ভদ্রলোক। যদ্দুর জানি এখনো সে চোর ধরা পড়েনি।' আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ল্যান্ডিং-এ এলাম।

ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে এমন কারুর কথা মনে পড়ছে ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'কেউ না। পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'আর শত্রু ?'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ধনীর ত শত্রু সব সময়ই থাকে, তবে তারা ত কেউ আর শত্রু বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না। সামনা সামনি দেখা হলে সকলেই খাতির করে কথা বলে।'

'আপনি মূর্তিটা ত নীলামে কিনেছিলেন বললেন।'

'হ্যাঁ। আরাটুন ব্রাদার্সের নীলামে।'

'ওটার ওপর আর কারো লোভ ছিল না ?'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক হঠাৎ কেন যেন একটু উত্তেজিত হয়ে হাত কচলাতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কথাটা জিগেস করে আমার ভাবনার একটা নতুন দিক খুলে দিলেন। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোকের অনেকবার নীলামে ঠোকাঠুকি হয়েছে – সেদিনও হয়েছিল।'

'তিনি কে ?'

'প্রতুল দত্ত।'

'কী করেন ?'

বোধহয় উকীল ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। সেদিন ওর আর আমার মধ্যে শেষ অবধি রেষারেষি চলে। তারপর আমি বারো হাজার বলার পর উনি থেমে যান - মনে আছে, নীলামের পর আমি যখন বাইরে এসে গাড়িতে উঠেছি, তখন হঠাৎ ওর সঙ্গে একবার চোখাচুখি হয়ে পড়ে। ওর চোখের চাহনিটা মোটেই ভালো লাগেনি।'

'আই সী।'

আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ি থেকে বেরোলাম। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'এ বাড়িতে কি আপনারা অনেকে থাকেন?'

নীলমণিবাবু হেসে বললেন, 'কী বলছেন মশাই ? আমার মত একা মানুষ বোধ হয় কলকাতায় দুটি নেই। ড্রাইভার, মালি, দুটি পুরোন বিশ্বস্ত চাকর, ও আমি - ব্যস !'

ফেলুদার পরের প্রশ্নটা একেবারেই এক্সপেক্ট করিনি –

'বাচ্চা ছেলে কি কেউ থাকে না এ বাড়িতে ?'

ভদ্রলোক একমুহূর্তের জন্য একটু অবাক হয়ে তারপর হো হো করে হেসে বললেন, 'দেখেছেন – ভুলেই গেছি ! আসলে আমি লোক বলতে বয়স্ক লোকের কথাই ভাবছিলাম ! আজ দিন দশেক হল আমার ভাগনে ঝুণ্টু এখানে এসে রয়েছে। ওর বাবা ব্যবসা করেন। এই সেদিন সস্ত্রীক জাপানে গেছেন। ঝুণ্টুকে রেখে গেছেন আমার জিম্মায়। বেচারি এসে অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার বাক্সের কথা মনে হল কেন ?'

ফেলুদা বলল, 'বৈঠক খানার একটা আলমারির পিছন থেকে একটা ঘুড়ির কোনা উঁকি মারছিল। সেইটে দেখেই . . . '

নীলমণিবাবুর চাকর একটা ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিল, সেটা নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে কড় কড় শব্দ করে পোর্টিকোর তলায় ঠিক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফেলুদা ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলল, 'সন্দেহজনক আরো কিছু যদি ঘটে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন। আপাতত আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে বললাম, 'শেয়াল দেবতার চেহারাটা দেখে কিরকম ভয় করে – তাই না ?'

ফেলুদা বলল, 'মানুষের ধড়ে অন্য যে কোন জিনিসের মাথা জুড়ে দিলেই ভয় করে - শুধু শেয়াল কেন ?'

আমি বললাম, 'পুরোন ইজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি ঘরে রাখা ত বেশ বিপজ্জনক।'

'কে বলল ?'

'বাঃ - তুমিই ত বলেছিলে।'

'মোটেই না। আমি বলেছিলাম, যেসব প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান মূর্তি-টুর্তি বার করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছে।'

'হ্যাঁ - হ্যাঁ - সেই যে একজন সাহেব - সে ত মরেই গিয়েছিল - কী নাম না ?'

'লর্ড কারনারভন।'

'আর তার কুকুর . . . ?'

'কুকুর তার সঙ্গে ছিল না। কুকুর ছিল বিলেতে। সাহেব ছিলেন ইজিপ্টে। তুতানখামেনের কবর খুঁড়ে বার করার কিছুদিনের মধ্যেই কারনারভন হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে মারা যান। তারপরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, যে সময় সাহেব মারা যান, ঠিক সেই একই সময় বিনা অসুখে রহস্যজনকভাবে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে তাঁর কুকুরটিও মারা যায়।

প্রাচীন ইজিপ্টের কোন জিনিস দেখলেই আমার ফেলুদার কাছে শোনা এই অদ্ভুত ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। শেয়ালদেবতা আনুবিসের মূর্তিটাও নিশ্চয়ই কোন মান্ধাতার আমলের ইজিপ্সিয়ান সম্রাটের কবর থেকে এসেছে। নীলমণিবাবু কি এসব কথা জানেন না? সাধ করে বিপদ ডেকে আনার মধ্যে কী মজা থাকতে পারে তা ত আমি ভেবেই পাই না।

পরদিন ভোর পৌনে ছ'টায় আমাদের বারান্দায় খবরের কাগজের বান্ডিলটা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি ফোনটা তুলে হ্যালো বলেছি, কিন্তু উল্টোদিকের কথা শোনার আগেই ফেলুদা সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। পর পর তিনবার 'হু', দুবার 'ও', আর একবার 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলেই ফোনটা ধপ করে রেখে দিয়ে ও ধরা গলায় বলল, 'আনুবিস গায়েব। এক্ষুনি যেতে হবে।'

সকাল বেলায় ট্রাফিক কম বলে নীলমণি সান্যালের বাড়ি পৌঁছতে লাগল ঠিক সাত মিনিট। ট্যাক্সি থেকে নেমেই দেখি নীলমণিবাবু কেমন যেন হ্যাবাচ্যাকা ভাব করে বাড়ির বাইরেই আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদাকে দেখেই বললেন, 'নাইটমেয়ারের মধ্যে দিয়ে গেছি মশাই। এরকম হরিব্‌ল অভিজ্ঞতা আমার কক্ষনো হয়নি।'

আমরা ততক্ষনে বৈঠকখানায় ঢুকেছি। ভদ্রলোক আমাদের আগেই সোফায় বসে প্রথমে তাঁর হাতের কব্জিগুলো দেখালেন। দেখলাম, লোকে যেখানে ঘড়ি পরে, তার ঠিক নীচ দিয়ে দুই হাতে দড়ির দাগ বসে গিয়ে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন।'

ভদ্রলোক দম নিয়ে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনার কথা মতো গতকাল মূর্তিটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে একেবারে বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যেখানে ছিল সেখানেই রাখলে আর কিছু না হোক, অন্তত শারীরিক যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হত না। যাক, সে - মূর্তিটা ত মাথার তলায় নিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছি, এমন সময় - রাত কটা জানি না - একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কে জানি দুহাত আষ্টেপৃষ্ঠে গামছা দিয়ে বাঁধছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার পথ বন্ধ দেখে হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলুম, আর তখনই বুঝতে পারলুম যে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী লোকের পাল্লায় পড়েছি। দেখতে দেখতে আমার হাত পিছমোড়া করে দিলে। ব্যস - তারপর বালিশের তলা থেকে মূর্তি নিতে আর কী ?

ভদ্রলোক দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঘন্টা তিনেক বোধহয় হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলুম। সমস্ত শরীরে ঝি ঝি ধরে গেল। সকালে চাকর নন্দলাল চা নিয়ে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বাঁধন খুলে দেয়, আর তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে ফোন করি।'

ফেলুদার এতক্ষণে চোখ -মুখের ভাব বদলে গেছে। সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার ঘরটা একবার দেখব, আর প্রয়োজন হলে আপনার বাড়ির কিছু ছবি তুলব। ক্যামেরাটাও ফেলুদার নতুন বাতিকের মধ্যে একটা।

নীলমণিবাবু দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই ফেলুদা বলল, 'একি - জানালায় শিক নেই ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, আর বলবেন না – বিলিতি কায়দার বাড়ি ত ! আর আমি আবার জানালা বন্ধ করে শুতেই পারি না।

ফেলুদা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখে বলল, খুব সহজ – পাইপ রয়েছে, কার্নিশ রয়েছে। একটু জোয়ান লোক হলেই অনায়াসে জলনল দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে।'

তারপর ফেলুদা ঘরের চারদিকে খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ছবি-টবি তুলে বলল, বাড়ির অন্য অংশও একবার ঘুরে দেখতে চাই।' নীলমণিবাবু প্রথমে দোতলা দেখালেন। পাশের ঘরটাতে দেখলাম একটা বছর বারো-তেরো বছর বয়সের একটা ছেলে গলা অবধি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখ গুলো বড় বড় আর দেখলেই মনে হয় তার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়। বুঝলাম এই হল ঝুণ্টু। নীলমণিবাবু বললেন, 'কালই আবার ডাক্তার বোস ঝুণ্টুকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন। তাই ও রাত্রে কিছুই শুনতে পায়নি।'

দোতলায় আরো দুটো ঘর দেখে, একতলার ঘরগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে এলাম। নীলমণিবাবুর ঘরের জানলার ঠিক নীচেই দেখলাম কয়েকটা ফুলের টবে পামজাতীয় গাছ লাগানো। ফেলুদা টবগুলোর ভিতর কিছু আছে কি না দেখতে লাগল। প্রথম দুটোয় কিছু পেলো না। তৃতীয়টার পাশে ভিজে মাটিতে একটা ছোট টিনের কৌটো পেলো। সেটার ঢাকনা খুলে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, এ বাড়িতে কারুর নস্যির বাতিক আছে?

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে না বললেন। ফেলুদা কৌটোটা নিজের প্যান্টের পকেটে রেখে দিল।

এবার নীলমণিবাবু বেন বেশ মরিয়া হয়েই বললেন, 'মিস্টার মিত্তির - আর কিছু না - মূর্তি একটা গেছে, আরেকটা না হয় কিনব - কিন্তু একটা ডাকাত আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার উপর যা তা অত্যাচার করে চলে যাবে - এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। আপনার এর একটা বিহিত করতেই হবে। যদি লোকটাকে ধরে দিতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ইয়ে - মানে, ইয়ে আর কী -'

'পারিশ্রমিক ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। পারিশ্রমিক - মানে, রিওয়ার্ড দেবো।'

ফেলুদা বলল, 'রিওয়ার্ডটা বড় কথা নয়। সে আপনি দিতে চান দেবেন। কিন্তু আমি কেসটার ভার নিচ্ছি তার প্রধান কারণ হল, এ ধরনের অনুসন্ধানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, একটা আনন্দ আছে।'

এটা শুনে আমার মনে হল, বড় বড় গোয়েন্দাকাহিনীতে ডিটেকটিভরা যে ভাবে কথা বলে, ফেলুদাও যেন ঠিক সেইভাবেই কথাটা বলল।

এর পরে প্রায় দশ মিনিট ধরে ফেলুদা নীলমণিবাবুর ড্রাইভার গোবিন্দ, চাকর নন্দলাল আর শীচু, আর মালি নটবরের সঙ্গে কথা বলল। তারা সবাই বলল রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু দেখে নি; বাইরের লোক আসার মধ্যে এক রাত নটা নাগাদ ডাক্তার বোস এসেছিলেন ঝুণ্টুকে দেখতে। নীলমণিবাবু নিজে নাকি তারপর একবার বেরিয়েছিলেন ও এন মুখার্জির ডাক্তারখানা থেকে ঝুণ্টুর জন্য ওষুধ কিনে আনতে।

ফেরার পথে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল ট্যাক্সি আমাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলেছে। ফেলুদাকে গম্ভীর দেখে তাকে আর কিছু জিগ্যেস করলাম না। ট্যাক্সি থামল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে। দেখলাম বাড়ির সদর দরজার উপরে সাইনবোর্ডে উঁচু উঁচু রূপোলি অক্ষরে লেখা রয়েছে – 'আমস্টুন ব্রাদার্স – অকশনিয়ার্স।' এটাই সেই নীলামের দোকান।

আমি কোনোদিন নীলামঘর দেখিনি। এই প্রথম দেখে একেবারে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত রকম হিজিবিজি জিনিস একসঙ্গে এর আগে কখনো দেখিনি।

ফেলুদার কাজ দুমিনিটের মধ্যে সারা হয়ে গেল। প্রতুল দত্তের ঠিকানা দেখেছি বাই ওয়ান শান্তলক্ স্ট্রিট। আমি মনে মনে ভাবলাম প্রতুল দত্তের বাড়ি গিয়েও যদি ফেলুদাকে হতাশ হতে হয়, তাহলে আর ওর কোথাও যাবার থাকবে না। তার মানে এবার ফেলুদাকে হার স্বীকার করতে হবে। আর তাহলে আমার যে কী দশা হবে তা জানি না। কারণ এখন পর্যন্ত ফেলুদা কোথাও হার মানেনি। ও কোনো ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ চুন করে বসে আছে - এ দৃশ্য আমি কল্পনাই করতে পারি না। আশা করি শিগ্গিরই ও একটা 'ক্লু' পেয়ে যাবে। আমি অন্তত এখন পর্যন্ত চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুপুরে খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'এর পর ?'

ও ভাতের ঢিপির মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে এক বাটি সোনামুগ ডাল ঢেলে বলল, 'এর পর মাছ। তারপর চাটনি, তারপর দই।'

'তারপর ?'

'তারপর জল খেয়ে মুখ ধোব। তারপর একটা পান খাব।'

'তারপর ?'

'তারপর একটা টেলিফোন করে আধঘন্টা ঘুম দেবো।'

এর মধ্যে টেলিফোনটাই একমাত্র ইন্টারেস্টিং খবর, কাজেই আমি সেটার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ডিরেক্টরি থেকে প্রতুল দত্তর নম্বরটা আমি বার করে দিয়েছিলাম। নম্বরটা ডায়াল করে 'হ্যালো' বলার সময় দেখলাম ফেলুদা গলাটা একদম চেঞ্জ করে বুড়োর গলা করে নিয়েছে। যে কথাটা হোল ফোনে, তার শুধু একটা দিকই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, আর সেইভাবেই সেটা লিখে দিচ্ছি –

'হ্যালো - আমি নাকতলা থেকে কথা বলছি।'

–

'আজ্ঞে আমার নাম শ্রীজয়নারায়ণ বাগচি। আমি প্রাচীন কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এই বিষয়ে নিয়ে আমি একটি পুস্তক রচনা করছি।'

–

'হ্যাঁ — আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কিছু জিনিস আমাকে দেখতে দেন ..'

–

'না না না। পাগল নাকি!

–

আচ্ছা।

–

হ্যাঁ - নিশ্চয়ই!

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার।

টেলিফোন শেষ করে ফেলুদা বলল, ভদ্রলোকের বাড়িতে চুনকাম হচ্ছে - তাই জিনিস পত্র গুলো সরিয়ে রেখেছেন। তবে সন্ধের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

'কিন্তু প্রতুলবাবু যদি সত্যিই যক্ষীর মূর্তি চুরি করে থাকেন, তাহলে ত আর সেটা আমাদের দেখাবেন না।'

ফেলুদা বলল, যদি তোর মত বোকা হয় তাহলে দেখাতেও পারে; তবে না দেখানোটাই সম্ভব। আমি মূর্তি দেখার জন্য যাচ্ছি না, যাচ্ছি লোকটাকে দেখতে।

তার কথামত ফেলুদা টেলিফোনটা করেই নিজের ঘরে চলে গেল ঘুমোতে। ফেলুদার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা হল, ও যখন তখন প্রয়োজন মত একটু - আধটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। শুনেছি নেপোলিয়নেরও নাকি এ ক্ষমতা ছিল; যুদ্ধের আগে ঘোড়ার পিঠে বসেবসেই ঘুমিয়ে নিয়ে শরীরটাকে তাজা করে নিতেন।

আমার বিশেষ কিছুই করার ছিল না, তাই ফেলুদার তাক থেকে একটা ইজিপ্শিয়ান আর্টের বই নিয়ে সেটা উলটে পালটে দেখছিলাম, এমন সময় ক্রীং-ক্রীং করে ফোনটা বেজে উঠল।

আমি এক দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলাম।

'হ্যালো!'

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না, যদিও বেশ বুঝতে পারছিলাম ফোনটা কেউ ধরে আছে।

আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল।

প্রায় দশ সেকেন্ড পরে একটা গম্ভীর, কর্কশ গলা শুনতে পেলাম।

প্রদোষ মিত্তির আছেন ?

আমি কোনমতে ঢোক গিলে বললাম, উনি একটু ঘুমোচ্ছেন। আপনি কে কথা বলছেন?

আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর কথা এলো, ঠিক আছে। আপনি তাকে বলে দেবেন যে মিশরের দেবতা যেখানে যাবার সেখানেই গেছেন। প্রদোষ মিত্তির যেন এ ব্যাপারে আর নাক গলাতে না আসেন, কারণ তাতে কারুর কোন উপকার হবে না। বরং অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি।

এর পরেই খট্ করে ফোনটা রাখার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই সব চুপ।

কতক্ষণ যে ফোনটা হাতে ধরে প্রায় দম বন্ধ করে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ ফেলুদার গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি রিসিভারটাকে জায়গায় রেখে দিলাম।

'কে ফোন করেছিল ?'

আমি ফোনে যা শুনেছি তা বললাম। ফেলুদা গম্ভীর মুখ করে ভুরু কুঁচকে সোফায় বসে বলল, 'ইস - তুই যদি আমাকে ডাকতিস !'

'কী করব ? কাঁচা ঘুম ভাঙালে যে তুমি রাগ কর।'

'লোকটার গলার আওয়াজ কিরকম ?'

'ভয়ঙ্কর গম্ভীর।'

'হুঁ ___। যাক্ গে, আপাতত প্রতুল দত্তর চেহারাটা একবার দেখে আসি। মনে হচ্ছিল একটু আলো দেখতে পাচ্ছি ; এখন আবার সব ঘোলাটে।

ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা প্রতুল দত্তর বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে বাবাও আমাদের দেখে চিনতে পারতেন না। ফেলুদা সেজেছে একটা ষাট বছরের বুড়ো। কাঁচা-পাকা মেশানো ঝোলা গোঁফ, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, হাঁটুর উপর ধুতি, আর মোজার উপর বাটার তৈরি একটি কেডস জুতো। আধঘন্টা ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে মেক-আপ করে বাইরে এসেই বলল, তোর জন্য দু-তিনটে জিনিস আছে চট্ করে পরে নে।'

'আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাকে এ মেক আপ করতে হবে নাকি ?'

'অবশ্যই !'

দু মিনিটের মধ্যে আমার মাথায় একটা কদম-ছাঁট পরচুলা, আর আমার নাকের উপর একটা চশমা বসে গেল। তারপর একটা কালো পেন্সিল দিয়ে আমার পরিষ্কার করে ছাঁটা - জুলপিটা ফেলুদা একটু অপরিস্কার করে দিল। তারপর বলল -

'তুই আমার ভাগনে, তোর নাম সুবোধ – অর্থাৎ অল্পভাষী গোবেচারী ভালোমানুষটি। এখানে মুখ খুলেছ কি বাড়ি এসে রদ্দা!'

প্রতুলবাবুর বাড়ির চুণকাম হয়ে এসেছে। ডিজাইন দেখে বোঝা যায় বাড়ি অন্তত: পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরোন, তবে নতুন রঙের জন্য দরজা জানলা দেয়াল সব কিছু ঝলমল করছে।

গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়েই দেখি বাইরে একটা খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাদের এগোতে দেখেও তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও বুঝলাম তাঁর মুখটা বেশ গম্ভীর।

ফেলুদা দুহাত তুলে মাথা হেঁট করে নমস্কার করে তার নতুন বুড়ো মিহি গলায় বলল, 'মাপ করবেন - আপনিই কি প্রতুলবাবু ?'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে আমারই নাম জয়নারায়ণ বাগচি। আমিই আপনাকে আজ দুপুরে টেলিফোন করেছিলাম। এটি আমার ভাগনে সুবোধ।

'আবার ভাগনে কেন? ওর কথা ত টেলিফোনে হয়নি।'

আমার মাথার পরচুলা কুটকুট করতে শুরু করেছে।

ফেলুদা গলা ভীষণ নরম করে বলল, 'আজ্ঞে ও ছবি আঁকা শিখছে আর . . . 'ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

'আপনারা আমার জিনিসগুলি দেখতে চাইছেন তাতে আপত্তি নেই, তবে সরিয়ে রাখা জিনিস সব টেনে বার করতে হয়েছে। অনেক

হাঁপাচ্ছাম। একে বাড়িতে রাতদিন মিস্ত্রিদের ঝামেলা, এটা ঠেলো, ওটা টানো ......চারিদিক খাঁচা ঠক ....মেজের শব্দটাও যাতে যায় না। সব ঝক্কি শেষ হলে যেন বাঁচি। আসুন ভেতরে—'

লোকটাকে ভালো না লাগলেও, ভিতরে গিয়ে তার জিনিসপত্তর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার কাছে মিশর দেশের শিল্পকলার অনেক চমৎকার নিদর্শন রয়েছে দেখছি।'

'তা আছে। কিছু জিনিস কায়রোতে কেনা, কিছু এখানে অকশনে।'

'দ্যাখো বাবা সুযোগ ভালো করে দ্যাখো।' ফেলুদা আমার পিঠে একটা চিমটি কেটে আমায় জিনিসগুলোর দিকে ঠেলে দিল। 'কতরকম দেবদেবী – দ্যাখো! এই যে বাজপাখী, এও দেবতা, এই যে প্যাঁচা – এও দেবতা। মিশরদেশে কতরকম জিনিসকে পুজো করত লোকেরা দ্যাখো।'

প্রতুলবাবু একটা সোফায় বসে চুরুট ধরালেন।

হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি বলে উঠলাম, 'শেয়ালদেবতা নেই, বড় মামা?

প্রশ্নটা শুনেই প্রতুলবাবু যেন হঠাৎ বিষম খেয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুরুটের কোয়ালিটি কমে গেছে। আগে এত কড়া ছিল না'

ফেলুদা সেই রকমই মিহি সুরে বললেন, 'হেঁ হেঁ – আমার ভাগনে আনুবিসের কথা বলছে। কালই ওকে বলছিলাম কিনা?'

প্রতুলবাবু হঠাৎ কোঁস করে উঠলেন, 'হুঁ!-আনুবিস! স্টুপিড ফুল!'

'আজ্ঞে?' ফেলুদা চোখ গোল গোল করে প্রতুলবাবুর দিকে চাইলেন। 'আনুবিসকে মূর্খ বলছেন আপনি?'

আনুবিস না। সেদিন নীলামে -লোকটাকে আজকেও দেখেছি আমি - হি ইজ এ ফুল। ওর বিডিং -এর কোন মাথামুন্ডু নেই। চমৎকার একটা মূর্তি ছিল। এমন এক অ্যাবসার্ড দাম হাঁকলে যে যার ওপর আর চড়া যায় না। অত টাকা কোথায় পায় জানি না।'

ফেলুদা চারিদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ। আপনি মহাশয় ব্যক্তি।' পরম আনন্দ পেলাম আপনার শিল্প সংগ্রহ দেখে।'

এসব জিনিসপত্র ছিল দোতলায়। আমরা এবার নীচে রওনা দিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে লোকজন আর বিশেষ ...?'

'গিন্নী আছেন। ছেলে বিদেশে।'

প্রতুল দত্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য প্রায় হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম পাড়াটা কত নির্জন। সাতটাও বাজেনি, অথচ রাস্তায় প্রায় লোক নেই বললেই চলে। দুটি বাচ্চা ভিখারী ছেলে শ্যামা সংগীত গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। একটু কাছে এসে পরে বুঝলাম একজন গাইছে আর অন্যজন বাজাচ্ছে। ভারী সুন্দর গান করে ছেলেটা। ফেলুদা তাদের সঙ্গে গলা মিশিয়ে গেয়ে উঠল –

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা ...

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে গিয়ে মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সির দেখা পেয়েই ফেলুদা হাঁক দিয়ে সেটাকে থামালো। ওঠার সময় দেখি বুড়ো ড্রাইভার ভারী অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। এই চিমড়ে বুড়োর গলা দিয়ে ওরকম জোয়ান চীৎকার বেরোল কি করে সেটাই বোধহয় চিন্তা করছে ও।

পরদিন সকালে যখন টেলিফোনটা বাজল, তখন আমি বাথরুমে দাঁত মাজছি। কাজেই ফোনটা ফেলুদাই ধরল।

টেলিফোন করে জানলাম নীলমণিবাবু ফোন করেছিলেন একটা খবর দেবার জন্য।

প্রতুলবাবুর বাড়িতেও কাল ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, আর এ খবরটা কাগজেও বেরিয়েছে। টাকা পয়সা কিছু যায় নি; গেছে শুধু কিছু প্রাচীন কারুশিল্পের নমুনা। আট-দশটা ছোট ছোট জিনিস, সব মিলিয়ে যার দাম বিশ-পঁচিশ হাজারের টাকার কম না। পুলিশ নাকি তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রতুলবাবুর বাড়িতে যে সকালে পুলিশের দেখা পাবো, আর তার মধ্যে যে ফেলুদার চেনা লোকও বেরিয়ে পড়বে সেটা কিছুই আশ্চর্য না। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন সোয়া সাতটা। অবিশ্যি আজ আর মেক-আপ করিনি। ফেলুদা দেখলাম তার জাপানি ক্যামেরাটা নিতে ভোলেনি।

আমরা গেটের ভিতর সবে ঢুকেছি-এমন সময় একজন বেশ হাসিখুশি মোটাসোটা চশমা পরা পুলিশ -বোধহয় ইন্সপেক্টর-টিন্সপেক্টর হবেন -- ফেলুদাকে দেখেই এগিয়ে এসে ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'কিহে, ফেলুমাস্টার! - গন্ধে গন্ধে এসে জুটেছ দেখছি।'

ফেলুদা বেশ নরমভাবেই হেসে বলল, 'আর কি করি বলুন -আমাদের ত ওই কাজ!'

'কাজ বোল না। কাজটা ত আমাদের। তোমাদের হল শখ। তাই না?'

ফেলুদা একথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিছু কিনারা করতে পারলেন ? বার্গলারি কেস ?'

তাছাড়া আর কি ? তবে ভদ্রলোক খুব আপসেট। খালি মাথা চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন কাল এক বুড়ো নাকি এক ছোকরার সঙ্গে করে এঁর জিনিস দেখতে এসেছিল। এঁর ধারণা এই দুজনই নাকি আছে এই বার্গলারির পেছনে।'

আমার কথাটা শুনেই গলা শুকিয়ে গেল। সত্যি, ফেলুদা মাঝে মাঝে বড্ড বেপরোয়া কাজ করে ফেলে।

ফেলুদা কিন্তু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, 'তাহলে ত সেই বুড়োর সন্ধান করতে পারলেই চোর ধরা পড়বে। এ তো জলের মতো কেস।'

গোলগাল পুলিশটি বললেন, 'বেশ বলেছ -একেবারে খাঁটি উপন্যাসের গোয়েন্দার মত বলেছ -বাঃ !'

ভদ্রলোকের পারমিশন নিয়ে ফেলুদা আর আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতুলবাবুর দেখি আজও সেই বারান্দাতেই বসে আছেন। বুঝলাম তিনি এতই অন্যমনস্ক যে আমাদের দেখেও দেখতে পেলেন না।

'কোন ঘরটা থেকে চুরি হয়েছে দেখবে ?' মোটা পুলিশ জিজ্ঞেস করলো।

'চলুন না।'

কাল সন্ধেবেলা দোতলার যে ঘরটায় গিয়েছিলাম, আজও সেটাতেই যেতে হল। অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ফেলুদা সটান ঘরের দক্ষিণ দিকের ব্যালকনিটার দিকে চলে গেল। সেটা থেকে ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে বলল, 'হুঁ, পাইপ বেয়ে অনায়াসে ওঠে আসা যায়-তাই না ?'

মোটা পুলিশ বললেন, 'তা যায়। মুশকিল হচ্ছে কি -দরজার রং কাঁচা বলে ওটাকে আবার দুদিন থেকে বন্ধ করা হচ্ছিল না।

'ঠিক কখন হয়েছে চুরিটা ?'

'রাত পৌনে দশটা।'

'কে প্রথম টের পেল ?'

'এদের একটি পুরোন চাকর আছে, সে ওদিকের ঘরে বিছানা করছিল। একটা শব্দ পেয়ে দেখতে আসে। ঘর তখন অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর আগেই সে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সুযোগে চোর বাবাজী হাওয়া।'

ফেলুদার কপালে আবার সেই বিখ্যাত ভ্রুকুটি। বলল, 'একবার চাকরটার সঙ্গে কথা বলব।'

চাকরের নাম বংশলোচন। দেখলাম ঘুঁষির ধাক্কা ফলে তার এখনো যন্ত্রণা আর জ্বর -কোনটাই যায়নি। ফেলুদা বলল, 'কোথায় ব্যথা ?'

চাকরটা চিঁ চিঁ করে উত্তর দিল, 'তলপেটে।'

'তলপেটে ? ঘুঁষি তলপেটে মেরেছিল ?'

'সে কী হাতের জোর -বাপরে বাপ ! মনে হল যেন পেটে এসে একখানা পাথর লাগল। আর তার পরেই সব অন্ধকার।'

আওয়াজটা শুনলে কখন ? তখন তুমি কী করছিলে ?'

'টাইম ত দেখিনি বাবু। আমি তখন মায়ের ঘরে বিছানা করছি। দুটো ছেলে এসে কীর্তন গান করছিল তাই শুনেছিলাম। মা ঠাকরুণ ছিলেন পুজোর ঘরে ; বললেন ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে আয়। আমি যাব যাব করছি এমন সময় বাবুর ঘর থেকে খটখাট পড়ার মত একটা শব্দ পেলাম। ভাবলাম -কেউ ত নাই -ত জিনিস পড়ে কেন ? তাই দেখতে গেছি -আর ঘরে ঢুকতেই . . .'

বংশলোচন আর কিছু বলতে পারল না।

সব শুনে -টুনে বুঝলাম, আমরা চলে যাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চোর এসেছিল।

আমি ভাবলাম ফেলুদা বোধহয় আরো কিছু জিগ্যেস করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও আর কোন কথাই বলল না। সেই মোটা পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে রাস্তায় এসে ফেলুদার মুখের চেহারা একদম বদলে গেল। এ চেহারা আমি জানি। ফেলুদা কী জানি একটা রাস্তা দেখতে পেয়েছে, আর সে রাস্তা দিয়ে গেলেই রহস্যের সমাধানে পৌঁছন যাবে।

পাশ দিয়ে খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল, কিন্তু ফেলুদা থামাল না। আমরা দুজনে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদার দেখাদেখি আমিও ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে খুব বেশিদূর এগোতে পারলাম না। প্রতুলবাবু যে চোর নন সেটা ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদিও প্রতুলবাবুকে বেশ জোয়ান লোক বলে মনে হয়, আর ওঁর গলার আওয়াজটা বেশ ভারি। কিন্তু তাও এঁর কিছুতেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না যে, প্রতুলবাবু একটা বাড়ির পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠতে পারেন। তার জন্য যেন আরো অনেক কম বয়সের লোকের দরকার ; তাহলে চোর কে ? আর ফেলুদা কেন জিনিসটার কথা এত মন দিয়ে ভাবছে ?

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখি আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে এসে পড়েছি। ফেলুদা পাঁচিলটা বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

কিছুদূর গিয়ে পাঁচিলটা বাঁ দিকে ঘুরেছে। ফেলুদাও ঘুরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও। এদিকে রাস্তা নেই, ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। মোড় ঘুরে আঠার কি উনিশ পা হাঁটার পর ফেলুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে পাঁচিলের একটা বিশেষ অংশের দিকে খুব মন দিয়ে দেখল। তারপর সেই জায়গাটার খুব কাছ থেকে একটা ছবি তুলল। আমি দেখলাম সেখানে একটা ব্রাউন রঙের হাতের ছাপ রয়েছে। পুরো হাত নয় - দুটো আঙুল আর তেলোর খানিকটা অংশ - কিন্তু তা থেকেই বোঝা যায় যে সেটা বাচ্চা ছেলের হাত।

এবার আমরা যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরে গিয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা একেবারে বাড়ির দিকে চলে গেলাম।

খবর পাঠাতেই নীলমণিবাবু বেশ ব্যস্ত হয়ে নীচে চলে এলেন। আমরা তিনজনেই বৈঠকখানায় বসার পর নীলমণিবাবু বললেন, 'আপনি শুনলে কী বলবেন জানি না, তবে আমার মনটা আজ কালকের চেয়ে কিছুটা হালকা। আমার মত দুর্দশা যে অন্যেরজনেরও হয়েছে, সেটা জেনে খানিকটা কষ্টের লাঘব হচ্ছে। কিন্তু তাও একটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া অবধি কষ্ট যাবে না-কোথায় গেল আমার আনুবিস ? বলুন। আপনি এত বড় ডিটেকটিভ - দুটো দুটো ডাকাতি দুদিন উপরি উপরি হয়ে গেল আর আপনি এখনো যেই তিমিরে সেই তিমিরেই ?'

ফেলুদা একটা প্রশ্ন করে ফেলল।

'আপনার ভাগ্নেটি কেমন আছে ?'

'কে, ঝুন্টু ? ও আজ অনেকটা ভালো। ওষুধে কাজ দিয়েছে। আজ জ্বরটা অনেক কমে গেছে।'

'আচ্ছা -বাইরের কোন ছেলেটেলে কি পাঁচিল টপকে এখানে আসে ? ঝুন্টুর সঙ্গে খেলতে-টেলতে ?'

'পাঁচিল টপকে ? কেন বলুন ত ?

'আপনার পাঁচিলের বাইরের দিকটায় একটা বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ দেখছিলাম।'

'ছাপ মানে ? কিরকম ছাপ ?'

'ব্রাউন রঙের ছাপ।'

'টাটকা ?'

'বলা মুশকিল - তবে খুব পুরোন নয়।'

'কই, আমি ত কোনদিন কোন বাচ্চাকে আসতে দেখিনি। বাচ্চা বলতে এক আসে -তাও সেটা পাঁচিল টপকে নয় - একটা ছোকরা ভিখারি। দিব্যি শ্যামাসংগীত গায়। তবে হ্যাঁ -আমার বাগানের পশ্চিম দিকে একটা জামরুল গাছ আছে। মধ্যে মধ্যে বাইরের ছেলে পাঁচিল টপকে এসে সে গাছের ফল পেড়ে খায় না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।'

'হুঁ...'

নীলমণিবাবু এবার জিগ্যেস করলেন, 'চোরের বিষয় আর কিছু জানতে পারলেন কি ?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

'লোকটার হাতের জোর সাংঘাতিক। এক ঘুষিতে প্রতুলবাবুর চাকরকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।'

'তাহলে এচুরি-ওচুরি এক চোরই করেছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'হতে পারে। তবে গায়ের জোরটা এখানে বড় কথা বলে আমার মনে হয় না। একটা বীভৎস বুদ্ধিরও ইঙ্গিত যেন পাওয়া যাচ্ছে।'

নীলমণিবাবু যেন মুষড়ে পড়লেন। বললেন, 'আশা করি সে বুদ্ধিকে জব্দ করার মত বুদ্ধি আপনার আছে! না হলে ত আমার মূর্তি ফিরে পাবার আশা ছাড়তে হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আরো দুটো দিন অপেক্ষা করুন। এখন পর্যন্ত কখনো ফেলু মিত্তিরের ডিফিট হয়নি।'

নীলমণিবাবুর বাড়ির গাড়িবারান্দা থেকে গেট অবধি নুড়ি পাথর দেওয়া রাস্তা। সেটার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি তখন একটা খট্‌ খট্‌ শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি নীলমণিবাবুর বাড়ির দোতলার একটা ঘরের জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট ছেলে -ঝুন্টুই বোধহয় - জানালার খড়খড়িতে হাত দিয়ে টোকা মারছে।

আমি বললাম, 'ঝুন্টু।'

ফেলুদা বলল, 'দেখেছি।'

সারা দুপুর ফেলুদা তার নীল খাতায় অভ্যাসমত গ্রীক অক্ষরে কী সব হিজিবিজি লিখল। আমি জানি ভাষাটা আসলে ইংরিজি, কিন্তু অক্ষরগুলো গ্রীক, যাতে আর কেউ পড়ে মানে বুঝতে না পারে। আমার সঙ্গে ওর কথা একেবারেই বন্ধ, তবে সেটা এক হিসেবে ভালো ; এখন ওর ভাববার সময়, কথা বলার সময় নয়। মাঝে মাঝে শুনছিলাম ও গুন গুন করে গান গাইছে। এটা সেই ভিখিরি ছেলেটার গাওয়া রামপ্রসাদী গানটা।

বিকেলে পাঁচটা নাগাৎ চা খেয়ে ফেলুদা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি ; গণুদার কোটো থেকে আমার ছবির এনলার্জমেন্টগুলো নিয়ে আসতে হবে।'

আমি একাই বাড়িতে রয়ে গেলাম।

দিন ছোট হয়ে আসছে। তাই সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সূর্য ডুবে অন্ধকার হয়ে এলো। গণুদার ফোটো দোকানটা হাজরা রোডের মোড়ে। ফেলুদার ছবি নিয়ে ফিরে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগা উচিত না। তবে এত দেরী হচ্ছে কেন ? অবিশ্যি অনেক সময় ছবি তৈরী না হলে দোকানে বসিয়ে রাখে। আশা করি অন্য কোথাও যায়নি ও। আমাকে ফেলে ঘোরাঘুরিটা আমার ভালো লাগে না।

একটা করতালের আওয়াজ কানে এলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চেনা গলায় সেই গান -

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা . . .

সেই ছেলে দুটো। আজ আমাদের পাড়ায় ভিক্ষে করতে এসেছে।

গান ক্রমে এগিয়ে এলো। আমি আমাদের ঘরের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে রাস্তাটা দেখা যায়। ওই যে ছেলে দুটো - একজন গাইছে, একজন করতাল বাজাচ্ছে। কী সুন্দর গলা ছেলেটার।

এবারে গান থামিয়ে ছেলেটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ করে বলল, 'মা দুটি ভিক্ষে দেবে মা ?'

কী মনে হল, আমার ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ নয়া বার করে জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে ফেলে দিলাম। ঠিং শব্দ করে পয়সাটা মাটিতে পড়ল। দেখলাম ছেলেটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝোলার মধ্যে পুরে আবার গান গাইতে গাইতে হাঁটতে শুরু করল।

একটা ব্যাপারে আমার মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে গেল। যদিও আমাদের রাস্তাটা বেশ অন্ধকার, তবু ভিখিরি ছেলেটা যখন ওপর দিকে মুখ করে ভিক্ষে চাইল তখন যেন মনে হল তার মুখের সঙ্গে ঘুণ্টুর একটা আশ্চর্য মিল আছে। হয়ত এটা আমার দেখার ভুল, কিন্তু তাতে মনের মধ্যে কেমন খটকা লাগতে লাগল। আমি ঠিক করলাম ফেলুদা এলেই কথাটা ওকে বলব।

প্রায় সাড়ে ছটার সময় মেজাজ বেশ গরম করে ফেলুদা এনলার্জমেন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরল ; যা ভেবেছিলাম তাই, ওকে দোকানে বসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বলল, 'এবার থেকে নিজেই একটা ডার্করুম তৈরী করে ছবি ডেভেলপিং-প্রিন্টিং করব। বাঙালী দোকানের কথার কোন ঠিক নেই।'

ফেলুদা যখন ওর বিছানার ওপর ছবিগুলো বিছিয়ে বসেছে, তখন আমি, ওকে গিয়ে ভিখিরি ছেলেটার কথা বললাম। ও কিন্তু একটুও অবাক না হয়ে বলল, 'সেটা আর আশ্চর্য কী ?'

'আশ্চর্য না ?'

'উহু।'

'কিন্তু তাহলে ভীষণ গন্ডগোল বলতে হবে।'

'গন্ডগোল ত বটেই ; সেটা ত আমি প্রথম থেকেই বুঝেছি।'

'তুমি বলতে চাও যে ওই ছেলেটা চুরির ব্যাপারে জড়িত ?'

'হতেও পারে।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের বুদ্ধির এত জোর যে একটা ধেড়ে লোককে অজ্ঞান করে দেবে ?'

'বাচ্চা ছেলে বুদ্ধি খেলেছে তা ত বলিনি।'

'তাও ভালো !'

যদিও ভালো বললাম, কিন্তু আসলে মোটেই ভালো লাগছিল না। ফেলুদাও যে কেন পরিষ্কার করে কিছু বলছে না তা জানি না।

খাটের উপর বিছনো বারোটা ছবির মধ্যে দেখলাম একটা ছবি ফেলুদা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছে ; কাছে গিয়ে দেখি সেটা আজই

সকালে তোলা নীলমণিবাবুর পাঁচিলে থাকা ছেলের হাতের পাঞ্জার ছবিটা। এনলার্জমেন্টের ফলে হাতের ছাপটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বললাম, 'তুমি ত বল হাত দেখতে জান – বল ত ছেলেটার কত আয়ু।'

ফেলুদা কোন উত্তর দিল না। সে তন্ময় হয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে আছে। লক্ষ করলাম যে তার মধ্যে একটা দারুণ কনসেনট্রেশনের ভাব।

'কিছু বুঝতে পারছিস?'

হঠাৎ ওর প্রশ্নটা আমাকে একেবারে চমকে দিল।

'কী বুঝব?'

'সকালে কী বুঝেছিলি, আর এখন কী বুঝলি – বল ত।'

'সকালে? মানে, যখন ছবিটা তুললে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আর বুঝব? বাচ্চা ছেলের হাত -এ ছাড়া আর কী বোঝার আছে?'

'ছাপের রংটা দেখে কিছু মনে হয় নি?

'রং ত ব্রাউন ছিল।'

'তার মানে কী?'

'তার মানে ছেলেটার হাতে ব্রাউন রঙের কিছু একটা লেগেছিল।'

'কিছু মানে কী? ঠিক করে বল।'

'পেন্ট হতে পারে।'

' কোথাকার পেন্ট?'

'কোথাকার পেন্ট . . . কোথাকার . . . ?'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

'প্রতুলবাবুর ঘরের দরজার রং!'

'এগজ্যাক্টলি। সেদিন তোরও সার্টের বাঁ দিকের আস্তিনে লেগেছিল। এখনো গিয়ে দেখতে পারিস লেগে আছে।'

'কিন্তু'-আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল, ' -যার হাতের ছাপ, সেই কি প্রতুলবাবুর ঘরে ঢুকেছিল?

'হতেও পারে। এখন বল - ছবি দেখে কী বুঝছিস।'

আমি অনেক ভেবেও নতুন কিছু বোঝার কথা বলতে পারলাম না।

ফেলুদা বলল, 'তুই পারলে আশ্চর্য হতাম। শুধু আশ্চর্য হতাম না — শক্ পেতাম। কারণ তাহলে বলতে হোত তোর আর আমার বুদ্ধিতে কোন তফাৎ নেই।

'তোমার বুদ্ধিতে কী বলছে?'

'বলছে যে এটা একটা সাংঘাতিক কেস। ভয়াবহ ব্যাপার। আনুবিস যেরকম ভয়াবহ — এই রহস্যটাও তেমনি ভয়াবহ।'

পরদিন সকালে ফেলুদা প্রথম নীলমণি সান্যালকে ফোন করল।

'হ্যালো-কে, মিস্টার সান্যাল? . . . আপনার রহস্য সমাধান হয়ে গেছে . . . মূর্তি এখনো হাতে আসেনি, তবে কোথায় আছে মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছি . . . আপনি কি বাড়ি আছেন? . . . অসুখ বেড়েছে? . . . কোন হসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন . . . ও, আচ্ছা। তাহলে পরে দেখা হবে . . .'

ফোনটা রেখেই ফেলুদা চট্ করে আরেকটা নম্বর ডায়াল করল। ফিস্ ফিস্ করে কী কথা হল সেটা ভালো শুনতে পেলাম না – তবে ফেলুদা যে পুলিশে টেলিফোন করছে সেটা বুঝলাম। ফোনটা রেখেই ও আমাকে বলল, 'এক্ষুনি বেরোতে হবে—তৈরী হয়ে নে।'

একে সকালে ট্রাফিক কম, তার উপর ফেলুদা আবার ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল টপ স্পীডে যেতে। দেখতে দেখতে আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির রাস্তায় এসে পড়লাম।

গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, তখন দেখি নীলমণিবাবু তাঁর কালো অ্যাম্বাসাডরে বেরিয়ে বেশ স্পীডের মাথায় আমরা যেদিকে যাচ্ছি তার উলটো দিকে রওনা দিলেন। সামনে ড্রাইভার আর পিছনে নীলমণিবাবু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

'ফলো করো' - ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। ট্যাক্সি ড্রাইভারও কিরকম এক্সাইটেড হয়ে অ্যাক্সিলারেটরে পা চেপে দিল। সামনের গাড়িটা দেখলাম বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ করে ডান দিকে মোড় নিচ্ছে।

এইবার ফেলুদা যে জিনিসটা করল সেটা এর আগে কক্ষনো করেনি।

কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হঠাৎ তার রিভলবারটা বার করে গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনের টায়ারের দিকে অব্যর্থ টিপ করে রিভলভারটা মারল।

প্রায় একই সঙ্গে রিভলভারের আর টায়ার ফাটার শব্দে কানে তালা লেগে গেল। দেখলাম নীলমণিবাবুর গাড়িটা বিশ্রী ভাবে রাস্তার একপাশে কেতরে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমাদের গাড়িটা নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনে থামতেই দেখি উল্টোদিক থেকে পুলিশের জীপ এসেছে।

এদিকে নীলমণিবাবু গাড়ি থেকে নেমে এসে ভীষণ বিরক্ত মুখ করে এদিক ওদিক চাইছেন।

ফেলুদা আর আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

পুলিশের জীপটাও কাছাকাছি এসে থেমেছে; দেখলাম সেটা থেকে নামলেন সেই মোটা অফিসারটি।

নীলমণিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসব কী হচ্ছে কী?'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কে আছে জানতে পারি কী?'

'কে আবার থাকবে?' ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন। 'বললাম ত আমি আমার ভাগনেকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি।'

ফেলুদা এবার আর কিছু না বলে সোজা গিয়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে একটানে দরজাটা খুলে ফেলল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে গাড়ি থেকে তীরের মত বেরিয়ে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুঁটি টিপে ধরল! কিন্তু ফেলুদা ত শুধু যোগব্যায়াম করে না? ও রীতিমত যুযুৎসু আর কারাটে শিখেছে। ছেলেটার কবজি দুটো ধরে উল্টে তাকে অদ্ভুত কায়দায় মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আছাড় মেরে রাস্তায় ফেলল। যন্ত্রণার চোটে একটা চিৎকার ছেলেটার মুখ দিয়ে বেরোল, আর সে চিৎকার শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেল!

কারণ সেটা মোটেই বাচ্চার গলা নয়।

সেটা একটা বয়স্ক লোকের বিকট হেঁড়ে গলার চিৎকার!

এই গলাই সেদিন আমি টেলিফোনে শুনেছিলাম!

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে নীলমণিবাবুর গাড়ির ড্রাইভার আর 'বাচ্চাটাকে' ধরে ফেলল।

ফেলুদা তার জামার কলারটা ঠিক করতে করতে বলল, 'পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ দেখেই ধরেছিলাম। অল্প বয়সের ছেলেদের হাতে এত লাইন থাকে না। তাঁদের হাত অনেক মসৃণ থাকে। অথচ সাইজ যখন ছোট্ট, তখন তার একটাই মানে হতে পারে। এটা আসলে একটা বেঁটে বামনের হাতের ছাপ। বাচ্চাটা আসলে আর কিছুই না - একটি জোয়ান। কত বয়স হল আপনার ভাগনের, নীলমণিবাবু?'

'চল্লিশ!' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে ভালো করে আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

'খুব খুঁত রয়েছেন যা হোক। আগে জিনিস চুরির মিথ্যে ফন্দিটা খাড়া করে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, তারপর নিজেই লোক লাগিয়ে পরের জিনিস চুরি করছেন। আপনার বাড়িতে কাল যাকে দেখলাম সে কি সেই ভিখারী ছেলেটি?'

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'তার মানে আপনার ভাগনে বলে আসলে কেউ নেই। ওকে বাড়িতে এনে ধরে রেখেছেন এই চুরির ব্যাপারে হেল্প করার জন্য?'

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলেন।

ফেলুদা বলে চলল, 'ছেলেটা গান গাইত আর বামনটা খঞ্জনী বাজাত। কেবল চুরির টাইম এলে খঞ্জনীটা ভিখারীর হাতে দিয়ে যেত, এবং তখন সে-ই বাজাতে থাকত। বামন বলেই তার গায়ের জোরের অভাব নেই। এক ঘুষিতে একজন জোয়ান লোককে ঘায়েল করতে পারে। ওয়াণ্ডারফুল! আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মিশরের প্রাচীন জিনিসের উপর একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। প্রচুর পড়াশুনা করেছি এই নিয়ে। সাধে কি প্রতুল দত্তের উপর হিংসা হয়েছিল।'

ফেলুদা বলল, 'অতি লোভে শুধু তাঁতিই নষ্ট হয় না, বামুনও হয়।
কারণ আপনার এই বেঁটেটিও বামুন, আর আপনি সান্যাল – একেবারে উচ্চ শ্রেণীর বামুন! . . . যাকগে – এবার একটা শেষ অনুরোধ আছে।'

'কী?'

'আমার রিওয়ার্ডটা।'

নীলমণিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'রিওয়ার্ড!'

'আনুবিসের মূর্তিটা আপনার কাছেই আছে বোধহয়?'

ভদ্রলোক কেমন যেন বোকার মত ডান হাতটা নিজের পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

হাতটা বার করতে দেখলাম তাতে রয়েছে এক বিঘত লম্বা কালো পাথরের উপর রঙীন মণিমুক্তা বসানো চার হাজার বছরের পুরোন মিশর দেশের শেয়ালমুখী দেবতা আনুবিসের মূর্তি।

ফেলুদা হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

* * * * *

সমাদ্দারের চাবি

॥ ১ ॥

ফেলুদা বলল, 'এই যে গাছপালা মাঠবন দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কী জানিস ? কারণ, আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমে শহর থেকে লোপাট হতে চলেছে, তাই শহর ছেড়ে বেরোলেই চোখটা আরাম পায়, আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়ে ওঠে। যত চোখের ব্যারাম দেখবি শহরে। পাড়াগাঁয়ে যা, কি পাহাড়ে যা, দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার।'

আমি জানি ফেলুদার নিজের চোখ খুব ভাল, তার চশমা লাগে না, সে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে, যদিও সে কোনওদিন গ্রামে-টামে থাকেনি। এটা ওকে বলতে পারতাম, কিন্তু যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তাই আর বললাম না। আমাদের সঙ্গে মণিবাবু রয়েছেন, মণিমোহন সমাদ্দার, তাঁর চোখে পুরু মাইনাস পাওয়ারের চশমা। তিনিও অবিশ্যি শহরের লোক। বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, বেশ ফরসা রং, নাকটা যাকে বলে টিকোলো, কানের কাছে চুলগুলো পাকা। মণিমোহনবাবুর ফিয়াট গাড়িতেই আমরা যশোর রোড দিয়ে চলেছি বামুনগাছি। কেন যাচ্ছি সেটা এই বেলা বলা দরকার।

গতকাল ছিল রবিবার। পুজোর ছুটি সবে আরম্ভ হয়েছে। আমরা দুজনে আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছি। আমি খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখছি, আর ফেলুদা একটা সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে বই খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। আমি লক্ষ

করছি সে কখনও আপন মনে হেসে আর কখনও ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে ভাল লাগা আর অবাক হওয়াটা বোঝাচ্ছে। বইটা ডক্টর ম্যাট্রিক্স সম্বন্ধে। ফেলুদা বলছিল এই ডক্টর ম্যাট্রিক্সের মতে মানুষের জীবনে সংখ্যা বা নম্বর জিনিসটা নাকি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনার পিছনেই নাকি খুঁজলে নানারকম নম্বরের খেলা আবিষ্কার করা যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হত না যদি না ফেলুদা বইটা থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিত। বলল, 'ডক্টর ম্যাট্রিক্সের একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শোন। আমেরিকার দুজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছিল জানিস তো?'

'লিঙ্কন আর কেনেডি?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা এই দুজনের নামে ক'টা করে অক্ষর?'

'L-I-N-C-O-L-N — সাত। K-E-N-N-E-D-Y — সাত।'

'বেশ। এখন শোন্ — লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হন ১৮৬০ সালে, আর কেনেডি হন ১৯৬০ সালে — ঠিক একশো বছর পরে। দুজনেই খুন হন শুক্রবার। খুনের সময় দুজনেরই স্ত্রী পাশে ছিল। লিঙ্কন খুন হন থিয়েটারে; সে থিয়েটারের নাম ছিল ফোর্ড। কেনেডি খুন হন মোটর গাড়িতে। সেটা ফোর্ড কোম্পানির তৈরি গাড়ি! গাড়িটার নাম ছিল লিঙ্কন। লিঙ্কনের পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হন তাঁর নাম ছিল জনসন, অ্যানড্রু জনসন। কেনেডির পরে প্রেসিডেন্ট হন লিন্ডন জনসন। প্রথম জনের জন্ম ১৮০৮, দ্বিতীয় জনের জন্ম ১৯০৮ — ঠিক একশো বছর পর। লিঙ্কনকে যে খুন করে তার নাম জানিস?'

'জানতাম, ভুলে গেছি।'

'জন উইল্‌কস বুথ। তার জন্ম ১৮৩৯ সালে। আর কেনেডিকে খুন করে লী হারভি অসওয়াল্ড। তার জন্ম ঠিক একশো বছর পরে — ১৯৩৯। এইবারে নাম দুটো আরেকবার লক্ষ কর। John Wilkes Booth — Lee Harvey Oswald — ক'টা করে অক্ষর আছে নামে?'

অক্ষর গুনে থ' হয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'দুটোতেই পনেরো!'

ফেলুদা হয়তো ডক্টর ম্যাট্রিক্সের তাজ্জব আবিষ্কারের বিষয়ে আরও কিছু বলত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হল মণিমোহন সমাদ্দার। ভদ্রলোক নিজের পরিচয়-টরিচয় দিয়ে সোফায় বসে বললেন, 'আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি — লেক প্লেসে।'

ফেলুদা 'ও' বলে চুপ করে গেল। আমি ভদ্রলোককে আড়চোখে দেখছি। গায়ে একটা হালকা রঙের বুশশার্ট আর ব্রাউন প্যান্ট, পায়ে বাটার স্যান্ডাক জুতো। ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে গলা খাঁকরিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো আমার কাকার নাম শুনে থাকবেন, রাধারমণ সমাদ্দার।'

'এই সেদিন যিনি মারা গেলেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। 'যাঁর খুব গান বাজনার শখ ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অনেক বয়স হয়েছিল না?'

'বিরাশি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে পড়ছিলাম। অবিশ্যি মৃত্যু সংবাদটা পড়ার আগে তাঁর নাম শুনেছিলাম বললে মিথ্যে বলা হবে।'

'সেটা কিছুই আশ্চর্য না। উনি যখন গান বাজনা ছেড়েছেন তখন আপনি নেহাতই ছেলেমানুষ। প্রায় পনেরো বছর হল রিটায়ার করে বামুনগাছিতে বাড়ি করে সেখানেই চুপচাপ বসবাস করছিলেন। আঠারোই সেপ্টেম্বর সকালে হার্ট অ্যাটাক হয়। সেইদিন রাত্রে মারা যান।'

'আই সি।'

ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ। ফেলুদা তার বাঁ পা-টা ডান পায়ের উপর তুলে বসেছিল, এই ফাঁকে ডান পা-টা বাঁ পায়ের উপরে তুলে দিল। মিস্টার সমাদ্দার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন লোকটা কী বলতে এল। আসলে ব্যাক-গ্রাউন্ডটা একটু না দিয়ে দিলে...।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' ফেলুদা বলে উঠল। 'আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। টেক ইওর টাইম।'

মণিমোহনবাবু বলতে লাগলেন, 'আমার কাকা ঠিক সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ওঁর পেশা ছিল ওকালতি, এবং তাতে রোজগারও করেছেন যথেষ্ট। বছর পঞ্চাশেক বয়সে সেটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে চলে যান। শুধু গাইতেন না, সাত আট রকম দিশি বিলিতি যন্ত্র বাজাতে পারতেন। সেতার বেহালা পিয়ানো হারমোনিয়াম বাঁশি তবলা এবং এ ছাড়াও আরও কয়েকটা। তার উপরে সংগ্রহের বাতিক ছিল। ওঁর বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম করে ফেলেছিলেন।'

'কোন বাড়িতে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতেই শুরু হয়, তারপর সে সব যন্ত্র বামুনগাছির বাড়িতে নিয়ে যান। যন্ত্রের সন্ধানে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গেছেন। বম্বেতে একবার এক ইটালিয়ান জাহাজির কাছ থেকে একটা বেহালা কেনেন, সেটা কলকাতায় এনে কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রি করে দেন ত্রিশ হাজার টাকায়।'

ফেলুদা একবার আমাকে বলেছিল ইটালিতে প্রায় তিনশো বছর আগে দু'তিনজন লোক ছিল যাদের তৈরি বেহালার এমন কয়েকটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে আজকের দিনে সেগুলোর দাম প্রায় লাখ টাকায় পৌঁছে গেছে।

সমাদ্দার মশাই বলে চললেন, 'এই সব গুণের পাশে কাকার একটা মস্ত দোষ ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। এই যে শেষ বয়সে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, তার একটা প্রধান কারণ হল তাঁর কৃপণতা।'

'আত্মীয় বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে?'

'এখন আর বিশেষ কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিছু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। আমার কাকারা ছিলেন চার ভাই, দুই বোন। বোনেরা মারা গেছেন। ভাইয়ের মধ্যে কাকাকে নিয়ে তিনজন মারা গেছেন, আর একজন জীবিত কি মৃত জানা নেই। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর আগে সংসার ছেড়ে চলে যান। রাধারমণ

নিজে বিপত্নীক ছিলেন ; একটি ছেলে ছিল, মুরলীধর, তিনিও প্রায় পঁচিশ বছর হল মারা গেছেন। তাঁর ছেলে ধরণীধর হল কাকার একমাত্র নাতি। ছেলেবেলায় সে কাকার খুবই প্রিয় ছিল। শেষটায় পড়াশুনোয় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন নাম বদলে থিয়েটারে ঢুকল, তখন থেকে কাকা আর তার মুখ দেখেননি। এই হল আত্মীয়।'

'ধরণীধর বেঁচে আছেন ?'

'হ্যাঁ। সে এখন থিয়েটার ছেড়ে যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। কাকার মৃত্যুর পর তার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু সে কলকাতায় নেই। দলের সঙ্গে কোনও অজ পাড়াগাঁয়ে ট্যুরে বেরিয়েছে। ওর বেশ নামটাম হয়েছে। গান বাজনাতেও ট্যালেন্ট ছিল, যে কারণে কাকা ওকে ভালবাসতেন।'

মণিমোহনবাবু হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করলেন। তারপর আবার বলে চললেন—

'আমার সঙ্গে কাকার যে খুব একটা যোগাযোগ ছিল তা নয়। বড়জোর দু'মাসে একবার দেখা হত। ইদানীং আরও কম। আসলে, আমার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে, ইউরেকা প্রেস, তাতে এই গত ক'মাস লোডশেডিং নিয়ে খুব ভুগতে হচ্ছে। কাকার হার্ট অ্যাটাকটা হওয়াতে ওঁর প্রতিবেশী অবনীবাবু আমাকে টেলিফোন করে খবর দেন, আমি তৎক্ষণাৎ চিন্তামণি বোসকে নিয়ে চলে যাই। যখন পৌঁছই তখন জ্ঞান ছিল না। মারা যাবার ঠিক আগে জ্ঞান হয়। আমাকে দেখে মনে হল চিনলেন। দু'একটা ভাঙা ভাঙা কথাও বললেন — ব্যস্ — তারপরেই শেষ।'

'কী বললেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। সে এখন আর পায়ের উপর পা তুলে নেই ; চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে বসেছে।

'প্রথমে বললেন — "আমার...নামে"। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁট নড়ছে, কথা নেই। শেষে অনেক কষ্টে দু'বার বললেন—"চাবি...চাবি..."। ব্যস্।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে মণিমোহনবাবুর দিকে। বলল, 'কী বলতে চাচ্ছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি ?'

'প্রথম অংশ শুনে মনে হয় ওঁর নামে যে কৃপণ বলে অপবাদ

ঘটেছিল সেটার বিষয় কিছু বলতে চাইছেন। আমার ধারণা ওঁর মনে একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল ; কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওই চাবি। কীসের চাবির কথা বলছেন কিছুই বোঝা গেল না। ঘরে একটা আলমারি আর একটা সিন্দুক ছিল। তার চাবি ওঁর খাটের পাশের টেবিলের দেরাজে থাকত। বাড়িতে ঘর মাত্র তিনটে, আর একটা বাথরুম, সেটা শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। অন্তত চাবি লাগে এমন জিনিস তো নেই বললেই চলে। দরজায় যে তালা ব্যবহার করতেন, সেটা একরকম জার্মান তালা, তাতে চাবির দরকার হয় না, নম্বরের কম্বিনেশনে খুলতে হয়।'

'সিন্দুক আর আলমারিতে কী ছিল ?'

'আলমারির তাকে কিছু জামা কাপড় ছিল আর দেরাজে কিছু কাগজপত্র। দরকারি কিছুই না। আর সিন্দুক ছিল একেবারে খাঁ খাঁ খালি।'

'টাকা পয়সা ?'

'নাথিং। নট এ পাইস! টেবিলের দেরাজে কিছু খুচরো পয়সা ছিল, আর বালিশের নীচে একটা বটুয়াতে কিছু দু'টাকা পাঁচ টাকার নোট। ব্যস্। বটুয়া থেকে নাকি সংসারের জন্য টাকা বার করে দিতেন। অন্তত চাকর অনুকূল তাই বলে।'

'কিন্তু সেও তো বলছেন সামান্য টাকা। সেটা ফুরিয়ে গেলে অন্য কোথাও থেকে বার করতে হত নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কি বলতে চান উনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না ?'

মণিমোহনবাবু হেসে বললেন, 'তাই যদি রাখবেন তা হলে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তফাতটা হবে কোথায় ? এককালে রাখতেন, তবে বছর পঁচিশেক আগে একটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় উনি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকে আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখেননি। অথচ — ' মণিবাবু গলার স্বর নামিয়ে নিলেন — 'আমি জানি ওঁর বিস্তর টাকা ছিল! এবং সেটা যে বাড়ি তৈরি করার পরেও ছিল সেটা তাঁর দুষ্প্রাপ্য বাজনার কালেকশন দেখলেই

বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া উনি নিজের পিছনে বেশ ভালই খরচ করতেন। ভাল খেতেন, বাড়িতে ভাল বাগান করেছিলেন, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অস্টিন গাড়িও কিনেছিলেন; মাঝে মাঝে বেরোতেন, শহরে আসতেন। কাজেই...'

ফেলুদা পকেট থেকে চারমিনার বার করেছে। মণিমোহনবাবুকে অফার করে দেশলাই ধরিয়ে দিল। ভদ্রলোক বেশ ভাল করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করেছেন কেন আপনার কাছে এসেছি। এতগুলো টাকা — সব গেল কোথায়? কোন চাবির কথা বলছিলেন কাকা? সে চাবি দিয়ে কোন জিনিসটা খুললে কী পাওয়া যাবে? সেটা কি টাকা, না অন্য কিছু? যদি উইল থেকে থাকে তা হলে সেটা তো পাওয়া দরকার। উইল না থাকলে অবিশ্যি টাকা নাতিই পাবে, কিন্তু তার আগে টাকাটা তো পেতে হবে। আপনার বুদ্ধির অনেক তারিফ শুনেছি। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন...'

মণিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল যে পরদিনই সকালে আমরা বামুনগাছি যাব। ওঁর গাড়ি আছে, উনি নিজেই সকাল সাতটায় এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন। আমি বুঝেছি যে ফেলুদার কাছে এটা একটা নতুন ধরনের রহস্য। রহস্য না বলে হেঁয়ালিও বলা যেতে পারে।

অন্তত গোড়াতে তাই মনে হয়েছিল। শেষে দেখলাম হেঁয়ালির চেয়েও অনেক বেশি গোলমেলে প্যাঁচালো একটা কিছু।

॥ ২ ॥

বারাসত ছাড়িয়ে একটা রাস্তা যশোর রোড থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে বামুনগাছির দিকে গেছে। সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান থেকে মণিমোহনবাবু আমাদের চা আর জিলিপি কিনে খাওয়ালেন। তাতে পনেরো মিনিট গেল, তা না হলে আমরা আটটার মধ্যেই বামুনগাছি পৌঁছে যেতাম।

গোলাপি রঙের পাঁচিল আর ইউক্যালিপটাস গাছে ঘেরা সাত

বিঘে জমির উপর রাধারমণ সমাদ্দারের একতলা বাড়ি। যে লোকটা এসে গেট খুলে দিল সে বোধহয় মালি, কারণ তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিল। গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজের ভিতর একটা পুরনো কালো গাড়ি রয়েছে। সেটাই বুঝলাম রাধারমণ সমাদ্দারের অস্টিন।

গাড়ি থেকে নামতেই একটা ঠাঁই শব্দ শুনে বাগানের দিকে ফিরে দেখি নীল হাফপ্যান্ট পরা আট-দশ বছরের একটি ছেলে হাতে একটা এয়ারগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মণিমোহনবাবু তাকে বললেন, 'তোমার বাবা বাড়িতে আছেন? তাঁকে গিয়ে বলো তো যে মণিবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন, একবার ডাকছেন।'

ছেলেটি বন্দুকে ছররা ভরতে ভরতে চলে গেল। ফেলুদা বলল, 'প্রতিবেশীর ছেলে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর বাবা অবনী সেনের একটা ফুলের দোকান আছে নিউ মার্কেটে। এখানে পাশেই ওঁর বাড়ি, তার সঙ্গে ওঁর নার্সারি। মাঝে মাঝে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকেন।'

ইতিমধ্যে একজন বুড়ো চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। মণিবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ বাড়িটার যদ্দিন না একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন অনুকূল এখানেই থাকছে। প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো চাকর। অনুকূল, এঁদের জন্য একটু সরবতের ব্যবস্থা করো তো।'

চাকর মাথা হেঁট করে 'হ্যাঁ' বলে চলে গেল, আমরা তিনজন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা খোলা জায়গা। সেটাকে ঘর বলা মুশকিল, কারণ মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাতিটাতিও নেই কারণ এদিকটায় ইলেকট্রিসিটিই নেই। আমাদের সামনেই একটা দরজা রয়েছে, মণিবাবু সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, এই হল সেই জার্মান তালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরেই

কিনতে পাওয়া যেত। এর নাম হল এইট-টু-নাইন-ওয়ান।'

গোল তালা, তাতে চাবির গর্ত-টর্ত নেই, তার বদলে আছে চারটে খাঁজ। প্রত্যেকটা খাঁজের পাশে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে, আর প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট হুকের মতো জিনিস বেরিয়ে আছে। এই হুকগুলোকে খাঁজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঠেলে সরানো যায়, আর দরকার হলে যে-কোনও একটা নম্বরের পাশে বসিয়ে দেওয়া যায়। কোনটাকে কোন নম্বরে বসাতে হবে না জানলে তালা খোলা অসম্ভব।

মণিবাবু বাঁ দিকের খাঁজ থেকে শুরু করে হুকগুলোকে পর পর ৮, ২, ৯ আর ১ নম্বরে ঠেলে দিতেই খড়াৎ শব্দ করে ম্যাজিকের মতো তালাটা খুলে গেল। মণিবাবু বললেন, 'বন্ধ করাটা আরও সহজ। তালাটা লাগিয়ে যে-কোনও একটা হুক নম্বর থেকে একটু সরিয়ে দিলেই লক্।'

আমরা তিনজন রাধারমণ সমাদ্দারের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা বেশ বড়। তাতে মণিবাবু যা যা বলেছিলেন সবই আছে, কিন্তু বাজনা যে এতরকম আছে সেটা ভাবতেই পারিনি। তার কিছু রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা লম্বা শেল্‌ফের তিনটে তাকের উপর, কিছু পুবদিকের দেয়ালের সামনে একটা লম্বা বেঞ্চির উপর, কিছু ঝুলছে দেয়ালের হুক থেকে, আর কিছু রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের উপর। এ ছাড়া ঘরে যা আছে তা হল খাট, খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল, উত্তর দিকের দেয়ালের সামনে একটা আলমারি। আর এক কোণে একটা ছোট সিন্দুক। খাটের তলায় একটা ছোট ট্রাঙ্ক চোখে পড়ল।

ফেলুদা প্রথমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নিল। তারপর আলমারি আর সিন্দুক খুলে তার ভিতরে বেশ ভাল করে হাত আর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর দেরাজ সমেত টেবিলটাকে পরীক্ষা করল, খাটের তোষকের নীচে দেখল, খাটের নীচে দেখল, ট্রাঙ্কের ভিতর দেখল (তাতে একজোড়া পুরনো জুতো আর একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছু নেই)। তারপর প্রত্যেকটা বাজনা আলাদা করে হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করে নেড়ে চেড়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার ফাঁপা বা ফোলা অংশে চাবির গর্ত আছে কি না দেখে আবার ঠিক যেমনভাবে রাখা ছিল তেমনিভাবে রেখে দিল। তারপর ঘরের মেঝে আর দেয়ালের প্রত্যেকটা জায়গা আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল। সমস্ত ব্যাপারটা করতে তার লাগল পনেরো মিনিট। তারপর আরও সাত মিনিট লাগল অন্য দুটো ঘর আর বাথরুম দেখতে। সবশেষে আবার রাধারমণবাবুর ঘরে ফিরে এসে বলল, 'মণিমোহনবাবু, আপনাদের মালিটিকে একবার ডাকুন তো।'

মালি এসে ফেলুদা তাকে দিয়ে ঘরের জানালায় রাখা দুটো ফুলের টব থেকে মাটি বার করিয়ে তাতে কিছু নেই দেখে আবার মাটি ভরিয়ে ফুল সমেত টব জানালায় রাখল।

এর মধ্যে অনুকূল বসবার ঘর থেকে চারটে চেয়ার এনে তার সামনে একটা গোল টেবিল পেতে তার উপর লেবুর সরবত রেখে গেছে। সরবতে চুমুক দিয়ে মণিবাবু বললেন, 'কিছু বুঝলেন ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'এতগুলো বাজনা এক সঙ্গে না থাকলে এঘরে যে কোনও অবস্থাপন্ন লোক বাস করত সেটা বিশ্বাস করা কঠিন হত।'

'সেই তো বলছি,' মণিবাবু বললেন, 'সাধে কি আপনাকে ডেকেছি! আমি তো একেবারে বোকা বনে গেছি মশাই।'

আমি বাজনাগুলোর দিকে দেখছিলাম। তার মধ্যে সেতার সরোদ তানপুরা এসরাজ তবলা বাঁশি—এগুলো আমি চিনি। অন্যগুলো আমি কখনও চোখেই দেখিনি। ফেলুদাও দেখেছে কি না সন্দেহ। সে মণিবাবুকে প্রশ্ন করল, 'সব ক'টা বাজনার নাম জানেন? ওই যে দেয়াল থেকে তারের যন্ত্রটা ঝুলছে, ওটার কী নাম?'

মণিবাবু হেসে বললেন, 'আমি মশাই একেবারে বেসুরো। আমাকে ও সব জিজ্ঞেস করলে কিন্তু ফাঁপরে পড়ব।'

একটা পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি সেই বন্দুকওয়ালা ছেলেটির সঙ্গে বছর চল্লিশের একজন ফরসা ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। মণিবাবু আলাপ করিয়ে দিতে জানলাম ইনিই হলেন ফুলের দোকানের মালিক অবনী সেন। ছেলেটির নাম হল সাধন। অবনীবাবু প্রদোষ মিত্তিরের নাম শুনেছেন জেনে ফেলুদা একটা ছোট্ট একপেশে হাসির সঙ্গে একটা গলা খাঁকরানি দিল। অবনীবাবু খালি চেয়ারটায় বসে মণিবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'ভাল কথা, আপনার কাকা কি কাউকে তাঁর কোনও বাজনা বিক্রি করার কথা বলেছিলেন ?'

'কই না তো!' মণিবাবু অবাক।

'কাল একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। এখানে কাউকে না পেয়ে

আমার বাড়িতে যান। আমি তাঁকে আজ আবার আসতে বলে দিয়েছি। আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনি হয়তো আসতে পারেন। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাশগুপ্ত। আপনার কাকার মতোই বাজনা সংগ্রহের বাতিক। রাধারমণবাবুর লেখা একটি চিঠি দেখালেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই লেখা। সেই চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক নাকি আগেই একবার দেখা করে গেছেন। আপনাদের চাকরও তাকে দেখেছে বলে বলল।'

'আমিও দেখেছি।'

কথাটা বলল সাধন। সে একটা টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো একটা বাজনার সামনে দাঁড়িয়ে তার পর্দার উপর আস্তে আস্তে আঙুল টিপে টুং টাং সুর বার করছে।

অবনীবাবু ছেলের কথা শুনে হেসে বললেন, 'সাধন প্রায় সারাটা দিনই এই বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে। দাদুর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল।'

'দাদুকে কেমন লাগত তোমার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'মাঝে মাঝে খারাপ।' সাধন আমাদের দিকে পিছন ফিরেই উত্তরটা দিল।

'খারাপ কেন?' ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল।

'খালি খালি সারেগামা গাইতে বলতেন।'

'আর তুমি গাইতে না?'

'না। কিন্তু আমি গাইতে পারি।'

'যত রাজ্যের হিন্দি ফিল্মের গান,' হেসে বলে উঠলেন অবনীবাবু।

'দাদু জানতেন তুমি গান গাইতে পারো?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমার গান শুনেছিলেন তিনি?'

'না।'

'তা হলে কী করে জানলেন?'

'দাদু বলতেন যার নামে সুর থাকে, তার গলায়ও সুর থাকে।'

কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না, তাই আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদা বলল, 'তার মানে ?'

'জানি না।'

'তোমার দাদুর গান তুমি শুনেছ ?'

'না। বাজনা শুনেছি।'

এই কথাটায় মণিমোহনবাবু যেন বেশ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'সে কী, সাধনবাবু! তুমি ঠিক বলছ ? আমি তো জানি উনি বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমার সামনে বাজিয়েছেন কখনও ?'

'সামনে না। আমি বাইরে ছিলাম, বাগানে। বন্দুক দিয়ে নারকোল মারছিলাম। উনি তখন বাজালেন।'

'অন্য কোনও লোক বাজায়নি তো ?' মণিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আর কেউ ছিল না।'

ফেলুদা বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে বাজনা শুনলে ?'

'না। বেশিক্ষণ না।'

ফেলুদা এবার মণিমোহনবাবুকে বলল, 'একবার আপনার অনুকূলকে ডাকুন তো।'

অনুকূল এসে হাত দুটোকে জড়ো করে দরজার মুখে দাঁড়াল। ফেলুদা বলল, 'তোমার মনিবকে সম্প্রতি কখনও বাজনা বাজাতে শুনেছ ?'

অনুকূল ভীষণ কাঁচুমাচু ভাব করে বলল, 'এজ্ঞে বাবু তো ঘরের ভিতরেই থাকতেন সর্বক্ষণ, তা সে কখন কী করতেন না করতেন...'

'তোমার সামনে বাজনা বাজাননি কখনও ?'

'এজ্ঞে না।'

'বাজনার আওয়াজ শুনেছ ?'

'এজ্ঞে তা যেন কয়েকবার...তবে কানে তো ভাল শুনি না...'

'মারা যাবার আগে একজন অপরিচিত লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি ? যিনি কাল সকালেও এসেছিলেন ?'

'তা এসেছিলেন বটে। এই ঘরে বসেই কথা বললেন।'